বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান

সম্পাদনা
মোশাররফ হোসেন খান

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশক

এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০

গ্রন্থস্বত্ব
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯৮

প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা

দাম : একশত পঁচাত্তর টাকা

Bangla Bhasha O Sahiytte Muslim Abodan, Edited by Mosharraf Hossain Khan, Published by A K M Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre, Kataban, Dhaka-1000 First Edition June, 1998   Price Taka 175.00 only.

www.pathagar.com

প্র স ঙ্গ ক থা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আর একটি শতাব্দী অতিক্রম করছে। শুধু কালের দিক থেকেই নয়, ইতিহাসের দিক থেকেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস—দীর্ঘতম এক ইতিহাস। এই ইতিহাসের সাথে যুক্ত হয়ে আছে মুসলিম অবদান প্রসঙ্গটিও। ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনের পরিবর্তে মুসলিম শাসন যখন বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন থেকেই সূচিত হলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিবর্তন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেছেন :

"১২০৩ খ্রীষ্টাব্দেই তুর্কীবীর ইখতিয়ারু-দ্-দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খল্‌জী হিন্দুরাজা লক্ষণ সেনকে লখনৌতী হইতে বিতাড়িত করিয়া, বাংলায় সংস্কৃত চর্চার মূলে কুঠারাঘাত হানিয়া বাংলা চর্চার পথ উন্মুক্ত করেন।"

মূলত ১২০৩ থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রযাত্রা শুরু। আর পলাশীর বিপর্যয়, অর্থাৎ ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত—এই সাড়ে পাঁচশ' বছর ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত অর্থে স্বর্ণকাল। এরপর ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে আবার নেমে এলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর ঘনঘোর কাল মেঘ। এই অশুভ কাল মেঘে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সূর্য আচ্ছাদিত ছিল ততদিন, যতদিন না তাদের শাসন ও শোষণের অবসান ঘটেছে।

পৃথিবীর আর কোনো ভাষার ওপর বাংলা ভাষার মত এত বিপর্যয় নেমে আসেনি। বাংলা ভাষা বারবার ধাক্কা খেয়েছে। আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। তবুও আজ যখন পেছনের দিকে তাকাই, তখন দেখি—এই বাংলা ভাষাতেই শ্রেষ্ঠ ফসলগুলি ফলেছে। সন্দেহ নেই, এর পেছনে অন্যতম অবদান—মুসলমানের। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে ক্রমোন্নতির দিকে ধাবিত হয়েছে, এর মুখ্য কারণ হলো সচেতনশীল মুসলিম লেখক, বিগত কালের মুসলিম শাসক এবং ইসলামপ্রচারকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা।

মুসলিম শাসক ও ইসলামপ্রচারকরা বাংলাকে যেমন রাজনীতি এবং ধর্মপ্রচারের জন্য ঐক্যবদ্ধ, সুসংহত করেছেন, ঠিক তেমনি তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় তখনকার লেখকদের হাতে অবহেলিত এবং মৃতপ্রায় এই বাংলা ভাষা নবজীবন লাভ করেছে।

www.pathagar.com

পলাশীর বিপর্যয়ের পর মুসলিম শাসকরা যেমন ক্ষমতা হারালেন, সেইসাথে বাংলা ভাষাও হয়ে পড়লো অভিভাবকহীন। ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গ্রন্থমালা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ইংরেজ ও ইংরেজ মদদপুষ্ট শিক্ষিত হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে বাংলা ভাষা জিম্মি হয়ে পড়লো। সেইসাথে যুক্ত হয়েছিল সুযোগসন্ধানী খ্রীস্টান মিশনারীদের বহুমুখী অপকৌশল।

মুসলমানদের চলছে তখন রাজনৈতিকভাবে চরম সংকটকাল। মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা তখনো তারা পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। এই সুযোগে হিন্দু ব্রাহ্মণ এবং খ্রীস্টানরা মুসলমানদের সযত্নে লালিত বাংলা ভাষার শরীর থেকে তাদের ঐতিহ্যাশ্রিত শব্দকে ছুড়ে ফেলে সংস্কৃতনির্ভর এক ব্রাহ্মণ্য ভাষার জন্ম দিল। এই ভাষায় রচিত হলো তাদের যাবতীয় গ্রন্থ এবং তা ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশ করে ছড়িয়ে দিল সর্বত্র। গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, অভিধান, ব্যাকরণসহ পাঠ্যপুস্তকের ভাষাও হয়ে গেল সংস্কৃতনির্ভর। সত্য বলতে, এই ব্রাহ্মণ্যভাষার নাগপাশ থেকে আজও আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত নই। হিন্দু ব্রাহ্মণরা সচেতনভাবে যে সংস্কৃত ভাষার বীজ বপন করে গেছেন, আজকের অনেকেই তো সেই ভাষাই চর্চা করে যাচ্ছেন। পশ্চিম বাংলার হিন্দু লেখকরা যে ভাষা এদেশের মানুষকে শিখিয়েছেন, এখনো এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষ চেতনে-অবচেতনে সেই ভাষারই লালন ও পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন।

অথচ আমাদের বুঝা উচিত, ভৌগোলিক দিক দিয়েই আমরা কেবল ভারত থেকে পৃথক নই। আমরা পৃথক—ভাষা, সাহিত্য, জাতি, ধর্ম, ঐতিহ্য এবং আবেগের দিক দিয়েও। ভারতের সাথে আমাদের পার্থক্য সামান্য নয়, বরং আকাশ-পাতাল। এই পার্থক্য চিরন্তন। এই পার্থক্য এবং প্রভেদ মনের, চিন্তার, ধর্মের, আচার-অনুষ্ঠানের, ভাষার, ঐতিহ্যের, কর্মের, নামের, জীবনাদর্শের, আদব-লেহাজের, সাহিত্য ও সংস্কৃতির।

পলাশীর প্রান্তরে মুসলমানদের যদি বিপর্যয় না ঘটতো, তাহলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হতো হয়তোবা অন্যভাবে। সংস্কৃত নয়, বরং বাংলা ভাষাই হতো হিন্দু-মুসলমানদের একক ভাষা। পলাশীতে আমরা কেবল ক্ষমতাই হারাইনি—আমরা হারিয়েছি আমাদের ভাষা, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং আমাদের গৌরবগাথা ঐতিহ্য।

বাংলা ভাষার ওপর বারবার আঘাত এসেছে, তবুও শেষ পর্যন্ত এই মুসলমানরাই, এই ঐতিহ্যবাদী লেখকরাই আবার ঠিকই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হাল ধরে এগিয়ে গেছেন। আর আজ, পেছনে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি, ঐতিহ্যবাদী সেইসব সংগ্রামী অগ্রজেরা আমাদের জন্য নির্মাণ করে গেছেন একটি আলোকিত পর্বত।

www.pathagar.com

দুই

আমাদের অনেকের ভেতর এক ধরনের অনাবশ্যক হীনমন্যতা কার্জ করে। ভাবেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সম্ভবত মুসলমানদের কোনো অবদানই নেই। বলাবাহুল্য, ভাবনাটি সম্পূর্ণ অমূলক এবং মিথ্যা। প্রকৃত সত্য হলো, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান রয়েছে অপরিসীম। বলতে দ্বিধা নেই, এ ধরনের হীনমন্যতার জন্য দায়ী আমাদের অজ্ঞতা, পরানুকরণ এবং শেকড়ের দিকে ফিরে তাকানোর অনীহা কিংবা অলসতা। সেইসাথে রয়েছে, আমাদের নিজস্ব গৌরবকে বিস্মৃত করার জন্য বিপরীতমুখী তৎপরতার প্রবল প্রতাপ। অবশ্য এর আর একটি কারণও আছে, আর সেটি হলো—আমাদের সামনে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান' সম্পর্কিত তেমন কোনো সহজলভ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ নেই।

এই অভাব এবং বেদনাবোধ থেকেই 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান' শীর্ষক একটি জাতীয় সংকলন-গ্রন্থের আয়োজন। এটা কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নয়। কিন্তু ইতিহাসগ্রন্থ না হলেও, ইতিহাসআশ্রিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদানের একটি প্রামাণ্য চিত্র তো বটেই।

তিন

গ্রন্থটি সম্পাদনার জন্য প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে লেখা সংগ্রহের কাজ শুরু করতে গিয়ে প্রচুর মূল্যবান লেখার সাথে পরিচিত হয়েছি। বিস্মিত হয়েছি লেখার পরিমাণ দেখে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদানের ওপর রচিত হয়েছে অসংখ্য লেখা। বিশেষ করে এই শতকের বিশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত অসংখ্য ঐতিহ্যবাদী-শেকড়সন্ধানী লেখক প্রচুর লিখেছেন। গ্রন্থের কলেবরের দিকে লক্ষ্য রেখে বিপুলসংখ্যক লেখা থেকে এখানে মাত্র অল্পকিছু লেখা নির্বাচন করতে হলো। লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান' শীর্ষক বিষয়কে। তবে বাংলা ভাষার ইতিহাস এবং ইতিবৃত্ত সম্পর্কেও কিছুটা আলোকপাত থাকছে। গ্রন্থভুক্ত লেখাগুলো চারটি পর্বে বিন্যস্ত করা হয়েছে— ১. বাংলা ভাষায় মুসলিম অবদান, ২. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান, ৩. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান। এই তিনটি অধ্যায়ের মাধ্যমে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের একটি সারসংক্ষেপ চিত্র ফুটে উঠেছে। চতুর্থ পর্বে থাকছে 'পরিশেষ'। 'পরিশেষ' অংশে সংযোজিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ, আবুল ফজল ও মোহিতলাল মজুমদারের কয়েকটি চিঠি। আমাদের চলমান সাহিত্য ও ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপটে এই চিঠিগুলোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।

www.pathagar.com

এই গ্রন্থের অধিকাংশ লেখা সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন রচনাবলী, সাহিত্য পত্রিকা, সাহিত্য সংকলন ও সাময়িকী থেকে। 'লেখা-পরিচিতি'তে এর যথাযথ উল্লেখ আছে। তবুও গ্রন্থের শেষে একটি সংক্ষিপ্ত 'গ্রন্থপঞ্জি' দেয়া হলো।

এ ধরনের সংকলনগ্রন্থে বানানসংক্রান্ত কিছুটা সমস্যা থেকেই যায়। কারণ বিভিন্ন সময়ের লেখকের লেখা এখানে সংকলিত হয়েছে। তবে লেখককৃত বানানই রেখে দেয়াকে সঠিক বলে মনে করেছি। সুতরাং এক্ষেত্রে বানানের ভিন্নতা চোখে পড়া স্বাভাবিক।

যাদের লেখার সমন্বয়ে এই গ্রন্থ—তাঁদের অনেকেই ইন্তিকাল করেছেন। যারা ইন্তিকাল করেছেন—তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। আর যারা জীবিত আছেন, তাঁদের অনেকের সাথে অনিবার্যকারণে যোগাযোগ এবং অনুমতি গ্রহণের সুযোগ হয়নি। তবুও আশা করি, একটি জাতীয় দায়িত্ব পালনে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা বিবেচনা করে এই অপারগতাটুকু ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন।

চার

পরিশেষে একটি ঋণস্বীকার না করলেই নয়। কারণ, এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ কিছুতেই সম্ভবপর হতো না—যদি বিশিষ্ট লেখক, ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সম্মানিত পরিচালক, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদের আন্তরিক সদিচ্ছা না থাকতো। মূলত তিনিই আমাকে এ ধরনের একটি জাতীয় গ্রন্থ সম্পাদনার সুযোগ, প্রয়োজনীয় পরামর্শ, উৎসাহ এবং দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে তাঁর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এ কাজে আরও যারা আন্তরিকভাবে শ্রম ও সময় দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি শুকরিয়া জানাচ্ছি সেই মহান রাব্বুল আলামীনকে, যিনি তাঁর অপার রহমতের দরোজা খুলে না দিলে আমার মতো এক নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে এ ধরনের কাজ সম্পাদন করা ছিল একেবারেই দুরূহ।

এই গ্রন্থের মাধ্যমে জাতি যদি কিছুটা হলেও উপকৃত হয়, তাহলে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

১৩/ সি, দক্ষিণ খিলগাও, ঢাকা
১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮

মোশাররফ হোসেন খান

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বাংলা ভাষায় মুসলিম অবদান

বঙ্গভাষায় মুসলমানী সাহিত্য ॥ আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ ১১
বাংলা ভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান ॥ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৪
বঙ্গ-ভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব ॥ শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন ১৮
মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি ॥ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ৩১
বাংলা ভাষা ও বাঙালী মুসলমান ॥ সৈয়দ এমদাদ আলী ৩৪
আমাদের ভাষাসমস্যা ॥ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ৪০
বাংলা ভাষার নূতন পরিচয় ॥ গোলাম মোস্তফা ৪৮
বাঙ্গালীর মাতৃভাষা ॥ খাদেমোল এসলাম বঙ্গবাসী ৬৮
নূতন দৃষ্টিতে পুরানো বাংলা ॥ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ৭১
বাংলা ভাষা : উৎসের দিকে ॥ নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান ১০৩
বাংলা ভাষার পথ-পরিক্রম ॥ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১১৫
বাংলা ভাষা ॥ সৈয়দ আলী আহসান ১২১
বাংলা ভাষার বিকাশে মুসলমানদের অবদান ॥ ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ ১২৬
বাংলা লিপি ও বাংলা ভাষার আদি নীড় ॥ মুহম্মদ আবূ তালিব ১৫০
বাংলা ভাষার বিকাশে মুসলমানদের অবদান ॥ সিরাজুল ইসলাম ১৬৭

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান

বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যিক জাগরণ ॥ আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ ১৭৯
বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ॥ আবদুল গফুর সিদ্দিকী ১৮৬
বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী মুসলমান ॥ এস, ওয়াজেদ আলী ১৮৯
সাহিত্যের রূপ ॥ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৩
মোসলেম বঙ্গ-সাহিত্য ॥ শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী ২০৭
বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান ॥ কাজী নজরুল ইসলাম ২১০
সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য কেন ॥ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ২১৩
সাহিত্য ও যুগধর্ম ॥ আবুল মনসুর আহমদ ২১৯
বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যসেবা ॥ কাজী আবদুল ওদুদ ২২৪
সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা ॥ আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন ২৩০

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান ॥ নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান ২৩৬
বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব ॥ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ২৬১
বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের সূচনাপর্ব ॥ মুহম্মদ আবদুল হাই ২৭১
বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব ॥ আবদুস সাত্তার ২৭৪
আমাদের সাহিত্য ॥ আল মাহমুদ ২৮২
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা ॥ আফজাল চৌধুরী ২৮৭
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশে মুসলমানদের অবদান ॥ আবদুল মান্নান সৈয়দ ২৯৬

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান

ভাষার উৎপত্তি ও সাহিত্যের গতি ॥ মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর) ৩১১
মুসলিম সাহিত্য সমাজ ॥ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ৩১৫
বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য ॥ মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী ৩২০
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানের স্থান ॥ মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন ৩২৪
বাংলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য ॥ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ৩৩৬
আমাদের ভাষা ও সাহিত্য ॥ তসদ্দুক আহমদ ৩৪৩
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমান ॥ আব্বাস আলী খান ৩৪৬
ভাষা সংস্কৃতি জাতীয়তা ॥ শাহেদ আলী ৩৫৫
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমান ॥ ডক্টর আসকার ইবনে শাইখ ৩৬১
একশত বছরের সাহিত্য ॥ ডক্টর গোলাম সাকলায়েন ৩৬৯
শতাব্দীর মুসলিম বাংলা সাহিত্য ॥ শাহাবুদ্দীন আহমদ ৩৮৩
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-চর্চায় মুসলমান ॥ ডক্টর মোমেন চৌধুরী ৩৯২
বাঙ্লা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানের দান ॥ ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহমান ৩৯৭
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান ॥ অধ্যাপক আবু জাফর ৪০৮

পরিশেষ

বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানী শব্দ ॥ রবীন্দ্রনাথ ও আবুল ফজলের পত্র ৪১৯
একখানি পত্র ॥ শ্রী মোহিতলাল মজুমদার ৪২৬
গ্রন্থপঞ্জি ৪৩১

www.pathagar.com

বাংলা ভাষায়
মুসলিম অবদান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বঙ্গভাষায় মুসলমানী সাহিত্য

আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ১৮৬৯ (১৫ আশ্বিন, ১২৩১, চট্টগ্রাম। **মৃত্যু ঃ** ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩। **শিক্ষা ঃ** এফ, এ, ক্লাসে অধ্যয়ন। **পেশা ঃ** কারণিক,ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্, ১৯০৬-৩৪।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রবন্ধ ও গবেষণা ঃ আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সহযোগে ১৯৩৫), ইসলামাবাদ (সৈয়দ মুর্তজা আলী সম্পাদিত- ১৯৬৪)। **সংকলন ঃ** বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ (প্রথম খণ্ড ১৯১৩, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯১৪), পুথি পরিচিতি (ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ১৯৫৮)।

লেখা-পরিচিতি ঃ লেখাটি 'নবনূর' আষাঢ় ১৩১০ সালে প্রকাশিত।

পৃথিবীর সভ্য ও অসভ্য সকল জাতিরই এক একটা নিজস্ব ভাষা ও সাহিত্য আছে। দেশ প্রচলিত ভাষাই কোন জাতির মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানদের সকলের মধ্যে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষা 'মাতৃভাষার' স্থানাধিকার করিয়া নাই। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাষা মুসলমান-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, বাঙ্গালার অন্যতম অধিবাসী হিন্দুগণের সহিত একতার কথা দূরে থাকুক, বাঙ্গালা মুসলমানদের মধ্যেও একটা ভাষাগত একতা সংস্থাপিত হইতে পারিতেছে না; এবং এই একতার অভাবই বাঙ্গালীর জাতীয় শক্তি বিকাশের একটা প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অস্বাভাবিক অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা কি কর্ত্তব্য নহে?

বাঙ্গালী হিন্দুর সহিত আমরা সর্ব্বোতভাবে এক দশাপন্ন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সমান অধিকার। কত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আজ হিন্দুগণ বাঙ্গালীজাতির নেতৃত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন। সুসময়ের উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে পারিলে ফল লাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। রাজা রামমোহন, ভূদেব, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি স্বনামধন্য মহাত্মাগণের ঐকান্তিক সাধনা ফলপ্রসূ না হইয়া যাইবে কেন? তাঁহাদের উদ্দীপনায় মোহনিদ্রা টুটিবে না ত কি? হিন্দুজাতির এই অভ্যুত্থানে বঙ্গভাষার কার্য্যকারিতা কে অস্বীকার করিবে? জাতিবিশেষকে স্বকর্ত্তব্যে প্রণোদিত করিবার পক্ষে জাতীয় সাহিত্যই এক প্রধান উপায়। বস্তুতঃ কোন জাতিকে মন্ত্র বিশেষে দীক্ষিত করিতে হইলে জাতীয় ভাষা ও জাতীয় ভাষা দ্বারাই সেই মন্ত্র দিতে হয়। কিন্তু আমাদের সেই ভাষাই কই? সেই মন্ত্রদাতাই কই? দেশে ভাষা ও সাহিত্য যাহা আছে, তাহাকে আমরা পর বলিয়া অবহেলা করিয়াছি এবং করিতেছি—অথচ নিজ চেষ্টায়ও নিজস্ব জাতীয় সাহিত্যের গঠন করি নাই। আমরা কোথায় পাই উদ্দীপনা! কোথায় পাইব মন্ত্র! লোক যে মাটীতে আছাড় পড়ে, তাহার পক্ষে সেই মাটী ধরিয়া উঠাই নিয়ম কিন্তু আমরা বাঙ্গালা ভাষা ত্যাগ

www.pathagar.com

করিয়া সেই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম করিতেছি। আমাদের দুর্দ্দশা না হইবে, ত হইবে কাহার ?

বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানের কিছুই নাই, বলিয়া যাঁহারা আক্ষেপ করেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কেবল কি নাই, নাই বলিয়া চীৎকার করিলেই আমাদের নিজস্ব একটা ভাষা হইবে? না , অবশ্য চেষ্টা করিতে হইবে? কিন্তু কই চেষ্টা? কই চেষ্টা করিবার লোক? যাঁহাদের শক্তি সামর্থ্য আছে, তাঁহাদের দৃষ্টি নাচ-গানে, অর্থের দিকে এবং উপাধির দিকে। সভা করিয়া বক্তৃতার চোটে গগন বিদীর্ণ করিলে ত 'কিছু নাই' কখনই 'কিছু' হইবে না। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িয়া পাথর ছেদ করিতে পারে; একটু একটু কাজ করিয়া কি আমরা কিছুই করিতে পারি না? কিন্তু যার মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা হইবে কেন? আমাদের যখন কোন নির্দ্দিষ্ট ভাষা নাই, তখন চেষ্টা করিব কোন্ ভাষায়? উর্দ্দূ, পারস্য ইত্যাদি আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের মাতৃভাষা বা জাতীয়ভাষা স্বীকার করিলেও, বর্ত্তমান কালে তাহাদিগকে সমগ্র বাঙ্গালাভাষা স্বীকার না করিলে কোন প্রত্যবায় নাই এবং সত্যেরও অপলাপ হয় না। তাহাদিগকে আমরা সসম্মানে জাতীয় ধর্ম্মভাষার আসনে বসাইয়া রাখিতে প্রস্তুত আছি। মাতৃভাষা জাতীয় ভাষার স্থানীয় না হইলে কোন জাতির অভ্যুদয়ের আশা করিতে যাওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যাক্ অতকথা। প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, পূর্ব্বকালে হিন্দুদের মত বঙ্গীয় মুসলমানগণও একটা নিজস্ব বাঙ্গালাসাহিত্য গঠনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। সে ক্রম অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করিতে পারিলে আজ আমাদিগকে "বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমান পাঠ্য কিছুই নাই" বলিয়া হা হুতাশ করিতে হইত না। এ অকিঞ্চন লেখক আজ বহু বৎসর ধরিয়া প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের আলোচনায় ব্যাপৃত। তাঁহার গবেষণার ফল সমস্ত প্রকাশিত হইলে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, বস্তুতই মুসলমানদেরও একটা স্বজাতীয় ভাষা বাঙ্গালায় গঠিত হইতেছিল। সেই ভাষাই 'মুসলমানী বাঙ্গালা' আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া আসিতেছে। মধ্যে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আমরা লক্ষ্মীছাড়া হওয়ার পর ইংরেজ সমাগমে নূতন কুহকে পড়িয়া সেই লক্ষ্যচ্যুত হই, তাহাতেই আমাদের এই সর্ব্বনাশ। আমাদের মধ্যে কতকগুলি লোকের বিশ্বাস যে, হিন্দুর বিপরীত আচরণ করিতে পারিলেই আমাদের পবিত্র স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করা হইল। তাহাই ত হিন্দুর ভাষা বাঙ্গালাকে অবহেলা করিয়া আজ আমরা সকলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া! আজও সে ভ্রান্তি সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।

বলিতে কি, বাঙ্গালাভাষা ত্যাগ করিলে বঙ্গীয় মুসলমানে কোন মঙ্গল আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। যদি কখনো অধঃপতিত বাঙ্গালীর উদ্বোধন হয়, তবে বাঙ্গালার অমৃতনিষ্যন্দিনী বাণী ও অনলগর্ভা উদ্দীপনাতেই হইবে। তবে শতবার স্বীকার করিব যে, সেইরূপ স্বজাতীয় ভাষা আমাদিগকে গঠন করিয়া লইতে হইবে। সকলে সমবেত চেষ্টা করিলে তাহাতে সফলকাম হইব না কেন, তাহার সদুত্তর নাই। জগতে চেষ্টার অসাধ্য কি আছে ?

www.pathagar.com

নূতনকে বরাবরই প্রাচীনের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু আমরা কি করিতেছি? জাতীয় গৌরব হৃদয়ঙ্গমে অক্ষম না হইলে কোন জাতির প্রকৃত অধঃপতন হইতে পারে না। কি পরিতাপ, আমরা এতদূর অধঃপাতে গিয়েছি যে, আমাদিগের কি ছিল, না ছিল, তাহা দেখিবার প্রবৃত্তিও কাহারো হইতেছে না! উন্নতিই বল, আর স্বজাতীয় সাহিত্যই বল, তাহা কি আপনিই হয়। বিলুপ্ত প্রায় প্রাচীন সাহিত্যের এখনো যাহা আছে, তাহা রক্ষা করিয়া তাহাকে সহজেই আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তিস্থানীয় করিতে পারি, এবং সেই প্রাচীন ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া আমরা স্বজাতীয় সাহিত্যের নূতন গৃহ-পত্তন করিতে পারি। এই নবীন গৃহের সাজসজ্জা শোভা সৌন্দর্য বর্দ্ধনে সকলের কঠোর সাধনা চাই। কারণ "যতন নহিলে, কোথা মিলবে রতন।" সকলে একাগ্র মনে একবার এই সাধনায় প্রবৃত্ত হউন, দেখিবেন বঙ্গভাষায় মুসলমানী সাহিত্য সৃষ্ট হইতে বেশী দিন বিলম্ব হইবে না। মঙ্গলময় আমাদের সহায় হইবেন। যেইদিন আমাদের মতিগতি এই শুভকার্য্যের দিকে ফিরিবে, সেইদিন বঙ্গীয় মুসলমানজাতির জীবনে নবযুগের অবতারণা হইবে। তদ্ব্যতীত কেবল ফাঁকা গলাবাজিতে কিছুই ফলোদয় হওয়ার নহে।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ আগস্ট, ১৮৭৫, আড়ালিয়া গ্রাম, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম। মৃত্যু ঃ ২৪ অক্টোবর, ১৯৫০। শিক্ষা ঃ ১৮৯৫ সালে হুগলী মদ্রাসা থেকে সনদ লাভ। পেশা ঃ শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা ও সম্পাদনা।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রবন্ধ/ইতিহাস ঃ ভারতে মুসলমান সভ্যতা, নিজামউদ্দীন আউলিয়া, তুরস্কের সোলতান, ভারতে ইসলাম প্রচার, মুসলমানদের অভ্যুত্থান, সমাজ সংস্কার, খগোল শাস্ত্রে মুসলমান, ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান, আওরঙ্গজেব, মোসলেম বীরাঙ্গনা, কুরআনে স্বাধীনতার বাণী, ইসলামের উপদেশ, তুরস্কের বৃহৎ ইতিহাস, এসলাম জগতের অভ্যুত্থান প্রভৃতি।

লেখা-পরিচিতি ঃ 'বঙ্গীয় মোসলমান ও উর্দ্দূ সমস্যা' শিরোনামে আশ্বিন, ১৩২৪ সালের 'আল-এসলাম' পত্রিকায় প্রকাশিত।

বঙ্গীয় মোসলমানগণের পক্ষে উর্দ্দূ শিক্ষা করা সঙ্গত বা প্রয়োজনীয় কিনা, এই বিষয় লইয়া কিছুকাল হইতে আমাদের মধ্যে দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে। একদলের মত—উর্দ্দূ মোসলমানি ভাষা, আরবী বর্ণমালা অবলম্বনে, প্রধানতঃ আরবী, পারসী সম্পদ লইয়া গঠিত, উর্দ্দূতে এস্লাম সংক্রান্ত বহু বিষয় প্রচারিত হইয়াছে, উর্দ্দূর সাহায্যে ভারতের সর্ব্বত্র ভাবের বিনিময় চলিতে পারে এবং কাজ কারবারের পক্ষে তাহা সাহায্যকারী হইতে পারে, অতএব ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের মোসলমানের পক্ষে উর্দ্দূকে মাতৃভাষারূপে বরণ করা এবং তৎ বিস্তারে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আর একদল লোকের মত—উর্দ্দূ একটি প্রাদেশিক ভাষা মাত্র। উর্দ্দূর ন্যায় প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে এক বা একাধিক ভাষা প্রচলিত আছে, বাঙ্গালাদেশের ভাষা বাঙ্গালা। যে প্রদেশের যে ভাষা, সেই ভাষা শিক্ষা করা তৎপ্রদেশবাসীদের পক্ষে অনিবার্য্য, তদ্ব্যতীত গত্যন্তর নাই, কারণ তাহাদিগকে কথোপকথনে, পরস্পর ভাবের বিনিময়ে, পত্র ব্যবহার, খাতাপত্রে, হিসাব নিকাশে অফিস আদালতের কাজকর্ম্মে, দলিল দস্তাবিজে সর্ব্ববিষয়ে তাহাদিগকে নিজেদের মাতৃভাষা-বাঙ্গালার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, সুতরাং তাহাদের পক্ষে মাতৃভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা না করিয়া উপায়ান্তর নাই, অতএব উহা প্রয়োজনীয়। বঙ্গীয় মোসলমানের পক্ষে উর্দ্দূশিক্ষা করার কোনই প্রয়োজন নাই, কারণ একে ত উর্দ্দূ যে বঙ্গদেশে মাতৃভাষারূপে প্রচলিত হইবে তাহা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক, তদুপরি তৎশিক্ষা দ্বারা ভাষার বোঝা বাড়ান ব্যতীত তাহাতে আর সার্থকতা কি আছে। উর্দ্দূ ভাষা এত উন্নত নহে যে, তাহার আদর্শ গ্রহণ [করিবার] জন্য বাঙ্গালী মোসলমানকে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। ধর্ম্মসংক্রান্ত ও জাতীয় বিষয় জানিবার জন্য মোসলমানের পক্ষে উর্দ্দূর পরিবর্ত্তে আরবী শিক্ষা করাই যথেষ্ট এবং শ্রেয়স্কর। উর্দ্দূ শিক্ষা করিতে যে সময় লাগিবে সে সময়ে আরবী শিক্ষাই অধিক

www.pathagar.com

লাভজনক। উর্দ্দূ সাহিত্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক ভিত্তিহীন, গাঁজাখোরী বিষয় স্থান পাইয়াছে, উর্দ্দূ জানা লোকেরা ঐ সকল রাবিশ বিষয়গুলি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালাসাহিত্যের কলুষবৃদ্ধি ও গৌরব নষ্ট করিতেছে, পক্ষান্তরে তদ্দ্বারা নানারূপ কুসংস্কার ও ধর্ম্মবিগর্হিত ভ্রম বিশ্বাস বঙ্গীয় মোসলেম সমাজে সংক্রমিত ও বদ্ধমূল হইয়া পড়িতেছে ইত্যাদি। এ সকল হইল উর্দ্দূ বিরোধী পক্ষের দলিল।

আমরা উভয় পক্ষের এরূপ আরও অনেক যুক্তিতর্কের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু আমরা কোন পক্ষের মতকেই সম্পূর্ণরূপে অবলম্বনীয় বা বর্জ্জনীয় বলিয়া ধারণা করিতে পারি না। যাহারা উর্দ্দূ-ভাষাকে ভারতের সর্ব্বত্রে বিস্তৃত করিতে অভিলাষী, নিজেদের ভাষার প্রভাব প্রতিপত্তি বর্দ্ধন করিতে লালায়িত, আমরা তাঁহাদের উদ্যম আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ বিস্তার শতমুখে প্রশংসা করিতে বাধ্য, এবং আন্তরিক সহানুভূতির সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত জাতি উত্থান ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, সে সকল জাতি সুসভ্য জাতি নামে অভিহিত হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছে, তাহারা যে নিজেদের জাতীয়সাহিত্য বা মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনও উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারেন নাই একথা বলাই বাহুল্য। জাতীয়জীবন গঠন ও জাতীয় অভ্যুত্থান সাধনে ভাষার কতটা অধিকার, তাহা জাতি গঠনতত্ত্ব সমালোচকগণের অবিদিত নাই। জাতীয়সাহিত্য ও মাতৃভাষার আশ্রয় না লইয়া আজ পর্য্যন্ত জগতে কোন সুসভ্য জাতির অভ্যুত্থান হইয়াছে এরূপ প্রমাণ জগতের ইতিহাসে আছে কিনা সন্দেহ।

অতএব যে সাহিত্যের উপর জাতির জীবন ও মরণ, যে ভাষার উপর জাতির উত্থান ও পতন নির্ভর করিতেছে, সে সাহিত্যের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যাহারা প্রয়াসী তাহারা যে নিরপেক্ষ বিচারে ধন্যবাদের পাত্র তাহতে কোন সন্দেহ নাই। যে সকল লোক উর্দ্দূ সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় জীবন গঠনের জন্য যত্নবান, তাহারা মোসলমান সমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র। তবে কথা এই যে, এক প্রদেশের ভাষা অন্য প্রদেশের মোসলমানগণের গ্রহণীয় ও মাতৃভাষা রূপে তাহা বরণীয় কিনা, ইহাই যা কিছু জটিল সমাস্যার বিয় [বিষয়]। এই সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহা যদি কার্য্যতঃ সম্ভবপর হয় তাহা হইলে তাহা অবশ্য সানন্দে অবলম্বনীয়, কারণ তদ্দ্বারা জাতীয় শক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত ও দৃঢ়তর হইবে। কিন্তু জগতের ইতিহাস এবং বর্ত্তমান অবস্থা আমাদিগকে এ কথা বলিতে বাধ্য করিতেছে যে, কোন একটি দেশ বা প্রদেশের ভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া সেখানে আর একটি ভিন্ন ভাষার প্রচলণ করা সম্ভবপর নহে।

আরবরা বহুকাল ব্যাপিয়া পারস্যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেখানে আরবী সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধন করেন। এমন কি মোসলেম সমাজে যত বড় বড় এমাম, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত এবং জগত প্রসিদ্ধ ফকিহ, মোহাদ্দেছ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের শতকরা ৯০ জনেরও অধিক পারস্য বা তুর্কিস্থানের অধিবাসী কিন্তু গত ১৩ শত বর্ষের মধ্যে পারস্য ও তুর্কিস্থানের ভাষা আরবীতে পরিণত হইতে পারিল না, মিশর সহস্রাধিক বৎসর আরবদিগের শাসনাধীন থাকা সত্ত্বেও তত্রত্য প্রাচীন কিবতী ভাষা পরিবর্ত্তিত হইল

www.pathagar.com

না। স্পেনে আরবদিগের ৭০০ বর্ষকাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু তত্রত্য ভাষা বিলুপ্ত এবং তাহার স্থান আরবী সাহিত্য অধিকার করিতে পারে নাই। হিজরী ৪৪ সাল হইতে ভারতে আরব ও ইরানী তুরানীদের প্রভাব বিস্তারলাভ করিতে থাকে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক মোসলমানগণের রাজত্ব ভারতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ভারতের ভাষা আরবী কিম্বা পারসী বা তুর্কী তুর্কী হইতে পারে নাই। ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের স্থান আরবী পারসী অধিকার করিতে পারে নাই।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগ বিশেষতঃ সম্রাট শাহজাহনের আমল হইতে-পারসী ও হিন্দিভাষার সংমিশ্রণে উর্দ্দূ নামক যে কথ্য ভাষার প্রচলন হইয়াছিল, তাহা ভারতের সর্ব্বত্র দূরে থাকুক, উর্দ্দূ ভাষা জন্মস্থান-দিল্লী, আগ্রা, লাহোর ও লক্ষ্মৌ প্রভৃতি মোঘল রাজধানী সমূহেও সম্পূর্ণরূপে দেশীয় ভাষা হিন্দি বা কায়থির স্থানে অধিকার করিতে পারে নাই। অমুসলমানের কথা বলিতে চাহিনা, মোসলমানগণও দেশের পূর্ব্বভাষা ত্যাগ করিতে পারে নাই। আজও দিল্লী লক্ষ্মৌ ও আগ্রা অঞ্চলের ব্যবসায়ী ও জনসাধারণ উর্দ্দূতে কথা বলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের খাতাপত্র ও দলিল দস্তাবিজ এবং চিঠিপত্র প্রায় হিন্দি বা কায়থি ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে। একটি দেশ বা প্রদেশের প্রচলিত জনসাধারণের মাতৃভাষা পরিবর্ত্তিত হওয়া বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে অসম্ভব না হইলেও কার্য্যত ব্যবহারিক জগতে তাহা অসম্ভব।

এই সিদ্ধান্তের প্রতি নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে পারি, দেশময় উর্দ্দূভাষার প্রসার ও বিস্তৃতি একান্ত বাঞ্ছনীয় হইলেও তাহাতে কোন প্রদেশের মাতৃভাষায় পরিণত করা সম্ভবপর হইবে না। পাঞ্জাবের গুরুমুখী, সীমান্ত প্রদেশের পশত, বোম্বায়ের গুজরাট, মাদ্রাজের তামিলী ও তেলেঙ্গী, মাড়ওয়ারের কায়থী, উড়িষ্যার উড়িয়াই, বাঙ্গালার বঙ্গভাষা, আসামের আসামী ইত্যাদি প্রাদেশিক ভাষাসমূহ মোসলমান রাজত্বের সুদীর্ঘ ৭/৮ বৎসর মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে নাই, উর্দ্দূ পারসী তাহার স্থানাধিকার করিতে পারে নাই। কখনও পারিবে কিনা তাহাতেও ঘোর সন্দেহ।

এখন খাস আমাদের আলোচ্য বিষয় বাঙ্গালা ও বাঙ্গালাভাষার কথা বলিব। বঙ্গীয় মোসলমানগণের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, তাহারা বাঙ্গালায় কথপোথন করে, চিঠিপত্র, খাতা, দলিল-দস্তাবিজ, জমিদারী সেরেস্তার কার্য্যাদি সমস্তই বাঙ্গালাতে নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। মোসলমান আমলদারীতেও এ দেশে বাঙ্গালার প্রচলন ছিল। এখন এদেশে বাঙ্গালার স্থলে উর্দ্দূর প্রচলন করা সম্ভবপর কিনা ইহাই চিন্তার্য্য বিষয়। আমাদের মতে তাহা সম্ভব হইলে অতীব সুখের কারণ হইত, জাতীয় অভ্যুত্থানের পথে বঙ্গীয় মোসলমানদিগকে উর্দ্দূ ভাষা বিশেষ সাহায্য করিতে পারিত। কিন্তু আমাদের সে আশা নাই এবং তাহা সম্ভবপর বলিয়াও মনে করিনা, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বঙ্গীয় মোসলমানদিগের উর্দ্দূ শিক্ষা হইতে বিরত থাকিতে বলিতে পারি না, বরং শিক্ষিত বাঙ্গালী মোসলমানের পক্ষে ন্যূনাধিক উর্দ্দূ শিক্ষা করা একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া জ্ঞান করি।

www.pathagar.com

এখন বাঙ্গালী মোসলমানের পক্ষে উর্দ্দূ শিক্ষা করার বিরুদ্ধে যে আপত্তি আছে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমাদের মধ্যে অনেকেই বলেন, উর্দ্দূ ভাষা বাঙ্গালাভাষার ন্যায় উন্নত নহে, এমতাবস্থায় বাঙ্গালী মোসলমান নিজেদের উন্নত ভাষা ছাড়িয়া একটি অনুন্নত সাহিত্যের আশ্রয় লইবে কেন? উর্দ্দূতে বহু ভিত্তিহীন গাঁজাখুরী গল্প ও কেচ্ছা কাহিনীপূর্ণ পুস্তক বিদ্যমান, তাহাতে এস্‌লামবিরুদ্ধ অনেক বিষয় সন্নিবেশিত আছে। তাহা শিখিতে গেলে যে ঐ সকল ধর্ম্মবিগর্হিত ভ্রষ্টনীতি আমাদের মধ্যে সংক্রামক হইয়া পড়িবে। আমরা অধঃপাতে যাইব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালাকে ছাড়িয়া বা বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে উর্দ্দূ শিক্ষা করা হউক ইহার আমরা আদৌ সমর্থক নহি, এবং তাহা সম্ভবপর বলিযাও স্বীকার করি না। বাঙ্গালা বাঙ্গালাদেশের মাতৃভাষা, এই ভাষা ত্যাগ করিবার কোন উপায় নাই। তবে উর্দ্দূটা অতিরিক্ত ভাষারূপে শিক্ষা করা প্রয়োজনীয় ইহাই আমাদের বক্তব্য।

উর্দ্দূ সাহিত্য বাঙ্গালার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য ও অনুন্নত আমরা তাহা সম্পূর্ণাংশে স্বীকার করিতে পারি না। মাহকাব্য ও কাব্যের হিসাবে উপন্যাস, গল্প, প্রহসনের হিসাবে উর্দ্দূ বাঙ্গালার কাছে দাঁড়াতে পারে না একথা সত্য, এবং রাজনীতিক আলোচনা সমন্বিত ভাষার হিসাবেও উর্দ্দূ বাঙ্গালার তুলনায় নিম্নে পতিত, তাহাও আমরা স্বীকার করি, কিন্তু মোসলমানী বিষয় ও অন্যান্য অবস্থা লইয়া তুলনা করিলে উর্দ্দূর শ্রেষ্ঠতা ও প্রাধান্য প্রমাণিত হইবে। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কাব্যের অভাব থাকিলেও পারস্যভাষার শাহনামা, সেকান্দারনামা ইউসুফজোলেখা প্রভৃতি কাব্যের উর্দ্দূ অনুবাদ বিদ্যমান। ইউরোপের বহু উৎকৃষ্ট উপন্যাসের উর্দ্দূর অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

কোরআন শরিফের বহু তফসীর, কোরআনের শব্দতত্ত্ব, কোরআনের মর্ম্মতালিকা অর্থগত শ্রেণী বিভাগ, কোরআনের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তফসীর, কোরআনের সত্যতা ও অবিকৃতিত্ব এবং বিজাতীয় আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ইত্যাদি বিষয় উর্দ্দূ ভাষায় এত অধিক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে যে, তাহার বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। হাদিস সংক্রান্ত প্রায় সকল কেতাবের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিহাস সংক্রান্ত পুস্তকাবলী এখনও যথেষ্ট হইয়াছে বলিতে না পারিলেও বাঙ্গালা ইতিহাসের তুলনায় উর্দ্দূ অগ্রগামী এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত যে পুস্তক বাঙ্গালাভাষায় যেমন উল্লেখযোগ্য হয় নাই, উর্দ্দূরও সেই দশা। উপন্যাস ও কাব্যের হিসাবে, তুলনায় উর্দ্দূর দৈন্য স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু গীতিকাব্যতে উর্দ্দূ বাঙ্গালার তুলনায় অনেক উন্নত। রসায়ণ শাস্ত্র, অর্থনীতি ও আধুনিক জোতিষ শাস্ত্র সংক্রান্ত অনেক পুস্তক উর্দ্দূতে অনূদিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক গবেষণার হিসাবে উর্দ্দূ বাঙ্গালার তুলনায় উন্নত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

www.pathagar.com

বঙ্গ-ভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব

শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্মস্থান ঃ ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার ববজুড়ি গ্রামে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা কলেজ থেকে বি-এ পাস করে তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তাঁর অসাধারণ গবেষণার পরিচয় লাভ করে। স্যার আশুতোষ তাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের পদ দান করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "ডি-লিট্" উপাধিতেও ভূষিত করে। তাঁর "ফুল্লরা", "বেহুলা", "সতী", "জড়ভরত", "রামায়ণী কথা" প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত। তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল ও সাবলীল। "ময়মনসিংহ গীতিকা", "পূর্ববঙ্গ গীতিকা" প্রভৃতি সম্পাদন করে তিনি বিদেশ থেকে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর History of Bengali Language and Literature, Folk Literature of Bengal, Chaitainya and his Companions, Bengali Prose Style প্রভৃতি বহু ইংরেজী গ্রন্থও বিখ্যাত। কবি সমর সেন হচ্ছেন তাঁর পৌত্র। তিনি ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বেহালাস্থ (কলকাতায়) ভবনে প্রাণত্যাগ করেন।

লেখা-পরিচিতি ঃ বঙ্গ-ভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব, 'সওগাত'– এর ১৩৩৫ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

মুসলমান আগমনের পূর্বে বঙ্গভাষা কোনো কৃষক রমণীর ন্যায় দীনহীন বেশে পল্লী কুটিরে বাস করিতেছিল। এই ভাষাকে এ্যাণ্ডারসন, স্ক্রাইন, কেরী প্রভৃতি সাহেবেরা অতি উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। কেরী বলিয়াছেন, "এই ভাষার শব্দ সম্পদ ও কথার গাঁথুনি এরূপ অপূর্ব যে, ইহা জগতের সর্বপ্রধান ভাষাগুলির পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারে।" যখন কেরী এই মন্তব্য প্রকাশ করেন, তখন বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যের অপোগণ্ডত্ব ঘোচে নাই; সে আজ ১২৫ বৎসর হইল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এমন কোন ভাব নাই, যাহা অতি সহজে, অতি সুন্দর ভঙ্গিতে বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ না করা যায় এবং এই গুণেই ইহা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির সমকক্ষ। স্ক্রাইন বলিয়াছেন, "ইটালী ভাষার কোমলতা এবং জার্মান ভাষার অদ্ভুত ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি এই মধুরাক্ষরা এবং স্বচ্ছন্দগতি বাঙ্গলা ভাষায় দৃষ্ট হয়।"

এই সকল অপূর্ব গুণ লইয়া বাঙ্গলা ভাষা মুসলমান প্রভাবের পূর্বে অতীব অনাদর ও উপেক্ষায় বঙ্গীয় চাষার গানে কথঞ্চিত আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। পণ্ডিতেরা নস্যাধার হইতে নস্য গ্রহণ করিয়া শিখা দোলাইয়া সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি করিতেছিলেন এবং "তৈলাধার পাত্র" কিম্বা "পাত্রাধার তৈল" এই লইয়া ঘোর বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহারা হর্ষচরিত হইতে 'হারং দেহি মে হরিণি' প্রভৃতি অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিলেন এবং কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি পদ্য-রসাত্মক গদ্যের অপূর্ব সমাসবদ্ধ পদের গৌরবে আত্মহারা হইতেছিলেন। রাজসভায় নর্তকী ও মন্দিরে দেবদাসীরা

www.pathagar.com

তখন হস্তের অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া এবং কঙ্কণ ঝঙ্কারে অলি গুঞ্জনের ভ্রম জন্মাইয়া "প্রিয়ে, মৃঞ্চময়ি মানমনিদানং" কিম্বা "মুখর মধীরম, ত্যজ মঞ্জীরম্" প্রভৃতি জয়দেবের গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিতেছিল। সেখানে বঙ্গভাষার স্থান কোথায়? ইতরের ভাষা বলিয়া বঙ্গভাষাকে পণ্ডিতমণ্ডলী 'দূর দূর' করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাড়ি-ডোমের স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন বঙ্গভাষা তেমনই সুধী সমাজের অপাংক্তেয় ছিল-তেমনি ঘৃণা, অনাদর ও উপেক্ষার পাত্র ছিল।

কিন্তু হীরা কয়লার খনির মধ্যে থাকিয়া যেমন জহুরীর আগমনের প্রতীক্ষা করে, শুক্তির ভিতর মুক্তা লুকাইয়া থাকিয়া যেরূপ ডুবুরীর অপেক্ষা করিয়া থাকে, বঙ্গভাষা তেমনই কোন শুভদিন, শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মুসলমান বিজয় বাঙ্গলা ভাষার সেই শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করিল। গৌড়দেশ মুসলমানগণের অধিকৃত হইয়া গেল। তাঁহারা ইরান-তুরান যে দেশ হইতেই আসুন না কেন, বঙ্গদেশ বিজয় করিয়া বাঙ্গালী সাজিলেন। আজ হিন্দুর নিকট বাঙ্গলাদেশ যেমন মাতৃভূমি, সেদিন হইতে মুসলমানের নিকট বাঙ্গলাদেশ তেমনই মাতৃভূমি হইল। তাঁহারা এদেশে আসিয়া দস্তুরমত এদেশবাসী হইয়া পড়িলেন। হিন্দুর নিকট বাঙ্গলা ভাষা যেমন আপনার, মুসলমানদের নিকট উহা তদপেক্ষা বেশী আপনার হইয়া পড়িল।

বঙ্গভাষা অবশ্য বহু পূর্ব হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল, বুদ্ধদেবের সময়ও ইহা ছিল, আমরা ললিত বিস্তরে তাহার প্রমাণ পাইতেছি। কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যকে একরূপ মুসলমানের সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাহা আমরা পরে দেখাইব।

চারিদিকে হিন্দু প্রজা, চারিদিকে শঙ্খ ঘন্টার রোল, আরতির পঞ্চপ্রদীপ, ধূপ, ধূনা, অগুরুর ধোঁয়া-চারিদিকে রামায়ণ মহাভারতের কথা, এবং ঐ সকল বিষয়ক গান। প্রজাবৎসল মুসলমান সম্রাট স্বভাবতই জানিতে চাহিলেন, "এগুলি কি?" পণ্ডিত ডাকিলেন, —তিনি তিলক পরিয়া, শিলা দোলাইয়া, নামাবলী গায়ে দিয়া হুজুরে হাজির হইয়া বলিলেন, "এগুলি কি জানিতে চাহিলে আমাদের ধর্মশাস্ত্র জানা চাই। দ্বাদশ বর্ষাকাল ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশাধিকার হইতে পারে।" এই ঝুনো নারিকেল না ভাঙ্গিয়া ভিতরের শাঁস খাইবার উপায় নাই। বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইলেন, "আমি ব্যাকরণ বুঝি না, রাজ-কাজ ফেলিয়া আমি ব্যাকরণ শিখিতে যাইব, তাহাও বামুন আমাকে পড়াইবে না,—ও সকল হইবে না। দেশী ভাষায় এই রামায়ণ-মহাভারত রচনা কর।" গৌড়েশ্বর দেশী ভাষা শিখিয়াছিলেন, না হইলে প্রজা শাসন করিবেন কিরূপে? তিনি পুরোদস্তুর বাঙ্গালী সাজিয়াছিলেন-সে কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। দেশী ভাষায় ধর্মগ্রন্থ রচনা করিতে হইবে, এই আদেশ শুনিয়া পণ্ডিতের মুখ শুকাইয়া গেল, ইতরের ভাষায় পবিত্র দেব-ভাষা রচনা করিতে হইবে, চণ্ডালকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান দিতে হইবে। কিন্তু শত শত কল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, শত শত স্মৃতি লিখিয়া শত শত বৎসরে যাহা না করিতে পারেন, শাহানশাহ বাদশাহের একদিনের হুকুমে তাহা হয়— রাজশক্তি এমনই অনিবার্য। অগত্যা প্রাণের দায়ে ব্রাহ্মণকে তাহাই করিতে হইল। পরাগলী মহাভারতে উল্লিখিত আছে, "শ্রীযুত নায়ক

www.pathagar.com

সে যে নসরত খান, রচাইল পাঞ্চালী সে গুণের নিধান।" এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ্ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন। পাঞ্চালী (পাঁচালী) অর্থ মহাভারত। নসরতের আদেশে রচিত মহাভারতের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি, কিন্তু পুস্তকখানি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এই গ্রন্থ অনুমান ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। তখনও নসরত সম্রাট হন নাই–তাঁহাকে শুধু 'নায়ক' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ চট্টগ্রাম বিজয়ের জন্য পূর্বাঞ্চলে প্রেরিত হন, তাঁহার বংশধরগণ ফেনী নদীর তীরস্থ পরাগলপুরে (নোয়াখালী জেলায়) এখনও বাস করিতেছেন, এখনও তাহারা তথাকার ভূম্যাধিকারী। এক সময়ে পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁর প্রতাপ এই প্রদেশে পরিব্যপ্ত ছিল, ছুটি খাঁর সম্বন্ধে কবি শ্রী করণ নন্দী লিখিয়াছেন, "ত্রিপুরা নৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ/পর্বত গহবরে গিয়া করিল প্রবেশ।" তখন ত্রিপুরার রাজা ছিলেন মহারাজ ধর্মমাণিক্য। তাঁহার মত এত বড় পরাক্রমশালী রাজা ত্রিপুরার ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি দেখা যায়না। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চাণক্যতুল্য রাজনীতি-বিশারদ রায়চান। এহেন সম্রাটও ছুটি খাঁর ভয়ে উদয়পুরের পার্বত্য দুর্গের নিভৃত কোণে আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকরণ নন্দী আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক জনৈক সুপণ্ডিত কবিকে মহাভারতের অনুবাদ রচনা করিতে নিযুক্ত করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর বহু স্থানে পরাগল খাঁর প্রশংসা করিয়াছেন, 'শ্রীযুক্ত পরাগল খান পদ্মিনী ভাস্কর তিনি।' 'রস বোদ্ধা', 'গুণগ্রাহী' ইত্যাদি বিশেষণ তাঁর প্রতি সর্বদা প্রযুক্ত হইয়াছে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রী করণ নন্দী উভয়েই মহাভারত অনুবাদের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছেন। কবীন্দ্র লিখিয়াছেন, "নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর/তান হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর। লস্কর পরাগল খান মহামতি/পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি। সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি। লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চাহিয়া/চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া। পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি/পুরাণন শুনন্ত নিত্য হরষিত মতি ॥"

কবীন্দ্র পরমেশ্বর সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং তিনি মহাভারতের স্ত্রী-পর্ব পর্যন্ত অনুবাদ রচনা করেন। পরাগলের বিজয়দৃপ্ত সুযোগ্য পুত্র ছুটি খাঁ শ্রী করণ নন্দীর দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ সংকলন করাইয়াছিলেন।

শ্রী করণ নন্দী তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় ঐতিহাসিক অনেক কথাই লিখিয়াছেন। পরাগল খাঁর আদেশে বিরচিত মহাভারতের এক জায়গায় কবীন্দ্র পরাগল–তনয় ছুটি খাঁর উল্লেখ করিয়াছেনঃ "তনয় ছুটি খাঁ পরগ উজ্জ্বল/কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল।"

*　　　*　　　*

সেই স্বভাবের নিভৃত পরম সুন্দর নিকেতন চন্দ্রশেখর পর্বতের ক্রোড়দেশে, শ্যামল বনস্পতি সচল মুক্তার পংক্তির ন্যায় নির্ঝরধারা অধ্যুষিত পরম রমণীয় রাজধানীতে বসিয়া প্রজারঞ্জক বা মহাবীর মুসলমান সেনাপতিরা হিন্দু পণ্ডিতের দ্বারা রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের কীর্তি জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক–এই ছিল হৃদয়ের

www.pathagar.com

আকঙ্ক্ষা। সে কামনা চরিতার্থ হইয়াছে। আজ ৪৫০ বৎসর পরে তাঁহাদের মাতৃভাষার গৌরবের সঙ্গে প্রজারঞ্জক এই রাজাদের কাহিনী দেশবিশ্রুত হইয়াছে। পরাগল খাঁর পিতা রাস্তি খানের সমাধি এখনও পরাগলপুরে বিরাজিত। ঐ পল্লীতে বিশাল পরাগলী দীঘি এখনও সেই মহামান্য লস্কর খানের স্মৃতি বহন করিয়া তরঙ্গায়িত হইতেছে।

হুসেন শাহ এবং অপরাপর মুসলমান সম্রাটেরা দেশীয় ভাষায় কতটা অনুরাগী ছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। কবি বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন, "সে যে নসিরা শাহজাদা যারে হানিল মদন্ বানে/চিরঞ্জীবী রহ প্রভু গৌড়েশ্বর; কবি বিদ্যাপতি ভনে।" অন্যত্র, "প্রভু গায়েশ উদ্দীন সুলতান।" পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন কবি বিজয় গুপ্ত তাঁহার মনসাদেবীর ভাষান গান রচনা করেন, তখন গৌড়ের তখ্‌তে হুসেন শাহ সমাসীন ছিলেন। কবি অতি সশ্রদ্ধভাবে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, "সনাতন হুসেন শাহ নৃপতি তিলক।" কবি যশোরজ খান হুসেন শাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "শাহ হুসেন, জগত ভূষণ, সেই রস জানে/গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর যশোরাজ খানে।"

কৃত্তিবাস রামায়ণের আদি অনুবাদ সংকলন কর্তা। তিনিও কোন গৌড়েশ্বরের আদেশে রামায়ণের বঙ্গানুবাদ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। দুঃখের বিষয়, কবি যদিও রাজসভার একটি আলেখ্য দিয়াছেন, অনেক সচিব ও মন্ত্রীর নাম করিয়াছেন, তথাপি গৌড়েশ্বরের নামটি দেন নাই। ইহা কিছু আশ্চর্যের কথা নহে। যেহেতু এখন কোন সভাসমিতি বা রাজকার্য উপলক্ষে উপস্থিত রাজপুরুষগণের নাম দেওয়া হয়, কিন্তু বড়লাট অথবা ছোটলাটকে কেবল ভাইসরয় কি গবর্ণর নামে উল্লেখ করিবার পদ্ধতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন যিনি সর্বজন পরিচিত ছিলেন, এখন তাঁহার পরিচয়ের দরকার হইয়াছে। সেই সভা মুসলমান প্রভাবান্বিত ছিল—কেদার খাঁ প্রভৃতি নামের পশ্চাতে খাঁ উপাধি দৃষ্টে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। বঙ্গের ইতিহাসে সেই যুগে একমাত্র রাজা গণেশ ক্ষণকের বিদ্যুৎচমকের ন্যায় হিন্দুশক্তির স্ফুরণ দেখাইয়াছিলেন এবং তারপর মুসলমানগণের হস্তে পুনরায় রাজদণ্ড আসিয়া পড়িয়াছিল। গণেশের পুত্র যদু জালালউদ্দিন নাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান ধর্ম অবলম্বনপূর্বক হিন্দু সিংহাসনে তাঁহার দাবী রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা গণেশ স্বয়ং হিন্দু হইলেও তাঁহার উপর মুসলমান প্রভাব এত বেশী হইয়াছিল যে, তিনি মুসলমানদিগের বিশেষ সাহায্য পাইয়া রাজতখ্‌ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সন-তারিখের সূক্ষ্ম আলোচনা করিলে মনে হয়, এই গণেশ রাজাই কৃত্তিবাসকে রামায়ণের অনুবাদ সংকলনের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপূর্ববর্তী গৌড়ের মুসলমান সম্রাটগণ হয়ত হিন্দু পণ্ডিত দ্বারা সংস্কৃত পুরাণের বঙ্গানুবাদ সংকলনের প্রথা প্রচলন করিয়াছিলেন মাত্র; তাহার একটি প্রমাণ এই যে, গৌড়ের শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ ১৩১৫ শকাব্দে (১৩৭৩ খৃ.) মালাধর বসুকে "গুণরাজ খাঁ" উপাধি দিয়া তাঁহার দ্বারা ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দের অনুবাদ করিয়াছিলেন। মালাধর বসু কুলীন গ্রামবাসী বিখ্যাত বসুবংশীয় এবং কৃত্তিবাসের প্রায় সমসাময়িক কবি। পরপর অনেক মুসলমান সম্রাটের সঙ্গে বঙ্গীয় পুরাণানুবাদকের নাম গ্রথিত দেখা যায়। সুতরাং আমাদের নিঃসন্দেহভাবে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, গৌড়েশ্বরগণের সহায়তা না পাইলে বঙ্গভাষা মাথা উঁচু করিয়া সুধী সমাজে দাঁড়াইতে

www.pathagar.com

পারিত না, মাথা হেঁট করিয়া পল্লীর এক কোণে চির উপেক্ষিতা হইয়া পড়িয়া থাকিত। এই সকল পুস্তক যে বাঙ্গলা ভাষায় বিরচিত হইতেছিল, ব্রাহ্মণগণ উহা কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, তাহা তাঁহাদের রচিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গলা প্রবাদ বাক্য হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যায়। "অষ্টাদশ পুরাণমণি রামস্য চরিতানিচ। ভাষায়াং মানবং শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ" অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ণ যাহারা বাঙ্গলা ভাষায় শ্রবণ করিবে, তাহারা রৌরব নামক নরকে গমন করিবে। ব্যক্তিগতভাবে কৃত্তিবাস ও কালীদাস এই কুকার্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণের ক্রোধবহ্নি হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কায়স্থকুলোদ্ভব কাশীদাস তাঁহার মহাভারতের প্রতি পত্রে ব্রাহ্মণদের এত স্তব-স্তুতি করিয়াও তাঁহাদের অভিশাপ হইতে অব্যাহতি পান নাই। তিনি তো ভনিতায় "মস্তকে রাখিয়া ব্রাহ্মণের পদরাজ্যঃ" প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিয়া তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণ রচিত এই প্রবাদ বাক্য–"কৃত্তিবেশে কাশীদেশে আর বামুন ঘেঁষে এই তিন সর্বনেশে" (কৃত্তিবাস, কাশীদাস এবং যাহারা বামুনদের সঙ্গে ঘেঁষিয়া সমান হইতে চায়– এই তিন সর্বনেশে) এখনও স্মরণীয় হইয়া আছে। এহেন প্রতিকূল ব্রাহ্মণ সমাজ কি হিন্দু রাজত্ব থাকিলে বাঙ্গলা ভাষাকে রাজসভার সদর দরজায় ঢুকিতে দিতেন? সুতরাং এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, মুসলমান সম্রাটেরা বাঙ্গলা ভাষাকে রাজ দরবারে স্থান দিয়া ইহাকে ভদ্র সাহিত্যের উপযোগী করিয়া নূতনভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আরাকান রাজের প্রধান সচিব মুসলমানধর্মী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নাম ছিল মাগন ঠাকুর। ১৬২৬–২৭ খৃঃ অব্দে মাগন ঠাকুর সৈয়দ আলওয়াল নামক কবিকে মালিক মোহাম্মদ রচিত পদ্মাবৎ নামক হিন্দী কাব্যের বাঙ্গলা তরজমা করিতে নিযুক্ত করেন। বাঙ্গলা পদ্মবৎ গ্রন্থের উল্লেখ আমরা পুনরায় করিব। দৌলত কাজী নামক এক কবি "লোর চন্দ্রানি" নামক কাব্য রাজানুগ্রহে রচনা করেন।

মুসলমান রাজ-রাজারা যে রীতি প্রবর্তন করেন, তাহা ব্রাহ্মণগণের নিষেধ-বিধি ও উপেক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া প্রচলিত হইয়াছিল; শাহানশাহ বাদশাহগণ যাহা করিলেন, ছোট ছোট হিন্দু রাজন্যবর্গ তাহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে বঙ্গভাষা ক্ষুদ্র–বৃহৎ রাজসভায় প্রতিষ্ঠা পাইয়া বিজয়ী হইল। ব্রাহ্মণগণই স্বয়ং রৌরব নরকের ভয় অতিক্রম করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রণয়নে তৎপর হইলেন। আমরা ষোড়শ শতাব্দীর কবি ষষ্ঠিবরকে জগদানন্দ নামক মুরুব্বীর আদেশে মহাভারতের অংশবিশেষের অনুবাদ করিতে দেখিতে পাই। এই ব্যক্তি সম্ভবতঃ কোন জমিদার বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

* * *

মুসলমানগণ এইভাবে বঙ্গদেশে বাঙ্গলা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের সাহিত্যে এক নূতন যুগ আনয়ন করিলেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহাদের প্রভাব আমাদের ভাষার বক্ষে আরবী–ফারসী ভৃগু পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল। প্রাকৃত ভাষার উপর ঐ সকল বিদেশী ভাষার দুচ্ছেদ্য ছাপ পড়িয়া গেল। মুসলমানেরা রাজ তখ্তে বসিলেন। তাঁহারাই সর্ববিষয়ে দেশে প্রাধান্য লাভ করিলেন। বিলাসের আসবাব রাজদরবারে যাহা কিছু শাসন সংক্রান্ত

www.pathagar.com

সমস্ত উচ্চপদ তাঁহাদের অধিকৃত হইল। বাঙ্গলা ভাষার অভিধান বদলাইয়া গেল। 'রাজস্ব' শব্দ 'খাজনায়' পরিণতি হইল, 'প্রজা'রা 'রায়ৎ' হইয়া গেল। 'মহাপাত্র' 'উজীর' হইলেন, 'নিশিপত' 'কোটাল' হইল, 'ধর্মাধিকারী' 'কাজী' হইলেন, 'ভৃত্য' 'নফর' হইল, 'দোষী ব্যক্তি' 'আসামী' হইল, 'অভিযোগ কারী' 'ফরিয়াদী' হইলেন। 'বিচারালয়' বা 'রাজসভা' 'আদালত' ও 'দরবারে' পরিণত হইল। 'প্রভু' হইলেন 'হুজুর', 'দাস' হইল 'খেদমতগার'। এইরূপ অসংখ্য শব্দ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, জাতীয় জীবনের উচ্চস্তরের ভাষা অনেকটা পরিবর্তিত হইয়া গেল। যেখানে বিলাস, যেখানে আমোদ-প্রমোদ, সেখানেও বিজেতাদের ভাষা প্রভাব বিস্তার করিল। যাহা সামাজিক জীবনের অধঃস্তরের কথা, সেই শব্দগুলি শুধু প্রাকৃত ভাবাপন্ন রহিয়া গেল। কুটির বা কুঁড়ে কথার পরিবর্তন হইল না, মেটে তেলের দীপটি কুঁড়েঘরে 'প্রদীপ' বা 'পিদিম' হইয়া জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু রাজপ্রাসাদে বা প্রাসাদোপম গৃহের আলো, ঝাড়, ফানুস, দেয়ালগিরি প্রভৃতি নাম বিদেশী কায়দা অবলম্বন করিল। শেষোক্ত শব্দটির শেষাংশ ফরাসীর অপভ্রংশ। ভাত, ডাইল, তেল, ঘি, ক্ষেতের শস্য প্রভৃতি নাম বদলাইল না। কিন্তু খাদ্য যেখানে উপাদেয় ও বিলাসীর যোগ্য, তখন তাহা 'খানা' হইয়া গেল। ক্ষেত যখন প্রভুত্বের নিদর্শন সেখানে তাহা 'জমি'। 'ভূস্বামী' জমিদার হইয়া পড়িলেন। দেশের বাণিজ্য ধীরে ধীরে মুসলমানের হস্তগত হইল, তখন উহার নাম হইল 'কারবার', কারবারের সঙ্গে 'আমদানী' 'রপ্তানী'ও বঙ্গভাষায় ঢুকিল। সৌখিন লোকদের সুগন্ধি-অগুরু ও চন্দনের স্থলে 'আতর' 'খোশবো' অধিকার করিয়া লইল। আকাশের বায়ু, তারা, চাঁদ, সূর্য এইগুলি অভিধানে রহিয়া গেল কিন্তু যেখানে বড় মানুষদের গৃহ কৃত্রিম আলোমালায় সুশোভিত হইল, সেখানে তাহা 'রৌশ্‌নাই' নাম ধারণ করিল। পূর্বে মাগধী 'সূত' ও 'বন্দীরা' শ্রুতিমধুর বন্দনাগীতি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীতের সঙ্গে মিল রাখিয়া প্রত্যুষে গান করিত। সেই সঙ্গীতের মোহনীয় গুণে রাজাদের নিদ্রাভঙ্গ হইত, কিন্তু এখন তাহার স্থলে 'রৌশনিচৌকী' 'নহবত' ইত্যাদি শব্দ প্রবর্তিত হইল। 'রাজসিংহাসন' 'তখত্‌নামায়' পরিণত হইল। তাহা ছাড়া বিচারালয়ের সমস্ত শব্দ, 'মতরজ্জম', 'নাজির', 'দলিল', 'দস্তরখানা', মোক্তার', 'আইন', 'মুসাবিদা', 'পেয়াদা' "খাজাঞ্চিখানা' 'উকীল' 'আরজী' প্রভৃতি শত শত শব্দ প্রাচীন ভাষার প্রাকৃত শব্দের স্থল কাড়িয়া লইয়া নিজেদের অধিকার বিস্তার করিল।

মুসলমানেরা এদেশ বিজয় করিয়া প্রভুত্ব করিয়াছিলেন এবং জীবনের 'ক্ষীরসর নবনীত' সমস্ত ভোগ করিতেছিলেন- তাহা কোন ইতিহাসে লেখা না থাকিলেও শুধু বাঙ্গলা ভাষা আলোচনা করিলেই স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাইলাম, বঙ্গভাষা মুসলমান সম্রাটদের কৃপায় দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করিয়া 'দ্বিজের' ন্যায় সম্মান লাভ করিল। বঙ্গভাষার উপর আরবী ও ফারসী তাহাদের সুস্পষ্ট ছাপ অঙ্কন করিয়া দিল। এইবার আমরা দেখাইব তাঁহারা শুধু বঙ্গভাষার উপর পূর্বোক্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তাঁহারা বঙ্গভাষাকে অপূর্ব কবিত্ব সম্পদে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহারা মুসলমানী কিতাব লিখিয়া বাঙ্গলাকে উর্দুর দিকে টানিয়া আনিয়াছেন সত্য, কিন্তু বিকৃত মুসলমানী বাঙ্গলায় আমরা বঙ্গভাষায় তাঁহাদের রচনার উৎকর্ষের বিশিষ্ট নিদর্শন পাই নাই।

www.pathagar.com

অনুমান ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে ফতেয়াবাদ পরগণায় সৈয়দ আলওয়ালের জন্ম হয়। ইনি বাঙ্গলা ভাষায় এতটা সংস্কৃত শব্দ আমদানী করিয়াছেন যে, স্বয়ং ভারতচন্দ্রও ততটা করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ইনি সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও সাহিত্যে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন এবং স্বীয় পদ্মাবৎ গ্রন্থে অনেক সংস্কৃত শ্লোক নিজে রচনা করিয়া জুড়িয়া দিয়াছেন। আলওয়ালই তাঁহার আদি বার্তাবহ। তাঁহার কাব্য এখনও চাটগাঁয়ের মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া গান করিয়া বেড়ায় এবং ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, মুসলমান শ্রোতাগণ এরূপ সংস্কৃতাত্মক একখানি কাব্যের রস আস্বাদ করিয়া থাকে। চাটগাঁয়ের মুসলমানদের রীতি অনুসারে এই বাঙ্গলা পদ্মাবৎ গ্রন্থ ফারসী অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে। পুস্তকের রচনা হইতে একটা নিদর্শন দিতেছিঃ

"বসন্তের নাগরব নাগরী বিলাসে।
বরবালা দুই ইন্দু সবে যেন সুধা বিন্দু
মৃদুমন্দ অধরে ললিত মধু হাসে।
প্রফুল্লিত কুসুম, মধুব্রত ঝংকৃত
হুংকৃত, পরভৃত কুঞ্জে রতরাসে।
মলয় সমীর সুসৌরভ সুশীতল,
বিলুলিত স্পতি অতিশয় রসভাসে
প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমাল ভ্রম,
মুকুলিত চ্যুতলতা কোরক জালে।
যুবজন হৃদয়, আনন্দে পরিপুরিত
বঙ্গ মল্লিকা মালতী মালো।
মধু সেনপতি সঙ্গে মদন মেদিনী পতি বাহিনী
কোরক নব পল্লব পূর্ণিত।
নবদন্ড কেশর, চামর সৌরভ,
ভুবন বিজয়ী চিত্ত যুবক শাসিত।
চৌদিকে যুবতিকুল, মাঝে শুনায় রব
নৃত্যগীত অতিশয় আনন্দে বিভোরে।
রোমাঞ্চিত শরীর, শ্রমিতা প্রেমভাসে অতিরসে।
রমণী ললিত পতি উরে ॥"

এই কবিতাটি পড়িতে পড়িতে—
"মদন মহিপতে কনক দণ্ড
রুচি কেশর কুসুম বিকাশে,
মিলিত শিলী মুখ পাটলি পটলকৃত

www.pathagar.com

স্মর তূণ বিকাশে ॥
উন্মাদ মদন মনোরথ পথিক,
বধূজন জনিত বিলাপে।
অলিকুল সঙ্কুল, কুসুম সমূহ
নিরাকুল বকুল কলাপে ॥"

প্রভৃতি জয়দেবের কবিতাগুলি স্বতঃই মনে পড়িবে। কিন্তু আলওয়ালের ছন্দসম্পদ ছিল অপূর্ব। নিরক্ষর চাষাদের আবৃত্তিতে ও ফারসী অক্ষরের নোক্তার গোলযোগে সেই ছন্দগুলির অনেক বিভ্রাট হইয়াছে। এতবড় পণ্ডিতের রচনায় যদি ভুল পাওয়া যায়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তাহা কখনই তাহার কৃত নহে, তাহা নিশ্চয়ই নকলের বিভ্রাটে। যিনি মগন, রগন প্রভৃতি অলঙ্কার শাস্ত্রের মূল সূত্র লইয়া এতটা সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন এবং স্বয়ং বহু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তাঁহার মূল রচনায় সে সকল দোষ কখনই ছিল না। বিশেষ বিশেষ ছন্দের জ্ঞান না থাকিলে আলওয়ালের সকল কবিতা আবৃত্তি করা সহজ হইবে না।

আলওয়াল জীবনে বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, যৌবনে এক জাহাজে চড়িয়া তাঁহার পিতা মজলিস কাজির সংগে বঙ্গোপসাগরে যাইতেছিলেন। পর্তুগীজ জলদস্যুরা তাঁহাদের জাহাজ আক্রমণ করে। সেই সমুদ্র বক্ষে জাহাজের উপর ছোটখাট একটি জলযুদ্ধ হয়। আলওয়ালের পিতা যুদ্ধে নিহত হন। কোন রকমে অব্যাহতি লাভ করিয়া আলওয়াল আরাকান যাইয়া তথাকার সচিব মাগন ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন। মহামান্য মাগন ঠাকুর তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহারই আদেশে আলওয়াল 'পদ্মাবৎ' কাব্যের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় সুজা বাদশাহ আরাকানে উপস্থিত হন এবং তাঁহার সহিত আরাকানরাজের মনোমালিন্য ঘটে। সুজা বাদশাহের গুপ্তচর বলিয়া আলওয়াল একটি মিথ্যাবাদী লোকের সাক্ষ্যে অভিযুক্ত হন এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া সাত বৎসরকাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করেন। তৎপরে উদ্ধার পাইয়া তিনি "ছয়ফুল মুল্লুক ও বদিউজ্জামান" নামক একখানি বাঙ্গলা কাব্য রচনা করেন। আলওয়ালের আরও অনেক কাব্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এখনও সাদরে পঠিত ও গীত হইয়া থাকে। তিনশত বৎসর পরেও যে কবির কাব্য জনসাধারণ হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার কবিতার গুণাগুণ আর সমালোচনাসাপেক্ষ নহে। তিনশত বৎসর যাবৎ যে কাব্য লোকের হৃদয়ে আনন্দ দান করিয়াছে, তাহার সমালোচনার আর বাকী কী আছে?

বাঙ্গলার একটি প্রদেশের একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। ইহা এত ছোট যে, ইহাকে একখানি ইতিহাসিকা বলা চলে, ইহার প্রায় ৪০০ ছত্র কবিতা আছে। শমসের গাজী... কালক্রমে এমন প্রবল হইয়া উঠেন যে, তিনি ত্রিপুরেশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎস্থলে নিজে অধিষ্ঠিত হন। শমসের আলীবর্দি খাঁর সমসাময়িক লোক ও প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। এখনও শমসের গাজির গান ত্রিপুরায় গীত হইয়া থাকে। অবশ্য ত্রিপুরার 'রাজমালা' গ্রন্থে তার বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে। শমসের গাজির বিবরণ সমস্তই

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক। ইনি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া দেশে শিক্ষা প্রচলনের যে রীতি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, ধান-চাউল ও অপরাপর খাদ্যদ্রব্যের এবং সোনা-রূপার যে দর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, রাস্তাঘাট নির্মাণ করিয়া দেশের যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহার একটি নিখুঁত ও খাঁটি চিত্র আমরা এই পুস্তকখানিতে পাইয়াছি।... নানারূপ ঐতিহাসিক তত্ত্বে এই পুস্তকখানি পূর্ণ। যদিও গ্রন্থকারের নাম নাই, তথাপি তিনি যে মুসলমান ও শমসের গাজির অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন বই পড়ার পর তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই বইখানি, রাজকৃষ্ণ বাবুর কথায় বলিতে গেলে একটি মুষ্টি ভিক্ষা, কিন্তু উহা সুবর্ণ মুষ্টি, যেহেতু প্রাচীন বাঙ্গলায় ঐতিহাসিক পুস্তক অতি অল্পই আছে। প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে নোয়াখালির জজ আদালতের সেরেস্তাদার মৌলভী লুৎফুল কবীর সাহেব এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়া আমাকে একখণ্ড উপহার পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কবীর সাহেব তারপর কিভাবে কোথায় গেলেন এমন কি, তিনি জীবিত কি মৃত, তাহা আমরা বহু সন্ধান করিয়াও জানিতে পারি নাই। তাঁহার বাড়ী ছিল ত্রিপুরা জেলায়। ছোটলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী গুরলে সাহেব একখণ্ড শমসের গাজির গানের বই খুঁজিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা পান নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার 'রাজমালা'য় শমসের গাজির বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

যদি মুসলমানগণ তাঁহাদের সমাজের উন্নত চরিত্রগুলি সুন্দর ও মহিমান্বিত বর্ণে চিত্রিত করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে উপস্থিত করেন, তবে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে তাহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে। উত্তর-পশ্চিমে অনেক হিন্দু মহররমের মর্মন্তুদ কাহিনী শুনিয়া অশ্রু বিসর্জন করে এবং উৎসবের দিনে তাজিয়া বাহির করে। নিদারুণ তৃষ্ণায় জলবিন্দুর জন্য কোমল কুসুমকোরকের মত সখিনা ও কাসেম শুকাইয়া মরিলেন—কারবালা ক্ষেত্রের সেই করুণ কাহিনী কি শুধু মুসলমানেরই জাতীয় সম্পত্তি, না সমস্ত বিশ্ববাসীর রস-সম্পদ? বঙ্গের যে পল্লীসঙ্গীত মুসলমান কৃষকের অতুলনীয় সম্পদ, যে গৌরব নভস্পর্শী অপূর্ব, আশ্চর্য, তাহার কথা আমি পরে লিখিতেছি। এখন এই সঙ্গীতের স্রোত মুসলমান সমাজে অবরুদ্ধ করিলে তাহাদের জাতীয় জীবন শুকাইয়া মরিবে। বাড়ীখানি গঙ্গার তীরে অবস্থিত, সেই সুর নদীকে বদ্ধ করিলে জাতীয় জীবনের রসধারা কে সঞ্জীবিত রাখিবে? আমির খসরু সেতারের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, মিঞা তানসেন সঙ্গীত বিদ্যারূপ হিমাদ্রির কাঞ্চন জঙ্ঘায় অধিরোহণ করিয়াছিলেন। ইহারা কি ইসলামের শত্রু ছিলেন?

এ পর্যন্ত আমরা অনেক মুসলমান বাঙ্গলা কবির নাম করিয়াছি, কিন্তু তাহা অতি নগণ্য অংশ। পূর্ববঙ্গের নিরক্ষর মুসলমান চাষা ও মাঝিরা মুখে মুখে যে সকল গান বাঁধিয়া থাকে, তাহা অনেক সময় অতি সুন্দর কবিত্বময়। মুসলমান বাউলের 'মুরশিদা' গান দেহতত্ত্ব বিষয়ক, তাহার ভাব-সম্পদ আধ্যাত্মিক, অনেক স্থলে তাহা এত সুন্দর যে আমাদের আশ্চর্য বোধ হয়, সামান্য ফকির ও বাউলেরা কি করিয়া ধর্মরাজ্যের সেই সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াছে? শত শত মুরশিদা গান সেই সকল বাউল, মাঝি ও কৃষকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া বাঙ্গলার পল্লীর আকাশ-বাতাস পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল পল্লীর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য গর্ব করিবার সামগ্রী, আমরা কখনও করিয়াছি? এই বঙ্গদেশে কত

www.pathagar.com

মসজিদ, কত ইষ্টক ও শিলালিপি, কত কীর্তিস্তম্ভ মুসলমানের বিজয়ের বার্তা ঘোষণা করিতেছে। বঙ্গদেশে এমন পল্লী নাই, যেখানে মুসলমানদের গৌরব ও পরাক্রান্ত অভিযানের কথা নাই, যেখানকার ধূলি পীর-দরবেশদের পদধূলি কিম্বা সমাধিতে পবিত্র হয় নাই। কতজন তাহার খবর রাখেন?

এ পর্যন্ত আমরা দেখাইছি বাঙ্গলা সাহিত্যের উপর মুসলমানদের কতটা প্রভাব পড়িয়াছে। কিন্তু শুধু তাহাই নহে, বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমান কবি রাজসিংহাসনের দাবী করিতেছেন, বাঙ্গলা সাহিত্যে এরূপ মুসলমান কবির আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা কবিকুল চক্রবর্তী, যাঁহাদের যাশোভাদির নিকট আলওয়াল এমন কি ভারতচন্দ্রের খ্যাতিও পরিম্লান হইয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তিন খণ্ড পল্লীগীতিকা প্রকাশিত করিয়াছে। তাহাতে মুসলমান কবিদের যে কবিত্বের নিদর্শন আছে, তাহা অতুলনীয়। দুঃখের বিয়য় এই সকল পল্লীগীতি সম্বন্ধে এদেশের লোক ততটা অবহিত নহেন। এই পল্লীগীতিকার প্রথম খণ্ডে 'দেওয়ানা মদীনা' নামক একটি পালাগান প্রকাশিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে ফরাসীদেশের বিখ্যাত লেখক মহাত্মা রোম্যা রোলাঁ লিখিয়াছেন, এরূপ অদ্ভুত কাব্য তিনি গ্রাম্য কৃষকের নিকট হইতে প্রত্যাশা করেন নাই। পল্লী কৃষককবি কিরূপে নিপুণ শিল্পীর ন্যায় এই আশ্চর্য কীর্তির মঠ রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

"দেওয়ানা মদিনা"র প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন 'জালাল গাএন'। তিনি যখন ভাটিয়াল সুরে এই গানটি গাহিতেন, তখন বেদনায় শ্রোতাদের হৃদয় ভরিয়া উঠিত ও তাঁহারা আর্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। উহা রয়াল আট পেজি ফর্মার ৩য় পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এত ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে এরূপ করুণ রসাত্মক কাব্য আমরা আর কোন সাহিত্যে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রোম্যা রোলাঁ সমালোচনা রাজ্যের সম্রাট, তিনি নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে কবিকে তাঁহার প্রাণ প্রশংসা দিয়াছেন। আমরা অধীন জাতি, আমরা নিজেদের কবি সম্বন্ধে একটা বড় রকমের প্রশংসা দিতে ভয় পাই। বিদেশী কবিগণের পশ্চাতে তাঁহাদের সমালোচকেরা দুন্দুভি-নিনাদ ও তাঁহাদের ডঙ্কা-নিনাদে বসুধা কম্পিত হয় এবং লোকেরা গরুড় পক্ষীর ন্যায় জোড়হস্ত হইয়া থাকে— কিন্তু আমাদের পল্লীর ক্ষেতে যদি অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ডও থাকে তাহা মাটির ডেলার মত উপেক্ষিত হয়। "কাঠুরে এক মানিক পেল, পাথর বলে ফেলে দিল, অভিমানে কাঁদছে মানিক মহাজনে টের পেল না"—আমাদের পরাধীন দেশের কাঞ্চন কাঁচ হইয়া যায়, জয়দৃপ্ত বিদেশীদের কাঁচও কাঞ্চন মূল্যে বিকাইয়া থাকে।

জামাত উল্লা বয়াতির রচিত 'মাণিক তারা' বা 'ডাকাতের পালা' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পালা গানটির কাব্য-ঐশ্বর্য অতুলনীয়। কৃষক-কবি চাষাবাদের জীবনের যে নিখুঁৎ ছবি আঁকিয়াছেন, বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার সমকক্ষ কবিতা কতটি আছে জানি না। এই পালাটির কোন স্থানে নিপুণ শিল্পীর ন্যায় লিপিকুশলতা, কোথাও হাস্যরসোজ্জ্বল হৈমন্তিক রৌদ্রের ন্যায় সুখদ-পদবিন্যাস, কোথাও পূর্বরাগের রমণীয়তা—এ সমস্তই এমন দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে যে জামাত উল্লাকে সারস্বত কুঞ্জের প্রথম পংক্তিতে স্থান দিতে

www.pathagar.com

বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। গ্রাম্য কবির এই কাব্যখানি প্রত্যেক বাঙ্গালীর পাঠ করা উচিত। পাড়াগেঁয়ে ভাষা কোন স্থানে প্রাদেশিকতার বাহুল্যে দুর্বোধ্য কিন্তু ধূলিমাটি মলিন হীরকের জ্যোতি কি সেই সকল বাহিরের মলিনতা ফুটিয়া বাহির হয় না? মাণিক তারার কবিত্বভাতির গ্রাম্য ভাষার মধ্য হইতে সেইরূপ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডেও অনেকগুলি পালাগান আছে, তন্মধ্যে "মঞ্জুর মার পালা"টি উৎকৃষ্ট। যদিও কবির নাম পাওয়া গেল না, তথাপি ইহা যে মুসলমান কবির লেখা-সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। মনির নামক এক মুসলমান সাপুড়ের কথা লইয়া এই কাব্য রচিত।

তৃতীয় খণ্ডের পল্লীগীতিকায় আর কয়েকটি উৎকৃষ্ট পালা আছে, তাহার একটি মনসুর ডাকাত বা কাফন চোরার পালা। এই মনসুর ডাকাতের জীবনের গতি কিভাবে ফিরিয়া গিয়াছিল, অতি জঘন্য নীচ ও নৃশংস-দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া সে কিরূপে একজন শ্রেষ্ঠ পীর ও সাধু হইয়াছিল, সেই মনস্তত্ত্বের আধ্যাত্মিক চিত্রপটখানি কবি এই পালা গানটিতে উদঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহার মাঝে মাঝে এমন সুন্দর কবিত্বপূর্ণ চরণ আছে যাহা পড়িলে কবিকে পল্লী-কালিদাস বলিয়া প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়। একটি নববিবাহিতা নারী পল্লীপথে প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিয়াছেন। জ্যোৎস্না ধবধবে রাত্রি, আটজন পাল্কীবাহক তাহাকে লইয়া যাইতেছে—কবি সেই রাত্রি দুইটি ছত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। কবি লিখিয়াছেন—জ্যোৎস্না রাত্রি, দোলা চলিয়া যাইতেছে-কেহ যেন মুষ্টি মুষ্টি বেলফুলের কলি দ্যুলোক হইতে ভূলোকে ছড়াইয়া ফেলিতেছে, এমনই সুন্দর জ্যোৎস্না।

এই জ্যোৎস্না রাত্রে মনসুর ডাকাত কুর্ম্মাই খালের একটা বাঁকের কাছে, কেতকী ঝাড়ের আড়ালে লুকাইয়া পাল্কীখানির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে।

দোলার গতি, জ্যোৎস্নার বর্ণনা কবিতাগুলিকে এমন একটা ছন্দ দিয়াছে যে, মনে হয় যেন আমরা বাহকদের পদশব্দ শুনিতে পাইতেছি ও মনসুর ডাকাতের ব্যাঘ্রমূর্তি চাক্ষুষ করিতেছি।

কিন্তু মনসুরের পরিবর্তনের কথাটি অতি অপূর্ব। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, দিনে পাঁচবার নমাজ পড়িবে। এই দুর্দান্ত দস্যু যে রমণীকে প্রকৃতই ভালবাসিয়াছে, তাহার নিকট এই প্রতিজ্ঞা—সুতরাং তাহা দুর্লঙ্ঘ্য।

হাতীখেদার গানটি একশত বৎসর পূর্বের রচনা। এমন একটা বিষয় লইয়া যে কবিতা রচিত হইতে পারে, তাহা অনেকেরই ধারণার অগম্য। কিন্তু গ্রাম্য মুসলমান কবি ইহাতে অপর্যাপ্ত কাব্যরস ঢালিয়া দিয়াছেন। কবিতাগুলির বিদ্রুপছন্দ যেন শিকারীদের পদশব্দের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়াছে। কবিতাগুলি একবারে স্বভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতি রাখিয়া কোন স্থানে বন্দুকের আওয়াজ, অগ্নিদাহের চটপট শব্দ, কোথাও শিবিরে দর্শকদের কোলাহল ও মশালের আলোকমালার দীপালির শোভা যেন পাঠককে প্রত্যক্ষ করাইয়া সেই অদ্ভুত বন্য-অভিযানের একেবারে কেন্দ্রস্থলে লইয়া গিয়াছে। হাতিগুলির ভীষণতা, বুদ্ধিহীনতা, অকারণ আশঙ্কা, দলবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা- খেদার মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদের

www.pathagar.com

আর্তনাদ ও না খাইয়া অস্থি-চর্মসার হইয়া যাওয়া—এই সমস্তই হয়ত নিতান্ত নিরস বিষয়— কিন্তু এগুলিকে যে কবি এরূপ রসাত্মক করিতে পারিয়াছেন—তাহার কবিত্ব ধন্যবাদার্হ—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ভাষা চাটগেঁয়ে, অনেক স্থলে বুঝিয়া উঠা কঠিন, কিন্তু নারিকেলের খোলাটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে যেরূপ ভিতরের সকলেই সুস্বাদু ও সরস, ভাষার বাধাটা অতিক্রম করিলে এই কবিতাও তেমনিই উপভোগ্য ও পরম উপাদেয় বোধ হইবে।

আমরা মুসলমান বিরচিত আরও অনেক পালাগানের উল্লেখ করিতে পারিলাম না—সেগুলিতে কবিত্বের অভাব নাই, কিন্তু আমাদের স্থান ও সময়াভাব।

মুসলমান সম্রাটগণ বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের একরূপ জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা বহু ব্যয় করিয়া শাস্ত্রগুলির অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং সেগুলি আগ্রহ সহকারে শুনিয়া আনন্দিত হইতেন। আরব-দেশবাসীরা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা শুধু ধনরত্ন আহরণের চেষ্টায় ভিন্ন দেশ জয় করিতেন না, সেই সকল দেশে যদি জ্ঞানের ভাণ্ডার থাকিত, তাহাও তাঁহারা লুটিয়া লইতেন। আবুল ফজলের ভ্রাতা ছদ্মবেশে কাশীতে যাইয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া আসিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ করিয়া সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, ইহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। বঙ্গ-সাহিত্য মুসলমানদেরই সৃষ্টি, বঙ্গভাষা বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা। বহু পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় রচনা করিয়া মুসলমান কবিগণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, -পালাগানে তাঁহারা যে শক্তি ও কবিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যিক আসরে তাঁহাদের স্থান প্রথম পংক্তিতে। কয়েকজন শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু এখন বঙ্গ-সাহিত্যের কাণ্ডারী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু গোটা বঙ্গদেশের সাহিত্য এখনও মুসলমানের হাতে—এই কথার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। ময়নামতীর গান হইতে আরম্ভ করিয়া গোরক্ষ-বিজয়, ভাসান গান ও পূর্বোক্ত শত শত পালা গান, মুরশিদা গান, বাউলের গান এ সমস্তই মুসলমানদের হাতে। তাঁহারাই অধিকাংশ স্থলে মূল গায়েন। তাঁহারাই তরজার গুরু। এই বঙ্গদেশ যে সুধামধুর কবিত্বরসে অভিষিক্ত, তাহার প্লাবন আনিয়াছে মুসলমান কৃষকরা। একবার ধান কাটার পর বঙ্গদেশ-বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গ ঘুরিয়া আসুন, দেখিবেন, মুসলমান কৃষকেরা দল বাঁধিয়া কত প্রকার গান গাহিয়া এদেশকে আনন্দ বিতরণ করিতেছে। কত বাউলের দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান, কত মাঝির ভাটিয়ালী গান, কত রূপকথা ও মনোহর কেচ্ছা ও গাজির গান তাহারা বাঙ্গলাদেশকে শুনাইয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করিতেছে। হিন্দুরা এ বিষয়ে কোনক্রমেই মুসলমানের সমকক্ষ নহে। দু'চারিজন শিক্ষিত লোক লইয়া এদেশ নহে। দু'চারিজন উপন্যাস পড়ুয়ার হাতে বঙ্গদেশটি নহে। বঙ্গদেশ বলিতে যে সপ্তকোটি লোক বুঝায় তাহার শতকরা ৯০ জনেরও বেশী আধুনিক উচ্চশিক্ষার কোন ধার ধারে না। এই সুবৃহৎ জনসাধারণের শিক্ষা বড় সাধারণ নহে। যাহারা পদ্মাবতের ন্যায় এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্য বুঝিতে পারে, দেহতত্ত্ব বিষয়ক অতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারে, তাহারা কি 'মূর্খ' অভিধা পাইবার যোগ্য? এই বিপুল জনসাধারণের ভাষা বাঙ্গলা, মুসলমানগণ এখনও এই ভাষার উপর পল্লীগ্রামে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছেন।

www.pathagar.com

যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষা এদেশে প্রচলনের প্রয়াসী, তাঁহারা কখনই সে চেষ্টায় কৃতকার্য হইবেন না। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের বাঙ্গলাই মাতৃভাষা, মায়ের মুখে তাহারা বাঙ্গলা ভাষা প্রথম শুনিয়াছে-সে ভাষা তাহাদিগকে ভুলাইয়া দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। ঘরের সামগ্রী তৈরী থাকিতে এরূপ চেষ্টা করিবার প্রয়োজন তো কিছুই দেখিতে পাই না। যদি বড় কিছু দিতে পার, তবে ছোট জিনিষটা ছাড়িয়া দাও। সূর্যের আলো আনিবার ব্যবস্থা করিয়া ঘরের প্রদীপটি নির্বাপণ কর, নতুবা যাহা আছে তাহা ছাড়িয়া দিয়া ঘর আঁধার করিবে মাত্র।

www.pathagar.com

মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ১৩ জুলাই, ১৮৮০, সিরাজগঞ্জ। মৃত্যু ঃ ১৭ জুলাই, ১৯৩১। শিক্ষা ঃ ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি (১৮৯৭)। পেশা ঃ সাংবাদিকতা; সাপ্তাহিক হাবলুল মতীন, সচিত্র মাসিক পত্র 'নূর' (১৯১৯), 'ছোলতান' ১৯২৩।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কবিতা ঃ অনল প্রবাহ (পুস্তিকাকারে, ১৩০৬, গ্রন্থাকারে ১৩০৭), উচ্ছ্বাস (১৩১৪), নবউদ্দীপনা (১৩১৪), উদ্বোধন (১৩১৫), স্পেন বিজয় কাব্য (১৯১৪), মহাশিক্ষা কাব্য (প্রথম খণ্ড ১৯৬৯, ২য় খণ্ড ১৯৭১)। উপন্যাস ঃ রায় নন্দিনী (১৯১৫), তারাবাঈ (১৯১৬), ফিরোজা বেগম (১৯১৮), নুরুদ্দীন (১৯১৯)। প্রবন্ধ ঃ মহানগরী কর্ডোভা/স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা (১৯০৭), স্ত্রী শিক্ষা (১৩১৪), আদব কায়দা শিক্ষা (১৯১৪), সুচিন্তা (১৯১৬), তুর্কী নারী জীবন (১৩২০) প্রভৃতি। ভ্রমণ ঃ তুরস্ক ভ্রমণ, ১ম খণ্ড (১৯১৩)। সঙ্গীত গ্রন্থ ঃ সঙ্গীত সঞ্জীবনী (১৯১৬), প্রেমাঞ্জলী (১৩২৩)।

লেখা-পরিচিতি ঃ সিরাজগঞ্জ বি.এল স্কুলের ছাত্র সমিতিতে মাতৃভাষা বিষয়ে বক্তৃতার সারাংশ। 'ইসলাম প্রচারক' পৌষ–মাঘ ১৩০৮ সালে প্রকাশিত।

ভাষা মানব জাতির উন্নতির সর্ব্বপ্রধান কারণ। উন্নতি–কুসুম ভাষা তরুতেই জন্মিয়া থাকে। মানবের ন্যায়নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস সমস্তই ভাষায় আবদ্ধ। আমাদের ভাষা আছে বলিয়াই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মধ্যে পরিগণিত হইতেছি। ভাষা প্রভাবে সুখ দুঃখ, শোক হর্ষ প্রভৃতি মনোভাব, পরস্পর পরস্পরের নিকট প্রকাশ করিতে পারি। পৃথিবীতে জাতীয় উন্নতির সহিত ভাষার উন্নতি দুচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যে জাতির ভাষা যত উন্নত, সে জাতির ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সংখ্যা তত অধিক—পৃথিবীতে চিরকাল সেই জাতি সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং করিতেছে। ভাষার উন্নতি করিতে না পারিলে জাতীয় উন্নতি আশা করা "আকাশ–কুসুম" ব্যতীত আর কিছুই নহে। পৃথিবীতে যখন যে জাতি গৌরবের পতাকা উড়াইয়াছেন, তখনই দেখিতে পাইবেন, সে জাতি আপনাদের মাতৃভাষাকে পুরিপুষ্ট সমলঙ্কৃত পরিপূর্ণ এবং সমুজ্জ্বল ও সুমার্জ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন। যেমন মাতৃদুগ্ধে শিশু-শরীর অনুদিন হৃষ্ট পুষ্ট দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হয়, তেমনি মাতৃভাষাও জাতিকে গঠিত, উন্নত এবং পরিচালিত করে। মাতৃভাষা প্রাণের ভাষা—ইহা পবিত্র এবং পূজ্য। ইহার সেবা না করিলে ঘোরতর অধর্ম হয়।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সময় হইতেই বাঙ্গালা ভাষার বিকাশ এবং গঠন হইতে থাকে, ইংরেজ রাজত্বে উহা এক্ষণে পুষ্টতা ও পক্বতা লাভ করিতেছে। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠতম কবি সৈয়দ আলাওল ২৫০ শত বৎসর পূর্বে যদিও মুসলমান-কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যাকাশে অপূর্ব

www.pathagar.com

জাতীয় গৌরব এবং বঙ্গের পতাকা উড়াইয়া গিয়াছেন, তথাপি মুসলমান কীর্তি বঙ্গ-সাহিত্যে আজ পর্যন্ত নিতান্তই অল্প পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদিগের স্বাধীনতার সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় আলোচনা তত কিছু প্রয়োজন ছিল না। তখন আরবী পারসী যথাক্রমে ধর্ম ও রাজভাষা এবং সর্ব-সাধারণের কথিত ভাষা ছিল। হিন্দু-মুসলমান সকলেই পারসী ও উর্দ্দূর আলোচনা করিতেন। পারসী ও উর্দ্দূতেই রাজকীয় সমস্ত কার্যই নির্ব্বাহিত হইত। তাই তখন বাঙ্গালা শিক্ষার বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় একান্ত আবশ্যকতা ছিলনা। কিন্তু এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষা ব্যতীত আমাদিগের আর উপায় নাই। মাতৃভাষা বাঙ্গালা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানদিগের উত্থানের এবং নব জীবনের আশা করা নিতান্তই মূর্খতা প্রকাশ মাত্র। কিন্তু নিতান্তই দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় যে, বঙ্গীয় শিক্ষিত মুসলমানগণ এখনও এ মহাসত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইতেছে না। অথবা অবহেলা করিয়া জাতীয় উন্নতির মূল সুদৃঢ় করিতে উদাসীন রহিয়াছেন।

আজ হিন্দুস্তানের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ কি আমাদিগের অপেক্ষা ইংরেজী শিক্ষায় অধিকতর অগ্রসর হইয়াছেন? আমি দৃঢ়তা এবং সততার সহিত বলিতেছি,-নিশ্চয়ই না। কিন্তু তাহাদের মাতৃভাষা উর্দ্দূর আলোচনা থাকায় উর্দ্দূ ভাষায় প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নিরন্তর অনুবাদিত হওয়ায়, উর্দ্দূর প্রতি তাহাদের মাতৃবৎ শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ থাকায় আজ তাহাদের মধ্যে নব জীবনের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। ভ্রাতঃ বঙ্গীয় মুসলমান! তুমিও তোমার মাতৃভাষা পরম পবিত্র বাঙ্গালার সেবায় বদ্ধপরিকর হও, শীঘ্রই দেখিবে, বঙ্গীয় মুসলমান গগনে শুভ উষার আগমন হইয়াছে। সমাজহিত চিকিৎর্ষ, মহোদয়গণ! নিশ্চয় জানিয়া রাখিবেন আমরা যতই আরবী, পারসী, উর্দ্দূএবং ইংরেজীতে পণ্ডিত হই না কেন, যতই আমরা অন্যান্য ভাষার আলোচনা করি না কেন, যতদিন আমরা বাঙ্গালার আলোচনায় বদ্ধপরিকর না হইব, যতদিন জাতীয় সাহিত্য ইতিহাস এবং দর্শন বিজ্ঞান ভূরি পরিমাণে লিখিত এবং রচিত না হইবে-যতদিন আমাদের মধ্যে শত শত জাতীয় কবি এবং বক্তা আবির্ভূত না হইবে, ততদিন আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা করা নিতান্তই মূর্খতা। মাতৃভাষার আলোচনা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া দুই চারিটী লোকের ব্যক্তিগত উন্নতি হইলেও হইতে পারে—কিন্তু জাতীয় উন্নতি বা অভ্যুত্থান কদাপি হইতে পারে না।

মাতৃভাষা ব্যতীত কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। যখন আরব জাতি জ্ঞান গৌরবের এবং জয় মহিমার বিজয় পতাকা পৃথিবীর নানাদেশে উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন, যখন বর্ত্তমান জগতের ভাগ্যচক্রের বিধাতা ইউরোপখণ্ড, তাঁহাদের পাদমূলে বসিয়া শিক্ষা ও সভ্যতা লাভ করিয়াছিল—তখন আরবগণ তাঁহাদের মাতৃভাষা আরবীর কীদৃশ কঠোর সাধনা এবং গভীর অধ্যবসায় বলে বিবিধ রত্নরাজিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা—গ্রীক, লাটীন, হিব্রু, জেন্দ, সংস্কৃত এমন কি চীন ভাষা হইতেও যাবতীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আরব্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। তাই আরব জাতি, ভূতলে অতুল কীর্ত্তির পতাকা উড়াইয়া গিয়াছেন।

www.pathagar.com

বর্ত্তমান যুগে ইংরেজ জাতির ইংরেজী ভাষার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। আজ ইংরেজী ভাষা অন্যূন ২৫ লক্ষ গ্রন্থে সমলঙ্কৃত আরবী, ফারসী, চীন, সংস্কৃত প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ এবং অশ্রেষ্ঠ ভাষা হইতে প্রতিদিন শত শত গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়া ইংরেজী ভাষাকে পরিপুষ্ট করিতেছে-সহস্র সহস্র ধীসমৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ মহা মহা পণ্ডিত, নিরন্তর মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়া অনবরত ইংরেজী ভাষায় আপনাদের অমূল্য চিন্তাস্রোতঃ ঢালিয়া দিতেছেন। তাই আজ ইংরেজী পৃথিবীর অদ্বিতীয় ভাষা এবং তাহার সেবক ইংরেজ ও আমেরিকান পৃথিবীর অদ্বিতীয় জাতি। তাই বলিতেছি, হে বঙ্গীয় মুসলমান! যদি জাতীয় মঙ্গল এবং কুশল কামনা কর তবে মাতৃভাষার সেবায় বদ্ধপরিকর হও।

বঙ্গের প্রতি মাদ্রাসায় বাঙ্গালা ভাষার প্রতিষ্ঠা করা একান্তই কর্ত্তব্য। আমাদের বঙ্গীয় মৌলবী সাহেবগণ, মাতৃভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া সমাজের বা ধর্মের কোনই উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তাঁহারা এক্ষণে কোনও সভা সমিতিতে বক্তৃতা বা ওয়াজ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহাদের কদর্য খিচুড়ী ভাষা শ্রবণে শিক্ষিত সভ্য শ্রোতাগণের হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। হায়! শত আক্ষেপ! আজ যদি আমাদের মৌলভী সাহেবগণ, একটুকু ভাল বাঙ্গালাও জানিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাদিগকে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জঠর জ্বালা নিবারণ করিতে হইত না। ভাল বাঙ্গালা জানিলে জমীদারী বা মহাজনী লাইনে অথবা আদালতে সেরেস্তায় কিম্বা চিকিৎসা বা গ্রন্থানুবাদ কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া গৌরবের সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিতেন। মাদ্রাসাসমূহে রীতিমত বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপনা না হওয়ায়, তাঁহারা আরবী ফারসী প্রভৃতি ভাষার যে দুই চারিখানি ভাল গ্রন্থ পড়েন, তাহাও তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। বাঙ্গালা না জানায় আমাদিগের শুদ্ধ আরবী পারসী পড়া মৌলবী সাহেবদিগের দ্বারা সমাজের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, অনুদিন ক্ষতি এবং অবনতির মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে। হায়! জানি না কবে মাদ্রাসাসমূহের সংস্কার হইবে। কবে হিন্দুস্তানী মৌলবীদিগের ন্যায় আমাদিগের দেশের মৌলবীগণ মাতৃভাষায় কৃতিত্ব লাভ করিয়া, আরবী, পারসী ভাষার গ্রন্থ সকল অনুবাদ করত জাতীয় উন্নতির পথ সুগম করিয়া দিবেন? হে মৌলভী সাহেবগণ! ইহা কি নিতান্তই লজ্জা এবং পরিতাপের বিষয় নহে যে, বঙ্গে সহস্র সহস্র মাদ্রাসা পাস মুসলমান থাকিতে, আজ ব্রাহ্ম পণ্ডিত আমাদিগের কোরাণ এবং হাদিসের অনুবাদ করিতেছেন?

তাই বলি, ভ্রাতঃ বঙ্গীয় মুসলমান! আর আলস্যে কাল কাটাইও না। বঙ্গভাষাকে হিন্দুর ভাষা মনে করিও না। যে ভাষায় তুমি মনে সুখ দুঃখের কথা প্রকাশ কর, যে ভাষায় তুমি স্বপ্ন দেখ, যে ভাষায় তুমি মনোভাব ব্যক্ত করিয়া সমস্ত শান্তি এবং আরাম লাভ কর তাহা নিজের মাতৃভাষা। জগতের সমস্ত ভাষা অপেক্ষা তাহার গৌরবের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। মাতাকে ঘৃণা করিলে, তাঁহার সেবা শুশ্রূষা না করিলে যে পাপ; মাতৃভাষার সেবা না করিলে, তাহার যত্ন না করিলেও সেই পাপ।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা ও বাঙালী মুসলমান

সৈয়দ এমদাদ আলী

লেখক -পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ১৮৮০, দমপাড়া, ঢাকা। মৃত্যু ঃ ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬। শিক্ষা ঃ আই. এ.। পেশা ঃ শিক্ষকতা ও পুলিশ বিভাগে চাকুরী।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কবিতা ঃ ডালি (১৯১২)। গদ্য ঃ তাপসী রাবেয়া।পত্র উপন্যাস ঃ হাজেরা।

লেখা-পরিচিতি ঃ মাসিক 'মোহাম্মদী', চৈত্র ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত।

মুসলমানের মধ্যে কেহ কেহ আজকাল বলিয়া থাকেন, লেখ্য ভাষা নামে যে ভাষা বাংলা সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে, উহাকে সাহিত্যের প্রাঙ্গণ হইতে দূর করিয়া দিয়া সেই স্থানে কথ্য ভাষাকে বসাইয়া দাও, নতুবা বাংলা ভাষার মুক্তি ঘটিবে না, মুসলমান বাংলাসাহিত্য শক্তি সঞ্চয় করিয়া গড়িয়া উঠিবে না। লেখ্য ভাষা বিকট, বিশ্রী, ইহা আবার সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য! কথাটা হিন্দুগণ যত না বলেন, কয়েকজন মুসলমান লেখক তারচেয়ে চারগুণ জোর গলায় বলেন। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের আদেশ মুসলমান লেখক মাত্রেই মান্য করিয়া চলিবেন এবং তাহার ফলে তাঁহারা আলাউদ্দীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের সহায়ে বাংলা ভাষার নিজস্ব যে রূপ, তাহা বদলাইয়া দিতে পারিবেন।

তাঁহারা সকলেই ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত, আমাদের মত নিরেট বোকা ও মূর্খ নহেন। তাঁহাদিগকে আজ আমরা খোলাখুলিভাবেই জিজ্ঞাসা করি, ইংরাজী ভাষার সুবিশাল সৌধ কি লেখ্য ভাষাকে বর্জ্জন করিয়া কথ্য ভাষার উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে, না কথ্য ভাষাকে সুমার্জ্জিত করিয়া লেখ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই লেখ্য ভাষার আশ্রয়েই ইংরাজী সাহিত্য শক্তি সঞ্চয় করিয়া বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ Continental literature-এর সহিতও সুপরিচিত বলিয়া জানি, তাঁহারা একথা কি বলিতে পারেন যে, ইউরোপের প্রধান ভাষাগুলি লেখ্য ভাষাকে বর্জ্জন করিয়া কথ্য ভাষাকে আশ্রয় করিয়াই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছে? যুগে যুগে, দেশে দেশে ভাষা ও সাহিত্য আপনার শক্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা লেখ্য ভাষাকে বর্জ্জন করিয়া হয় নাই, হইতে পারে না।

আগে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, পরে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষার সৃষ্টির মূলে কথ্য ভাষাই বর্ত্তমান। আদিযুগে মানবগণ যে ভাবে কথা বলিতেন, তাহাকেই কোনও অপরিসীম শক্তিশালী পুরুষ ভাষা নাম দিয়া কতকগুলি নিয়মের অধীন করিয়া দেন। তখন সাহিত্যের রচনা হইত মুখে মুখে। কিন্তু যেমন দিন যাইতে লাগিল, মানবের চিন্তাশক্তিরও সেইরূপ উন্মেষ হইতে লাগিল, তখন সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন দাঁড়াইল লিপি-প্রণালীর প্রচলন। কবে কোন্ সুদূর অতীতে কাহারা এই লিপি প্রণালী প্রচলন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে সে বিষয় লেখা নাই, তবুও তাঁহারাই যে মানব জাতির উন্নতির মহান সূচনা করিয়া দিয়াছিলেন,

www.pathagar.com

সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ণমালার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যের সৃষ্টি আরম্ভ হইল, প্রথমতঃ কথ্য ভাষার ভিতর দিয়া। এইরূপে যেমন দিন যাইতে লাগিল, তেমনি অল্প অল্প করিয়া কথ্য ভাষার সংস্কার হইতে লাগিল, শেষে কথ্য ভাষার স্থান সাহিত্যে অতি সামান্যই রহিয়া গেল-মার্জ্জিত ভাষা লেখ্য ভাষা নামে সাহিত্যের বিরাট দেহ অধিকার করিয়া বসিল।

কেবল আমাদের দেশেই যে কথ্য ভাষাকে স্থানচ্যুত করিয়া লেখ্য ভাষা সাহিত্যের আদর্শ ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এমন নহে, সকল দেশেরই সাহিত্যের আদর্শ ভাষা হইল লেখ্য ভাষা। ইংরাজী সাহিত্যের কথাই ধরুন। ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সের ভাষা ইংরাজী। কিন্তু কাউন্টি ভেদে তথায়ও যে কথ্য ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে, ইংরাজী উপন্যাস ও নাটক পাঠে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা সে দেশে বাস ও ভ্রমণ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ত উহা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান জগতে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত কিন্তু আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, ইংরাজী সাহিত্য কি কথ্য ভাষার ভিতর দিয়াই নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, না লেখ্য ভাষকে অবলম্বন করিয়াই উহা উহার এই বর্ত্তমান সম্পদ ও গৌরবের অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে?

আমাদের দেশে যাঁহারা কথ্য ভাষার দালালী করেন, তাঁহারা যদি এ কথা বলেন যে, খাঁটি কথ্য ভাষায়ই তাঁহারা সাহিত্য রচনা করেন, তাহা হইলে কি ইহা বুঝিতে হইবে না যে, তাঁহারা সত্যের পথ হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন? তাঁহারা লেখ্য ভাষাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহাদের উজ্জ্বল রচনাগুলি গাঁথিয়া তুলেন, পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাঁহারা এই করেন যে, সাধারণ বাংলা ক্রিয়াপদগুলিতে তাঁহারা কেবলমাত্র [কেবল] পশ্চিম বঙ্গের কথ্য ভাষার আকার দিয়া থাকেন। এইটুকু করিয়াই তাঁহারা মনে করেন যে, বাংলা ভাষার রূপ তাঁহারা আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। মোটকথা এই যে, তাঁহাদের ও আমাদের আসল বেসাতী লেখ্য ভাষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা লইয়াই আমরা উভয় দলে বেচাকেনা করি, পার্থক্য কেবল ক্রিয়াপদের সমাবেশের মধ্যে। আমরা এ কথা বলি না যে, বীরবলি ভাষা অচল, অকেজো; উহা চলিতেছে, চলুক। উহাকে গতি দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে এই সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্র ও পত্রিকাগুলির পৌনে ষোল আনারও বেশীর ভাগ লেখ্য ভাষার প্রাধান্যই কীর্ত্তন করিতেছে। বাংলা কথা সাহিত্যের আদর্শও লেখ্য ভাষাকে অতিক্রম করিয়া কথ্য ভাষা হইয়া দাঁড়ায় নাই। ইহার অর্থ এই যে, লেখ্য ভাষা নিজের স্থানেই সুপ্রতিষ্ঠিত আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। কথ্য ভাষার প্রচলন চেষ্টা একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র। এই উচ্ছ্বাস জল-বুদ্বুদের মত কালের বুকে মিলাইয়া যাইবে। কেন এমন হইবে তাহা খুলিয়া বলা দরকার।

সকলে জানেন, পশ্চিম বঙ্গের নানা জিলার কথ্য ভাষা নানারূপ। আবার পূর্ব্ববঙ্গ বা উত্তরবঙ্গের কথ্য ভাষার সহিত যেমন পরস্পরের মিল নাই, তেমনি উহার কাহারও সহিত পশ্চিম বঙ্গের কথ্য ভাষারও মিল নাই। কিন্তু এই প্রভেদকে ডুবাইয়া দিয়া বাঙ্গালীর জন্য

www.pathagar.com

যে এক সাধারণ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই লেখ্য ভাষা নামে পরিচিত হইয়াছে। এই লেখ্য ভাষাকে বর্জ্জন করিয়া কথ্য ভাষার প্রচলন করিতে গেলে বাংলার অধিবাসীকে বহুধা বিভক্ত করিয়া দিতে হয়। আমাদের প্রতিপক্ষগণ হয়ত বলিবেন, লেখ্য ভাষাকে কথ্য ভাষা অর্থাৎ কলিকাতার কথ্য ভাষার ছাঁচে ঢালিয়া চালাইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইতে পারে। তাঁহারা যখন এ কথাটা বলেন, তখন তাঁহারা climatic influence বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহা ভুলিয়া যান। কথ্য ভাষার ভিতরকার আবহাওয়ার এই প্রাধান্য তাঁহারা রোধ করিবেন কি করিয়া? দুই চারিজন শিক্ষিত ব্যক্তি পশ্চিম বঙ্গের কথ্যভাষার আবৃত্তি করিলে বা করিতে সক্ষম হইলেই যে, উহা দেশের আপামার [আপামর] সাধারণের গ্রহণীয় হইয়া গেল বা তাহারা উহা গ্রহণ করিল, কোন প্রকারেই একথা বলা যায় না।

বাংলা ভাষার গতি নির্দ্দেশ করিতে গেলে একটা বিষয় খুব বড় হইয়া আমাদের চোখে ঠেকে। সে হইতেছে সরল, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষা দ্বারা ভাব প্রকাশের চেষ্টা। কাদম্বরীর ভাষায় এখন আর কেহ সাহিত্য সৃষ্টি করেন না। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ বা অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির ভাষাও এখন Classic এর সামিল হইয়াছে। এখন সহজ, সরল, শব্দ ও ছোট ছোট বাক্যের দ্বারা ভাব প্রকাশের রীতি তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে বা করিতেছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনা তাহার নিদর্শন। ইহার মূলে যে আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে,' তাহার উদ্দেশ্যকে মহান আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, কারণ এতদ্বারা নানাবিধ কথ্য ভাষা প্রচলিত বাংলাদেশে সকলের উপযোগী, সর্ব্ব সাধারণের বুঝিবার উপযোগী, এক সাধারণ ভাষা গড়িয়া উঠিতেছে। বাংলা সাহিত্যকে যদি আমরা বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের মিলনক্ষেত্র বলিয়া লই, তাহা হইলে এইরূপ ভাষা প্রচলনের যে সার্থকতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার ফলে ভাব প্রকাশের জন্য অনুকূল যে সকল আরবী ফারসী ও তুর্কী শব্দ বাংলা ভাষায় বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহাদের ব্যবহার অনিবার্য হইয়া পড়িবে। সকল দেশেই নানা ভাষা হইতে নিত্য নূতন নূতন শব্দ গৃহীত হইতেছে, ভাষার শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য। কেবল বাংলা সাহিত্যেই কি একদল লোকের গোঁড়ামীর জন্য তথাকথিত ভাষার পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলমানী শব্দের প্রচলন বন্ধ রাখিতে হইবে? যাঁহারা বাংলা ভাষার বুক হইতে মুসলমানী ছাপটি অবলীলাক্রমে মুছিয়া ফেলিতে তৎপর, তাঁহারা যে হিন্দু মুসলমান অধ্যুষিত এই বাংলাদেশের পরম শত্রু, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

মুসলমানী শব্দের প্রচলন-বিরোধী যেমন একদল আছেন, অত্যধিক আরবী, ফারসী শব্দের প্রচলনকামীও আর এক দল আছেন। ইহারা মনে করেন হিন্দী ভাষার ভিতরে অত্যধিক আরবী ফারসী শব্দের প্রচলন করিয়া যদি উহাকে উর্দ্দু ভাষায় পরিণত করিয়া খুব ভাল রকমেই কাজ চলিতে পারে, তবে আমরা কেন বাংলা ভাষাকে ঠিক তেমনিভাবে রূপান্তরিত করিতে পারিব না? করিতে পারিবেন না এই জন্য যে, উহাতে বাংলা ভাষার দ্বিখণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী এবং এইরূপ দ্বিখণ্ডিত করার ফলে দেশের কোন

www.pathagar.com

মঙ্গল হইবে না। হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষার একই বুনিয়াদ। যাঁহারা হিন্দী জানেন, কিন্তু উর্দ্দু জানেন না তাঁহারাও উর্দ্দু মোটামুটিভাবে বুঝিতে পারেন। উর্দ্দু ভাষার পক্ষও ঠিক সেই কথাই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু বাংলা ভাষাকে যদি এমনভাবে দ্বিখণ্ডিত করা হয় যে, একপক্ষ কেবল সংস্কৃত ভাষার আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিবেন, আর একপক্ষ কেবল আরবী ফারসীর দামামা বাজাইবেন, তাহা হইলে দুই দলের মধ্যে এমন পার্থক্য দাঁড়াইয়া যাইবে যে, কেহ আর কাহারও ভাষা বুঝিবেন না। তখন বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে। আমাদের মনে হয়, মধ্যপথ অবলম্বন করিলেই সকল দিক বজায় থাকিতে পারে। হিন্দুও প্রচলিত মুসলমানী শব্দকে বর্জ্জন করিবেন না, মুসলমানও অত্যধিক আরবী, ফারসী শব্দের প্রয়োগ করিয়া বাংলা ভাষার যাহা নিজস্ব রূপ, তাহা বদলাইয়া দিবেন না।

আজকাল আমাদের মধ্যে দু-একজন মুসলমান লেখক তাঁহাদের রচনার মধ্যে বহু দুর্ব্বোধ্য ও কঠিন অনাবশ্যক আরবী, ফারসী শব্দের অবাধ প্রচলনে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। আরবী-ফারসী অভিধানের সাহায্য না লইয়া সেই সকল শব্দের অর্থ গ্রহণ করা বাংলা সাহিত্যের সাধারণ মুসলমান পাঠকের পক্ষে অসম্ভব, হিন্দুর ত কথাই নাই। ইঁহাদের যে কোন বাংলা রচনার অর্দ্ধেকই ঐরূপ শব্দে ভরা থাকে এবং ইঁহারা এত বিবেচক যে, দয়া করিয়া ফুট নোটেও তাহাদের প্রতিশব্দ দেন না। ফলে এই হয় যে, তাঁহাদের রচনা মাঠে মারা যায়, ততটা কষ্ট স্বীকার করিয়া কেহ উহা পড়িতে চাহেন না। কোন কোন হিন্দু লেখক নিজেদের রচনায় সহজ ও দেশ-প্রচলিত আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহাতে ভাষার সৌষ্ঠব ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়। ইঁহারা দেশ ও জাতির দিক দিয়া প্রকৃতই ধন্যবাদার্হ। পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার রচনায় মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এজন্য তাঁহার নাম তাঁহার কবি-প্রতিভার মতই চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

কবি নজরুল ইসলাম তাঁহার কবিতা-নিচয়ে বহু আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয় বাংলা ভাষার শক্তি ও শব্দ সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্যই তিনি এইরূপ করিয়া থাকেন। আমরা একথা স্বীকার করিতে বাধ্য নই যে, তাঁহার বাংলা শব্দের সঞ্চয় কম বলিয়াই তিনি মিলের সন্ধানে ছুটিয়া যান আরবী ফারসীর দিকে। বাংলা ভাষার চেয়ে যদি তিনি আরবী ফারসীতে বেশী সুপণ্ডিত হইতেন, তবুও বরং একথা বলা উচিত। তিনি তাহা নন বলিয়াই আমরা এই বীরবলী মতটি গ্রহণ করিতে একান্ত নারাজ। নজরুল ইসলামের মতের উপাসক না হইয়াও বাংলা কবিতায় আরবী ফারসী শব্দের সুপ্রয়োগকে আমরা ভাষার শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক বলিয়া সমর্থন করি। নজরুল ইসলাম যে সকল আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করেন, তিনি সেই সকল শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দিতে কৃপণতা করেন না। তাহাতে এই সুফল ফলিয়াছে যে, নজরুল ইসলামের ব্যবহৃত অনেক আরবী ফারসী শব্দ তরুণ হিন্দু কবিগণ অবাধে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভাব প্রকাশের পক্ষে উহাদের প্রয়োজন অত্যধিক বলিয়াই তাঁহারা ঐরূপ করেন।

www.pathagar.com

কিন্তু একথাও আমরা বলিতে বাধ্য যে, আরবী ফারসী অভিধান খুলিয়া কঠিন কঠিন শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক উহাদিগকে খুব বেশী করিয়া ব্যবহার করিলেই বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে না। সকলের আগে ব্যবহার করিতে হইবে সেই সকল শব্দ, যাহা বাংলার মুসলমান সমাজে নিত্য-প্রচলিত এবং যাহা বুঝিতে ইসলামী-ভাব ও আদর্শ প্রচার-ইসলামের স্বরূপ, সভ্যতা ও কালচার (Culture) বাংলার অধিবাসীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা। আজ ইংল্যাণ্ডে ওকিং মসজিদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারকগণ যে ইংরাজী ভাষায় ইসলাম প্রচার করিতেছেন, তাহার মধ্যে কি তাঁহারা গাড়ী বোঝাই করিয়া আরবী-ফারসী শব্দের আম্‌দানী করেন? না, তাহা করেন না, করিলে তাঁহাদের সকল শ্রম ব্যর্থ হইয়া যাইত, কোন ইংরাজই তাহা হইলে তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন না বা রচনা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন না। ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শ ও আভিজাত্যকে অক্ষুণ্ন রাখিয়াই তাঁহারা খাঁটি ইংরাজী ভাষায় তাঁহাদের পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছেন-ইসলামের মহান বাণী প্রচার করিতেছেন। ইহার সুফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, প্রতিদিন মোসলেম ইংরাজের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহাকে ইংরেজের দেশে, যে দেশ হইতে ইসলামকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়া আক্রমণ করা হইয়াছে সেই দেশে, ইসলামের বাণী ও আদর্শের জয় বলিয়া আপনারা ধরিয়া লইতে পারেন।

বাংলা ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত না করিয়া প্রচলিত ভাষার মধ্য দিয়াই মুসলমানদিগকে ইসলামের বাণী ও মহত্ত্ব প্রচার করিতে হইবে। এতদুপলক্ষে অনেক আরবী ফারসী শব্দ ক্রমে ক্রমে বাংলা ভাষার অধিকার-সীমার মধ্যে নিজেদের স্থান করিয়া লইতে পারিবে। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন, যে, উর্দ্দু ভাষার মত বাংলা ভাষায়ও এত আরবী ফারসী শব্দের আম্‌দানী হইবে যে, তাহা পরিশেষে আরবী ফারসী শব্দের আগার হইয়া যাইবে। প্রাচীন বাংলা পুঁথির ভিতর দিয়া এ চেষ্টা একবার হইয়াছিল, কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যের হিসাবে তাহার ফল শুভ হয় নাই। বাংলা পুঁথির ভাষা নিজের গণ্ডী ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে পারে নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেবল কতকগুলি শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামী ছাপ আঁকিয়া দেওয়া অসম্ভব। আবার বলিতেছি উহা নিরর্থক প্রয়াসই হইবে। ট্রেডমার্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে চলিতে পারে, চলিয়া থাকে; কিন্তু সাহিত্যে উহার একেবারেই স্থান নাই, - উহা একেবারে অচল। এই কথাটা ভুলিলে চলিবে না যে, কোন রচনার শ্রেষ্ঠত্ব কতকগুলি কঠিন ও অপ্রচলিত ভিন্ন ভাষার শব্দের প্রয়োগ দ্বারা নির্ণীত হয় না, ইহা হয় সরল, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া ভাব ও আদর্শকে রূপ দিতে পারিলে। বাংলা ভাষার সময়োচিত সেবা না করিয়া অপরাধ আমরা করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্তের ভার অন্যের ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না, সে আমাদেরই করিতে হইবে।

এখন আমাদের সাহিত্যকে হিন্দুগণ গ্রাহ্য করেন না, সে জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। আমাদিগকে বিপুল সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এই সাধনার ভিতর দিয়া আমরা যে সাহিত্য গড়িয়া তুলিব, সে সাহিত্য নিশ্চয়ই কাহারও উপেক্ষার জিনিষ হইবে না,—সে সাহিত্যকে সসম্মানে বাংলার সকল জাতিকেই গ্রহণ করিতে হইবে। আপনারা মনে

www.pathagar.com

রাখিবেন ইহা নিরর্থক আশা নহে। বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের এই আশাকে সফল করিয়া দিয়া প্রমাণ করিতে হইবে যে, চিরদিন পতিত বা পদানত থাকিবার জন্যই বাংলার মুসলমানের জন্ম হয় নাই। আমরা জাগরণের বাণী শুনিয়াছি,সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদের এই জাগরণকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

বাংলা ভাষা এতদিন হিন্দুদের দান গ্রহণ করিয়াছে, এইবার তাহাকে মুসলমানের দানও গ্রহণ করিতে হইবে—অনুগ্রহ করিয়া নহে, আগ্রহের সহিতই গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলার তরুণ মোসলেম সাহিত্যিকদের রচনায় আমরা যে আশার আলোক দেখিয়াছি, তাহা অসাধারণ না হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। তাঁহারা আমাদের সাহিত্যিক সাধনার প্রথম যাত্রীর দল, দুর্যোগের মধ্য দিয়াই তাঁহাদিগকে চলিতে হইবে, বন্ধুর পথকে সুগম করিয়া দিয়া। ইহাই তাঁহাদের কাজ, পরবর্ত্তী দল সেই পথ বহিয়াই জয়যাত্রা করিবেন।

বাংলা সাহিত্যের তরুণ মোসলেম সাধকগণ, তোমাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট তাহা ভাবিবার অবসর এখনও তোমাদের নাই, ওদিকে তোমরা মন দিও না। তোমরা কাজ করিয়া যাও,-ইসলামের জন্য, নিজের দেশ ও জাতির জন্য, সকল ভুলিয়া তোমরা সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ কর। একথা ভুলিও না যে, আল্লাহ্ তোমাদের হাতেই বাংলার মুসলমানের সকল প্রকার মঙ্গলের ভার দিয়াছেন। এখন বড় ছোটর বিচার করিতে গেলে তোমাদের মধ্যে বিরুদ্ধ মতের বিভিন্ন দল গড়িয়া উঠিবে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে যে হিংসার ভাব মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, তাহা তোমাদের সকল শ্রম এবং আমাদের সকল আশাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

লেখ্য ভাষা চলিবে কি কথ্য ভাষা চলিবে, সে-বিরোধে যোগ দিয়া আমাদের কাজ নাই। আমাদের কাজ কেবল সাহিত্য সৃষ্টি—ইসলামী আদর্শপূত সাহিত্যসৃষ্টি। আমাদের লক্ষ্য হইবে এক ও অনন্য—মোসলেম বাংলার বোধগম্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া জাতির ভিতরে জাগরণ আনয়ন। এই জাগরণের ফলেই আমাদের মধ্যে যাহা কিছু অসত্য আছে, তাহা লোপ পাইবে—সত্য আপনার গৌরব জয়যুক্ত হইয়া দর্শন দিবে—অশুভের তিরোধান হইয়া শুভ যাহা, তাহার আগমন হইবে।

www.pathagar.com

আমাদের ভাষাসমস্যা

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ১০ জুলাই, ১৮৮৫, পেয়ারা গ্রাম, চব্বিশ পরগনা। মৃত্যু ঃ ১৩ জুলাই, ১৯৬৯। শিক্ষা ঃ এম. এ (তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব) ১৯১২। ডি. লিট, সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়, প্যারিস, ১৯২৮। ডিপ্লোমা ধ্বনিতত্ত্ব, প্যারিস, ১৯২৮। পেশা ঃ অধ্যাপক, বাংলা ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অধ্যক্ষ বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রধান সম্পাদক, উর্দ্দু উন্নয়ন বোর্ড, করাচী। এমিরিটাস প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গবেষণা ঃ বাংলা সাহিত্যের কথা (১৯৫৩)। ভাষাতত্ত্ব ঃ বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৬৫), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১), বাংলা ব্যাকরণ (১৯৩৭)। প্রবন্ধ ঃ ইকবাল (১৯৪৫), আমাদের সমস্যা (১৯৪৭), বাংলা আদব কি তারিখ (১৯৫৭), Essays on Islam (1945), Traditional Culture in East Pakistan (1963)। গল্প ঃ রকমারী (১৯৩১)। শিশু সাহিত্য ঃ শেষ নবীর সন্ধানে। অনুবাদ ঃ রুবাইয়াৎ-ই- উমর খয়্যাম (১৯৪২), শিকওয়াহ্ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ্ (১৯৪২), অমর কাব্য (১৯৬৩)। পুরস্কার ঃ তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রাইড অব পারফরমেন্স সাহিত্য পুরস্কার। বহুভাষাবিদ, শিক্ষাবিদ এবং জ্ঞান তাপস হিসাবেও ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সমধিক পরিচিত।

লেখা-পরিচিতি ঃ ১৩২৪ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিরূপে কলিকাতায় প্রদত্ত অভিভাষণ থেকে উদ্ধৃত এবং 'শহীদুল্লাহ্- রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড), সম্পাদক, আনিসুজ্জামান, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ থেকে সংগৃহীত।

আমরা বঙ্গদেশবাসী। আমাদের কথাবার্ত্তার, ভয়-ভালবাসার, চিন্তা-কল্পনার ভাষা বাংলা। তাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। দুঃখের বিষয়, জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় এই সোজা কথাটীকেও আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দিলেও তাঁহারা জোর করিয়া বুঝিতে চাহেন না। তাই মধ্যে মধ্যে আমাদের মাতৃভাষা কি কিংবা কি হইবে, তাহার আলোচনা সাময়িক পত্রিকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। হা আমাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি!

মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া পরাণ আকুল করে? মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষার ধ্বনির জন্য প্রবাসীর কান পিয়াসী থাকে? মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন্ ভাষায় কল্পনা-সুন্দরী তাহার মনমজান ভাবের ছবি আঁকে? কাহার হৃদয় এত পাষাণ যে মাতৃভাষার অনুরাগ তাহাতে জাগে না? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোনও জাতি কখনও কি বড় হইতে পারিয়াছে? আরব পারস্যকে জয় করিয়াছিল। পারস্য আরবের ধর্ম্মের নিকট মাথা নীচু করিয়াছিল, কিন্তু আরবের ভাষা লয় নাই; শুধু লইয়াছিল তাহার ধর্ম্মভাব আর কতকগুলি শব্দ। তাই আনোয়ারী, ফারদৌসী, সাদী, হাফিয, নিযামী, জামী, সানাঈ, রূমী-প্রমুখ কবি ও সাধক-বুলবুলকুলের কলতানে আজ ঈরানের কুঞ্জ-কানন মুখরিত। যে দিন ওয়াইক্লিফ লাটিন ছাড়িয়া ইংরাজি ভাষা বাইবেলের অনুবাদ করিলেন, সেই দিন ইংরাজের ভাগ্য-লক্ষ্মী

www.pathagar.com

সুপ্রসন্ন হইল। যতদিন পর্যন্ত জর্ম্মানিতে জর্মন ভাষা অসভ্য ভাষা বলিয়া পরিগণিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত জর্ম্মানির জাতীয় জীবনের বিকাশ হয় নাই। বেশী দূর যাইতে হইবে না। আমাদেরই প্রতিবেশী আমাদের হিন্দুস্তানী মুসলমান ভাইগণ সংখ্যায় এত অল্প হইয়াও এত উন্নত কেন? আর আমরা সংখ্যায় এত বেশী হইয়াও এত অবনত কেন? ইহার একমাত্র কারণ তাঁহারা মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত আর আমরা মাতৃভাষার প্রতি বিরক্ত। হিন্দুস্তানী আলিমগণ উর্দ্দু ভাষায় কোরআন শরীফের অনুবাদ এবং তফ্‌সীর, ফিকহ্‌, হাদীস, তসউউফ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া কিংবা এতদ্বিষয়ক আরবী, পারসী ও ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া উর্দ্দু ভাষায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু দুই চারিজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত আমাদের মৌলভী-মৌলানাগণ বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক, বঙ্গভাষা কাফেরী ভাষা, তাহাতে ধর্ম্ম গ্রন্থের অনুবাদ করিলে ধর্ম্ম-গ্রন্থের অমর্য্যাদা করা হয় ইত্যাদি রূপ প্রলাপ উক্তি করিতে ছাড়েন না। বিশুদ্ধরূপে বাংলা বলা বা লেখা তাঁহারা অপবাদজনক মনে করেন। ফলে তাঁহাদের ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা শুনিয়া সামান্য বাংলা জানা শ্রোতারা পর্য্যন্ত হাসিবে কি কাঁদিবে, তাহা ঠিক করিতে পারে না। তাঁহাদের বাংলা ভাষায় যেমন দখল, উর্দ্দুও তেমন। স্কুলের ন্যায় যে পর্য্যন্ত বাংলার মদ্রাসায়ও বাংলা ভাষা অবশ্য পাঠ্য দেশীয় ভাষারূপে স্থান না পাইবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের এ দুরবস্থা ঘুচিবে না। যে পর্য্যন্ত আরবী পারসী জানা মুসলমান লেখক বাংলা ভাষার সেবায় কলম না ধরিবেন, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য গঠিত হইবে না।

সে দিন অতি নিকট, যে দিন বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভাষার স্থান অধিকার করিবে। বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মতন সৃষ্টিছাড়া প্রথা কখনও টিকিতে পারে না। যত দিন পর্য্যন্ত তাহা না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে একটি সময়োপযোগী শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। স্কুলের ছাত্রদের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় মানে কেবলমাত্র বাংলা থাকিবে। তৃতীয় মান হইতে ইংরাজি আরম্ভ হইবে। পঞ্চম মান হইতে Classical language শুরু হইবে। মুসলমান ছাত্রের পক্ষে কোন্ Classical language লওয়া উচিত, ইহার উত্তরে প্রত্যেক মুসলমান একবাক্যে বলিতে বাধ্য হইবেন- আরবী। আল্লাহর শেষ প্রত্যাদেশ আরবীতে। আল্লাহর শেষ নবী আরবী। আমরা সেই নবীর উম্মত (মণ্ডলী), সেই শেষ প্রত্যাদেশের উত্তরাধিকারী। অনুবাদে মূলের ছায়া পাওয়া যায় মাত্র; মূলের প্রাণ অনুবাদে থাকিতে পারে না। যদি ইসলাম ধর্ম্মকে তাহার প্রাথমিক যুগের অনাবিল অবস্থায় বজায় রাখা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, যদি শত দেশভেদ এবং সহস্র ভাষাভেদ সত্ত্বেও ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তবে মুসলমানকে তাহার কোরআন হাদীস মূল ভাষায় পড়িতে হইবে, পড়িয়া বুঝিতে হইবে, বুঝিয়া মজিতে হইবে। যদি মরুকে নগর করিবার, পশুকে মানুষ করিবার, অন্ধকে চক্ষুষ্মান করিবার, কাঙ্গালকে আমীর করিবার, ভীরুকে বীর করিবার অমোঘ মন্ত্র শিখিতে চাও, তবে আরবী কোরআন শিখ। যেমন প্রত্যেক খ্রীষ্টান বালক তাহার বাইবেল জানে,

www.pathagar.com

যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক মুসলমান বালক তেমনই তাহার কোরআন শরীফকে না জানিবে, সে পর্য্যন্ত মুসলমান সমাজ জাগিবে না। সমস্ত জগতের বদলে যে মুসলমান তাহার কোরআন ছাড়িতে প্রস্তুত ছিল না, আজ দেখ, সেই মুসলমান সন্তান সংস্কৃত, পারসী কিংবা পালী ভাষার বিনিময়ে কিরূপে তাহার কোরআনকে বর্জ্জন করিতেছে। হা ধিক্ আমাদের মৌখিক ধর্ম্মানুরাগকে! হা ধিক্ আমাদের দুনিয়া-পূজাকে! আমি বলি না মুসলমান কূপমণ্ডুক হইয়া কেবল আরবী সাহিত্যই আলোচনা করিবে। জগতের জ্ঞানভাণ্ডার মুসলমানেরই জন্য। ধর্ম্মগুরু এইরূপ বলিয়াছেন যে, "বিজ্ঞান মুসলমানের হারান ধন, যেখানে পাও তাহাকে গ্রহণ কর।" পুনশ্চ, "জ্ঞান অনুসন্ধান কর, যদিও তাহা চীন দেশে হয়।" আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই আগে ঘরের খবর জান, পরে পরের খবর জানিও। হে মুসলমান, তুমি বাপ দাদার নাম ডুবাইয়া হেদে জোলার নাতি হইতে যাইও না।

স্কুলের ন্যায় মাদ্রাসায়ও দেশীয় ভাষা, প্রধান ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা এই তিন ভাষার চর্চ্চা হইবে। মাদ্রাসাতেও স্কুলের ন্যায় ১ম হইতে ১০ম পর্য্যন্ত দশ মানে জুনিয়ার বিভাগ এবং ১ম বর্ষ হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত ছয় বর্ষ সিনিয়ার বিভাগ রাখিতে হইবে। ১ম ও ২য় মানে কেবল মাত্র বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে। তৃতীয় মান হইতে আরবী ভাষা এবং পঞ্চম মান হইতে দ্বিতীয় ভাষা আরম্ভ হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, দ্বিতীয় ভাষা কি হওয়া উচিত? আমি বলি ইংরাজি। ইংরাজি ভাষার সাহায্যে আমাদের মৌলভী সাহেবগণ আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞানের তত্ত্ব পাইবেন। যদি আমাদের আলিমকুল কুফ্‌রী ফৎওয়ারূপ প্রচণ্ড দণ্ড দ্বারা আমাদের ইংরাজি শিক্ষিত সমাজকে ভীতচকিত ও দলিতমথিত করিয়া ইসলামের অপ্রতিহত ক্ষমতার পরিচয় দিতে না গিয়া, বাস্তবিক তাহাদের হৃদয়রাজ্যে ভক্তির আসন লাভ করিতে চান; যদি তাঁহারা ক্রমবর্ধনশীল শিক্ষিত সমাজকে ইসলামের গণ্ডী হইতে খারিজ করিয়া না দিয়া তাহাদের প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশক হইতে চান, তবে তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপক্ক হইতেই হইবে। পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে বলিলে যাঁহাদের মতে অতিভাল মুসলমানও কাফের হইয়া যায়, পৃথিবী মাছের পিঠে আছে, পৃথিবীর চারিদিকে কাফ পাহাড় দিয়া ঘেরা ইত্যাদিরূপ বালকোচিত মত যাঁহারা আজও গম্ভীরভাবে প্রচার করেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সমস্ত ধার্ম্মিকতা সত্ত্বেও শিক্ষিত সমাজ ভক্তি করিতে অক্ষম।

স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা সর্ব্বত্রই উর্দ্দু বা পারসী বৈকল্পিক বিষয় (optional subject) থাকিলে মুসলমান ছাত্রগণের ভাষা-সমস্যার সমাধান হয়। যাহাতে উর্দ্দু বা পারসী বৈকল্পিক বিষয় হইতে পারে, তজ্জন্য আমাদিগকে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে সম্মত করাইতে হইবে।

অনেক দিন পূর্ব্বে উর্দ্দু বনাম বাংলা মোকদ্দমা বাংলার মুসলমান সমাজের ভিতরে উঠিয়াছিল, তাহাতে বাংলার ডিক্রী হইয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া যায়। বর্ত্তমানে আবার সেই মোকদ্দমার ছানি বিচারের জন্য উর্দ্দু পক্ষকে বিস্তর সওয়াল জওয়াব করিতে শুনিতেছি। কিন্তু ন্যায়বান বিচারক দেখিবেন যে, উর্দ্দু বাংলার দখল উত্যক্তে কিছুতেই

www.pathagar.com

খাস দখল পাইতে পারে না, দখল বাংলারই থাকিবে, তবে উর্দ্দু বাংলার অধীনে উপযুক্ত করে ইচ্ছাধীন প্রজাই স্বত্বে কিছু ভূমি বন্দোবস্ত পাইতে পারে মাত্র।

বাংলা ভাষা চাই-ই। মুহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের বাংলা জয়ের পরে যখন হইতে মুসলমান বুঝিল এই চির-হরিতা ফলশষ্যপুরিতা নদনদী–ভূষিতা বঙ্গভূমি শুধু জয় করিয়া ফেলিয়া যাইবার জিনিস নহে; এ দেশ কর্ম্মের জন্য, এ দেশ ভোগের জন্য, এ দেশ জীবনের জন্য, এ দেশ মরণের জন্য, তখন হইতে মুসলমান জানিয়াছে বাংলা চাই। তাই বাংলার পাঠান বাদশাহগণ বাংলা ভাষাকে আদর করিতে লাগিলেন। যে ভাষা দেশের উচ্চশ্রেণীর অবজ্ঞাত ছিল, তাহা বাদশাহের দরবারে ঠাঁই পাইল। নসরৎ শাহ, হোসেন শাহ, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁর নাম বাঙ্গালী ভুলিতে পারিবে না। বাদশাহের দেখাদেখি আমীর ওমরা বাংলার খাতির করিলেন। আমীর ওমরার দেখাদেখি সাধারণে বাংলার আদর করিল। গোঁড়া ব্রাহ্মণের অভিসম্পাৎ ও চোখরাঙ্গানিকে ভয় না করিয়া বাঙ্গালী নবীন উৎসাহে তাহার প্রিয় ধর্ম্ম পুস্তকগুলি বাংলায় অনুবাদ করিল, কত দেশ প্রচলিত ধর্ম্ম কথা বাংলায় প্রকাশ করিল, কত মর্ম্মগাথা বাংলায় প্রচার করিল। মুসলমানও চুপ করিয়া থাকে নাই। হিন্দুর রামায়ণ আছে; মুসলমানের "জঙ্গনামা" আছে। হিন্দুর মহাভারত আছে, মুসলমানের "কাসাসুল আম্বিয়া" আছে। হিন্দুর মহাজন পদাবলী আছে; মুসলমানের মারফতী গান আছে। হিন্দুর বিদ্যাসুন্দর আছে; মুসলমানের "পদ্মাবতী" আছে।

এই পুথি সাহিত্যকে ঘৃণা করিলে চলিবে না। ইহাই বাঙ্গালী মুসলমানের খাঁটি সাহিত্য। সেই সময়ের কথিত ভাষায় পুথিগুলি রচিত হইয়াছিল। তখন পারসী রাজ–ভাষা মুসলমানের বাংলাদেশে নূতন ভাব ও নূতন জিনিস আনিয়াছিল। এই নূতন ভাব ও নূতন জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পারসী নাম বাংলা ভাষায় ঢুকিয়া পড়িল। রাজভাষার প্রভাব কথিত ভাষার উপর হওয়া স্বাভাবিক। এখন যেমন বাঙ্গালী চলিত ভাষায় ইংরাজির বুকনি ঝাড়েন, তখন ঝাড়িতেন পারসীর বুকনি। মুসলমান সেই পারসীর 'আমেজ' দেওয়া কথিত ভাষাতেই পুথি লিখিতেন। হিন্দু কিন্তু লিখিবার সময় যথাসাধ্য পারসী বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করিতেন। এখনও বাংলা ভাষায় প্রায় এক হাজার পারসী বা পারসীগত আরবী শব্দ পারসী প্রভাবের পরিচয় দিতেছে।

গুটিকতক শিক্ষিত লোককে ছাড়িয়া দিলে, এখনও এই পুথি সাহিত্যই বাংলার বিশাল মুসলমান–সমাজের আনন্দ ও শিক্ষা সম্পাদন করিতেছে। পুথি পাঠক যখন সুর করিয়া পুথি পড়িতে থাকে; তখন শ্রোতৃবর্গ কখনও কারবালার শহীদগণের দুঃখে গলিয়া যায়, কখনও আমীর হামজার বা রোস্তমের বীরত্বে মাতিয়া উঠে, কখন বা হাতেমের দয়ায় ভিজিয়া যায়। বেচারাদের আহার নিদ্রার কথা, ঘর–সংসারের কথা, চিরদৈন্যের কথা আর মনে থাকে না। দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ন্যায় কে আমাদের এই পুথি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিবে?

যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানের ভাগ্য–বিপর্যয় না ঘটিত, তবে হয়ত এই পুথির ভাষাই বাংলার হিন্দু–মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত। যাক সে কথা। অতীতকে

www.pathagar.com

যখন আমরা বদলাইতে পারিব না, তখন সে কথা লইয়া বেশী আলোচনায় লাভ কি? এখন বর্ত্তমানে আমরা বুঝিয়াছি পুথির ভাষা আর চলিবে না। তাহার সময় গিয়াছে। অতীত যুগের জীব-কঙ্কালের ন্যায় তাহাকে কেবল দেখিবার জন্য রাখিয়া দাও। এখন আমাদের শিক্ষিত সমাজের রুচি সাধু ভাষার দিকে। এখন এই ভাষাই চলিবে। ইহাতেই লেখাপড়া করিতে হইবে। ইহাতেই আমাদের ভাবী বাঙ্গালার মুসলমান সাহিত্য রচনা করিতে হইবে। ইহাই হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালী জাতির ভাষা হইবে।

হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া তুলিতে বহু অন্তরায় আছে। কিন্তু দূর ভবিষ্যতেই হউক না কেন, তাহা ত করিতেই হইবে। বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গালী মুসলমান ব্যতীত চলিতে পারিবে না। চিরকাল কি একভাবেই যাইবে? জগতের ইতিহাস পৃষ্ঠে কি হিন্দু-মুসলমান-মিলিত বাঙ্গালী জাতি, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালিয়ান, জার্ম্মান, জাপানী প্রমুখ জাতির ন্যায় নাম রাখিতে পারিবে না? আশা কানে কানে গুঞ্জন করিয়া বলে "পারিবে।" উত্থান-পতন, পতন-উত্থান ইতিহাসের ত এই ধারা। যদি আমাদের এই মহামহীয়ান আদর্শ থাকে, তবে এখন হইতেই সেই আদর্শকে চোখের সামনে রাখিয়া চলিতে হইবে। এই আদর্শের অনুরোধে বলি ভাই মুসলমান, আমাদের মিলনের শত বাধার মধ্যে আর এই ভাষার বাধা আনিও না; আর ভাই হিন্দু, তোমার নাটক-নভেলে মুসলমানের, শুধু মুসলমানের কেন-হিন্দু-মুসলমানের, বাদশাহ বেগমদিগের কালিমাখা মূর্ত্তি কালি-মাখা কল্পনা দ্বারা আঁকিয়া আর তাহার ভগ্নহৃদয়ে বেদনা দিও না।

আর এক কথা। মুসলমানের ধর্ম্ম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম্ম নহে। তাহা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার ধর্ম্ম তাহার প্রতিবেশীকে বুঝাইয়া দেওয়া। সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদিগকে ইসলামের মহত্ত্ব ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, ইসলামের সৌন্দর্য প্রচার করিতে হইবে। এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম অপেক্ষা খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অধিক পক্ষপাতী। সে কি খ্রীষ্টান ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাবে নহে? প্রচারের উদ্দেশ্যে আমাদিগকে আমাদিগের প্রতিবেশীর ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে। যে ভাষা তাহাদিগের মর্ম্ম স্পর্শ করে, সেই ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। হিন্দুর ভাষায় ইসলামী ভাব ফুটাইতে হইবে। কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন-

যবাঁ কয বহ্‌রে দী গোঈ চে ইব্‌রানী চে সুরিয়ানী।
মকাঁ কয বহরে হক্‌ জোঈ চে জাবল্‌কা চে জাবলসা ॥

"ধর্ম্মের তরে আছে সব বাণী, কি বা সে হিব্রু কিবা সুরিয়ানী।
সত্যের তরে খোঁজ সব ঠাঁই পূব-পশ্চিম কোন ভেদ নেই।"

মুসলমানি বাংলার কটমট বুলি বাংলার কানে স্থান পাইবে না, অন্তরে ত নয়ই। খোদা, পয়গম্বর, বেহেশত, দোযখ, ফেরেশতা, নমায, রোযা প্রভৃতি পারসী শব্দ ব্যবহার করিতে যদি আপত্তি না থাকে, তবে ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, উপাসনা, উপবাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে আপত্তি কেন? পানি, চাচা, নানা, দাদা, ফুফু প্রভৃতি শব্দগুলি ত হিন্দী বা রাজপুতনী। ইহাদের জন্য এত মারামারি কেন?

www.pathagar.com

মুসলমানি বাঙ্গালা বাংলাদেশে প্রাদেশিক বুলির ন্যায় চলিত ভাষায় থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সাহিত্যের ভাষা হইবে না। জলকে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হয় না। সে আপনার পথ আপনি চিনিয়া লয়। বাঙ্গালার মুসলমানের মন আপনিই জানিতে পারিয়াছে কোন্ ভাষায় তাহাকে সাহিত্য রচিতে হইবে। এখন মৌলানা, মৌলভী ও পণ্ডিত, যিনিই বঙ্গ ভাষায় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কিছু লিখিতেছেন, তিনিই সাধু ভাষা ব্যবহার করিতেছেন। দুই একজন যদি কেহ মুসলমানি বাংলা চালাইতে চেষ্টা করেন বা তাহাতে বই লেখেন, তাহা শুধু কলমের জোরে। ইহাদেরই সমশ্রেণীর মহাত্মারা বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা কলমের জোরে উর্দ্দু করিয়া দিতে চান। কখনও কখনও আমার মনে হয় হয়ত ইহাদের কলম বনমানুষের হাড়ে তৈরী, তাহা না হইলে এত গুণ কোথা হইতে আসিল?

বনমানুষের হাড়ে কত গুণ,
নুনকে বানায় চুন, চুনকে বানায় বেগুন।

এখানে এক নতুন সমস্যা উপস্থিত হইতেছে। বর্ত্তমানে বাংলা লেখকগণের মধ্যে ভাষার রীতি (style) লইয়া তিন দলের সৃষ্টি হইয়াছে। একদল কলিকাতার বিভাষাকে সামান্য একটু মাজিয়া ঘষিয়া চালাইতে চান। এই দলের চাঁই "সবুজ পত্রের" সম্পাদক প্রমথ বাবু। আমি রবি বাবুকে এই দলের প্রধান বলিয়া মনে করি। ইহাদিগকে চরমপন্থী বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় দল সাবেক দল। ইহারা ভাষার কোনও পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারেন না। "সাহিত্য" পত্রিকা এই দলের মুখপত্র। ইহারা প্রাচীনপন্থী। তৃতীয় দল সকলের বোধগম্য সহজ সরল বাংলা প্রচলন করিতে চান। পরলোকগত অক্ষয় কুমার সরকার ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। ইহাদিগকে মধ্যপন্থী বলা যাইতে পারে। এই তিন দলের মধ্যে কোন্ দলে আমরা যাইব? এই প্রশ্নের একটা গা-জোরি উত্তর না দিয়া ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক কোন্ দলে আমাদের যাওয়া উচিত।

যেমন রাজনীতিক্ষেত্রে অভিজাত-তন্ত্র (Aristocracy) এবং গণতন্ত্র (Democracy) আছে, ভাষা ক্ষেত্রেও তদ্রূপ অভিজাত-তন্ত্র ও গণতন্ত্র আছে। ভারতীয় ভাষা হইতে আমি ইহার উদাহরণ দিতেছি। যে সময় ঋষিগণের মধ্যে বৈদিক ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই সময় সাধারণ আর্যগণের মধ্যে বৈদিক হইতে কিছু বিভিন্ন লৌকিক ভাষা প্রচলিত ছিল। বৈদিক ছিল অভিজাত-তন্ত্রের ভাষা, লৌকি "লৌকি ভাষা অগ্রাহ্য অকথ্য। ন ম্লেচ্ছিতবৈ। নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করিও না। অপভাষা ব্যবহার করিওনা। যদি কর, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" ছিল গণতন্ত্রের ভাষা। ঋষিরা বলিলেন, "খবরদার। ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিংবা স্বরের উচ্চারণে যদি এক চুল পরিমাণ এদিক ওদিক হয় আর তোমার রক্ষা নাই। দেখনা অসুরেরা 'হে অরুয়ঃ' 'হেরুয়ঃ' স্থানে 'হেলয় : হেলয়:' বলিয়াছিল, তাই তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল। দেখ না, বৃত্রের পিতা পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ইন্দ্রশত্রু শব্দ বলিতে স্বরে অপরাধ করিয়াছিল, তাই বৃত্র ইন্দ্রের জেতা না হইয়া ইন্দ্রই বৃত্রের নিহন্তা হইল।"

www.pathagar.com

ঋষিদিগের শত সহস্র দোহাইতেও কিন্তু বৈদিক ভাষা পূজা অর্চ্চনায় ছাড়া অন্যত্র লৌকিক ভাষার নিকট টিকিতে পারিল না। গণ তন্ত্রের নিকট অভিজাত-তন্ত্রের পরাজয় হইল।

পরবর্ত্তীকালে উচ্চবর্ণেরা লৌকিক ভাষাকে মার্জ্জিত করিয়া সংস্কৃত করিয়া লইল। সাধারণে লৌকিক ভাষা পালী ব্যবহার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকারেরা বলিলেন, "ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত, ম্লেচ্ছ ভাষা শিখিও না।" তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দুর্দ্দশা, বৌদ্ধ ধর্ম্ম তাহার নবীন তেজে দণ্ডায়মান। কেহ ব্রাহ্মণের কথা শুনিল না। বৌদ্ধগণতন্ত্রের পক্ষ লইল। পালী ভাষা এক বিপুল সাহিত্যের ভাষা হইল। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাত-তন্ত্রের পরাজয় হইল।

আর এক যুগ আসিল। এখন রাজশক্তি বৌদ্ধ। বৌদ্ধ এখন অভিজাত-তন্ত্রের দিকে। বৌদ্ধ এখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পালীকে ধরিয়া রাখিতে চাহিল; তখন কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষ লইল জৈন ধর্ম্ম। তখন লৌকিক ভাষা প্রাকৃত। পালী প্রাকৃতের নিকট তিষ্টিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাত-তন্ত্রের পরাজয় হইল।

আর এক যুগ আসিল। এ যুগ অন্ধকারময়। এ যুগে উচ্চ শ্রেণীর প্রাকৃত নিম্ন শ্রেণীর অপভ্রংশের নিকট পরাজিত হইল। এই অপভ্রংশ হইল বাংলা, ওড়িয়া, আসামী, হিন্দী, গুজরাতী, মারহাটী প্রভৃতি দেশীয় ভাষাসমূহের জননী।

তারপর আধুনিক যুগ। এ যুগে পণ্ডিতেরা সাধারণের ভাষাকে মাজিয়া ঘষিয়া সাধু ভাষা করিয়া লইলেন। বিশাল জন সাধারণের ভাষাকে ইতর ভাষা বলিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। বর্ত্তমানে এই ইতর ভাষা পণ্ডিতের ভাষার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। পণ্ডিতে তাঁহার অন্ধ সংস্কৃত ভক্তির জন্য বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুর্ব্বহ শিকলে বাঁধিতে চাহিতেছেন। আর ইতর ভাষা সেই শিকলকে কাটিতে চাহিতেছে। তাহার চেষ্টা সফল হইবে কি? যদি ভারতের ভাষা ইতিহাসের শিক্ষা মিথ্যা না হয়, তবে নিশ্চয়ই একদিন এই ইতর ভাষা সাধু ভাষাকে, যেমন লৌকিক বৈদেককে, পালী সংস্কৃতকে, প্রাকৃত পালীকে, অপভ্রংশ প্রাকৃতকে ঠেলিয়া দিয়াছিল সেইরূপ ঠেলিয়া ফেলিবে। সাধু ভাষা মৃত ভাষারূপে পুস্তকে ঠাঁই পাইবে। যেমন মিলটন, জনসন প্রভৃতির ল্যাটিনবহুল ভাষা এখন কেবল কেতাবী ভাষা হইয়া রহিয়াছে, এখনকার সাধু ভাষার অবস্থাও সেইরূপ হইবে। পরিণামে চরমপন্থীরই জয় হইবে। তবে মধ্যম পন্থা বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনশীল যুগের (Transitional period এর) উপযুক্ত ভাষা বটে। একেবারে নি হইতে সা-তে সুর নামাইতে গেলে অনেকের কানে বেখাপ্পা লাগিবে নিশ্চয়ই।

ভাষাবিজ্ঞান শিক্ষাদান করে যে বহু প্রাদেশিক বিভাষার মধ্যে যে বিভাষায় বহু সদ্‌গ্রন্থ রচিত হয় বা যাহা রাজশক্তি আশ্রয় পায়, তাহা সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠে। জীবজগতের ন্যায় বিভাষাগুলির মধ্যেও যোগ্যতমের পরিত্রাণ-নীতি চলিয়া আসিতেছে। সাহিত্যিক শক্তিতে নবদ্বীপের বুলি সমস্ত বাংলার সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। এখন পুনরায় সাহিত্যিক শক্তিতে ও রাজশক্তির আশ্রয়ে কলিকাতার বুলি বাংলা সাহিত্যের ভাষা হইয়া

www.pathagar.com

উঠিতেছে। এখন বাংলার বিভিন্ন জেলার ভদ্রলোক আপোসে কথা বার্ত্তার জন্য কলিকাতার বুলিই ব্যবহার করেন। সাহিত্যিক ভাষা হইয়া উঠিবার ইহাই সূচনা। তারপর রবিবাবু প্রমুখ কলিকাতাবাসী সাহিত্যিকগণের প্রভাবে কলিকাতার বিভাষা সাহিত্যের ভাষার স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে।

ভাষার-রীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। একদল অন্ধ সংস্কৃতভক্ত বাংলা ভাষার মধ্যে প্রচলিত আরবী পারসী শব্দগুলিকে যাবনিক বলিয়া বর্জ্জন করিতে চাহেন। আমি বলি আগে তাঁহারা বাংলাদেশ হইতে যবনকে দূর করুন, পরে ভাষা হইতে যাবনিক শব্দগুলি দূর করিবেন। যখন সংস্কৃত ভাষা হোরা, কেন্দ্র, জামিত্র, দীনার প্রভৃতি গ্রীক শব্দ এবং ইক্কবাল, ইন্দুরার, মুকাবিলা প্রভৃতি আরবী শব্দ গ্রহণ করিয়াছে, তখন বাংলা ভাষার বেলায় আপত্তি কেন? ঐ সকল আরবী-পারসী শব্দ বাংলা ভাষার অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে। ভাষা হইতে ইহাদিগকে তাড়ান সহজ ব্যাপার হইবে না। দোয়াত, কলম, কাগজ, জামা, কামিজ, কমর, বগল প্রভৃতি এবং আইন আদালতে প্রচলিত সর্ব্বসাধারণের সহজবোধ্য হাজার খানিক শব্দ ত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ গড়িলে তাহা নামের জোরে পুস্তকে চলিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ভাষায় চলিবে না। বাংলা ভাষায় আরবী, পারসী, তুরকী, ইংরাজি, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি যে কোন ভাষার শব্দ বেমালুম খাপ খইয়া গিয়াছে, তাহারা নিজেদের দখলী স্বত্ববলে বাংলা ভাষায় থাকিবে। তাহাদিগকে তাড়াইতে গেলে জুলুম করা হইবে।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার নূতন পরিচয়

গোলাম মোস্তফা

লেখক-পরিচিতিঃ জন্ম ঃ ১৮৯৭, মনোহরপুর, যশোর। মৃত্যু ঃ ১৩ অক্টোবর, ১৯৬৪, ঢাকা। শিক্ষা ঃ বি.এ, ১৯১৮, বি.টি, ১৯২৪। পেশা ঃ শিক্ষকতা। হেয়ার স্কুল কলকাতা; বালিগঞ্জ হাইস্কুল, কলকাতা; প্রধান শিক্ষক, ফরিদপুর জেলা স্কুল।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ রূপের নেশা (১৯২০), ভাঙ্গাবুক (১৯২১)। গল্প ঃ জয় পরাজয়। কবিতা ঃ রক্তরাগ (১৯২৪), হাস্নাহেনা (১৯৩৮), খোশরোজ (১৯২৯), সাহারা (১৯৩৫), কাব্যকাহিনী (১৯৩৮), বুলবুলিস্তান (১৯৪৯), বনি আদম (১৯৫৮)। গান ঃ তারানা-ই-পাকিস্তান (১৯৪৯)। কাব্যানুবাদ ঃ শিকওয়া, জওয়াব-ই- শিকওয়া (১৯৬০), মুসাদ্দাস-ই-হালী (১৯৪১), আল কুরআন (১৯৫৭)। জীবনী ঃ বিশ্বনবী (১৯৪২), মরুদুলাল (১৯৪৮)। প্রবন্ধ ঃ আমার চিন্তাধারা (১৯৫২), ইসলাম ও কমিউনিজম, বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য, ইসলাম ও জেহাদ (১৯৪৭),

লেখা-পরিচিতি ঃ লেখাটি মাহফুজা খাতুন সম্পাদিত 'গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন' থেকে সংগৃহীত। প্রকাশক ঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৬৮।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। ভাষার দরবারে বাংলা ভাষা সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া আছে। কোনো ভাষার চর্চা করিতে হইলে তাহার ইতিহাসের সহিত অল্প-বিস্তর পরিচয় থাকা প্রয়োজন; নতুবা সেই ভাষার রূপ ও প্রকৃতি, মন ও মেজাজ, গঠন ও আঙ্গিক এবং লক্ষ্য ও প্রবণতা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা জন্মে না। আমরা তাই অতি সংক্ষেপে বাংলা ভাষার ইতিহাস এখানে আলোচনা করিব।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনগ্রাহ্য কোনো ইতিহাস আজ পর্যন্ত রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য রামগতি ন্যায়রত্ন, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তি এযাবত কয়েকখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থেও অনেক বিভ্রান্তি ও গোঁজামিল আছে। উপাদানের অপ্রতুলতাও এই বিড়ম্বনার অন্যতম কারণ। বর্তমানে নূতন নূতন তথ্য ও উপাদান আবিষ্কৃত হওয়ায় পূর্বের অনেক মতবাদ স্বাভাবিকভাবে খণ্ডিত বা পরিত্যক্ত হইয়াছে; কাজেই, নূতন গবেষণার আলোকে বাংলা ভাষার একখানি নূতন ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

উপরোক্ত লেখকদিগের প্রায় সকলেই এই কথা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, বাংলা ভাষা সংস্কৃতের দুহিতা, কাজেই ইহা আর্য-ভাষা। এই দাবীর ভিত্তি রচনার উদ্দেশ্যে তাঁহারা বৈদিক যুগ হইতেই বঙ্গদেশের সহিত আর্যদের একটা সম্পর্ক স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ডক্টর সুকুমার সেন বলেন ঃ "বঙ্গদেশ হইতে দেশবাচক বঙ্গ শব্দের উৎপত্তি।

www.pathagar.com

বঙ্গজাতি তথা বঙ্গ শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ রহিয়াছে ঐতরেয় আরণ্যকে।" [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস]

অন্যত্র বলিতেছেন ঃ "খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব হইতে এদেশে আর্যদিগের বসতি আরম্ভ হয় গঙ্গাপথ ধরিয়া এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র আর্যভাষার একচ্ছত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্যদিগের পোষাকী ভাষা অর্থাৎ শিক্ষার, বিদ্যাচর্চার ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ভাষা ছিল সংস্কৃত, আটপহুরিয়া অর্থাৎ ঘরোয়া ভাষা ছিল সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত। কালক্রমে সংস্কৃত ভাষা বদলাইয়া প্রাকৃত ভাষার রূপ নিল। এই প্রাকৃত ভাষা ভাঙিয়া আবার বিভিন্ন প্রদেশে আঞ্চলিক ভাষায়–যেমন বাঙ্গালা, আসামী, উড়িষ্যা, মৈথিলী, গুজরাটী, মারাঠি ইত্যাদি–পরিণত হইল। বাংলাদেশে যে আর্যভাষা প্রবর্তিত হইল, তাহা এই পূর্বী প্রাকৃতেরই প্রকারভেদ।" [বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা] উপরোক্ত দাবীগুলি কতোদূর সত্য, পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক ঃ

ঐতরেয় আরণ্যক

সুকুমার সেন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বলিতে চান যে, যেহেতু ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ শব্দের উল্লেখ আছে এবং ঐতরেয় আরণ্যক বেদের অংশ অতএব বঙ্গদেশ বৈদিক যুগ হইতেই আর্যভূমি।

একেইতো সিদ্ধান্তটি ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিধারার (syllogism) সম্পূর্ণ বিরোধী তদুপরি ঐতিহাসিক সত্যের সহিতও ইহার কোনো সম্পর্ক নাই।

ঐতরেয় আরণ্যকে প্রকৃতই 'বঙ্গ' শব্দের উল্লেখ আছে কিনা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। থাকিলেও সে প্রমাণ এত ক্ষণ-ভঙ্গুর যে, তাহার উপর কোনো থিওরী রচনা করা চলে না। কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার বলেন যে, ঐতরেয় আরণ্যক বা অন্য কোনো বৈদিক-সাহিত্যে বঙ্গদেশের কোনো উল্লেখ নাই। বঙ্গ শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় অথর্ববেদের পরিশিষ্টে, কিন্তু সেখানেও শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি বলেন ঃ

"It is a fact that the Veda-Samhita and the early Vedic literature do not mention the name 'Vanga' either in connection with the names of the Indian tribes or in any enumeration of the countries owned by the Aryans, as well as by the non Aryans. The Rigveda-Samhita did not know even Anga, but the Anga country is mentioned in the Atharvaveda Parisista. In the Atharvaveda Parisista however, the word 'Vanga' occurs with Bagadha (বঙ্গবগধা) as a component of a compound word ; but as the scholars do not attach any value to it owing partly to the lateness of the Parisista itself, I advisedly leave the mention out of consideration." [History of Bengali Literature]

www.pathagar.com

তাহা হইলে পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে যে, ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বঙ্গদেশের কোনো উল্লেখ নাই; ঐতরেয় আরণ্যক বেদের কোনো অংশও নহে। পর সময়ে রচিত একখানি ভাষ্য মাত্র। বঙ্গ শব্দের উল্লেখ দেখা যায় অথর্ববেদের পরিশিষ্টে; তাহাও 'বঙ্গবগধা' নামক একটি যৌগিক শব্দের অংশ রূপে—আর, যাহার অর্থ কোনো দেশ নয়, এক প্রকার রাক্ষস বিশেষ।

যদি ধরিয়াই লই যে, ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ শব্দের উল্লেখ আছে, তবে দেখা যাক্ আরণ্যক গ্রন্থ্ কখন কিভাবে কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছিল।

ঐতরেয় আরণ্যকের রচনাকাল

বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থখানির রচয়িতা হইতেছেন মহিদাস ঐতরেয় নামক একজন ঋষি-কবি। তিনি রাজা ভোজের সমসাময়িক ছিলেন। রাজা ভোজ মালব-রাজ্যের অন্তর্গত ধারা নগরের রাজা ছিলেন। একাদশ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি রাজত্ব করিতেন। গজনীর সুলতান মাহমুদ যখন সোমনাথ আক্রমণ করেন, তখন রাজা ভোজ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ মুসলিম পরিব্রাজক আল্‌বিরুণী তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে রাজা ভোজের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই এ অনুমান অনায়াসেই করা যায় যে, ঐতরেয় আরণ্যক একাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয় নাই।

অথর্ববেদের পরিশিষ্টও অনেক পরে রচিত। কাজেই ইহার উল্লেখ কোনো প্রাচীন ঘটনার প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না।

বাংলা ভাষা কি আর্য ভাষা?

বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত কাজেই উহা আর্যভাষা—এ দাবীও বিচারসহ নয়। সংস্কৃত ভাষাভাষি আর্যদের আসিবার বহু পূর্ব হইতেই এ দেশবাসীদের যে নিজস্ব ভাষা ছিল, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। প্রাচীনকালে বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া ঐতিহাসিক (Marshman 1859) যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্যঃ

"অতি প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে কি অবস্থা ছিল তাহা নিশ্চয় করা অতি দুষ্কর। বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম কোন্ সময় হইতে চলিল, তাহা জানা যায় না। যে মানুষেরা বঙ্গদেশে প্রথম বাস করিয়াছিল, তাহারা হিন্দু ছিল না। কিন্তু পশ্চিম সীমার পার্বতীয় লোকদের তুল্য এক জাতি ছিল। যে ভাষা এখন চলিত আছে, তাহা কোন্ সময় উৎপন্ন হইল, ইহাও নিশ্চয় করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভিন্ন আরও অন্য অনেক শব্দ বঙ্গভাষায় চলিত আছে। তাহাতে অনুমান হয় যে, বঙ্গদেশবাসী লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহার সহিত সংস্কৃত ভাষার কোনো সম্পর্ক ছিল না।" [বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত]

শুধু তাই নয়। সুপ্রসিদ্ধ বাঙালী ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় আরও কঠিন কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে আর্যভাষা তো দূরের কথা, বাংলাদেশে আদৌ কোনো আর্য আছে কিনা, তাহাই তো সন্দেহের বিষয়। তিনি বলেন ঃ

www.pathagar.com

“যে সময় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অথবা আরণ্যকে আমরা বঙ্গ অথবা পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ দেখিতে পাই, সেই সময় অঙ্গে-বঙ্গে অথবা মগধে আর্য জাতির বাস ছিল না।”

অন্যত্র বলিতেছেন ঃ “এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিই বঙ্গ-মগধের আদিম অধিবাসী। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা আধুনিক বঙ্গবাসিগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাহারা দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মগধে ব্রাহ্মণাদি ও উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিগণকে আর্যজাতীয় অথবা আর্য-সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বঙ্গবাসিগণকে জাতিনির্বিশেষে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা যাইতে পারে। উত্তরাঞ্চলের পশ্চিমাংশ আর্যগণ-কর্তৃক বিজিত হইবার বহুকাল পরেও মগধ স্বাধীন ছিল। সেই সময় তাহাদের কেহ এখানে আসিলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। প্রাচীন সাহিত্যে আর্যগণ-কর্তৃক মগধ ও বঙ্গ অধিকারের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং কোন্ সময় আর্যজাতি বঙ্গ মগধ অধিকার করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।” [বাঙ্গালার ইতিহাস]

বিখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক V.C Pillai সুস্পষ্টভাবে বলিতেছেন যে, আর্যদিগের ভারতাগমনের পূর্বে-(যাহা আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল) এদেশ সম্পূর্ণভাবে দ্রাবিড়দের শাসনাধীন ছিল ঃ

"The theme which first set up upon this investigation is the intricate subject known as the Aryo-Dravidian problem. It is needless to mention that the question was first set in motion on the day the Aryan entered India; which event we shall soon see took place in the fifteenth century B.C. India, prior to this entry, was a Dravidian land."

ইহা হইতে স্পষ্টভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষা উৎসারিত হয় নাই। আর্যদের বহুপূর্ব হইতে যখন এদেশে দ্রাবিড়রাই বাস করিত, তখন স্বীকার করিতেই হইবে বাংলা ভাষা তাহাদের হাতেই জন্মলাভ করিয়াছিল–আর্যদের হাতে নয়। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, আধুনিক বাংলা ভাষাতেও বহু দ্রাবিড় শব্দ মিশিয়া রহিয়াছে। এদেশের বহু প্রাচীন নগর ও গ্রামের নাম, নদ-নদী ও পর্বতের নাম এখনও দ্রাবিড়। যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, পাবনা, ঝিনাইদাহ, দামুকদিয়া, রএড়া, নাগিরাট, গড়াই, তিস্তা, কড়া, গণ্ডা, পণ, কুড়ি, খোকা, খুকি– ইত্যাদি অসংখ্য দ্রাবিড় শব্দ আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় চালু আছে। তবে অনেক শব্দ ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে, কারণ হিন্দু-মুসলমান ইংরাজ ও অন্যান্য জাতিরা কালে কালে ঐ সব শব্দ হয় বর্জন করিয়াছে, নয় বিকৃত বা রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহার করিতেছে। যেমন নাগিরাট হইয়াছে নাগের হাট, যসর হইয়াছে যশোহর ইত্যাদি। ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতও ঠিক তাই। তিনি বলেন ঃ

“প্রাগৈতিহাসিক কালের বাঙ্গালার অধিবাসীরা কি প্রকারের মানুষ ছিল, তাহা জানা অসম্ভব, তবে এইটুকুই অনুমান হয় যে, যে যুগের ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই

www.pathagar.com

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই বাঙ্গালা দেশে আধুনিক বাঙ্গালীর পূর্ব পুরুষেরাই বাস করিয়া আসিতেছে। ভাষাতত্ত্ব হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা দেশে আর্য ভাষা আসিবার পূর্বে এ দেশের লোকেরা অষ্ট্রীক জাতীয় ভাষা এবং কতকটা দ্রাবিড় ভাষা বলিত। বাঙ্গালা দেশের ভৌগোলিক নামে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রীক কথার সন্ধান পাওয়া যায়। এইগুলি হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, আর্যভাষা উত্তর-ভারতে ও বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এ দেশে অষ্ট্রীক ও দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন ছিল; অষ্ট্রীক ও দ্রাবিড় ভাষী লোকেরা নিজ নিজ ভাষার কথা দিয়াই এ দেশের নদনদী, পাহাড়-পর্বত ও গ্রামের নামকরণ করিয়াছিল। সেই সকল নামকে ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া উত্তরকালে সংস্কৃত রূপ দেওয়া হইয়াছিল, কোথাও বা সেই সকল নাম বিকৃত হইয়া অর্থহীন নাম রূপে এখনও প্রচলিত আছে। [জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য]

লিপি কাহাদের?

বাংলা ভাষা যে আর্যদের সৃষ্টি নয়, অন্যদিক দিয়াও তাহা প্রমাণিত হয়। ভাষা ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন হইতেছে তাহার লিপি। লিপি ছাড়া কোনো ভাষা প্রসারিত বা পল্লবিত হইতে পারে না। কিন্তু আর্যদিগের কোনো লিপি ছিল কি?- না। আর্যেরা কোনো লিপিচর্চা করিত না। ভারতের প্রাচীনতম লিপি ছিল 'ব্রাহ্মী' ও 'খরোষ্ঠী' লিপি। 'অশোক' লিপিও পরে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু কোনো লিপিই আর্যদের নিজস্ব নয়- সব লিপিই সেমিটিক। লিপিতত্ত্ববিদ Rawlinson বলেন ঃ

"The Brahmi script, the parent script of India, was borrowed from semitic source probably about the seventh century B.C."

উপরোক্ত তিনটি লিপিই যে সেমিটিক, তার আর এক বড় প্রমাণ এই যে, উহাদের প্রত্যেকটিই দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত (from right to left)।

এই সব লিপি দ্রাবিড়রাই আমদানি করিয়াছিল। খ্রীষ্টের জন্মের চারি হাজার বৎসর অথবা তাহারও পূর্ব হইতে ভারতীয় দ্রাবিড় জাতিদের সহিত আরবদিগের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রেই তাহারা এইসব লিপি ভারতে আনিয়াছিল। বলাবাহুল্য, দ্রাবিড় জাতি ছিল সেমিটিক জাতিদেরই জ্ঞাতি। ব্যাবিলন অঞ্চল হইতে তাহাদের এক শাখা বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং কালে কালে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাংলাদেশে অধিকার বিস্তার করে। সিন্ধুর ময়েন-জো-দারোতে কিছুকাল পূর্বে (১৯২১) প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে যে লিপি ও সীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও সেমিটিক, কেননা সে লিপিও দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত।[১]

অতএব কোনো দিক দিয়াই বাংলা ভাষার সৃজনে বা বিকাশে আমরা আর্যদের কোনো দানেরই পরিচয় পাইতেছি না। বাংলাদেশের প্রতি এবং বাংলা ভাষার প্রতি আর্যদের মনোভাবও সুকুমার সেনের অনুমানকে সমর্থন করে না। তিনি তো নিজেই বলিয়াছেন

---

১. The Indus Script runs from right to left : Sir John Marshall

www.pathagar.com

"বাংলাদেশ আর্যেতর জাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল বলিয়া এদেশে আগমন ও বসতি উত্তর ভারতবাসী আর্যদিগের পক্ষে বহুদিন অবধি নিষিদ্ধ ছিল।" ঠিকই তো, আর্যেরা বাংলাদেশের মাটি ও মানুষকে চিরদিনই অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে। বাংলার অধিবাসীদিগকে তাহারা ম্লেচ্ছ, যবন, রাক্ষস, বর্বর ইত্যাদি বলিয়া গালাগাল দিয়াছে এবং তাহাদের ভাষাকে 'পক্ষীর ভাষা' বলিয়া উপহাস করিয়াছে। এমন কি যদি কোনো আর্য ভুলক্রমেও বাংলাদেশের মাটি মাড়াইত, তবে বিনা প্রায়শ্চিত্তে আর্যেরা তাহাকে সমাজে গ্রহণ করিত না। নিম্নের শাস্ত্রবাণীই তাহার প্রমাণ ঃ

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ।
তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন পুনঃ সংস্কার মহতি ॥"

এই অবস্থায় কি করিয়া আর্যদের হাতে বাংলা ভাষার জন্ম হইতে পারে? যাহারা বাংলাদেশকে ভালোবাসিল না, বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসিল না, বাংলা ভাষাকে ভালোবাসিল না, বাঙালীদের সহিত মেলামেশা, উঠাবসা বা কোনোরূপ সামজিক সম্বন্ধ স্থাপন করিল না, যাহাদের লিপিজ্ঞান ছিল না, ছুঁৎমার্গের ভয়ে যাহারা লিপিচর্চাই করিল না, তাহারা কি করিয়া বাংলা ভাষার স্রষ্টা হইতে পারে?

খ্রীষ্টের জন্মের পরে

খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বাবস্থা তো দেখিলাম। এইবার দেখা যাউক খ্রীষ্টের জন্মের পর হইতে দশম-একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত (অর্থাৎ মুসলমানদের বঙ্গবিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত) আর্যেরা কখন কিভাবে বাংলাদেশে আসিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং বাংলা ভাষাকে কতখানি উৎসাহ দিল।

ডক্টর সুকুমার সেন বলিতেছেন, "পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেই বাংলাদেশের সর্বত্র আর্যবসতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে আর্য ভাষাও সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।" কিন্তু ইতিহাসে সেরূপ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। দশম-একাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ পাল বংশের পরাজয় না হওয়া পর্যন্ত) আর্যেরা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। কর্নাট হইতে আগত আর্য-ভক্ত সেনাগণ যখন বৌদ্ধ পালদিগকে পরাজিত করিয়া বাংলাদেশ দখল করিল, তখনই আর্যেরা এদেশে আসিবার সুযোগ পাইল। একটা গূঢ় কথা এখানে চাপা পড়িয়া আছে। আর্যেরা যে বাংলাদেশ এবং বাঙালীদিগকে ঘৃণা করিত বলিয়াই এদেশে আসে নাই, ইহা পূর্ণ সত্য নহে। ইহাতে মনে হয় যেন আর্যেরা আসিতে চাহিলেই এদেশবাসী তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইত। সেরূপ ধারণা নিতান্তই ভুল। এদেশে দ্রাবিড়-বৌদ্ধ প্রভৃতি অনার্যরাও আর্যদিগকে রীতিমত শত্রুজ্ঞান করিত। দ্রাবিড়-বৌদ্ধদের কি কোনোরূপ আত্মমর্যাদাবোধ ছিল না? দেশপ্রেম ছিল না? শক্তি-সাহস ছিল না? আর্যরা যখন তাহাদিগকে 'যবন' 'ম্লেচ্ছ' 'রাক্ষস' 'বর্বর' 'দস্যু' ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিত, তখন তাহারাই বা আর্যদিগকে পূজা করিবে কেন? তাহারাও প্রাণপণে আর্যদিগকে বাধা দিত। কাজেই আর্য-অনার্য বিরোধ সর্বদা লাগিয়াই ছিল।

www.pathagar.com

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এদেশের লোকেরা তাই আর্যদিগকে বাহিরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন এই সত্যের কিছুটা আভাস দিয়াছেন ঃ

"The country (i.e. Bengal) was for centuries in open novolt against Hindu orthodoxy. Buddhist and Jain influence was so great that the codes of Manu, while including Bengal within the geographical boundary of Aryyavarta, distinctly prohibited all contact with the land for fear of contamination." [History of Bengali Language & Literature]

ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন, পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেই আর্যেরা বাংলাদেশ দখল করিয়াছিল এবং আর্যভাষায় সারা দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমরা তো দেখিতেছি অন্যরূপ। গুপ্তদের দ্বারা (পঞ্চম শতাব্দী) বাংলাদেশ (সমতট) যে বিজিত হইয়াছিল এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। অন্ততঃ হিন্দুদের সহিত তখনও যে বৌদ্ধদের ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল, একথা চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হুয়েন-সাঙ তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ঃ

"The Chinese pilgrims Fa-Hien in the fifth century and Huen Tsang in the seventh century found the Buddhist religion prevailing in Bengal, but already engaged in a fierce struggle with Hinduism, which ended about the ninth or tenth century in the general establishment of the later faith. In the eleventh century the Senas rose to power in Bengal while in the next century, both the Palas and the Senas were submerged beneath the flood of Muslim conquest. [Encyclopaeda Britanica]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, পাল রাজাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই আর্য-হিন্দুরা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশ তাহাদের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও কি বাংলা ভাষার প্রতি তাহারা কোনোরূপ দরদ দেখাইয়াছে?–মোটেই না। বহুভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ বলেনঃ "আমরা হিন্দু-কালের কোনো বাঙ্গালা সাহিত্য পাই নাই। হিন্দু সেনরাজগণ সংস্কৃতের উৎসাহদাতা ছিলেন। ব্রাহ্মণেতর ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহারা বাংলা ভাষার প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন।" [বাঙ্গালা ব্যাকরণ]

কোনোরূপ সাহায্য করা তো দূরে থাকুক, বাংলা ভাষার উচ্ছেদ-সাধনের জন্যই তাহারা প্রয়াস পাইয়াছিল। সুপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্‌ ঠিকই বলিয়াছেন ঃ "বাংলার শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। তাঁহার সভায় ধোয়ী, উমাপতি ধর প্রভৃতি কবি এবং হলায়ুধ মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু নানা পণ্ডিত ও কবির সমাবেশে তাঁহার রাজধানীতে যে

www.pathagar.com

সংস্কৃত ভাষা চর্চার ও পাণ্ডিত্য-প্রকাশের সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়িয়া উঠে, তাহা জয়দেবের গীত-গোবিন্দের মাধ্যমে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করিলেও বাংলা ভাষা চর্চার কোনো আয়োজন তথায় ছিল না।" আর একটি মূল্যবান মন্তব্যও তিনি করিয়াছেন ঃ

"১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীবীর ইখ্‌তিয়ার বিন্ মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার লক্ষ্মণ সেনকে লক্ষ্মণাবতী হইতে বিতাড়িত করিয়া বাংলায় সংস্কৃত চর্চার মূলে কুঠারাঘাত হানিয়া বাংলা চর্চার পথ উন্মুক্ত করেন।" [মুসলিম বাংলা-সাহিত্য]

বস্তুতঃ মুহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ারের হাতে বঙ্গ-বিজয় বাংলা-ভাষার পক্ষে এক মহামুক্তির দিন। মুসলমানদের দ্বারা বঙ্গ-বিজয় না হইলে আর্যদের হাতে যে বাংলাভাষা লোপ পাইত অথবা শুদ্ধিকৃত হইয়া ভিন্নরূপ ধারণ করিত, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই। সেন রাজাদিগের অল্প-পরিসর সময়-রেখার মধ্যই আর্য ব্রাহ্মণগণ আইন করিয়া বাংলা ভাষার উৎখাত সাধনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারা এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, যদি কোনো আর্য হিন্দু বেদ, পুরাণ, রামায়ন, মহাভারত ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্রসমূহ কোনো মানব ভাষায় (অর্থাৎ বাংলা ভাষায়) আলোচনা করে, তবে তাহাকে 'রৌরব' নামক নরকদণ্ড ভোগ করিতে হইবে–

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চারিতানি চ।
ভাষায়ং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥"
ইহাই সংস্কৃতের সহিত বাংলা ভাষার প্রথম সংঘাতের ফল।

বৌদ্ধদের দান

এখানে বাংলা ভাষার সংগঠনে ও প্রচারে বৌদ্ধদের দান, সেবা ও ত্যাগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বৌদ্ধরা আর্যদের নিকট পরাজিত হইয়া এবং তাহাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া আরাকান, নেপাল, সিংহল প্রভৃতি দেশে পালাইয়া যায়। আরাকানে গিয়া বৌদ্ধরা বাংলা ভাষার অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। আরাকান রাজসভায় বৌদ্ধ রাজা ও মন্ত্রীবর্গের উৎসাহ পাইয়া বাংলাদেশ হইতে অনেক মুসলিম কবি সেখানে গিয়া কাব্যচর্চা আরম্ভ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাকবি আলাওল, দৌলত কাজী প্রভৃতি খ্যাতনামা কবি বৌদ্ধদের উৎসাহেই দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলাসাহিত্য চর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। আলাওলের 'পদ্মাবতী', 'হপ্তপয়কর' এবং দৌলত কাজীর 'সতী-ময়না' প্রভৃতি কাব্য এই যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই সাহায্য ও সহানুভূতির জন্য বাংলা সাহিত্য চিরদিন আরাকানী বৌদ্ধদিগের নিকট ঋণী থাকিবে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার ঘাঁটিয়া ৪৬টি চর্যাপদ বা বৌদ্ধ দোঁহা আবিষ্কার করিয়া আনেন। তিনি অনুমান করেন সেগুলিই প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন। চর্যা গীতিগুলি দশম শতাব্দীতে লুইপার প্রমুখ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত। নিম্নে একটি চর্যার নমুনা দিতেছি ঃ

www.pathagar.com

"উঁচা উঁচা পাবত, তহিঁ বসই শবরী বালী।
মরঙ্গি গিচ্ছ পরহিণ; গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত শবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহারী।
তোহেরি নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী।"

(উঁচু উঁচু পর্বত–তায় শবরী বালিকা বাস করে। সে ময়ূরপুচ্ছ পরিহিতা, তাহার গলায় গুঞ্জার মালা। হে উন্মত্ত শবর, গোল করিও না। তোমার নিজ গৃহিনী সহজ সুন্দরী নামে পরিচিতা)।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত এই দোঁহাগুলির রচয়িতা ও রচনা কাল সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে,[১] কিন্তু এ কথা না মানিয়া উপায় নাই যে, সেগুলি বৌদ্ধ রচনা–আর্য নহে। কোনো আর্য হিন্দুর এরূপ কোনো রচনা আবিষ্কার করিতে পারিলে বাংলা ভাষার উপর আর্যদের কিছুটা দাবী প্রতিপন্ন হইত বটে। কিন্তু দশম শতাব্দীতে নামিয়া গিয়াও তো সেই বৌদ্ধদিগকেই আমরা দেখিতে পাইতেছি।

আর্য-থিওরীর অসারতা

এতক্ষণ আমরা দেখাইলাম যে বাংলা ভাষা আর্য ভাষা নয়। এইবার আরও গভীরে যাইব। গোটা আর্য-থিওরীটাই এবার আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিব। আমরা দেখিব আর্য বলিয়া কোনো জাতি ছিল কি না? থাকিলে কোথায় তাহারা ছিল, কোথা হইতে কোথায় তাহারা গেল, কেমন তাহাদের স্বরূপ আর কেমন তাহাদের প্রকৃতি। এই ভিত্তিমূল যদি অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ইহার উপর নির্মিত গোটা সৌধটাই তো ভূমিস্মাৎ হইয়া যাইবে।

এতকাল ইতিহাসে আমরা পড়িয়া আসিতেছি যে, অতি প্রাচীনকালে পাক-ভারত উপমহাদেশে অনার্য জাতিরা বাস করিত। তাহারা অত্যন্ত অসভ্য ও বর্বর ছিল। তাহারা ফলমূল ও কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিত এবং বনে-জঙ্গলে বাস করিত। তারপর আসিল দ্রাবিড় জাতি। তাহারাও অনার্য ও অসভ্য ছিল। তবে পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা কিছুটা উন্নত ছিল। সর্বশেষে আসিল এক সুশ্রী গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় ও সুসভ্য জাতি। ইহাদের নাম আর্যজাতি। ইহারা মধ্য-এশিয়ায় বাস করিত। কালে কালে সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে তাহারা দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। মোটামুটিভাবে দুইভাগে তাহারা বিভক্ত হয়। এক ভাগ যায় পশ্চিম দিকে, অপর ভাগ আসে পূর্ব দিকে। পূর্বশাখা ইরান হইয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্য জাতিদিগকে পরাজিত করিয়া এই দেশ অধিকার করে। তাহারাই সর্বপ্রথম এদেশে সভ্যতার আলো জ্বালে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্যে ও ললিত-কলায় তাহারাই এদেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে।

---

১. সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪৬ পৃষ্ঠা।
নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, ৪৬-৫০ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

কিন্তু এই থিওরী এখন একরূপ অচল। সিন্ধুর ময়েন-জো-দারো, পাঞ্জাবের হরপ্পা ও অন্যান্য স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের পর এখন আর একথা কেহই বলিতে সাহস করে না যে, পাক-ভারতের সভ্যতা আর্যদের দান। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, আর্যদের অপেক্ষা দ্রাবিড়রাই ছিল অধিকতর উন্নত ও সভ্য। ময়েন-জো-দারো ধ্বংসাবশেষ হইতে জানা যায় যে, সেখানে সুপরিকল্পিত নগর ছিল, ইষ্টক নির্মিত গৃহ ছিল, রাজপথ ও পয়ঃপ্রণালী ছিল, এমন কি সে-যুগের লোকেরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কৌশলও জানিত। বিভিন্ন কারুকার্যখচিত মৃৎপাত্র, নানা ধরনের তৈজসপত্র, বহু সৌখিন আসবাবপত্র ও প্রসাধন দ্রব্য এবং অন্যান্য আরও অনেক নিদর্শনই পাওয়া গিয়াছে–যাহাদের মধ্যে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছাপ রহিয়াছে। আর একটি বিশেষ বস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে–তাহা হইতেছে ৫০০ সীলমোহর। সীলমোহরগুলির উপরে এক বিশেষ ভাষার অক্ষর অঙ্কিত। সেগুলি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত এবং প্রাচীন ব্যাবিলন ও মিসর-লিপির সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। অন্য কথায় ঃ লিপিগুলি সেমিটিক।

বলাবাহুল্য, এই সভ্যতা ছিল দ্রাবিড়দের। ইহার সহিত আর্য সভ্যতার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না, কেননা এ সভ্যতা ছিল আর্যদের ভারত আগমনের অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর অগ্রগামী। Sir John Marshal বলেন ঃ

"They (i.e. material remains of Mohen-jo-daro) exhibit the Indus people of the fourth and the fifth millennium B.C. in possession of a highly developed culture in which no vestige of any Indo-Aryan culture is to be found."

কাজেই আর্যরাই যে সর্বপ্রথম প্রাচীন ভারতে সভ্যতার আলো জ্বালাইয়াছিল এ কথার মূলে কোনো সত্য নাই। প্রসিদ্ধ ভারতীয় ঐতিহাসিক K.M. Panikkar অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবেই এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন ঃ

"One thing is certain, and can no longer be contested: civilisation did not come to India with the Aryans. The doctrine of the Aryan origin of Indian civilisation is the result of the theories of the Indo-Germanic scholars who held that anything valuable in this world originated from the Aryans.... not only is Indian civilisation pre-Vedic, but also the essential features of the Hindu religion as we know it today, were perhaps present in Mohen-jo-daro." [A Survey of Indian History]

তারপর আর্যদের আদি নিবাস যে কোথায় ছিল, আজ পর্যন্ত তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। কেহ বলে মধ্য এশিয়ায়, কেহ বলে ইউরোপে, কেহ বলে ভারতে, কেহবা বলে অন্যরূপ। প্রত্যেক প্রাচীন জাতিরই একটা আদিম উৎপত্তিস্থল এবং তাহার

www.pathagar.com

জাতীয় সংস্কৃতির কিছু না কিছু নিদর্শন আছে। মিসরীয়দের পিরামিড, ব্যাবিলোনিয়ানদের শূন্যোদ্যান, চীনাদের মহাপ্রাচীর, বৌদ্ধদের নালন্দা, তক্ষশীলা, দ্রাবিড়দের ময়েন-জো-দারো ইত্যাদি স্মৃতিচিহ্ন এখনও বিদ্যমান। কিন্তু আর্যদের সেরূপ কোনো কীর্তি-চিহ্ন কই? কোথাও আছে কি? শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র দাস (এম.এ. বি.এল) তাই আর্যসভ্যতার প্রাচীনতার দাবী মিথ্যা বলিয়া মনে করেন ঃ

"The Indo-Aryans claim that they are the most ancient people in India; but that clain is false. India has no ancient monuments or relics like Egypt, Babylonia or Assyria."

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সত্যসন্ধানী ঐতিহাসিকেরা আর্য-থিওরীকে এখন একটি অলীক কাহিনী (myth) বলিয়া মনে করেন। কেহ বা বলেন, থিওরীটি শুধুমাত্র একটা অনুভূতির উপর দাঁড়াইয়া আছে (based on a solid basis of sentiment)। আবার কেহ বা ইহাকে একটা ঐতিহাসিক প্রলাপ (a historical nonsense) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

আর্য–থিওরীর জন্ম

এইবার আর্য–থিওরী সম্বন্ধে শেষ কথা বলিব। আর্য–অনার্যের কথা শুনিলেই আমরা আমাদের চিন্তা ও ধারণাকে সুদূর অতীতে টানিয়া লইয়া যাই এবং ভাবি যে, আলো ও অন্ধকারের মতো দুই স্বতন্ত্র পরিমণ্ডলে আর্য ও অনার্যেরা বাস করিতেছে এবং সেখান হইতেই মানব-গোষ্ঠীর এই দুই ধারা বহিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল। আর্য-থিওরীর বয়স এখন মাত্র দেড়শত বৎসর। ইহার পূর্বে কোনো ইতিহাসে 'আর্য' অথবা 'অনার্য' বলিয়া কোনো বিশেষ চিহ্নিত জনগোষ্ঠী অথবা কোনো ভাষা ছিল না। এসব তীক্ষ্ণ শ্রেণী বিভাগ আমরা এখানে বসিয়া করিতেছি মাত্র! কাজেই সমস্ত কল্পনাটাই একটা কৃত্রিম আবরণ দিয়া মোড়া। থিওরীটির উৎপত্তি কাহিনী নিম্নরূপ ঃ

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের তদানীন্তন চীফ জাস্টিস এবং 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এর প্রেসিডেন্ট Sir William Jones সোসাইটির এক বার্ষিক সভায় একটি মূল্যবান ভাষণ দান করেন। ঐ ভাষণে তিনি ল্যাটিন, গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসী, জার্মানি, পহলবী, সংস্কৃত প্রভৃতি কতিপয় ভাষার অনেকগুলি শব্দ ও ধাতুরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যে, ঐ সব ভাষার মূলে ঐক্য রহিয়াছে। তিনি তাই অনুমান করেন, ঐসব ভাষাভাষীজনেরা আদিতে একই স্থানে বাস করিত এবং একই ভাষায় কথা বলিত। কালে কালে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। এইরূপেই বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই ইংগিত পাইয়া জার্মান পণ্ডিতদের মনে এক নতুন চিন্তার উদ্রেক হইল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) আলোচনায় তাঁহারা প্রবৃত্ত হইলেন। Max Muller, Bopp, Kalaproth প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে বহু গবেষণা করিলেন। অতঃপর ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে Sir Thomas Young নামক জনৈক মিসরভাষাবিদ পণ্ডিত আলোচ্য ভাষাগুলিকে "Family of

www.pathagar.com

Indo-European Language" বলিয়া অভিহিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐসব ভাষাভাষী জনগণকে Indo-European Races নামে পরিচয় দেন। ইহার পরই Indo-Aryan এবং Aryan নামের উৎপত্তি হয়।

তাহা হইলে একথা অনায়াসেই বুঝা যায় যে, আর্য-অনার্যের প্রভেদ নিতান্তই আধুনিক যুগের সৃষ্টি। এই জন্যই ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে, আর্য, অনার্য বা দ্রাবিড় কোনো নৃতাত্ত্বিক প্রকারভেদ নয়; উহারা ভাষার নাম; অর্থাৎ আর্য ভাষাভাষী যাহারা তাহারাই ছিল আর্য, দ্রাবিড় ভাষাভাষী যাহারা তাহারা ছিল দ্রাবিড়।[১] কিন্তু এ ব্যাখ্যাও খুব সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় না। তবে ইহাতে আর্যদের আভিজাত্যের ভঙ্গি নষ্ট হয় বটে।

আর্য–থিওরীর কুফল

আর্য–থিওরীর স্বরূপ দেখান হইল। ইহাতে ভারতীয় আর্যদের ভূমিকা থাকিলেও তাহারা ইহার স্রষ্টা নহে; ইউরোপ হইতে–বিশেষ করিয়া জার্মান জাতির দ্বারা–এই থিওরী উদ্ভাবিত ও প্রচারিত। উৎকট সেমিটিক বিদ্বেষ এবং দুর্বল জাতিদিগকে গ্রাস করিবার গভীর দুরভিসন্ধি এই থিওরীর প্রধান প্রেরণা। ইউরোপে জার্মান জাতিই গোঁড়া আর্য বলিয়া খ্যাত। বিগত দুইটি মহাযুদ্ধ তাহাদের গোঁড়ামির ফলেই সংঘটিত হইয়াছে। পাক-ভারত উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহার মূলেও আছে এই আর্য-থিওরীর প্রভাব। বস্তুতঃ এই থিওরী নিতান্তই মানবতা বিরোধী, মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে ও দেশে দেশে বিরোধ ও বৈষম্য সৃষ্টি করিতে এই থিওরী এক অমোঘ অস্ত্র। এই থিওরী মানব-সভ্যতার ইতিহাসকেও বিকৃত ও কলুষিত করিয়াছে এবং মানবজাতির সত্য পরিচয়কে সকলের চোখের আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। কাজেই প্রত্যেক কল্যাণকামী মানুষের উচিত এই থিওরীর অবসান ঘটানো।

মধ্যযুগ

মুহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ারের বঙ্গ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাংলা ভাষার মধ্যযুগের প্রবেশ-দুয়ারে আসিয়া পৌছিলাম। এ যুগকে মুসলিম যুগও বলা যাইতে পারে। ১৩৫০–১৭৫০ খ্রী: পর্যন্ত দীর্ঘ চারিশত বৎসর ধরিয়া বাংলা সাহিত্য মুসলিমদিগের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের প্রারম্ভে কিছুকাল যাবৎ সাহিত্য ও সংস্কৃতিকর্ম তেমন উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, কারণ যুগ-বিপ্লবের পর শান্ত পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে কিছুটা সময় লাগে। বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের আমল হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলিমদিগের সেবায়, দানে, সাহায্যে ও সহানুভূতিতে বাংলা ভাষা নানা গৌরবে সমৃদ্ধ হইতে থাকে। বাংলা ভাষার সর্ব প্রথম মুসলিম কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর আযম শাহের রাজত্বকালে 'য়ুসুফ জুলিখা' নামক কাব্য লিখিয়া যশস্বী হন। মুহম্মদ সগীরের 'য়ুসুফ জুলিখা' এবং তৎপূর্ববর্তী বড় চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'ই বাংলা সাহিত্যের দুই প্রথম

---

১. বাঙ্গালীর ইতিহাস

www.pathagar.com

গ্রন্থ্। য়ুসুফ জুলিখার ভাষা ছিল এইরূপঃ

কহে শাহ্-মোহাম্মদ য়ুসুফ জুলিখা পদ
দেশিভাষা- পয়ার রচিত।
কিতাব কোরাণ মধ্যে দেখিনু বিশেষ
য়ুসুফ জুলিখা কথা অমিয়া অশেষ।
কহিব কিতাব চাহি সুধারস পুরি।
শুনহ্ ভকত জন শ্রুতিঘট ভরি ॥
দোষ খেম, গুণ ধর রসিক সুজন।
মোহাম্মদ ছগীর ভনে প্রেমিক বচন ॥ [মুসলিম বাংলা সাহিত্য]

সুলতান হুসেন শাহ্ এবং তাঁহার বংশধরদিগের আমলই মধ্য-বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এই উদারমনা সাহিত্য-রসিক গুণগ্রাহী সুলতান সত্যই বাংলা সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের কবি-সাহিত্যিকদিগকে ডাকিয়া তিনি দরবারে স্থান দেন। আরবী-ফারসী হইতে নানা ধর্মগ্রন্থ্, ইতিহাস, গল্প ইত্যাদি অনুবাদ করাইবার কাজে তিনি মুসলিম কবিদিগকে নিয়োগ করেন। সেই সঙ্গে মৌলিক রচনাবলীরও মর্যাদা দেন। শুধু মুসলিম কবি নন, হিন্দু কবিদিগকেও তিনি এবং তাঁহার অনুবর্তিগণ সাদরে আহ্বান করেন। তাঁহাদেরই উৎসাহে রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য হিন্দু গ্রন্থাদি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। হুসেন শাহের আমলে শ্রী চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হওয়ায় বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব-ধারাও সংযোজিত হয়। এইরূপে বাংলা ভাষা জাতিধর্ম-নির্বিশেষে গোটা বাঙালী জাতির প্রতিনিধিত্ব করিবার সুযোগ পায়।

কিন্তু একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। হুসেন শাহের দরবারে যখন বাংলা সাহিত্য চর্চার এমন সমারোহ চলিতেছে, তখনই-বা বাংলা ভাষার প্রতি আর্য-হিন্দুদিগের মনোভাব কিরূপ ছিল? পূর্বের সেই জাতক্রোধ, বিদ্বেষ ঘৃণার ভাব তাহারা তখনও অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতেছিল, এই জন্য সুলতানের আবেদনে অগ্রে তাহারা সাড়া দেয় নাই। পরে যখন অন্যান্য কবিরা নিজেদের কাব্য-রচনার জন্য সুলতানের নিকট হইতে প্রচুর ইনাম, খেতাব ও পুরস্কার লাভ করিতে লাগিল, কেবল মাত্র তখনই তাহারা রাজ-দরবারে আসিয়া সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করিল।

"The Brahmins could not resist the influence of this high patronage. They were, therfore complelled to favour the language they had hated so much and laterly they themselves came forward to write poems and compile works of translation in Bengali." [History of Bengali Literature]

শুধু তাই নয়। সুলতানদের দেখাদেখি দেশীয় অন্যান্য হিন্দু রাজারাও তখন নিজেদের রাজসভায় বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদিগকে সমাদর করিতে লাগিলেন। এই ভাবেই বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন হইল এবং উহার সমস্ত গৌরব মুসলমানদের প্রাপ্য ঃ

www.pathagar.com

"Thus the appoinment of Bengali poets to the courts of Hindu Rajas grew to be fashtion after the example of the muslim chiefs." [Ibid]

এইসব তথ্যের মুকাবেলায় কি করিয়া বলা যায় যে, বাংলা ভাষা আর্যভাষা?

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদিগের দান এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যও ছিল প্রচুর। ধর্ম, ইতিহাস, জীবনী, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, লৌকিক কেচ্ছা ও কাহিনী এবং অনুবাদই ছিল তাঁহাদের সাহিত্য-কর্মের মূলধারা। কাসাসোল আম্বিয়া, ফতুহুশ্বাম, ফত্হুল মেছের, আলেফ-লায়লা, জঙ্গনামা, শহীদে-কারবালা, লায়লি-মজনু, ইউসুফ-জোলেখা, আমির হামজা, চাহার দরবেশ, ছয়ফুল মুলক বদিউজ্জামান, সোনাভান, গাজী কালু ইত্যাদি অসংখ্য পুঁথি মুসলমান কবিরা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ডক্টর আব্দুল গফুর সিদ্দিকীর মতে মুসলিম পুঁথির সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০ হইবে। মুসলিম পুঁথি-সাহিত্যের ভাষা ও রচনা-রীতির কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে দেওয়া হইলঃ

"মেছের সহর হইতে বাহির হইয়া
মকদ্দস পানে নবি জান নেকালিয়া
সামের সহর বিচে ফলগুন গ্রাম
তথা উতরিল যদি নবি নেককাম।
জিবরিল আসিয়া কহে শোন সমাচার
দেখ হেথা জমিনেতে কেমন বাহার ॥" [কাসাসুল আম্বিয়া]

"উজিরের পানে বাদশা আঁখি ঘুমাইল।
দেলেতে হইল গোশ্বা কিছু না কহিল।
উজির কহিল বাদশা আমি সব জানি।
আমিরের বেটা এই উম্মর ইউসানি ॥" [আমির হামজা]

"শুন যত বেরাদার, কহি কিছু সমাচার
শুন সবে আগামি কালাম।
রুমের সহর বিচে, কুস্তনতুনিয়া দেশে
এস্তাম্বুল বলে যার নাম।" [চাহার দরবেশ]

এই চলিত ভাষা এতই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, অনেক হিন্দু কবিও এই ভাষায় পুঁথি লিখিয়া গিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই ঃ

"আল্লা আল্লা বল পাক পরোয়ারদিগার।
আখেরে দোজখে ডালি. . . যার ॥
দোজখ তরিতে বান্দা করহ ফিকির।
জাহিরে বাতুনে লইলাম আল্লার জিকির ॥

www.pathagar.com

আল্লার আরশ কোর্সে কিছু মেহেরবানী চাই।
ইমামগণের কেচ্ছা কিছু মিলাইয়া গাই।
শ্রীযুক্ত সাহেবের কেচ্ছা রাধাচরণ গাএ।
আল্লা আল্লা বল নবি পাঞ্জাতনের পাএ"॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও হিন্দু কবিরা তাঁহাদের কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতচন্দ্র ও বিদ্যাপতির নাম করা যায়। নিম্নে দুইটি উদ্ধৃতি দিতেছি ঃ

"মানসিংহ জোড় হাতে অঞ্জলি বাঁধিয়া মাথে
কহে জাহাঁপনা সেলামত।
রামজির কুদরতে মহিম হইল ফতে
কেবল তোমারই কেরামত।
হুকুম শাহানশাহী আর কিছু নাহি চাহি
জের হৈল নিমকহারাম।
গোলাম গোলামী কৈল জালিম কয়েদ হৈল
বাহাদুরী সাহেবের নাম।" [ভারতচন্দ্র রায়]

হৈয়া বান্দার বান্দা নুঙাইয়া শির।
বন্দির বড় খাঁ গাজী পীর দস্তগীর।
নিয়ৎ হাছিল সত্যপীরের কালাম।
কহে বিদ্যাপতি করি হাজার ছালাম ॥ [বিদ্যাপতি]

প্রাচীন গদ্য

প্রাচীন বাংলা গদ্যের নিদর্শন খুবই বিরল। শুধু সরকারী দলিল-দস্তাবিজের মধ্যেই যা-কিছু নমুনা পাওয়া যায়। নিম্নে সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ভাষার নমুনা দেখানো হইতেছে ঃ

সপ্তদশ শতাব্দী (১৬৬২)

"শ্রী যশোমাধব ঠাকুর কুমড়াল গ্রামে দেবালয়ৎ আছিলা। রাম শর্মা ও গায়রহ্ আপনার ২ ওয়াদা মাফিক সেবা করিতেছিল। রাত্রদিন চৌকি দিতেছিল। শ্রী রামজীবন মৌলিক সেবার সরবরাহ পুরুষানুক্রমে করিতেছেন।"- ইত্যাদি। (শ্রী মনোমোহন ঘোষের 'বাংলা গদ্যের চারযুগ')

অষ্টাদশ শতাব্দী (১৭৮৬)

"শ্রীযুক্ত ওলন্দেজ কোম্পানীতে আড়ঙ্গ বিরভূমের খরিদর দাদনী আমি লইয়া ঢাকা আড়ঙ্গ চালানী করিয়াছি। আপরেল মাহেতে এবং মোকাম মজবুরের গোমস্তা কাপড় খরিদ করিতেছিল এবং কাপড় কথক ২ আমদানি হইয়াছে এবং হইতেছে দাস্ত কথক ২ তৈয়ার

www.pathagar.com

হইতেছে এবং মবলগ কাপড় ধোবার হাতে দাস্তর কারণ রহিয়াছে। তাহাতে সংপ্রীতি মেঃ গেল সাহেবের তরফ পেয়াদা আসিয়া খামখা জবরদস্তী ও মারপিঠ করিয়া ঘাট হইতে ধোবা লোককে ধরিয়া লইয়া গেল।".... ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় এই মিলিত রূপ অব্যাহত ছিল। কিন্তু ইহার পরই বাংলা ভাষার খাত পরিবর্তিত হইল। তখন এদেশে ইংরাজ শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে। শাসন কার্যের 'সুবিধার' জন্য ইংরাজেরা ভেদনীতির আশ্রয় লইল। সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাহারা এই নীতি অবলম্বন করিল। এতদিন ফার্সী ভাষা রাজভাষা ছিল, এখন তাহার স্থলে ইংরাজী ভাষাকে তাহারা রাষ্ট্রভাষা রূপে ঘোষণা করিল। বাংলা ভাষাকেও হিন্দুয়ানী রূপ দিয়া মুসলমানদিগের শিক্ষা ও প্রগতির পথে মস্ত বড় বাধার সৃষ্টি করিল। কিরূপ করিয়া এই পটপরিবর্তন ঘটিল, চিন্তাশীল লেখক সজনীকান্ত দাস তাহা নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

"১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্তীকালে হেন্‌রি গিটস্ ফরষ্টার ও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী-পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃত পক্ষে এই তিন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী নিসূদন-যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদলত সমূহে আরবী-পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজীর প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি।" [বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস]

এই কাজে ইংরাজ পাদ্রীদের সহিত যোগ দিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, রামরাম বসু এবং আরও অনেকে। তখন বাংলা ভাষা হইতে আরবী-ফার্সী শব্দ বর্জন করিয়া ভাষাকে সংস্কৃতায়িত করা হইল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ হিন্দু মনীষীরা এই কার্যে অগ্রণী হইলেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা ভাষা রূপান্তরিত হইয়া গেল। এইখান হইতেই বাংলা ভাষার নবযুগ আরম্ভ হইল। ইহাকে "হিন্দু রেনেসাঁর" যুগও বলা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে বাংলা ভাষা নিম্নের রূপ ধারণ করিলঃ

"কিয়ৎক্ষণ এইরূপ আক্ষেপ করিয়া লক্ষণ উচ্ছ্বসিত শোকাবেগের সম্বরণ পূর্বক সীতার চৈতন্য সম্পাদনে সমর্থ হইলেন। চৈতন্য সঞ্চার হইলে সীতা কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া স্নেহভরে সম্ভাষণ করিয়া লক্ষণকে বলিলেন, বৎস, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আর বিলাপ ও পরিতাপ করিও না। সকলই অদৃষ্টাধীন। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। আমি তপোবনে থাকিয়া এই উদ্দেশ্যে ঐকান্তিক চিত্তে তপস্যা করিব– যেন জন্মান্তরেও তিনি আমার পতি হন।" [সীতার বনবাস]

এই ভাষা ও ভাবধারা যখন সরকারী স্কুলসমূহে পাঠ্য হইল, তখন মুসলমানেরা এক চরম সংকটের সম্মুখীন হইল। এ ভাষা কিছুতেই তাহারা প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। একবাক্যে তাহারা তাহাদের সন্তান-সন্ততিদিগকে শিক্ষা দিতে অসম্মতি জানাইল।

www.pathagar.com

William Hunter তাঁহার Indian Musalmans নামক গ্রন্থে তৎকালীন বাংলার মুসলমানের মনোভাব বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন ঃ

"The language of our Government schools, in Lower Bengal is Hindu and the masters are Hindus. The Musalmans with one consent spurned the instruction of their boys through the medium of this language of idolatry."

কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় কালে কালে মুসলমানদিগকে ইংরাজী ভাষাও শিখিতে হইল, সংস্কৃত-বাংলাও শিখিতে হইল।

এই পণ্ডিতী বাংলায় বুদ্ধির দীপ্তি ও মার্জিত রুচিবোধ থাকিলেও, এ ভাষা জনসাধারণের বোধগম্য হয় নাই। এই ভাষাকে লক্ষ্য করিয়া বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ Grierson মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন ঃ

"Literary Bengali, as now known, is the product of the present (19th) century. It direct cultivators were the Calcutta pandits who, however well-meaning, have ruined the language by their learning."

অবশ্য এই পণ্ডিতী বাংলার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইতে বেশী বিলম্ব ঘটে নাই। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে একটা গতিহীন অচলায়তনে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ঠিক সেই সময়েই ভাগ্যক্রমে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব হইল। উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও পাশ্চাত্যধর্মী মন লইয়া তিনি বাংলা ভাষার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে গণ্ডী-সংকীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন। মাইকেলই এ যুগে আর্য-বাংলার বিরুদ্ধে প্রথম মুক্তিযোদ্ধা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী কবি। তিনি না আসিলে বাংলা ভাষা কোন্ ধারায় কোন্ সমুদ্রে গিয়া বিলীন হইত তাহা ভাবিবার বিষয়।

ইহার পর প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাতে বাংলা ভাষা আরও সহজ ও সবল হইয়াছে, সন্দেহ নাই; তবু ইহার সাহিত্য-রূপ এখনও জনগণের দুর্বোধ্য হইয়াই আছে।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো অতি আধুনিক লেখকও একথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন ঃ "উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা যে খাত বদল করেছিল আজও সেই পথেই তার স্রোত বইছে। ইংরেজ এসেছে, তার ভাষা ও আঙ্গিকের প্রভাব এসেছে, বাংলা-রীতি তাতে আরও সমৃদ্ধি লাভ করেছে; কিন্তু উনবিংশ শতকের সেই প্রথম পর্বেই জনসাধারণের ভাষার সঙ্গে তার যে পার্থক্য রচিত হয়েছে আজও তা সমান্তরাল সরল রেখার মতই চলেছে। আজ যখন বাঙালী লেখকের রচনা জনমনস্পর্শী হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে তখন সে অভিযোগের পেছনে নাগরিক সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যই নয়, দেড়শ বছর আগে বাংলা ভাষার নববিধানও যে তার জন্য কতটা দায়ী, সে কথাও ভেবে দেখবার সময় এসেছে।"

www.pathagar.com

এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের বর্তমান বাংলা সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম-সাহিত্য

রাজ্যহারা মুসলমানেরা যখন বুঝিতে পারিল যে, ইংরাজী ও বাংলা না শিখিয়া তাহাদের গত্যন্তর নাই, তখন তাহারা এইদিকে মনোযোগ দিল। এই নতুন যুগের প্রথম মুসলিম সাহিত্য-স্রষ্টা হইতেছেন মরহুম মীর মোশারফ হোসেন (১৮৪৭–১৯১১)। তাঁহার প্রণীত 'বিষাদ-সিন্ধু' সাধু ভাষায় লিখিত হইলেও তাহার ভাষা যে কতো সাবলীল ও প্রাণবন্ত, নিম্নের উদ্ধৃতি হইতেই তাহা বুঝা যাইবে ঃ

"রক্ত দর্শনে হোসেন চমকিয়া উঠিলেন। আজ ভয়শূন্য মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সভয়ে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন ঃ আবদুল্লাহ্ জেয়াদ, ওমর, সীমার এবং আরও কয়েকজন সেনা তাঁহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া যাইতেছে। সকলের হাতেই তীর-ধনু। ইহা দেখিয়াই তিনি চম্‌কিয়া উঠিলেন। যে সমুদয় বসনের মাহাত্ম্যে তিনি নির্ভয়-হৃদয়ে ছিলেন, তৎসমুদয় এখন পরিত্যাগ করিয়াছেন; তরবারি, তীর, নেজা, বল্লম, বর্ম, খঞ্জর কিছুই তাঁহার সঙ্গে নাই। কেবল দুইখানি হাত মাত্র সম্বল। অন্যমনস্কভাবে তিনি দুই এক পদ করিয়া চলিলেন, শত্রুরাও পূর্ববৎ ঘিরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।" [বিষাদ-সিন্ধু]

কিন্তু মুসলিম কাব্য-সাহিত্য ও পুঁথির ধারা তখনও মন্থর গতিতে চলিতেছিল। এই সময়কার জনৈক মুসলিম কবির রচিত নিম্নের ব্যঙ্গ কবিতাটিতে কিছুটা আধুনিকতার ছাপ এবং উন্নত রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাটি ইনকামট্যাক্সকে লক্ষ্য করিয়া রচিতঃ

"বালেশ্বর বিচে গড় পদ্দা পরগনা
ভিক্টোরিয়া শাহাজাদী যার মালিকানা।
লেয়সন করোসন দুই লাট বন্দি,
খাজানা দাখিল করি মোরা হাত বান্ধি।
জরিপেতে বন্দবস্ত হইয়াছে যার
বহুত মশকেলে দিতে হবে রাজকর!
তাহাতে যাহোক করি দুঃখেতে গুজরাণ
এইরূপে দিনপাত চালান রহমান।
রাতদিন দোওয়া করি মহারাণীর তরে,
রাজ্যবৃদ্ধি হয় তার খোদাতালা করে।
এমন আমল দুটা হয় না জাহানে
এক জাগায় রাখে বাঘ বকরী দুইজনে।
কেহ কারো জবরদস্তি করিতে না পারে,
কায়েম হুকুম যে আইন অনুসারে।
এই মতে কতদিন যায় গুজারিয়া
পালেন সবার তরে মেহের করিয়া।

www.pathagar.com

তাহাতে আইল এক এমন রাক্ষস
তাহার বিখ্যাত নাম ইনকাম ট্যাকস্।”

এই ধারা এখনও বাঁচিয়া আছে। নজরুল ইসলামের হাতে ইহার রূপান্তর ঘটিয়াছে। আরবী-ফার্সী শব্দ দ্বারা, বলিষ্ঠ আঙ্গিক দ্বারা এবং ইসলামী ভাবধারা দ্বারা তিনি বাংলা ভাষাকে প্রচুর শ্রী ও সমৃদ্ধি দান করিয়াছেন।

উপসংহার

প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এতক্ষণ আমরা দিলাম। এই পরিচয়ে দেখিলাম বাংলা ভাষা আর্য ভাষা নয়, অনার্য ভাষা। অনার্য ভাষার অর্থে অসভ্য বর্বর অস্পৃশ্যদের ভাষা নয়– আর্য-বহির্ভূত নরগোষ্ঠীর ভাষা; অন্য কথায় বাংলার ভাষা– বাঙালীদের ভাষা। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। কিন্তু সে প্রভাব ‘অত্যন্ত নগণ্য’ এবং ‘অত্যন্ত আধুনিক’। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্ বলেন ঃ

“বর্তমান বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রত্যক্ষ প্রভাব যেমন নগণ্য, তেমনই অত্যন্ত আধুনিকও বটে।” [মুসলিম বাংলা সাহিত্য]

বাংলা ভাষার সংগঠনে সংস্কৃত হইতে যতটুকু সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাহা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি। কিন্তু বাংলা যে সংস্কৃতের দুহিতা এবং কাজেই আর্যভাষা এই দাবী অস্বীকার করি। আর্যামির গোঁড়ামি হইতে বাংলা ভাষাকে আমরা মুক্ত রাখিতে চাই। ইহাই হইবে বাংলা ভাষার কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথ।

আজ বাংলা ভাষা দ্বিধা-বিভক্ত। পশ্চিম বঙ্গের বাংলা এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা এক হইয়াও এক নয়। উভয়ের গতি ও লক্ষ্য বিভিন্ন। ইহাতে আমাদের আনন্দের কারণ আছে। এখানকার বাংলা সংস্কৃতের আওতা হইতে অনেক দূরে থাকিবে। সংস্কৃত একটি মৃতভাষা; সুতরাং মৃতের সহিত যাহারা যত বেশী মিতালী করিবে, তাহারা ততো বেশী আড়ষ্ট ও প্রাণহীন হইবে। পাক-ভারত উপমহাদেশের বহু প্রাদেশিক ভাষা রহিয়াছে। যেমন বাংলা, উর্দু, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠি, আসামী ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে বাংলা ও উর্দুই যে শীর্ষস্থানীয়, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছেন। উর্দুর কবি ইকবাল আজ সারা জগতের বিপ্লবী কবি ও দার্শনিক। এই দুই ভাষাতেই বহু বিশিষ্ট মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এ গৌরব এক হিসাবে ইসলামের। উর্দু ও বাংলা যে আজ এত প্রগতিশীল ও জীবন্ত তাহার কারণ যে উহারা আর্য ভাষা নহে; অন্য কথায় সংস্কৃত হইতে উহাদের জন্ম হয় নাই। সংস্কৃত হইতে যে ভাষা যতো দূরে রহিয়াছে, সে ভাষা আজ ততো জীবন্ত, ততো প্রগতিশীল। পাক-ভারত উপমহাদেশের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে আজ যে উর্দু ও বাংলা ভাষাই সর্বাপেক্ষা উন্নত, বলিষ্ঠ ও ব্যাপক, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, ইহাদের প্রকৃতি ও রক্তে আছে ইসলামের বিশ্বজনীন উদারতা ও মানবিকতার ছাপ। প্রচারধর্মী সাম্যবাদী মানুষেরাই ইহাদের জন্মদাতা ও

www.pathagar.com

পালয়িতা। বাংলা ভাষার গতিপথ লক্ষ্য করিলেও এ সত্য সহজেই বুঝা যায়। দ্রাবিড়, বৌদ্ধ, সুলতানী আমল পার হইয়া সে আসিল বৃটিশ আমলে। এখানে আসিয়া পাদ্রী ও পণ্ডিতদের ষড়যন্ত্রে সে অনেকখানি স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিল বটে, কিন্তু মুক্তির নূতন পথ ধরিয়া বাহিরে আসিতে তাহার বিলম্ব ঘটিল না। এই মুক্তি-সংগ্রামে সাহায্য করিলেন মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম প্রমুখ উদারধর্মী কবি-সাহিত্যিকেরা। পাকিস্তান আসিয়া তাহার রূপান্তর ঘটিয়াছে। সুখস্মৃতি ঘেরা পূর্ব পাকিস্তানই তো তাহার আদি বাসভূমি। এখানে আসিবা মাত্রই সে আবার তাহার হৃতগৌরব ফিরিয়া পাইয়াছে। উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাও এখন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। এই গৌরব বাংলা ভাষা অন্যত্র লাভ করিতে পারে নাই।

পূর্ব-পাক বাংলা সাহিত্যে এবারেও ইসলাম এক নূতন ভূমিকা গ্রহণ করিবে। ইসলামের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ও মহামানবতার বাণী এবং তাহার রূপ, রস ও সুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রেরণা যোগাইবে এবং সম্ভাবনার এক নূতন দিগন্ত খুলিয়া দিবে।

ঢাকা, ১৯৬৩।

www.pathagar.com

বাঙ্গালীর মাতৃভাষা

খাদেমোল এসলাম বঙ্গবাসী

লেখা-পরিচিতি ঃ লেখাটি 'আল এসলাম' পত্রিকার কার্তিক, ১৩২১ সালের সংখ্যায় প্রকাশিত।

মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা বুদ্ধিমানজনোচিত কাজ নহে। আমরা যে কোন ভাষাই পড়ি না কেন, তাহা মাতৃভাষার সাহায্যেই বুঝিয়া থাকি, কারণ বাল্যকাল হইতে সেই ভাষা দ্বারাই আমাদের অন্তরে কথা বুঝিবার শক্তি গঠিত হইয়া থাকে। আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদিগকে নানাদেশ ও নানাজাতিতে বিভক্ত করিয়া সৃজন করিয়াছেন এবং দেশ ও জাতি বিশেষে বিভিন্ন ভাষাও দিয়াছেন। এজন্য কাহারও লজ্জিত হওয়ার কারণ নাই। বাঙ্গালা, ইংরেজী, উর্দ্দূ ও ফারসী ইত্যাদি ভাষা অর্থাৎ আরবী ভিন্ন পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাই মুসলমানের জন্য সমান এবং সংস্কৃত ভিন্ন অন্য সকল ভাষাই হিন্দুর জন্য সেইরূপ। মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, বাঙ্গালী হইয়া নিজের মাতৃভাষা উর্দ্দূ বা আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া, কিংবা 'বাঙ্গালা জানি না বা ভুলিয়া গিয়াছি' এরূপ বলা– এই মারাত্মক রোগ কেবল একশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁহাদের এরূপ নীতি অবলম্বন করা কি বাস্তবিক পক্ষে নিতান্ত লজ্জাজনক নহে? যাহারা এরূপ আচরণ করে তাহারা যে আপন মাতা ও মাতৃভূমির প্রতি নিন্দা প্রকাশ করে এবং নিজমুখে নিজের মায়ের এবং দেশের দীনতা হীনতা জ্ঞাপন করে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে মাতৃভাষা শিক্ষা করা এবং তাহার উন্নতি সাধন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করিলে তাহা উর্দ্দূ প্রভৃতি হইতে কোন মতেই হীন হওয়ার কথা নহে। আমাদের শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যই তদ্দারা সম্পাদিত হইতে পারে। মায়ের কাজ মায়ের দ্বারাই সম্পন্ন করাইতে হইবে, অপরের দ্বারা তাহা কখন পূর্ণ হইবে না। এরূপ না করার ফল হইয়াছে যে, আজকাল সামান্য-শিক্ষিত ব্যক্তির বাঙ্গালা বক্তৃতা শুনার জন্য যেখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়, সে ক্ষেত্রে আমাদের ভক্তিভাজন মৌলবী মৌলানা সাহেবানের আরবী-উর্দ্দূ ওয়াজ শুনিবার জন্য শীরণী, রসগোল্লা, লাড্ডু ও জিলাপী ইত্যাদি বিতরণের প্রলোভন সত্ত্বেও সভায় লোক উপস্থিত করা মহা মুস্কিল হইয়া থাকে।

মাতৃভাষার উন্নতি আমরা দুই রকমে করিতে পারি। প্রথমতঃ ঐ ভাষায় ধর্ম্ম সংক্রান্ত কেতাব সকল তরজমা করা এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাদশা অলী ও দরবেশগণের জীবন চরিত্র ইত্যাদি লেখা। দ্বিতীয়তঃ আজকালের নূতন আবিষ্কৃত হেকমত বা জ্ঞান বিজ্ঞান ও হিসাব ইত্যাদি পার্থিব উন্নতি বিষয়ক পুস্তকাদি লিখিয়া তাহা জনসমাজে প্রচারের সুবিধা করা।

আজকাল আমাদের দেশে দুই রকমের বাঙ্গালা দেখা যাইতেছে। একটী আমাদের

www.pathagar.com

হিন্দু ভ্রাতৃগণের অবলম্বিত সংস্কৃতবহুল শব্দ বিজড়িত বাঙ্গালা, ইহা ইংরেজ আমলদারীর বিগত শতাব্দীর গড়ানে বাঙ্গালা ভাষার নূতন সংস্করণ নামে অভিহিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময় অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমানও তাঁহাদের অনুকরণে ঐরূপ সাধু ভাষা জড়িত বাঙ্গালা বই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই রকম বাঙ্গালাই আজকাল স্কুলে পড়ান হয়। এই ভাষাতে বাঙ্গালীর পূর্ব্ব-পুরুষগণ যেসব শব্দ কখনও শুনেন নাই, তাহা অতি অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়াছে। এমন কি, তাহা ভালমতো বুঝার জন্য মৃত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা এবং ওস্তাদ ও অভিধানের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই। বাঙ্গালার সাধারণ লোকে কখনও ঐরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে না। ইহাকে তাহাদের মাতৃভাষা বলা যাইতে পারে না বরং তাহা মাতৃভাষার বিকৃতি মাত্র।

অন্যরূপ বাঙ্গালা এই দেশে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত আছে। তাহাতে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের ধর্ম্ম ও কারবারের আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত শব্দের ব্যবহার ও স্থান আছে। এই ভাষাই বাস্তবিকপক্ষে এ দেশের লোকের মাতৃভাষা।

এইরূপ ভাষাকে মুসলমানী বাঙ্গালা বলা ঠিক হয় না। কারণ এই ভাষায় আমরা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতি পুরুষানুক্রমে কথাবার্ত্তা ও লেখাপড়া করিয়া আসিতেছি। কাগজ, কলম, কেতাব, আদালত, আরজী, ইন্সাফ, কুরছি, মেজ, দোয়াত, সির, সিনী, মগজ, বরতন, পেয়ালা, তস্তরী, পালং, তোষক, বালিশ, গয়রহ ইত্যাদি শব্দ আমরা উভয় সমাজে সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি এবং এখনও করিয়া থাকি। কিন্তু আজ ২০/২৫ বৎসর হইতে দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ শিক্ষাদোষে বাঙ্গালী হিন্দু ভ্রাতাদের মনে মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি ভালবাসা কমিয়া যাওয়ায়, তাঁহারা মুসলমানগণ হইতে পৃথক হওয়ার উদ্দেশ্যেই যেন মাতৃভাষার অন্তরাঙ্গ স্বরূপ পুরুষানুক্রমে প্রচলিত শব্দসমূহের স্থলে, নূতন শব্দ ব্যবহার করত এবং তাহাকে নানা রকমের বিকৃত আবরণ দ্বারা আবৃত করিয়া তাঁহারা যেন বৃদ্ধ মায়ের এক যুবতী সতীন গড়িয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণপ্রিয় কতক মুসলমানও ইহার পরিণাম ফলের বিষয় চিন্তা না করিয়া মায়ের গায় কুড়াল মারিতে ত্রুটি করেন নাই। এতদিন ত মুসলমানগণ লেখাপড়ার দিকে বিশেষ কোনরূপ মনোযোগ দেন নাই। তাহাদের বাদশাহী গেলেও কিন্তু বাদশাহী খেয়াল যায় নাই এবং পূর্ব্ব-পুরুষগণের ঝুট (উচ্ছিষ্ট) সব খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন। কিন্তু এখন তাহাও ফুরাইয়া যাওয়ায় উপয়ান্তর না দেখিয়া বিদ্যা শিক্ষার জন্য স্কুল পাঠশালার দিকে ছুটিয়াছেন। সেখানে যাইয়া দেখেন, তাহাদিগকে মাতৃভাষা নামে এক নূতন ভাষা শিখিতে হইবে। তাঁহাদের মা-বাপের নিকট যাহা কিছু শিখিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই সেখানে কোন কাজে লাগিবে না এবং বাধ্য হইয়া তাহা ভুলিয়া যাইতে হইবে। বাস্তবিক বিগত ২০/২৫ বৎসর মধ্যে আমরা পূর্ব্ব প্রচলিত অনেক শব্দই ভুলিয়া গিয়াছি এবং কতক নিত্য ব্যবহারের শব্দও কমাইতে শিখিয়াছি। হায় কি দুর্দ্দশা! যে জাতিকে মাতৃভাষাও নূতন করিয়া শিখিতে হয়, তাহারা কি শিক্ষা ক্ষেত্রে অপর লোকদের সমানে পড়া চালাইতে পারে? এখনও সময় আছে, শিক্ষার উন্নতির সহিত হিন্দুদের বেয়াদবি ভাব বাড়িতেছে, এবং শিক্ষিত মুসলমানগণও এখন এত

www.pathagar.com

কম নহেন যে তাহাদিগকে তুচ্ছ করা যায়। বলাবাহুল্য যে সকলেই এখন উন্নতির দিকে ছুটিয়াছে। এমন সুসময়ে উভয় সমাজের লেখকগণের পক্ষে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া এ বিষয়ে— যে ক্ষেত্রে দেশের হিন্দু মুসলমান এই উভয় জাতি একত্রে সম্মিলিত হইতে পারে, মাতৃভাষাকে সেরূপভাবে গড়িয়া তোলা আবশ্যক, এবং আমি ভরসা করি, সকলে এই বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

এখন আমি মুসলমান লেখকদের প্রতি কয়েকটী কথা বলিতে চাহি। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নূতন শিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই সংসর্গ দোষে সাবেক ভাষাকে ঘৃণা করিয়া নয়া ভাষার আশ্রয় লইয়াছেন এবং তাঁহাদের শক্তি সাধারণতঃ কাব্য কবিতা ও উপন্যাস লিখনে ব্যয় হইয়াছে। তাঁহারা সময় সময় সমাজের বা ধর্ম্মের উপকারের জন্য যে সকল বহি লিখেন তাহার ভাষা সাধারণ লোকে সহজে বুজে না বলিয়া নিজ সমাজে সে সকল পুস্তকের আশানুরূপ আদর হয় নাই। হযরতের যেসব জীবন বৃত্তান্ত ছাপা হইয়াছে, তাহা প্রায়ই কবিতা বা উপন্যাসের সুরে দুর্ব্বোধ্য নূতন বাঙ্গালায় লিখিত। লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ 'আল্লাহ' স্থলে ঈশ্বর, রসূল স্থলে প্রেরিত পুরুষ, বিবি স্থলে দেবী, সাহেব স্থলে দেব, নামাজ রোজা স্থলে উপাসনা, উপবাস, মসজিদ স্থলে ভজনালয় ইত্যাদি ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

হায়! আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এতকাল যাবত আবশ্যক মতে আরবী ও পারসী হইতে শব্দাদি লইয়া বাঙ্গালা ভাষার যে অভাব পূরণ ও যে উন্নতি করিয়াছিলেন তাহা কি আমরা নাকাবেল কাপুরুষ সন্তানগণ গঙ্গায় ভাসাইয়া দিব? যে আরবী ভাষা ১০০০ বৎসর যাবত এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্ক, চিকিৎসা গয়রহ সমগ্র শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু মুসলমানগণ মুসলমান আমলে ও ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে যে সব আবশ্যকীয় শব্দ লইয়া নিজ বাঙ্গালা ভাষা গড়াইয়া ছিলেন, তাহা কি আমাদের ভুলিয়া যাওয়া কিম্বা উঠাইয়া দেওয়া উচিত? পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষা ভুলিয়া নূতন ভাষা শিখিতে কি জাতীয় জীবনের বলক্ষয় হইবে না? এই অতিরিক্ত বলক্ষয়ের পর জীবন সংগ্রামে আমরা কি অপর জাতিদের সমানে দাঁড়াইতে পারিব? ভ্রাতৃগণ চিন্তা করুন, মুসলমানগণের এশিয়াবাসী হইয়া জাতীয় শব্দের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা ভাল দেখায় না। এখনও সময় আছে। সরকারী সেরেস্তায় এখনও সাবেক ভাষা রহিয়াছে। লেখকগণের মুখে এখনও সাবেক কথাই প্রবল।

www.pathagar.com

নূতন দৃষ্টিতে পুরানো বাংলা

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক

লেখক -পরিচিতি : জন্ম : ১৯০৬, বখতপুর, গ্রাম-ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মৃত্যু : ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২। শিক্ষা : এম, এ (বাংলা) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পি. এইচ. ডি. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৪)। পেশা : উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; সদস্য, মঞ্জুরী কমিশন; সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : আবাহন, ঝরণা ধারা (১৯২৮)। গবেষণা : চট্টগ্রামী বাংলার রহস্য ভেদ (১৯৪৩), বাংলা ভাষার সংস্কার (১৯৪৮), পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম (১৯৪৮), আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য (আবদুল করিম সাহিত্য- বিশারদ সহযোগে), বঙ্গে সুফী প্রভাব, মুসলিম বাংলা সাহিত্য (১৯৫৭), মনিষা-মঞ্জুষা, (১ম খণ্ড ১৯৭৫, ২য় খণ্ড, ১৯৭৬। ভ্রমণ : বুলগেরিয়া ভ্রমণ (১৯৭৮)। পুরস্কার : গবেষণায় বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৬৪।

লেখা-পরিচিতি : 'নূতন দৃষ্টিতে পুরানো বাংলা' লেখাটি লেখকের 'মনীষা-মঞ্জুষা' প্রথম খণ্ড, (প্রকাশক, মুক্তধারা, প্রকাশকাল, ১৯৮৫) থেকে গৃহীত।

আজকাল আমাদের অনেকেই সখ করিয়া পুরানো বাংলার আলোচনা করি এবং এই আলোচনা শুনি। আমার মনে হয়, ইহা যেন ভুরি-ভোজননিরত ব্যক্তির সখ করিয়া চাট্‌নি খাইয়া রুচি পাল্‌টাইবার ইচ্ছার অভিব্যক্তি। কেননা, আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন, যাঁহারা এই বিষয়ে সত্যিকারের রুচির পরিচয় দিয়া থাকেন, অথবা এই বিষয়ে সত্যিকারের উদ্যোগী। দেশের মাটির রস-ধারায় সিক্ত নয় এমন হাল্‌ ফ্যাশনের বাংলা-সাহিত্য আলোচনা করিতে করিতে অরুচি ধরিয়া গেলেই, সাধারণতঃ আমরা পুরানো বাংলার দিকে সাময়িকভাবে নজর দিয়া থাকি। সেই কারণেই আধুনিক বাংলা-সাহিত্যালোচনায় আজও পুরানো বাংলা কৌতূহল-উদ্রেকাত্মক প্রাচীন বস্তুর পণ্যশালায় (Old curiosities shop) পরিণত হইয়া রহিয়াছে; ইহা এখন জাতির অস্থিমজ্জায় গৌরবের সামগ্রীরূপে রূপায়িত হইয়া উঠে নাই।

আবার, যাঁহারা এই পণ্যশালায় কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টিও সকল দিকে সমভাবে সঞ্চারিত হয় নাই,—এক একটি বিষয় যেন তাঁহাদিগকে অধিকমাত্রায় অভিভূত করিয়াছে। মনের স্বাভাবিক কৌতূহলবশে আমরাও এই পণ্যশালায় প্রবেশ করিয়াছিলাম। ইহা যে-ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। যে-দিকে অপর ব্যক্তির নজর পড়ে নাই বা খুব কমই পড়িয়াছে, আমাদের দৃষ্টি প্রধানত: সেইদিকেই নিবদ্ধ হইয়াছিল। ইহা হয়ত স্বভাবের দোষ; কিন্তু তথাপি দৃষ্টির সত্যকে অস্বীকার করা সম্ভবপর হয় নাই। ফলে পুরানো বাংলাকে অস্বীকার করা সম্ভবপর হয় নাই। ফলে পুরানো বাংলাকে এক নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে বাধ্য হই। এই দৃষ্টিকে "মুস্‌লিম-দৃষ্টি" বলিয়া অভিহিত করিতে দোষ কি? বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের সমবেত সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার ফলে যখন বাংলা-সাহিত্যের উদ্ভব, বর্ধন ও বর্তমান পরিণতি ঘটিয়াছে,

www.pathagar.com

তখন এই সাহিত্যে মুসলিম সাধনার ধারাকে পরীক্ষা করিয়া দেখার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

বাংলা-ভাষার বয়স মোটামুটি হাজার বছর বলিয়াই ধরা হইয়া থাকে। বাংলার সহিত মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধও প্রায় হাজার বছরের। বাংলা-ভাষার জন্ম হইতেই এদেশের সঙ্গে মুসলমানদের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া, এদেশের সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস ও ভাষার ক্রম-বিকাশের স্তরে স্তরে মুসলমানদের সাধনাও জড়াইয়া রহিয়াছে। এ-ইতিহাস নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইহার প্রধান প্রধান বৈচিত্র্যের প্রতি ইঙ্গিত করাই বর্তমান আলোচনার প্রধান লক্ষ্য।

অনেকের ধারণা, খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায় বঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বাংলার সহিত মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল না। এ-ধারণা একান্ত ভ্রমাত্মক। খ্রীস্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী হইতে এদেশের সহিত মুসলমানদের ধর্মীয় ও বাণিজ্যিকসম্বন্ধীয় যোগাযোগ সংস্থাপিত হয়। পাহাড়পুরে পাল-যুগের ভূপ্রোথিত বৌদ্ধ-বিহার হইতে খলীফা হারুনু-র রশীদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রী:) একটি মুদ্রার (৭৮৮ খ্রী:) আবিষ্কার; প্রাচীন আরবী ভৌগোলিকগণ কর্তৃক চট্টগ্রাম অঞ্চলে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরব বণিকগণের উপনিবেশ সংস্থাপনের সাক্ষ্য; চট্টগ্রামে-সুলতান বায়িজীদ বিসতামীর (মৃ: ৮৭৪ খ্রী:) পদার্পণ, বগুড়ার মহাস্থানে মীর সৈয়দ সুলতান মাহীসওয়ারের (১০৪৭ খ্রী:) আগমন, ময়মনসিংহের মদনপুরে শাহ্ সুলতান রূমীর (১০৫৩ খ্রী:) প্রতিষ্ঠা; ঢাকার বিক্রমপুরে বাবা আদম শহীদের আত্মোৎসর্গ এবং ঐ জেলার মানিকগঞ্জের পারিল গ্রামে গাজী মুল্‌ক্ ইকরাম খানের (১২১৪ খ্রী:) আগমন, গৌড়ের পাণ্ডুয়ায় মুখ্‌দুম্ শয়খ্ জলালুদ্-দীন্ তব্‌রিজীর (মৃ: ১২২৫ খ্রী:) ধর্মপ্রচার প্রভৃতি ঘটনার পর ঘটনার পটপরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে দেখা যায়, বাংলাদেশে মুসলিম-রাষ্ট্র স্থাপিত হইবার বহুপূর্বে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যেই বাংলার সহিত ইসলাম ও মুসলিমসম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সম্বন্ধ ছিল মূলত: স্থানীয় ভাবাপন্ন। শুধু ধর্ম ও বাণিজ্যের সূত্রে কতকগুলি বিশিষ্ট স্থানের লোক ইসলাম সম্বন্ধে অবহিত হইল বটে, কিন্তু এই নব-পরিচিত প্রসার ও নিবিড়তা স্থান, কাল ও পাত্র এই তিনটিকে ছাড়াইয়া বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। এই কারণেই বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের সহিত বাংলার এই সময়কার ইসলামের কোন বিশেষ যোগাযোগ ছিল না,— থাকা সম্ভবপরও নহে।

আরও একটি বিশেষ কারণে বাংলা-ভাষার সহিত এই সময়কার ইসলামের যোগ সাধিত হয় নাই। যে-ভাষাকে আজ আমরা বাংলা-ভাষা বলি, তাহা খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আপন বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক রূপ গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারে নাই। বলা হয় যে, এই সময়ের মধ্যে কাহ্নপাদ, ভুসুকপাদ, লুইপাদ, সরহপাদ প্রভৃতি তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা রচিত "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়" নামে খ্যাত কতিপয় পদ বাংলা-ভাষার আদিম নিদর্শনরূপে লিখিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই 'চর্যাপদ'গুলির ভাষা যে বাংলা-ভাষার জনক, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে, তখনও আমাদের ভাষার এই জনকটি যে

www.pathagar.com

একান্তই অসহায় শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে নাই,-এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, "চর্যাপদ"-রচয়িতাদের মধ্যে কেহই বাংলার অধিবাসী ছিলেন কিনা, সে-বিষয়ে অনুমান ব্যতীত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহারা যে-ভাষায় পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা "প্রাকৃত-ভাষা"র একধাপ নীচের এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলা-ভাষার বেশ একধাপ উপরের পূর্ব ভারতীয় অপভ্রংশ ভাষাগুলির মধ্য হইতে একটি মাত্র। আবার বাংলাদেশের সর্বত্রই এই অপভ্রংশ ভাষাটির প্রচলন ছিল কিনা, সে কথাই বা আজ কে বলিবে?

খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই খাঁটি বাংলা বলিতে পারা যায়, এমন ভাষা এই দেশে আপন বৈশিষ্ট্য লইয়া রূপ গ্রহণ করিল। ঠিক এই সময়েই বাংলার হিন্দু-রাজত্বের অবসান ও তুর্কীজাতির অধীনে মুসলিম রাজত্বের সূত্রপাত হয়। হিন্দু শাসনকালে "সংস্কৃত" ছিল এদেশের ধর্মীয় দেবভাষা এবং সেই কারণে সাংস্কৃতিক ও দরবারী ভাষা। পবিত্রতার অজুহাতে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ এই ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন এবং আবশ্যক মত পুঁথিপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রাজকার্য পর্যন্ত সর্ববিষয়ে এদেশের শিক্ষিত সমাজ এই ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ করিতেন। সেই কারণে দেশের জনসাধারণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল স্তরের লোক তাঁহাদের প্রাত্যহিক কাজে অপভ্রংশ (বাংলা) ব্যবহার করিলেও, সংস্কৃত-ভাষার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার নিকট দেশের অপভ্রংশ-ভাষা কখনও দাঁড়াইতে পারে নাই। সুতরাং বঙ্গে হিন্দু-রাজত্বকালে খাঁটি বাংলা-ভাষা সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া ছিল কিনা, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়া হইতে বাংলার তুর্কীজাতির অধীনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, দেশের ধর্ম, শাসন ও সংস্কৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ভাষা পর্যন্ত সকল বিষয়ে পরিবর্তন দেখা দিল। অবশ্য, এই পরিবর্তন এক নিমিষে সাধিত হয় নাই। তুর্কী মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা ছিল আরবী, আর সাংস্কৃতিক ও দরবারী ভাষা ছিল ফারসী এবং ঘরে ব্যবহারের ভাষা ছিল বেশ ফারসী-মিশ্রিত তুর্কী। এই স্বাভাবিক কারণে, মুসলিম রাজত্বের গোড়া হইতে দেবভাষা "সংস্কৃত" ইহার দেবত্ব খোয়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও দরবারী প্রতিষ্ঠাও হারাইয়া ফেলিল। হিন্দু ধর্ম-জগতে তাহার প্রভাব আজ পর্যন্ত বিশেষ খর্ব হয় নাই বটে, তবে দেশের শাসনক্ষমতা হারাইয়া, ইহা একেবারেই পঙ্গু হইয়া পড়িতে থাকে। ক্রমেই এই ভাষা আভিজাত্যবর্জিত হইয়া "দেশীভাষা"র সমপর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াতে লাগিল। সংস্কৃত-ভাষার পক্ষে এই বাধ্যতামূলক দুর্বলতা কাল-ধর্ম-দোষে স্বাভাবিক দৌর্বল্যে পরিণত হইয়া খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইহাকে জীবন্মৃত করিয়া তুলিল। ইহার এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত বাংলা-ভাষার লক্ষণাক্রান্ত অপভ্রংশ-ভাষা তাড়াতাড়ি মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমেই দেশে এইভাবেই খাঁটি বাংলা-ভাষার সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও প্রসারের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বাংলা-ভাষার এই নবীন অধ্যায় লিখিত হয়,-ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই দেড়শত বৎসরের মুসলিম-রাজত্বের স্থায়িত্বের দ্বারা সৃষ্ট নূতন সুযোগ প্রাপ্তি ও নয়া-আবহাওয়ার পত্তনে। এই সময়কার বাংলা-

www.pathagar.com

ভাষার নমুনা বাঙালীর কোন সাহিত্যে আজ পর্যন্ত মিলে নাই বটে, কিন্তু ইহার কিয়ৎকালপরবর্তী বাংলাভাষার নমুনা বড়ুচণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে" পাওয়া যাইতেছে। "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে"র ভাষা দেখিয়া ইহার এক শতাব্দী পূর্ববর্তী বাংলা-ভাষার অবস্থা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে ইসলামও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হইতে থাকে। এই যুগকে বঙ্গে ইসলাম-বিস্তৃতির-ইতিহাসে "যোধনীয় প্রবর্তনার যুগ" বলিয়া উল্লেখ করা যায়। এই সময়ে বহু ধর্মপরায়ণ দরবেশ, অনেক স্বধর্মনিষ্ঠ গাজী এবং অসংখ্য ইসলাম-বিশারদ আলিম বাংলায় আগমন করিয়া দেশ ছাইয়া ফেলিলেন। বেশির ভাগ সময়ে হিন্দু সভ্যতা ও শাসন-কেন্দ্রগুলিতেই তাঁহাদের আস্তানা পড়িল। স্বর্ধমানুরাগী ও স্বজাতিবৎসল তুর্কী শাসক-সম্প্রদায়ের ক্ষাত্রশক্তির পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সমর্থনে দেশে ইঁহাদের ধর্মপ্রচার কার্য জোরে চলিতে লাগিল। এইভাবে দেশে ইসলাম ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল বটে, তথাপি তাহা মুসলমানদের মধ্যে বাংলা-ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টির সময় ছিল না। কেননা, তখন পর্যন্ত বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বিদেশাগত ও নও-মুসলিম হিসাবে যে-দুই শ্রেণীর মুসলমান ছিল, তাহাদের কোন শ্রেণীতেই তখনও সাহিত্যসৃষ্টির কথা ভাবিতে পারেন নাই।

তখন বাংলার বাহির হইতে যে-সকল মুসলমান এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সংখ্যায় খুব অল্প ছিলেন। দেশের শাসন-কার্যেই তাঁহারা ব্যস্ত। বিশেষত: ফারসী ছিল তাঁহাদের সাহিত্যের ভাষা; এই ভাষাতেই তাঁহারা সাহিত্যালোচনা করিতেন। বাংলায় সাহিত্য-রচনা বা আলোচনা করিবার মত ভাষাগত অধিকার তখনও তাঁহারা লাভ করেন নাই, অথবা তদ্রূপ অধিকার লাভের আবশ্যকতাও বোধ করেন নাই। বাঙালী নও-মুসলিমগণ সংখ্যায় বেশ পুষ্ট থাকিলেও, তখন তাঁহারা সবেমাত্র ইসলামের ন্যায় এক নূতন ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিতেছেন। এমন অবস্থায় প্রাচীন ও নবীন সংস্কৃতিগত মানসিক সংঘাতে পীড়ন কাটাইয়া তাঁহারা সাহিত্য-সৃষ্টি করিবার মত মনের অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই।

প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে, এই দেড়শত বৎসর কাল বাংলার মুসলমান সমাজে বাংলাভাষা-প্রবেশের সময় ছিল। রাজকার্য ও বাণিজ্য-ব্যপদেশে বিদেশাগত মুসলমানগণ বহু পূর্ব হইতেই কিছু কিছু বাংলা-ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তখনও এই শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে সত্যিকারভাবে বাংলা-ভাষা প্রবেশ করে নাই। তাহা হইতে আরও বহুদিন লাগিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে নও-মুসলিমদের জন্মগত ভাষার অধিকারকে অবলম্বন করিয়া বাংলা-ভাষা বাঙালী মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে। তারপর বৈবাহিক সম্বন্ধের সূত্র ধরিয়াও তাঁহাদের মধ্যে এই ভাষা সম্প্রসারিত হয়। নও-মুসলিমগণ ত বাংলা বলিতেনই, তদুপরি বঙ্গে তুর্কী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার যে-সকল তুর্কী কর্মচারী ও সৈন্য রহিয়া গেলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এদেশীয় স্ত্রী গ্রহণ করিয়া বাঙালী বনিতে লাগিলেন; কেননা তাহারা নিজ দেশ হইতে সপরিবারে বাংলায় আসেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। প্রধানত: এইরূপেই বাংলা-ভাষা ধীরে ধীরে বাংলার মুসলমান সমাজে প্রতিষ্ঠা করিয়া

www.pathagar.com

লইতে লাগিল। এইরূপ একটি সমাজে সম্যক প্রতিষ্ঠা অর্জনের পক্ষে দেড়শত বৎসর ভাষার ইতিহাসে মোটেই দীর্ঘসময় নয়।

খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে আসিয়া বাংলা-ভাষার পূর্ব অবস্থার বেশ পরিবর্তন ঘটে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থাই এইজন্য প্রধানত: দায়ী। তখন বঙ্গদেশে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। ফখ্রু-দ্-দীন্ মুবারিক শাহ্, ইখ্তিয়ারু-দ্-দীন্ গাজী শাহ্, আলাউ-দ্-দীন্ আলী শাহ্ এবং শাম্সু-দ্-দীন্ ইলিয়াস শাহ্ (১৩৩৯-১৩৫৮) নামক প্রতিদ্বন্দ্বী চতুষ্টয়ের মধ্যে বাংলার স্বাধীনতা লাভের প্রতিযোগিতা দস্তুরমত শুরু হইয়া গিয়াছে। তখন এই প্রতিদ্বন্দ্বীরা বুঝিতে পারিলেন যে, শাসকশ্রেণীর মুসলমানগণ শাসিত হিন্দু-সম্প্রদায়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করিতে না পারিলে এবং ধনবল, জনবল ও জ্ঞানবলের সাহায্য না পাইলে, তাহাদের পক্ষে ক্ষমতা লাভ করা সহজ নহে। বাংলার হিন্দুসম্প্রদায়ের এইরূপ সমর্থন লাভ করিবার জন্য, এই সম্প্রদায়কে দেশের শাসন, শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতিতে মুসলমানদের সমান অধিকার দিয়া, ইঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার আবশ্যকতাও অনুভূত হইল। তাই দেখা যায়, ফখরু-দ্-দীন্ মুবারিক শাহ্ শ্রীহর্ষ সেন নামক কোন খ্যাতনামা কবিরাজকে তাঁহার অন্ত:পুরচারিণীর সকল চিকিৎসার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বীরভূমের অন্তর্গত সেনভূমের জমিদারী ও তৎসঙ্গে "রাজা" উপাধি দান করিয়াছেন। এই শ্রীহর্ষ সেনের পুত্র বিনায়ক সেনও গৌড়ের সুলতানদের কাছ হইতে কণক–ছত্র, গজ ও বহু ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহ্ যখন সমগ্র বঙ্গ অধিকার করিয়া বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন তাঁহার সৈন্যদলের বেশির ভাগই বাঙালী "পাইক" বা পদাতিক স্থান পাইয়াছিল। তিনি এই বিশাল বাঙালী পাইক-বাহিনীকে আদর করিয়া "আবূ-বঙ্গাল" বা বাংলার রক্ষক নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহার বাঙালী বীরগণ তাঁহার নিকট হইতে বাংলা উপাধিও লাভ করিতেন : তিনি চট্টবংশীয় বীর দুর্যোধনকে "বঙ্গভূষণ" এবং পুতিতুণ্ডবংশীয় বীর চক্রপাণিকে "রাজজয়ী" উপাধি দান করেন। সহদেব নামক আর এক বাঙালী বীর তাঁহার পক্ষে দিল্লী সুলতান ফীরূজ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া এক লক্ষ আশী হাজার পাইকের সহিত সমর-ক্ষেত্রে জীবন দান করেন। এই ইলিয়াস শাহেরই অঙ্কশায়িনী সোনারগাঁয়ের বজ্রযোগিনী গ্রামের ব্রাহ্মণ-কুমারী 'ফুলবতী' বেগমের কথা সর্বজনবিদিত।

এইরূপে দেশের হিন্দু-সম্প্রদায়ের পূর্ব সহযোগিতায় বাংলাদেশ মুসলমানদের অধীনে স্বাধীন হওয়ার ফলে, রাজদ্বারে হিন্দু-সম্প্রদায়ের শুধুই যে প্রতিষ্ঠা জন্মিল তাহা নহে, এই সুযোগে বাংলা-ভাষারও খানিকটা সুবিধা হইয়া গেল। 'ম্যাগ্নাকাটা'র মত আইনের বলে বাংলার লোক গৌড়ের সুলতানদের কাছ হইতে জোর করিয়া বাংলা-ভাষার অধিকার কাড়িয়া লইলেন না বটে, কিন্তু হিন্দু কর্মচারী ও জনসাধারণের সহিত সুলতানদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠার ফলে, শাসক-সম্প্রদায়ে জ্ঞাতসারে ও মৌন-সম্মতিক্রমে বাংলা-ভাষা দেশে বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া ফেলিল। আমরা দেখিয়াছি, এতদিন ধরিয়া বাংলা-ভাষা দেশের হিন্দু-সমাজের গণ্ডি উল্লঙ্ঘন করিয়া এদেশের মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠার সীমা বাড়াইয়া লইয়াছে। এইবার মুসলিম রাজশক্তির মৌন-

www.pathagar.com

সমর্থনে রাজঅন্তঃপুর ও দরবার হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের সর্বত্র বাংলা-ভাষার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িল। রাজভাষা হিসাবে বাংলায় ফারসী-ভাষা চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু সব সময়ে বেশির ভাগ বাঙালী ও বিদেশাগত মুসলমানের ঘরে এবং প্রায়ই বাহিরে কর্মক্ষেত্রে বাংলা-ভাষা ব্যবহৃত হইতে লাগিল। মোটের উপর, এখন হইতে প্রায় সকল মুসলমান বাংলা-ভাষা বলিতেন ও বুঝিতেন। এইরূপে বাংলা-ভাষা দেশে যতই প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত হইয়া পড়িতেছিল, সংস্কৃত-ভাষা ততই স্বীয় প্রতিষ্ঠার সীমা সঙ্কোচন করিতে করিতে কেবল হিন্দুর ধর্মীয় গণ্ডিতে আসিয়া আশ্রয় লইতেছিল। ইহার পর হিন্দুর ধর্মজগতের বাহিরে আর তাহার স্থান হইল না।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হইতেই নানাদিক দিয়া বাংলার আপন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিতে থাকে। দেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্প, কলা, সাহিত্য প্রভৃতিতে একে একে বাঙালীর জাতীয় প্রতিভার স্ফূরণ দেদীপ্যমান হইতে লাগিল। স্বাধীন অবস্থায় বাংলার দীর্ঘ শান্তিভোগই ইহার কারণ। দেশে এইরূপ শান্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া গৌড়ের সুলতানগণও সাহিত্যসেবায় মনোনিবেশ করিলেন। এই প্রসঙ্গে সুলতান ঘয়াসু-দ্-দীন্ আজম শাহের (১৩৮৯-১৪০৯) নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যায়। সুদূর পারস্যের খ্যাতনামা কবি হাফিয সুলতানকে কবিত্বশক্তিতে এমনই মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, সুলতান কবিকে বাংলায় পদার্পণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ দান করিলেন। কিন্তু বার্ধক্যের অজুহাতে কবি এই রাজসম্মান গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই নিমন্ত্রণের পশ্চাতে সম্ভবত: সুলতানের স্বপ্ন ছিল,—তিনি যেন বাংলার তালতমালাবৃত কুঞ্জের ছায়ায় বসিয়া পারস্যের গোলাপ-বুলবুলের প্রেমালাপ শ্রবণ করেন এবং সাকী-পরিবেষ্টিত শরাব পানের মাদকতায় বিভোর হইয়া বাংলায় এক নবজীবনের সূত্রপাত করেন। সত্যই যদি ইহা সুলতানের স্বপ্ন হইয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে, তৎপরবর্তী দুই শতাব্দীর মধ্যে তাঁহার এই স্বপ্ন সফল হইয়াছিল।

গৌড়ের সুলতানদের মধ্যে এই যে সাহিত্য-প্রীতি ও বিদ্যোৎসাহিতা জাগ্রত হইল, ইহা শুধু রাজ-দরবারে সীমাবদ্ধ থাকিল না। ইহা অনতিবিলম্বে দরবারের আওতা ছাড়াইয়া দেশের জনসাধারণের মধ্যেও বহুল পরিমাণে সম্প্রসারিত হইয়া পড়িল। তখনও রাজদরবারে সাহিত্যের আলোচনা হইত ফার্সী-ভাষায়, আর দেশের জনসাধারণ সাহিত্যের আলোচনা করিত প্রচলিত বাংলা-ভাষায়। আমরা দেখিয়াছি, বঙ্গে মুসলিম রাজত্বের অনুকূল আব-হাওয়ায় ইত:পূর্বেই বাংলা-ভাষার অসহায় শৈশব অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে। এখন চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে আসিয়া বাংলা-ভাষা বেশ সবল ও বলিষ্ঠ শিশুতে পরিণত,—আপন পায়ে দাঁড়াইয়া ছুটাছুটি করিতে সমর্থ। ঠিক এই সময়ের বাংলা-ভাষারই নমুনা "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন।" বড়ু চণ্ডীদাস নামে পরিচিত কোন গায়ক-কবি কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে যে-সকল গান বাঁধিয়াছিলেন, তাহা কিয়ৎকাল পরবর্তী কোন লেখকের কল্যাণে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন" যে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিরচিত এবং ইহার রচয়িতা যে বাংলার 'চণ্ডীদাস' নামে চিরপ্রসিদ্ধ ও পরিচিত কবিটি, সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা অতিরিক্ত পাকামির পরিচায়ক। বঙ্গে ইসলামধর্ম ও মুসলিম সংস্কৃতির

www.pathagar.com

প্রাথমিক যুগে রচিত বাংলার এই কাব্যটিতে মুসলিম-প্রভাব নিতান্তই নগণ্য, এবং এইরূপ না হইলেই বরং অস্বাভাবিক হইত। মুসলিম-সংস্কৃতিবাহী শ্রম, যুদ্ধাস্ত্র, ফল ও ফুল-সংক্রান্ত গোটা আষ্টেক ফারসী শব্দ মাত্র ধারণ করিয়া এই কাব্যটি জানাইয়া দিতেছে যে, তখনও ইসলাম পারিপার্শ্বিক হিন্দু-সমাজে বড় বেশী প্রভাব বিস্তার করে নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে দেশের, এই সময়ের সাহিত্য আরও অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না কেন? এক চণ্ডীদাস ব্যতীত আর কি কেহ তখনও বাংলায় কিছু লেখেন নাই? বাংলার মুসলমানই বা তখন কি করিতেছিলেন? যাঁহারাই এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন, তুর্কীদের অধীনে মুস্‌লিম-শাসনের প্রাথমিক যুগের রাষ্ট্র-বিপ্লবই এইজন্য একমাত্র দায়ী; এই রাষ্ট্র-বিপ্লবই বাংলার এই সময়কার সমস্ত সাহিত্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

এই সময়ের বাংলা-সাহিত্য অপ্রচুর, তাহা সহস্রবার স্বীকার্য। কিন্তু, বাংলা-সাহিত্যের এই অপ্রাচুর্যের জন্য, যাঁহারা মুস্‌লিম শাসনের প্রাথমিক যুগের রাষ্ট্র-বিপ্লবকেই শুধু দায়ী করেন, তাঁহারা দেশের তখনকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে বালকোচিত অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। রাষ্ট্র-বিপ্লবে দেশের লিখিত সাহিত্যের অকিঞ্চিৎকর অংশ নষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নহে, তবে এইজন্যই ইহাই একমাত্র দায়ী নহে। কেননা, তখনকার রাষ্ট্র-বিপ্লবের সহিত দেশের জনসাধারণের সম্বন্ধ বর্তমানের ন্যায় এত নিবিড় ছিল না। দেশে রাজা হইত বা যাইত, যুদ্ধে হার-জিত হইত। তজ্জন্য জনসাধারণের বড় একটা আসিত বা যাইত না। তাহারা ইহার খবরও রাখিত না। এই কারণে রাষ্ট্র-বিপ্লবের আওতার বাহিরে থাকিয়াও সাহিত্য-সাধনা করা চলিত। বাস্তবিকই, বাংলা-ভাষায় তখন যে-সাহিত্য রচিত বা আলোচিত হইত, তাহা রাষ্ট্র-বিপ্লব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যদি এই উক্তি সত্য হয়, তবে এই সময়ের বাংলা-সাহিত্য কোথায়? এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর—বাংলাভাষায় তখনও প্রচুর পরিমাণে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় নাই; কারণ তখনও ভাবপ্রকাশের অক্ষমতা ভাষার অঙ্গে অঙ্গে বিদ্যমান। এই প্রকাশগত অক্ষমতার জন্যই এই ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে পারিতেন এমন প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব অধিক সংখ্যায় ঘটে নাই। ইহার দ্বিতীয় উত্তর অন্যত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এই সময়ে দেশে যে দুই চারজন কবি জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের লেখা বা লিখিত গানগুলি সর্বগ্রাসী কাল, বাংলার কীট, অগ্নি, বায়ু, জল, মহামারী প্রভৃতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। ইহার তৃতীয় কারণ প্রথম কারণের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেও পৃথকভাবে উল্লেখযোগ্য। কালজয়ী প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাবান কবির অভাবকে উপেক্ষা করিলে এই সময়ের অবস্থার প্রতি সুবিচার করা হয় না। ভাষার প্রথম উন্মেষের যুগে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র মানুষ আপন মনোভাব গানেই প্রকাশ করিয়াছে; বাংলা-ভাষার বেলায়ও তাহা ঘটিয়াছিল। তাই আজও চণ্ডীদাস প্রাচীন বাংলার প্রথম অমর কবি। তাঁহার গান কালজয়ী হইয়া লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে বাজিতে বাজিতে "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন" আবিষ্কৃত হওয়ার বহুপূর্বে আমাদের কাছে আসিয়া না পৌছিলে, শুধু "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন" তাঁহাকে আজও বাঁচাইতে পারিত কিনা সন্দেহ। এই

www.pathagar.com

সময়ে কি হিন্দু, কি মুসলমান,কাহারও মধ্যে এইরূপ প্রতিভাশালী কবি বাংলায় আরও জন্মগ্রহণ করিলে, নিশ্চয় তাঁহাদের সহিত কোন-না কোন সূত্রে আজ আমাদের পরিচয় ঘটিত। তবে এই সময়কার বাংলা-সাহিত্য যে আর আবিষ্কারের প্রতীক্ষা রাখে না, সেই কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

সে যাহা হউক, যে-কথা বলা হইতেছিল তাহা এই : খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলা-ভাষার যে-উন্নতি ঘটিল, তাহা বঙ্গে মুসলিম-শাসন ও ইসলাম-বিস্তৃতির আশ্রয়েই সম্ভবপর হইয়া উঠিল। বাংলা-ভাষার অসহায় শৈশব অবস্থায় বাংলার-প্রাচীন মুসলমানগণ ধাত্রীরূপে ইহাকে লালন-পালন করেন নাই সত্য, তথাপি দেশের যে-জনসাধারণের হাতে ইহার লালন-পালনের ভার ছিল, তাহাদের হাতে যাহাতে দেশে এই ভাষাটি আশু বর্ধিত হইয়া উঠিতে পারে, তজ্জন্য জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অথবা উভয় প্রকারে তাহারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। একদিকে দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হইতে সংস্কৃত-ভাষার প্রাধান্য খর্ব করিয়া এবং অন্যদিকে দেশের বাংলাভাষী স্ত্রী-পুরুষকে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও বৈবাহিক-সূত্রের সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া, তাঁহারা বাংলা-ভাষার দ্রুত পরিপুষ্টি সাধনের জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিলেন, উত্তরকালে সেই ক্ষেত্রই বাংলা-ভাষাকে দেশের সাহিত্যে ব্যবহৃত হইবার পক্ষে উপযুক্ত করিয়া তুলিল। এই হিসাবে বাংলার প্রাচীন মুসলমানগণই এদেশের ভাষার মুখ্য সেবক। ভারতের বহু প্রাদেশিক ভাষা আজও যেরূপ অনুন্নত, তাহার ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, বাংলার প্রাচীন মুসলমানদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অথবা উভয়বিধ সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলে, এই ভাষার অবস্থা আজও অনুন্নত ভারতীয় ভাষার উপরে উঠিতে পারিত না।

এইরূপে খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী কাটিয়া গেল; ধীরে ধীরে বাংলা-ভাষাও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল; সাহিত্যের ক্ষেত্রে চণ্ডীদাস দেখা দিলেন এবং তাঁহার সমসাময়িক অথবা কিয়ৎকালপরবর্তী কবিগণ ক্রমে ক্রমে হয় কালের অন্ধ-যবনিকার অন্তরালে লুকাইতে লাগিলেন, নয় আজ পর্যন্ত কোন অখ্যাত ও অবজ্ঞাত বাঙালীর গৃহ-কোণে আবদ্ধ থাকিয়া আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতেছেন। আজ প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরের ব্যবধানে দাঁড়াইয়া জ্ঞানের দূরবীণ-যোগে যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা হইতেও বুঝিতে পারিতেছি, চণ্ডীদাসের সময় হইতে বাংলা-ভাষার মোড় ফিরিয়া গিয়াছে। ইহা ভাষার সাহিত্যিক মর্যাদা লাভেই সম্ভবপর হইয়াছিল। বাংলা-সাহিত্য তখনও সবে অঙ্কুরিত হইতেছে।

ঠিক এই সময়েই খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী প্রবেশ করিল, আর বাংলার সুলতানগণ ও মুসলিম্ জনসাধারণ দেশের এই সাহিত্য-শিশুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নিদর্শন সুলতান- জলালু-দ্-দীন্ মুহম্মদ্ শাহ্ ওরফে "যদু" (১৪১৪-১৪৩১)। ভাতুরিয়ার জমিদার বিদ্রোহী রাজা গণেশের এই "যদু" নামধেয় ছেলেটিই স্বাধীন বাংলার সর্বপ্রথম বাঙালী মুস্‌লিম্ সুলতান। নানা কারণে বাংলার ইতিহাসে তাহার রাজত্ব চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা ও সাহিত্য-সেবা অন্যতম। "স্মৃতিরত্নহার" নামক স্মৃতিগ্রন্থ এবং "অমরকোষ", "শিশুপাল-

www.pathagar.com

সগীরকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। আমরা কিন্তু তাঁহার "ইউসুফ জোলেখা" স্বচক্ষে দেখিয়া এবং ইহার আলোচনা করিয়া কবিকে পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালেও ঠেলিতে পারিব না। তাঁহার কাব্যখানি প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ এবং নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাব্য।

এতদ্ব্যতীত খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর অবশিষ্ট পাদত্রয়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্য-সৃষ্টির প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। তাহাও আবার গৌড়ের মুসলিম সুলতানদের অনুগ্রহ ও উৎসাহে পরিপুষ্ট এবং বাংলার মুসলিম জনসাধারণের সেবায় শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। গৌড়ে সুলতান বারবক শাহ্ (১৪৫৯-১৪৭৪) যখন রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামবাসী মালাধর বসু কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়া থাকিবেন। ইঁহারই রাজত্বের শেষ বৎসরে অর্থাৎ ১৪৭৩ খ্রীস্টাব্দে মালাধর বসু তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" রচনা আরম্ভ করেন। তখন কবি গৌড়েশ্বর-প্রদত্ত "গুণরাজ খান" উপাধি তাঁহার কাব্যে গৌরবের সহিত ব্যবহার করিতেছেন। সুতরাং সুলতান বারবক শাহ্‌ই কবিকে এই উপাধি দিয়া সম্মানিত এবং কাব্য-রচনায় সমুৎসাহিত করিয়া থাকিবেন।

মুসলমান সুলতানদের বঙ্গ-সাহিত্য-প্রীতি ও পরিপোষকতা এইখানে আসিয়া থামিল না। পরবর্তী সুলতানগণ, এমন কি তাঁহাদের আমীর ওমরাহরাও যেন উত্তরাধিকার-সূত্রে এই সুগুণের অধিকারী হইলেন। বারবক শাহের পরবর্তী সুলতান ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে (১৪৭৪-১৪৮২) মালাধর বসু দীর্ঘ আট বৎসরের সাধনায় ১৪৮১ খ্রীস্টাব্দে "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" রচনা সমাপ্ত করেন। এই একটানা আট বৎসরের কাব্য-সাধনার পশ্চাতে গৌড়েশ্বর ইউসুফ শাহের অনুগ্রহ-ধারা বর্ষিত না হইলে সম্ভবতঃ মালাধর বসুর কাব্যখানির পরিসমাপ্তি ঘটিত না।

এই ইউসুফ শাহ্ আরও একজন বাঙালী কবিকে করুণা-ধারায় সিক্ত করিয়াছিলেন; তিনি "রসূল-বিজয়" নামক একখানা কাব্য-প্রণেতা শয়খ জৈনু-দ্-দীন। জানিতে পারা যায়, ইনি সুলতানের আদেশে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া "রসূল-বিজয়" রচনা করিয়াছিলেন। সুলতানের নাম 'রাজ্যেশ্বর" উপাধি ও অবারিত করুণার কথা কাব্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও, যখন কোন কোন গ্রন্থকার শয়খ জৈনু-দ্-দীন্‌কে ঐ নামীয় কোন স্থানীয় ভূস্বামীর আশ্রিত অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া গম্ভীরভাবে মত প্রকাশ করেন, তখন বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার স্বীয় ধারণাবিরুদ্ধ কোন সত্য আবিষ্কৃত হইলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। এহেন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির লোকের সহিত তর্ক করিয়া কোন ফয়দা নাই।

ইউসুফ শাহের প্রায় এক যুগ পরে আসিয়া আমরা গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই, আলাউ-দ্-দীন হুসৈন শাহকে (১৪৯৩-১৫১৯)। এই সময়ের মধ্যে গৌড়ের আর কোন সুলতান বাংলা-সাহিত্য রচনায় কাহাকেও উৎসাহিত করিয়াছিলেন কি না, তাহা আজ পর্যন্ত জানা যায় নাই। রাজ্য-শাসন ব্যাপারে সুলতান হুসৈন শাহ্ যেমন ইতিহাসে অমর, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসেও তেমনই তাঁহার নাম চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁহার

www.pathagar.com

বিদ্যোৎসাহিতা ও সাহিত্য-প্রীতির কথা আজ নূতন করিয়া জানাইবার প্রতীক্ষা রাখে না। তাঁহারই রাজত্বকালে যখন ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দে আধুনিক বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামের বিজয়গুপ্ত তাঁহার "মনসা-মঙ্গল" এবং ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত বারাসত মহকুমার বাদুড়িয়া গ্রামের বিপ্রদাস পিপিলাই ঐ একই নামীয় গ্রন্থ রচনা করিতে গিয়া শ্রদ্ধাভরে বারংবার সুলতান হুসৈন শাহের নাম উল্লেখ করিতে দেখি, তখন সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া ইনি বাংলা-সাহিত্যের উন্নতি বিধানকল্পে যে বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ হৃদয়ঙ্গম করিতে আর কষ্ট হয় না। যশোরাজ খান নামক শ্রীখণ্ড নিবাসী এক পদকর্তা তাঁহার একটি পদের শেষে হুসৈন শাহের যে-খ্যাতি ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে এ-বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি সোলতানকে সাহিত্যরসে রসিক ব্যক্তি হিসাবে যেভাবে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ ঃ

"শ্রীযুত হুসন, জগতভূষণ, সো ইহ-রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর, ভোগপুরন্দর, ভণে যশোরাজ খান ॥"

বাংলা-সাহিত্যের শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া এই শতাব্দীর (পঞ্চদশ) শেষভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ দেড়শত বৎসরের মধ্যে বাংলার মুস্‌লিম সুলতান এবং মুসলমান কবিগণ এদেশের সাহিত্য-সাধনার জন্য কি করিয়াছেন, তাহা এখন স্পষ্টরূপে দেখা যাইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাধনা ব্যতীত এই সময়ে বাংলা-সাহিত্য কি অবস্থা প্রাপ্ত হইত, সেই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে গেলে নিছক অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইলেও, একথা সর্বত্র স্বীকৃত হইবে যে, এই সময়ের বাংলা-সাহিত্য এদেশের মুসলমানদের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী। সম্প্রতি এই ঋণের পরিমাণ লাঘব করিবার জন্য যে-সকল অপপ্রচেষ্টা চলিয়াছে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া ইহাদিগকে উল্লেখ করা যায় না। যতই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দোহাই পাড়ুক না কেন, এই প্রচেষ্টাগুলির সততা সম্বন্ধে স্বতঃই মনে সন্দেহের উদয় হয়।

এই সময়ে বাংলার মুসলমান জনসাধারণের সাহিত্য-সাধনার কথা শুনিয়া কেহ কেহ চমৎকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত অজ্ঞতাই এইরূপ মানসিক চাঞ্চল্যের একমাত্র কারণ। নতুবা কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর ও শৈখ জৈনু-দ্-দীনকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। বাংলার মুসলমানদের প্রাচীন সাহিত্য প্রচুর পরিমাণে সমগ্র বাংলা হইতে সংগৃহীত হইলে, এই সময়ের আরও দুই-চারজন মুসলমান কবি আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। বাংলা-সাহিত্যে ইঁহাদের দান নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বাংলার সংস্কৃতিগত পটভূমিতে এই শতাব্দীর সাহিত্য-সাধনাকে চিত্রিত করিলে, এই উক্তির সারবত্তা আরও পরিস্ফুট হইবে।

খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে মূলতঃ অনার্য ও আর্যজাতির মিলনে এই দুই জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগাযোগ লইয়া, "বাঙালী জাতি" বলিতে অধুনা যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা গড়িয়া উঠিতে থাকে। খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া সার্ধ এক

www.pathagar.com

শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গে তুর্কী আক্রমণ ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সংঘাতে এই দুই জাতির মিলন আরও গভীর এবং এই দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ আরও ঘনিষ্ঠ ও গাঢ় হইয়া ইতোমধ্যে এই দুই জাতির ভাষায়ও এক হইয়া পড়ে। বাঙালী জাতির পক্ষে এই সময়টি অপরাপর বিষয়ের সহিত ভাষাগত বৈশিষ্ট্য লইয়া একজাতিরূপে গড়িয়া উঠার সময়। এই সময়ে তুর্কীর ন্যায় আর একটি নূতন জাতি এবং ইসলামের ন্যায় আর একটি নবীন সংস্কৃতি বাংলাদেশে ঢুকিয়া পড়ায়, তাহাও গঠনোন্মুখ বাঙালী জাতির সহিত মিশিয়া গেল। সুতরাং প্রকৃত বাঙালী জাতি হইল অনার্য, আর্য ও মুসলিম সংস্কৃতির ত্রিধারার ত্রিবেণী-সংগম। তাই আজ দুই-চারিটি বিশিষ্ট আচার-ব্যবহার এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান ব্যতীত-তাহার বেশির ভাগের মধ্যে যে পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণ নাই তেমন নহে- অন্য কোন প্রকারে উক্ত জাতিত্রয়-মিশ্রিত বাঙালীকে পৃথক করিয়া চিনিয়া লইবার উপায় নাই।

খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যে বঙ্গীয় সংস্কৃতির এই ত্রিধারার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুরা ছিল দেবতার পূজারী; এই দেবতাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম প্রভৃতি দেবতা বা দেবত্বারোপিত মানব ছিল প্রাচীন আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্যোতক, আর মনসা প্রভৃতি স্থানীয় দেবদেবী ছিল প্রাচীন অনার্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক। তাই স্বাভাবিক কারণে হিন্দুদের মধ্যে এই সমস্ত দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া হয় গান, না হয় গাথা বাংলা-ভাষায় রচিত হইয়া সাহিত্যের সৃষ্টি হইল।

মুসলমানেরা কিন্তু ইহা করিলেন না; ইহা তাঁহাদের সংস্কারে বাধিল। তাঁহারা লিখিলেন "ইউসুফ-জোলেখা" অথবা "রসূল-বিজয়" জাতীয় গ্রন্থ। কোরআন-শরীফে বিবৃত সংক্ষিপ্ত গল্পের আধারে ঢালিয়া যে-ভাবে রক্ত-মাংসের সংযোগে "ইউসুফ-জোলেখা" লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে ইহা উঁচুদরের একখানি উপাখ্যান-কাব্যে পরিণত হইয়াছে। যদিও কাব্যখানিতে কবির নৈতিক ভিত্তির আসন টলে নাই, তথাপি রস-সৃষ্টিই কবির মুখ্য লক্ষ্য ছিল। ধর্মের সহিত সংস্রব রাখার ফলেই এই রূপ ঘটা অস্বাভাবিক নহে। আর, নিছক ধর্ম-প্রেরণাই "রসূল-বিজয়" সৃষ্টির কারণ। হজরৎ মুহম্মদের (সা) প্রতি আরোপিত কতকগুলি ধর্ম প্রচারের উপাখ্যান বর্ণনাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। হজরৎ মুহম্মদের (সা) মাহাত্ম্য-কীর্তনই কবির প্রধান লক্ষ্য।

মোটকথা, এই যুগের হিন্দু-মুসলমানের বাংলা-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হইল ধর্ম। মূলতঃ ধর্ম লইয়া ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এই যুগে সাহিত্য সৃষ্টি হইলেও, পৌত্তলিক মানসিকতার বসে অতিরিক্ত দেবভক্তি ফুটাইতে গিয়া, কি কৃত্তিবাস, কি মালাধর বসু, কি বিজয়গুপ্ত কি বিপ্রদাস কেহই যে-ক্ষেত্রে তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্যে পাঠকের জন্য রস পরিবেশন করিতে পারেন নাই, সেই ক্ষেত্রে সংস্কারমুক্ত মুসলমান কবি তাঁহাদের পাঠকের জন্য প্রচুর সাহিত্য-রস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই রসের দিক হইতে বিচার করিলে এই সময়ের বাংলা সাহিত্য যতই দরিদ্র বলিয়া মনে হউক, প্রকৃতপক্ষে "ইউসুফ-জোলেখা" ও "রসূল-বিজয়" লইয়া তাহার দারিদ্র্যের মাত্রা অনেকখানি কমিয়া যায়। বাংলার মুসলমানেরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ না করিলে বাংলা-সাহিত্যের এই দারিদ্র্য সত্বর ঘুচিত না।

www.pathagar.com

এই রস পরিবেশনের কথা ছাড়িয়া দিয়া, ইসলাম ধর্ম, মুসলমান শাসন, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতেও এই সময়ের বাংলা-সাহিত্য যে ইসলামী-প্রভাবে প্রভাবিত, তাহা স্পষ্টরূপে দেখা যায়। বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাসের "মনসা-মঙ্গল"ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই কাব্য-দুইখানি স্থানে স্থানে ইসলাম ধর্ম, মুসলিম শাসন, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি-সংক্রান্ত বহু ফারসী ও আরবী শব্দ ধারণ করিয়া ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান জাতির সহিত এদেশীয় হিন্দু-সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধের প্রমাণ দিতেছে।

অতঃপর খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী বাংলা-সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। এই শতাব্দী নানা কারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তবে, তন্মধ্যে দুইটিই প্রধান ঃ গৌড়ের সুলতান ও বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বাংলা-সাহিত্য-প্রীতি ও সেবার প্রসার এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যের উদ্ভব। এই দুইটি ঘটনাই এই সময়ের বাংলা-সাহিত্যকে প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনাবহুল করিয়া তুলিয়াছে।

সুলতান আলাউ-দ্-দীন হুসৈন শাহ্কে লইয়াই এই শতাব্দী আরম্ভ হইয়াছিল। সুলতানের প্রায় পঁচিশ বৎসর (১৪৯৩-১৫১৯) রাজত্বের মধ্যে শেষের আঠার বৎসর এই শতাব্দীতেই অতিবাহিত হয়। তাঁহার ন্যায় উদারচেতা সুলতানের রাজত্বে চৈতন্যদেবের (১৪৮৫-১৫৩৩) আবির্ভাব ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার না ঘটিলে, এই সময়ের বাংলা-সাহিত্য কোন্ রূপ গ্রহণ করিত তাহা, কে বলিবে? বাংলা-সাহিত্যের প্রতি হুসৈন শাহ্ যে-প্রীতি পোষণ করিতেন, তাহা উত্তরকালে গৌড়ীয় সুলতান ও তাঁহাদের কর্মচারিগণের আদর্শরূপে পরিণত হইয়াছিল। তৎপুত্র নাসিরু-দ্-দীন নসরৎ শাহ্ (১৫১৯-১৫৫২) সর্ববিষয়ে যেরূপ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। বাংলার খ্যাতনামা হিন্দু ও মুসলমান কবিগণও তাঁহার উৎসাহ ও সমাদর লাভ হইতে বঞ্চিত হয়েন নাই। শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি নামক এক পদকর্তা তাঁহার একটি ব্রজবুলি পদে সুলতান নসরৎ শাহের প্রশংসা করিয়াছেন ঃ

"বিদ্যাপতি ভানি
অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ্ নাসির মধুপ ভুলে কমলা বাণী ॥"

এই সময়ে শেখ কবীর নামে আর একজন মুসলমান পদকর্তার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তিনিও সেই সময়ে বাংলার একজন বিশিষ্ট পদকর্তা হিসাবে যে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার এক পদে তিনি সম্ভ্রমসহকারে সুলতান নাসিরু-দ্-দীন নসরৎ শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; যথা ঃ

"সেক কবিরে ভণে,
অহি গুণ পামরে জানে,
সুলতান নাসির সাহা ভুলল কমল-বনে ॥"

www.pathagar.com

সুলতান হুসৈন শাহ্‌ ও তৎপুত্র নসরৎ শাহের বঙ্গ-সাহিত্য-প্রীতি ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সত্য বটে, রাজশক্তির অনুকরণ ও অনুসরণ বড়ই সংক্রামক; তথাপি যাঁহারা রাজশক্তি পরিচালিত করেন, তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও মানসিক প্রবণতা এই সকল ব্যাপারে উপেক্ষার বস্তু নহে। এই হিসাবে এই দুই গৌড়ীয় সুলতানের দান বাংলা-সাহিত্য চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

পিতার দেখাদেখি নসরৎ শাহের পুত্র যুবরাজ ফীরূজ শাহ্‌ও বঙ্গ-সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি মাত্র কয়েক মাস কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রাজত্বের পূর্বে, দ্বিজ শ্রীধর নামক এক কবিকে তিনি "বিদ্যাসুন্দর" নামক এক কাব্য রচনা করিতে উৎসাহ দেন। কবি শ্রীধর তাঁহার কাব্যে স্বীয় পৃষ্ঠপোষক ফীরূজ শাহের নাম এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

নৃপতি নাসির সাহা তনয় সুন্দর।
সর্ব কলা-নলিনীভোগীত মধুকর ॥
রাজা শ্রীপেরোজ সাহা বিনোদ সুজান।
দ্বিজ ছিরিধর কবি রাজা পরমাণ ॥
শ্রীপেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ।
কহিল পঞ্চালী ছন্দে ছিরি কবিরাজ ॥

যৌবরাজ্য হইতেই তিনি যে-ভাবে বাংলা-সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হয়, তিনি দীর্ঘদিন রাজ্যশাসন করিলে বাংলা-সাহিত্য প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধ হইত। তাঁহার পূর্ণ সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হইয়াও, বাংলা-সাহিত্যের সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি খর্ব হইয়া যায় নাই। প্রায় এক শতাব্দীর অধিককাল হইতে ধারাবাহিকভাবে গৌড়ীয় সুলতানগণ ও মুসলিম জনসাধারণের বঙ্গ-সাহিত্য-প্রীতিতে, বিশেষ করিয়া সুলতান হুসৈন্‌ শাহ্‌ ও নসরৎশাহের বিদ্যোৎসাহিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায়, গৌড় বাংলা দেশের সাহিত্য-চর্চারকেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয় এবং বাংলা-সাহিত্যের মূল উৎসে পর্যবসিত হয়। এই উৎস হইতে অত:পর বাংলা-সাহিত্য-চর্চারধারা বাংলার দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

এই ধারার এক অংশ গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলিতে স্থায়ী হয়। এই রামকেলি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এক বিশাল আড্ডায় পরিণত হইয়াছিল। বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিত রূপ ও সনাতন এই রামকেলিরই সৃষ্টি। রামকেলির কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক আলোচনা এদেশের সাহিত্য ও শিল্পে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

এই ধারার আর এক শাখা পশ্চিমবঙ্গের শ্রীখণ্ডে গিয়া পৌছিয়াছিল। এই সময় শ্রীখণ্ড বাংলা-সাহিত্যের একটি উপকেন্দ্রে পরিণত হয়। এইস্থানে এইরূপ বাংলা সাহিত্য-চর্চার ফলে, যশোরাজ খান ও কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতির ন্যায় পদকর্তার আবির্ভাব ঘটে।

নদীয়া প্রাচীনকাল হইতে সাহিত্য-চর্চারকেন্দ্রস্থান ছিল বলিয়া, ইহার কথা এই প্রসঙ্গে ছাড়িয়া দেওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহার অস্তোন্মুখ গৌরব গৌড়ের কৃপায় এই সময়ে নূতন

www.pathagar.com

করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। নদীয়ার এই সাহিত্যিক পুনরুত্থানে গৌড়ের দান অপ্রতুল নহে।

বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত চাটগাঁয়েও গৌড়ের সাহিত্যিক উৎস ধারার এক শাখা গিয়া পৌঁছিল। হুসৈন্ শাহের সেনাপতি পরাগল খান তখন এই অঞ্চলের শাসনকর্তা। প্রভুর অনুসরণে লস্কর পরাগল বাংলা-ভাষায় মহাভারত রচনা করিবার জন্য কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে নিযুক্ত করিলেন। অচিরকাল মধ্যে মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব রচিত হইল। এই পরাগলের পুত্র ছুটি খানও শ্রীকর নন্দীর সাহায্যে অশ্বমেধ-পর্বের বিস্তৃততর অনুবাদ রচনা করাইয়াছিলেন। এইরূপে বাংলা-ভাষায় মহাভারত-চর্চা সর্বপ্রথমে চাটগাঁ হইতেই আরম্ভ হইল।

গৌড়ের মুসলমান সুলতান ও বাংলার মুস্‌লিম জনসাধারণের কাছ হইতে বাংলা-সাহিত্য এই সময়ে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করে, তাহার পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে এই আলোচনা কেবল একদিক মাত্র। ইহার অন্যদিকের চিত্র আরও উজ্জ্বল এবং আরও সুন্দর। এই চিত্র বঙ্গে মুস্‌লিম সংস্কৃতি, সভ্যতা ও রাষ্ট্র শাসন প্রভৃতির পটভূমিকায় সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া চিত্রিত বলিয়া সহজে সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা দিতে চাহে না। তথাপি এই প্রসঙ্গে এই আলোচনার আবশ্যক।

খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া হইতেই তখনকার বাংলা-সাহিত্যে এক ঘোর পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের স্রোতে বাংলার প্রাচীন কাব্য-ধারা একরূপ জীবন্মৃত হইয়া পড়ে এবং বাংলায় এক নূতন সাহিত্য অভিনব মূর্তিতে গড়িয়া উঠিতে থাকে। এই সাহিত্য বাংলার খ্যাতনামা "বৈষ্ণব-সাহিত্য"। বঙ্গে বৈষ্ণব মতের উদ্ভবের ফলে এই নূতন সাহিত্যের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল। যে-সংস্কৃতিগত পটভূমিকায় বাংলায় বৈষ্ণব মতের উদ্ভব সম্ভবপর হয়, তাহার সর্বাঙ্গে ইসলামী প্রভাব ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

এই শতাব্দী মুস্‌লিম শাসনাধীনে বাংলার স্বাধীনতার উন্নতির চরম যুগ। এই সময়ে বাংলায় ইস্‌লাম-বিস্তৃতিও একরূপ স্থায়িত্বপ্রাপ্ত হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্র, শাসন, সমাজ, শিল্প ও সাহিত্য এতই সম্প্রসারিত হয় যে, এই সমুদয়কে আশ্রয় করিয়া পারিপার্শ্বিক হিন্দু-সমাজে ইস্‌লামধর্ম দারুণ প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। বাংলার হিন্দু-সমাজের মেল ও পটিবন্ধনের ইতিহাসে, তাহার শিল্প ও স্থাপত্যে, তাহার আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতিতে তাহার সাহিত্য ও কলায়, বিশেষ করিয়া ধর্ম ও সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শনৈঃ শনৈঃ ইস্‌লামী প্রভাব শারদ-সন্ধ্যার নীলাকাশস্থিত নক্ষত্রমালার ন্যায় একটির পর একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এই অবস্থায় এদেশের হিন্দু মনীষিগণের নিকট তাঁহাদের পৈতৃক ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি ইস্‌লামী ('যাবনিক') প্রভাবে বিপন্ন বলিয়া বিবেচিত হয় বটে, কিন্তু জাতিকে ইস্‌লামের সর্বগ্রাসী হাত হইতে বাঁচাইবার উপায় স্থির করিতে গিয়া তাঁহারা বিব্রত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। যখন হিন্দুধর্মের এইরূপ গ্লানি যুগে যুগে দেখা দেয়, তখন ধর্মকে পুনরায় সংস্থাপিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে বলিয়া গীতায় একটি প্রতিশ্রুতি আছে। বাংলায় হিন্দু-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি নদীয়ার হিন্দু-মনীষিগণ এই সময়ে এই প্রতিশ্রুত ফলটির প্রতীক্ষায় উৎসুকভাবে দিন কাটাইতেছিলেন।

www.pathagar.com

এমন সময়েই নদীয়ায় চৈতন্যদেবের (১৪৮৫-১৫৩৩) আবির্ভাব ঘটে। বাংলার বহু হিন্দু তাঁহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ অনুভব করিলেন। কতিপয় মুসলমানও তাঁহার চিন্তাধারা ও কার্যকলাপে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া তৎপ্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মত গ্রহণ করিলেন। বাংলার হিন্দুদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মুস্‌লিম দরবেশ-জাতীয় হিন্দু-সাধক। তাঁহার দরবেশী বৈশিষ্ট্য মুসলমানকে এবং সাধক বৈশিষ্ট্য হিন্দুকে যে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতে ইসলামের সার্বভৌমিক বহু মত এবং দরবেশদের নানা বিষয়ের স্পষ্ট ছাপ পরিস্ফুট। এইরূপ ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সমন্বয়ে যে বৈষ্ণব-মত উদ্ভূত হইল, তাহাই তখন বাংলাদেশে প্রগতিসম্পন্ন হিন্দুমতরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ঠিক এই সময়ে রক্ষণশীল হিন্দুও বাংলায় নেহাত কম ছিলেন না। তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ রঘুনন্দনকে আঁকড়িয়া ধরিলেন। কিন্তু স্মার্ত রঘুনন্দন শাস্ত্রের বাঁধনে বাঁধিয়া হিন্দু-সমাজকে বাঁচাইতে পারিলেন না। প্রগতিপন্থী বৈষ্ণবদের জয় হইল। এইরূপে চৈতন্য-দেবের দ্বারাই বাংলায় ইস্‌লামের অপ্রতিহত গতি প্রতিরুদ্ধ হইল; তিনিই বাংলার হিন্দুকে মরণের হাত হইতে বাঁচাইলেন। এই বিষয়টি আমি "বঙ্গে ইসলাম বিস্তার" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে এবং "বঙ্গে সূফী-প্রভাব" নামক পুস্তকে কতকটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

বৈষ্ণব-মত বালার প্রাণে যে গভীর ছাপ আঁকিয়া দিল, তখনকার বাংলা-সাহিত্যে তাহার ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রেমধর্মী বৈষ্ণব-"পদাবলী"-সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা চৈতন্যদের হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার অনুচর ও তস্য অনুচরদের জীবনের সম্ভব-অসম্ভব সকল ঘটনা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত যেমন সাধারণ বৈষ্ণবমত হইতে বহু বিষয়ে নূতন মূর্তি গ্রহণ করিয়াছিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই দুই জাতীয় সাহিত্যেও বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে নূতনরূপে দেখা দিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতে যেমন ইসলামী প্রভাব সুস্পষ্ট, তেমনি বাংলার "পদাবলী" সাহিত্যও সূফী "গজলিয়াৎ" (অর্থ-পদাবলী) সাহিত্যের প্রভাবে ভরপুর। বৈষ্ণব মহাজনদের চরিতাখ্যানগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, বাংলার এই জাতীয় সাহিত্যটিও শয়খ্‌ ফরীদু-দ্‌-দীন্‌ অত্তারের (১২৩০ খৃ: মৃ:) "তধ্‌কিরতু-ল্‌-ঔলিয়া" বা "সাধক-চরিতাখ্যান" নামক পুস্তক বা ঐ জাতীয় ফার্‌সী পুস্তকের অনুকরণ বা অনুসরণ মাত্র।

বাংলা-সাহিত্যের যে-সকল ঐতিহাসিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই দুই জাতীয় সাহিত্যে কোন "বৈদেশিক প্রভাব" (প্রকারান্তরে ইসলামী প্রভাব) "আপ্ত-বাক্য" বলিয়া সম্ভব-অসম্ভব অনুমান বলে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দোহাই পাড়েন, হয় তাঁহাদের দৃষ্টি অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নয় উগ্র জাতীয়তাবাদের মিথ্যা অহমিকায় আবৃত। বাংলার বৈষ্ণবদের পদাবলীজাতীয় কবিতা প্রাচীন বাংলা বা সংস্কৃত সাহিত্যে নাই। চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির পদাবলী বৈষ্ণব পদাবলী হইতে ভাবসম্পদে পৃথক এবং অন্তর্নিহিত প্রেরণার দিক দিয়া

www.pathagar.com

স্বতন্ত্র। প্রাচীন বাংলা বা সংস্কৃত সাহিত্যে সাধক-জীবনীরও একান্তই অভাব। প্রাচীন "হর্ষচরিত", অর্বাচীন বলিয়া কুখ্যাত "রামচরিত" অথবা "শংকর-বিজয়" সংস্কৃত সাহিত্যে আছে বটে, কিন্তু তাঁহার আদর্শে বৈষ্ণব-চরিতাখ্যানগুলি লিখিত হইয়াছিল, এমন উক্তি বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে অবৈজ্ঞানিকের ভাঁওতা মাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের এই গ্রন্থগুলির সহিত ভাব বা বক্তব্য কোন বিষয়ে বৈষ্ণব-চরিতাখ্যানগুলির মিল নাই। এইগুলি অন্য ঢঙে লেখা এবং অন্য ছাঁচে ঢালা। যদিও "চৈতন্যভাগবত" পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, ভাগবতোক্ত কৃষ্ণের বাল্যলীলা শ্রীচৈতন্যে আরোপ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে, তথাপি এই গ্রন্থ ভাগবত নহে, সাধকের জীবনী মাত্র। বিশেষত: যে যুগের বৈষ্ণব স্বয়ং সাক্ষ্য দিতেছে ঃ

"মসনবী আবৃত্তি করে থাকে নলবনে।
মহাপাপী জগাই মাধাই দুইজনে ॥
ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে।
মোজা পাত্র নড়ি হাতে কামান ধরিবে ॥
মসনবী আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর।
ডাকা চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর ॥" —জয়ানন্দ

সেই যুগে বৈষ্ণব-সাহিত্যে মুসলমানদের ফারসী-সাহিত্যের প্রভাবের কথা না ভাবিয়া, যিনি শত শত বৎসর পূর্বেকার বিস্মৃত হিন্দুগ্রন্থের প্রভাবের কথা-চিন্তা করেন, তাঁহার দৃষ্টিবিভ্রম বা ভাঁওতা এই দুইয়ের যেটিই হউক, তাহা বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

এই সময়ের রক্ষণশীল হিন্দুদের সাহিত্যও নিতান্ত অল্প নহে। শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রভৃতি কবির "ভারত-পাঁচালিতে", ভাবগবতাচার্য, মাধবাচার্য, কৃষ্ণদাস, কবিশেখর প্রভৃতির "কৃষ্ণায়ন" কাব্যে, মাধবাচার্য, কবিকঙ্কণ প্রভৃতির "চণ্ডীমঙ্গলে," এবং বংশীদাস প্রভৃতির "মনসা-মঙ্গলে" রক্ষণশীল হিন্দু সংস্কৃতি দেশের সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তখনকার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে ইসলামী প্রভাব যেমন নগণ্য ছিল, এই দলের সাহিত্যেও ইসলামী প্রভাব তেমনই কম। তবে, মুস্‌লিম-সংস্কৃতি ও ধর্মের সাধারণ প্রভাব এই সাহিত্যেও দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও ইস্‌লামধর্মকে আশ্রয় করি। অলক্ষিতে কিছু-কিছু প্রবেশ করিয়াছে। এই সাহিত্যে যে-সকল ফারসী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে একটু নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করিলেই, এই উক্তির সারবত্তা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বাংলার মুসলমানেরাও এই সময়ে নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। কবি দৌলৎ উজীর বহরাম খান (১৫৪৫-১৫৭৬) "লায়লী-মজনু" রচনা করিয়া বাংলা-সাহিত্যের জন্য ফারসী-সাহিত্যের দ্বার পূর্বযুগ হইতে আরও একটু উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। নিছক কাব্যরস, লিপিচাতুর্য, ভব্যতা ও শালীনতায় "লায়লী-মজনু"র সমকক্ষ কাব্য খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা-সাহিত্যে একটিও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের

www.pathagar.com

"চণ্ডী-মঙ্গল"কেই সাধারণতঃ এই যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া ধরা হয়। উপর্যুক্ত গুণের দিক হইতে বিচার করিতে বসিলে, "চণ্ডীর" সহিত "লায়লী-মজনুর" তুলনাই চলে না।

১৫৮৮ হইতে ১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে[১] পাঁচ বৎসর ধরিয়া কবি মুহম্মদ কবীর "মনোহর-মধুমালতী" নামক এক কাব্য হিন্দী হইতে বাংলায় অনুবাদ (সম্ভবত ঃ ভাবানুবাদ বা গল্পাংশের অনুবাদ) করিয়া বালা-সাহিত্যের সহিত সর্বপ্রথমে ভারতীয় হিন্দী-সাহিত্যের যোগ সাধন করিলেন। সম্পূর্ণ উপাখ্যানমূলক এই কাব্যখানি কবিত্বপূর্ণত বটেই, এতদ্ব্যতীত হিন্দী-সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

সাবিরিদ খান নামক আর এক পণ্ডিত কবি তাঁহার "রসূল-বিজয়ে", সৈয়দ সুলতান (১৫৮০) নামক সাধক-কবি তাঁহার "নবী-বংশ", "শবে মেরাজ" ও "ওফাৎ-রসূলে" পূর্বযুগের 'রসূলায়ন'-কাব্যধারা যে শুধু বজায় রাখিলেন তাহা নহে, "ইহাকে এই শ্রেণীর কাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনে উন্নীত করিলেন। এই সাবিরিদ খানের, 'হানিফা ও কয়রা পরী' এবং বররুচির বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মূলসংস্কৃতসহ বাংলা অনুবাদ বাংলা-ভাষায় উপকথা ও অনুবাদ সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। সংস্কৃতমূলক ভাষার পাণ্ডিত্যে সাবিরিদ খানের সমকক্ষ কবি পরবর্তী যুগের আলাওল ও ভারতচন্দ্র ব্যতীত প্রাচীন বাংলায় আর একজনও জন্মেন নাই।

এই সময়ে মুহম্মদ অকীল "মুসানামা" এবং কমর আলী "সরসালের নীতি" (১৫৭৯) রচনা করিয়া শাস্ত্রীয় ইসলামের সহিত বাংলা সাহিত্যের যোগ আরও একটু ঘনিষ্ঠ, আরও একটু নিবিড় করিয়া দিলেন। সাহিত্যে যদি ধর্মের স্থান থাকে, তবে ইঁহাদের সাহিত্যসাধনাও ব্যর্থ হয় নাই।

শেখ ফয়জুল্লা বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার "গোরক্ষ-বিজয়" রচনার জন্য প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত তিনি "গাজী-বিজয়" ও "সত্যপীর" নামে আরও দুইখানি পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন। "গাজী-বিজয়" উত্তর বঙ্গের কাঁটাদুয়ারের পীর ইস্‌মাঈল গাজীর কথা লিখিত হইয়াছিল। খুব সম্ভব তিনি উত্তর বঙ্গের লোক। তিনি ১৪৬৭ শাকে অর্থাৎ ১৫৪৬

---

১. মনোহর মালতীর অকুল পিরিত।
গাহিব সকল লোক মন হরষিত ॥
এহি সে সোন্দর কেচ্ছা হিন্দিতে আছিল।
দেশী ভাসাএ মুঞি পঞ্চালী ভণিল ॥
অন্ত অন্তে অন্ত রএ সিন্ধু তার পাছ।
পঞ্চালী ভণিতে গেল হিজরার পাঁচ ॥
পণ্ডিত জনার ঘিন্না মুরুক্কের গোহারি।
শিরে ধরি কাব্য কথা দিলুং সঞ্চারি ॥
মোহাম্মদ কবিদের কহে ভাবিয়া আকুল।
কি জানি ডুবিব সেসে এইকুল অইকুল ॥

(সন ১১০১ মঘীর বৈশাখ মাসে মোঃ আব্দুল আলী সাং পরাগলপুর, অনুলিখিত পুঁথির পাণ্ডুলিপি হইতে)

www.pathagar.com

খ্রীস্টাব্দে "সত্যপীর" রচনা করেন[২]। তাঁহার পুস্তক লৌকিক প্রবাদ ও বিশ্বাসের সহিত এদেশের মুসলমান ও হিন্দুর ঘনিষ্ঠ যোগ রচনা করিয়াছিলেন।

বাংলা-সাহিত্যের এই যুগ প্রধানতঃ গীতিকাব্য রচনার যুগ। বৈষ্ণব কবিদের "পদাবলী" সাহিত্যই তাহার প্রমাণ। বাংলার মুসলমান এই যুগ-ধর্মকে অস্বীকার করেন নাই। সম্ভবতঃ শেখ কবীরই (১৫১৯-১৫৩২) মুসলিম পদাবলী সাহিত্যের প্রাচীনতম কবি। তাঁহার বহু পদ আবিষ্কৃত না হইলেও, যে কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার আভাস পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বহু মুসলমান পদকর্তা বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ শ'-খানিক পদকর্তার সন্ধান আমরা লাভ করিয়াছি; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কে কোন্ শতাব্দীর লোক, তাহা আজ পর্যন্ত নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই শ'-খানিক পদকর্তা হইতে প্রায় দশ-বারজন কবি ষোড়শ শতাব্দীর হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। ইঁহাদের কয়েকজন পদকর্তার পদ প্রাচীন বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহ পুস্তকেও স্থান পাইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন, এই মুসলমান পদকর্তৃগণ বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন। এই উক্তি নিতান্তই ভ্রমাত্মক ধারণার ফল। কেননা ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্রীয় ইসলাম সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি রচনা করিয়া প্রমাণ করিতেছেন যে, তাঁহারা চিন্তায় মুস্‌লমানই ছিলেন,- বৈষ্ণব নহে। বাংলার বৈষ্ণবদের হাতে স্বূফীদের প্রেমময় ভগবান প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণে জমাট বাঁধিয়াছিলেন; রাধিকা ছিলেন, ভগবানের প্রতি মানব-প্রেমের প্রতীক,- যেমন "সাকী" ছিল স্বূফীদের প্রেমের প্রতীক। মুসলিম-সাহিত্যের সহিত বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই মূলগত ভাব-সামঞ্জস্য থাকায়, বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ নামের পার্থক্যকে বড় করিয়া না দেখিয়া ভাবের সামঞ্জস্যকে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। প্রধানতঃ এই কারণে বাংলা সাহিত্যের এক নূতন প্রকাশ-ভঙ্গীরূপে যুগধর্ম হিসাবে বৈষ্ণবীয় ভঙ্গীতে পদাবলী রচনা করিতে মুসলমানদের সংস্কারে বাঁধে নাই।

পদাবলী রচকরূপে কবি সৈয়দ সুলতান সাধারণ পদাবলী-রচক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁহার বহু গীতিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গীতিকাগুলি বাউলজাতীয় সংগীত। ভাবের প্রাধান্যে ও মর্মবাদিতার স্পষ্ট ছোঁয়াছে এই সংগীতগুলি প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ।

---

২. "গোখবিজএ আদ্যেমুনি সিদ্ধা কত।
কহিলাম সভ কথা সুনিলাম যত ॥
ঝোঁটাদূরের পীর ইছমাইল গাজী।
গাজীর বিজএ সেহ মোক হৈল রাজি ॥
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব্ব কথন।
মুনি রস বেদ শশী শাকে কহি সন ॥
ধন বাড়ে মুনিলে পাতক খণ্ডন।
শেখ ফয়জুল্লা ভণে ভাবি দেখ মন ॥"

(পূর্ব পুঁথির সহিত সংশ্লিষ্ট পুঁথিতে লিখিত)

www.pathagar.com

এই স্থলে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেই সর্বপ্রথম হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাবসমন্বয় ঘটে। এই সময়ে ভারতের সর্বত্রই এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই কারণেই কবীর, নানক, দাদু ও চৈতন্যের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল। এতদিন হিন্দু-মুসলমান শাসন, সমাজ ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে পরস্পর সম্মুখীন হইতেছিল। এখন তাহার মিলন ঘটিল। বাংলাদেশেও যে তাহাই হইয়াছিল, বাংলা-সাহিত্যই তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন। বৈষ্ণবদের "পদাবলী"-সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া একদল মুসলমান বাংলার প্রগতিপন্থী হিন্দুদের সহিত ভাব-বিনিময়ের পূর্ণতাসাধন করিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের সহিতও বাংলার মুসলমানদের ভাবসমন্বয় ঘটিল। বাংলার কোন-কোন মুসলমান হিন্দুর প্রাচীন যোগ-শাস্ত্রের "ঘট্‌চক্র' "প্রাণায়াম", "ধ্যান-ধারণা" ও "আসন" প্রভৃতি ব্যবহারিক প্রক্রিয়ায় স্থূফীদের "লতীফা", "হাস্‌ব-ই-দস্‌", "জিক্‌র" ও "মুরাকিবা" প্রভৃতি ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার মিল খুঁজিয়া পাইলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে, মুসলমানদের মধ্যে "যোগ-কালন্দর" নামক একপ্রকারের স্থূফী-সাধনভাবাপন্ন যৌগিক সাহিত্যের উদ্ভব হইল। হাজী মুহম্মদের "নূর-জমাল", শেখ চাঁদের "শাহদৌলা", এবং সৈয়দ সুলতানের "জ্ঞান-চৌতিশাই" এই জাতীয় মুসলিম সাহিত্য। শেখ চাঁদের "রসূল-বিজয়"ও একখানি সুন্দর কাব্য। বাঙালী মুসলমানদের এই "যোগ-কালন্দর" সাহিত্য বাংলার সংস্কৃতির এক নূতন দিক উদঘাটিত করিয়া দিতেছে।

খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আসিয়া হিন্দু-সমাজের বাংলা-সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি বড় দেখা যায় না। হিন্দুর সৃজনীশক্তি যেন এই শতাব্দী হইতেই ফুরাইয়া গেল। এই সময়ে "ভারত-পাঁচালি"র লেখক কাশীরাম দাস (১৬০৫) ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ খ্যাতনামা কবির উল্লেখ করা যায় না। এই কাশীরামের "মহাভারত" খানিও হিন্দুর ধর্ম-জীবনের জন্য যতটুকু সমাদর লাভ করিয়াছে, কাব্য হিসাবে রস-সৃষ্টির দিক হইতে বিচার করিলে, ইহাকে তাহার সিকি মূল্যও দেওয়া যায় না, তবে, বাংলা-সাহিত্য এই সময়ে শাখা-পল্লবে বহুবিস্তৃত হয়। —বহু বৈষ্ণব সাধুর জীবন-চরিত লিখিত হয়; বৈষ্ণব গ্রন্থাদির অনুবাদও নিতান্ত কম হয় নাই; পদাবলীর রচনা এবং প্রসারও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। বৈষ্ণব আওতার বাহিরের হিন্দুদের মধ্যে কৃষ্ণায়ন, রামায়ণ, ভারত-পাঁচালি, মনসা-মঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতির বহুল প্রচার ও লেখা চলিতে লাগিল; শিব, কালী, দুর্গা বা চণ্ডী প্রভৃতি বহু দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পুঁথিও রচিত এবং পঠিত হইতে শুরু করিল। কিন্তু এই সমস্ত পুস্তকের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ উঁচুদরের নহে।

এই যুগে উল্লেখযোগ্য বাংলা-সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন, বাংলার মুসলমানগণ। দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন ও আলাওল প্রভৃতি মুসলমান কবি আরাকান-রাজসভার আশ্রয়ে এই সময়ে যে-সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন, তাহা বাংলা-সাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। দৌলত কাজীর "সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী" এবং আলাওলের "পদ্মাবতী" হিন্দী হইতে অনুদিত বাংলা-কাব্য হইলেও, কাব্য দুইখানির সমকক্ষ পুঁথি প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে বিরল। ইঁহারা দুইজনেই বাংলার বাহিরে বসিয়া বাংলা-সাহিত্যের সেবায়

www.pathagar.com

মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহারা বাঙালীকে হিন্দী-সাহিত্যের রস পরিবেশনে মাতোয়ারা করিয়াও তুলিয়াছিলেন। আলাওলের অপর গ্রন্থগুলি ফারসী সাহিত্যেরই অনুবাদ। তথাপি তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অপরিমেয় রসবোধ তাঁহার বাংলা-কাব্যগুলিকে এমন করিয়া তুলিয়াছে যে, সুললিত ও সুমধুর ফারসী সাহিত্যের ভাব-সম্পৎ ও ঝঙ্কার যেন বাঙালীর আপন সম্পদরূপে তাহার হাতে আসিয়া নূতন করিয়া ধরা দিয়াছে। কোরেশী মাগন ঠাকুরের "চন্দ্রাবতী" সম্পূর্ণই উপকথাজাতীয় সাহিত্য। দেশের রূপকথাকে কাব্যের আসরে উন্নীত করিবার জন্য বোধহয় এই-ই প্রথম প্রয়াস। এই প্রয়াস মাগনের প্রতিভায় ব্যর্থ হয় নাই। সৈয়দ মুহম্মদ আকবরের "জেবুল্-মুলক্-শামারোখ" (১৬৭৩) নামক কাব্যখানিও একটি সুন্দর উপাখ্যানমূলক গ্রন্থ। সৈয়দ মুহম্মদ আকবর এই যুগের মামুলী পর্যায়ভুক্ত কবিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কবিত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন।

এই সময়ে বাংলায় মুঘল শাসন চলিতেছিল। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে শাহ্‌জাহান ও ঔরঙ্গজীব ব্যতীত প্রায় অপর সকলই শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান ছিলেন। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ মুঘল পর্যন্ত বেশির ভাগ মুঘল-মুসলমান শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বাংলার মুঘল-শাসনকর্তাদের মধ্যও অধিকাংশই ছিলেন শিয়া। এই কারণে আজও মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া এই জেলার বহু মুসলমান শিয়া। শিয়া-মতাবলম্বী মুঘল রাজপুরুষ ও জনসাধারণের আমদানীতে বাংলার সুন্নী-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের মধ্যেও সপ্তদশ শতাব্দীতে শিয়া-প্রভাব বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। "মহরম"ই শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ পর্ব। মহরমের হৃদয়-বিদারক কারবালার ঘটনা কাহারও অবিদিত নাই। এই সময়ে বাংলায় মহাসমারোহে "মহরম" পর্বের অনুষ্ঠান হইতে থাকে এবং সুন্নীদের মধ্যেও নূতন করিয়া কারবালার কাহিনী আলোচিত হইতে আরম্ভ করে। এই সময়ের বাংলা-সাহিত্যে মুসলমান সমাজের এই অনুষ্ঠানের ছাপ পড়িল। বাংলার কারবালার হৃদয়বিদারক কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া মুসলমানদের মধ্যে এক নূতন সাহিত্যের উদ্ভব ঘটিল; এই সাহিত্যকে "মহরমী-সাহিত্য বা "মর্‌সিয়া-সাহিত্য" বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়। ইংরেজীর Elegy নামক গাথাগুলি যে করুণ-রসের উৎসধারা হইতে উৎসারিত, ফারসী "মর্‌সিয়া" বা শোকগীতিকাগুলিও সেই একই উৎস হইতে ক্ষরিত হইয়াছে। আর বাংলার "জারী"-গান এবং "মহরমী-সাহিত্য"ও সেই একই উৎস হইতে প্রবাহিত হইতেছে। "মরসিয়া" বা "শোক-সাহিত্য" বাংলা-সাহিত্যে এই প্রথম। মুসলমান কবিদের পূর্বে কেহই বাংলা-সাহিত্যে জাতীয় শোকগীতি রচনা করিয়া কাব্য লেখেন নাই। কেহ কেহ বৈষ্ণবদের "মাথুর" শ্রেণীর পদকে বাংলার প্রাচীনতম শোক-সংগীত বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। এই মত প্রকাশের পূর্বে মনে রাখিতে হইবে, "মাথুর" শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরাগমনে বৃন্দাবনবাসীর বিরহ-সংগীত, আর "মরসিয়া" স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মপ্রেমে উদ্বুদ্ধ শহীদের জন্য জাতীয় শোকগাথা।

এই "মহরমী" বা "মর্‌সিয়া" সাহিত্যে সর্বপ্রথমে নাম করিতে হয় মুহম্মদ খানের "মকতুল হুসেন" বা "হুসেনবধ" কাব্যের। এই কাব্যখানি ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়।

www.pathagar.com

শুধু এই শ্রেণীর কাব্যে নহে, এই যুগের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে এই কাব্যখানি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। কবি আবদুল আলিমের "হানিফার লড়াই", নসরুল্লা খানের 'জঙ্গনামা" (১৬০৭ এর কাছাকাছি) এবং মুহম্মদ এয়াকুবের "জঙ্গনামা" (১৬৯৪) বাংলার "মর্‌সিয়া-সাহিত্যে"র নিদর্শন। বিষয়বস্তুর কারুণ্যে, বর্ণনার চাতুর্যে এবং ভাষার মাধুর্যে ও অবিকৃতিতে এই "মহরমী কাব্য" গুলির মধ্যে মুহম্মদ খানের "মকতুল-হুসেন" একান্তই অতুলনীয় এবং জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের উপভোগ্য।

এই সময়ের আর একজন অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি আবদুল নবী। তাঁহার "আমীর-হাম্‌জা" কাব্য ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। ইহা ফারসী "দাস্তান-ই-আমীর হামজা" নামক কাব্যের গল্প লইয়া রচিত। ইহাকে অনায়াসে কাশীরাম দাসের মহাভারতের সহিত তুলনা করা যায়। কবি হিসাবেও আবদুল নবী কাশীরাম দাস হইতে নিকৃষ্ট ত নহেনই, বরং কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।

গীতিকবিতার ক্ষেত্রেও এই শতাব্দীতে মুসলমান কবির দান নিতান্তই নগণ্য নহে। তাঁহারা পদাবলী, বাউল বা বৈরাগ্য সংগীত, ইসলামী সংগীত ইত্যাদি বহু গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে মুসলমান গীতিকবিদের মধ্যে "ব্রজবুলি"-ভাষারও বহুল প্রচলন হয়। সম্ভবতঃ সৈয়দ মর্‌তুজাই (১৫৯০-১৬৭০ ?) এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুস্‌লিম পদকর্তা। পদকর্তা হিসাবে মহাকবি আলাওলের স্থানও খুব উচ্চে।

এই শতাব্দীর পূর্ব-শতাব্দীতেই পীর-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক সাহিত্যের উদ্ভব হয়। বোধ হয় শেখ ফয়জুল্লাই এই বিষয়ের পথ-প্রদর্শক। এই শতাব্দীতে "সত্যপীর" বেশ লোক-প্রিয় হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে এই পীরের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য বহু হিন্দু-মুসলমান কবি "সত্যপীর" নামক কাব্য রচনা করিতে থাকেন। এই সময়ে "সত্যপীর" ব্যতীত আরও বহু পীর তাঁহাদের ভক্তদের কাছ হইতে প্রশস্তি লাভ করেন। প্রধানত পীরভক্তি বৃদ্ধির ফলে, এই সময়ের প্রায় কবিই তাঁহাদের কাব্যের প্রারম্ভে কোন-না-কোন পীর-প্রশস্তি সংযোজিত করিয়াছেন।

শাস্ত্রীয় ইসলামের বিধান-সম্বলিত গ্রন্থরচনার বাহুল্যও এই শতাব্দীর মুস্‌লিম সাহিত্য-সাধনার আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই সকল গ্রন্থ বাংলার লোককে ইসলামের ধম-বিশ্বাস ও বিধানের সহিত যে বহু পরিচিত করিয়া দিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আলাওলের "তোহফা", শেরবাজের "ফক্কর-নামা", মুহম্মদ খানের "কেয়ামৎ-নামা" (১৬৪৬), শেখ সাদীর (বাঙালী) "গদামল্লিকার পুঁথি", শেরবাজের গুরু শাহ্ বদীউ-দ্-দীনের "সিফৎ-ই-ঈমান", "ফাতিমার সুরৎ-নামা" ও "নমাজের কিতাব", মুহম্মদ আশরফের "কিফায়িতু-ল্-মুস্‌লিমীন্" ও "মহরমের মাহাত্ম্য", মুহম্মদ ফসীহ-এর "ত্রিশ হরফের মুনাজাৎ" (১৬৯৫) প্রভৃতি এই সমেয়র উপাদেয় মুসলিম শাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

পূর্ব শতাব্দীর "যোগ-কালন্দর"-জাতীয় সাহিত্য এই শতাব্দীতে আসিয়া আরও বাড়িয়া যায়। খ্যাতনামা পদকর্তা সৈয়দ মরতুজার (১৫৯০-১৬৭০?) "যোগ-কালন্দর", মুহম্মদ শফীর "নূর-কন্দিল" ও "নূর-নামা" এবং শেখ পরাণের "নূর-নামা" এই সময়ের হিন্দু-

www.pathagar.com

মুসলমানের মধ্যে ভাব-সমন্বয় জ্ঞাপক শ্রেষ্ঠ পুঁথি। এই গ্রন্থগুলির বিশেষ কোন সাহিত্যিক মূল্য নাই বটে, কিন্তু বাংলার সংস্কৃতি-ধারা বুঝিবার পক্ষে ইহাদের চেয়ে মূল্যবান গ্রন্থ আর লিখিত হয় নাই।

খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের অবনতির যুগ। তবে এই অবনতি এই শতাব্দীর শেষ ভাগেই বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই সময়ে নূতন সৃষ্টি কিছু হয় নাই বটে, কিন্তু বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীন ধারার বহুল প্রচার ও প্রসার হয়। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০) এবং রামপ্রসাদ সেনই (১৭২৩-১৭৭৫) এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি।

বাংলা-সাহিত্যের এই সাধারণ অবনতির হাত হইতে বাংলার মুস্‌লিম সাহিত্যও অব্যাহতি পায় নাই সত্য, তাই বলিয়া পলাশী-যুদ্ধের (১৭৫৭) পরবর্তী আরও প্রায় পনের-বিশ বৎসর পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে যেই সকল বাংলা-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষার বস্তু নহে। ইহার কোন কোন কবির কাব্য সাহিত্য-হিসাবে ভারত-চন্দ্রের কাব্য, অথবা গান হিসাবে রামপ্রসাদের গান হইতে নিকৃষ্ট নহে, সে কথা জোর করিয়া বলা যায়। এই সময়কার মুসলমান কবিদের দ্বারা রচিত বাংলা-সাহিত্যের কোন অংশ না দেখিয়া, অথবা বটতলা হইতে প্রকাশিত কয়েকখানি তথাকথিত "মুসলমানী পুঁথি" দেখিয়া যাঁহারা বিজ্ঞের ন্যায় গম্ভীরভাবে মত প্রকাশ করেন যে, "মুসলমান কবিরা ধর্মমূলক বা আরবী-ফারসী-হিন্দী উপাখ্যানমূলক অনেক কাব্য রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সাহিত্য হিসাবে সেগুলি একান্ত মূল্যহীন," তাহারা বাংলার মুস্‌লিম্ সাহিত্য সম্বন্ধে হয় একান্তই অজ্ঞ, নয় একেবারে উদাসীন, নয় সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে নিতান্তই অক্ষম। এই কারণে তাঁহারা সত্যই ক্ষমার পাত্র।

এই সময়ের মুস্‌লিম্ বাংলা-সাহিত্যের শুধু কাব্য-শাখাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাই উপর্যুক্ত মন্তব্যের কোন কাণা-কড়ির মূল্যও নাই। এই সময়ে বাংলার মুসলমান যে-সকল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মুহম্মদ রাজার (১৬৯১-১৭৬৭) "তমিম-গোলাল" এবং "মিসরী-জমাল"; মুহম্মদ চুহরের "আজর শাহ সমন-রোখ"; মুহম্মদ নকীর "তূতী-নামা"; সৈয়দ নসীরের "বেনজীর বদ্‌র-ই-মুনীর"; মুহম্মদ জীবনের "বাহরাম গোর" (১৭৬০); সলীমুদ্‌দীনের "তূতী-ময়না"; করীমুল্লার "যামিনীভান"; মুকীমের "গুল্-ই-বকাওলী"; "ফরদু-লু-মুক্‌তদী" (১৭৯১), "কালাকাম" এবং "মৃগবতী"; মুহম্মদ রফউ-দ্-দীনের "জেবল-মূলক-শামারোখ"; হায়াৎ মাহমুদের "জঙ্গনামা" (১৭২৩) এবং "আম্বিয়-বাণী" "(১৭৫৭)"; সৈয়দ হামজার "আমীর-হামজা" (১৭৯৩), "হাতিম-তাই" (১৮০৩), "জৈগুনের পুঁথি" (১৮৯৭) এবং "মনোহর-মধুমালতী" (১৮০৬); গরীবুল্লার "আমীর-হামজা" (১৭৯৪) এবং "মধুমালতী" প্রভৃতি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই কাব্যগুলির প্রায় সব কয়টিই হয় ঐ নামের খ্যাতনামা ফারসী বা উর্দু কাব্য নতুবা ঐ নামের শ্রেষ্ঠ হিন্দী কাব্যের গল্পাংশ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাংলা কাব্যগুলি বাংলা-ভাষার বৈশিষ্ট্যবর্জিত ত নহেই, বরং

www.pathagar.com

রস ও সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা ও ক্ষমতায় এই সময়ের যে-কোন বাংলা মৌলিক কাব্যের তুলনায় নিকৃষ্ট নহে বরং উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ "যামিনীভান" "কালাকাম" ও "মৃগবর্তী" মৌলিক কাব্য। মুসলমানদের এই সকল কাব্যে যাঁহারা রসের সন্ধান না পাইয়া "কাব্যহিসাবে এইগুলি একান্ত মূল্যহীন" বলিয়া নির্বিচারে রায় দেন তাঁহারা সত্যই বেরসিক।

এই শতাব্দীর গীতিসাহিত্যে বহু মুসলমান কবি পদাবলী, ইসলামী সংগীত, বৈরাগ্য ও বাউল সংগীত, মারফতী ও মুর্সিদা সংগীত ইত্যাদি দান করিয়া বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। এই সমস্ত সংগীত রচনা-গৌরব ও ভাব-সম্পদে এতই পুষ্ট যে, সাহিত্যের যে-কোন সমালোচক ইহাদের সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে বাধ্য। প্রধানত এই কারণেই কোন সমালোচক স্বীকার করিয়াছেন যে "এই শতাব্দীতে দুই একটি উৎকৃষ্ট মুসলমান পদকর্তা পাইতেছি।"

মুসলমান কবি কর্তৃক কাব্যে ইতিহাস রচনাই এই শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানদের একটি বিশিষ্ট দান। সাধক-জীবনের আখ্যায়িকা ব্যতীত বাংলা-সাহিত্যে ইতঃপূর্বে আর ইতিহাস রচিত হয় নাই। বাংলার এই ঐতিহাসিক মুস্‌লিম কবিদের মধ্যে "তওয়ারীখ্-ই-উস্‌মানী" (১৭১৮) প্রণেতা উজীর আলী "সিফৎ নামা" প্রণেতা নূরুল্লা, "সিফৎ নামা" (১৭৯৭) প্রণেতা আজমতুল্লাহ "শমশের গাজী" প্রণেতা শয়খ মুনব্বর "ইসাপুরের ইতিহাস" প্রণেতা এতীম কাসিম, "কুকীকাটার পুঁথি" প্রণেতা গোলবখ্‌শ প্রভৃতির নাম করা যায়।

বাংলা-ভাষায় সংগীত শাস্ত্রের রচনাও অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমানদের পূর্বে আর কেহ করেন নাই। রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি ও তালমানের বিবরণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট গীত চয়ন প্রভৃতি বিষয়ে সর্বপ্রথমে দানিশ কাজী ও ফাজিল নাসিরের "রাগমালা"-র (১৭৩২) নাম করিতে হয়। সম্ভবতঃ তাঁহাদের পরেই চম্পা গাজী ও মুহম্মদ পরাণ "রাগমালা" রচনা করিয়াছিলেন। আলী রাজার (১৭২০-১৮০০) "ধ্যানমালা"-ও নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

এই সময়ে কয়েকজন মুসলমান কবি জ্যোতিষ সম্বন্ধেও পুঁথি লেখেন। এই পুঁথিগুলি কুসংস্কারপূর্ণ লৌকিক বিশ্বাসের অভিব্যক্তিরূপে বাংলা-সাহিত্যে উল্লেযোগ্য। হুসৈন ফকীরের "রাশি-গণনার পুঁথি", মুজাম্মিলের "সায়াৎ-নামা" (১৭৫৮) ও "খঞ্জন-বচন" এবং আবদুল গনীর "ফালনামা" এই সময়েই রচিত হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁথিতে শুভাশুভ নির্ণয়, রাশিচক্র ও তাহার ফলাফাল, মৃত্যুর লক্ষণ, প্রাকৃতিক ঘটনার সংঘটনে উন্নতি অবনতির ইঙ্গিত প্রভৃতি বহু জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখা যায়।

"যোগ-কালন্দর"-জাতীয় সাহিত্যের পূর্ণ পরিণতি ঘটে এই শতাব্দীর মুসলমান কবিদের হাতে। নয়ানচাঁদ ফকীরের "বালকা-নামা", বালক ফকীরের "বুরহানু-লু-আরিফীন" মুহম্মদ নসিক্যার "দরবেশী পুঁথি" এবং আলী রাজার "সিরাজ-কুলুপ" "জ্ঞান-সাগর" ও "আগম", প্রভৃতির পর আর এই জাতীয় সাহিত্য বাংলায় রচিত হয় নাই। এই

www.pathagar.com

পুঁথিগুলির রচনায় সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত না হউক, অন্ততঃ বাংলার সংস্কৃতিতে খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমানদের দান কতটুকু তাহার একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়।

অসংখ্য পীর-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক সাহিত্যও এই শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান কবি এই জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টিতে বেশ বড় অংশগ্রহণ করেন। তবে, বাংলার মুসলমানের চেয়ে হিন্দুরাই এই জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টিতে অধিক অংশগ্রহণ করেন বলিয়া মনে হয়। "সত্যনারায়ণ" বা "সত্যপীর" জাতীয় পুঁথির বাহুল্যই তাহার প্রমাণ। "বড়খাঁ গাজী" "কালুগাজী". "ত্রৈলক্ষ্য-পীর", "মোচড়া-পীর" প্রভৃতিও এই শতাব্দীতে বাংলা-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়।

বলা বাহুল্য, এই শতাব্দীর ঠিক মাঝখানেই (১৭৫৭) পলাশীর ক্ষেত্রে বাঙালী জাতির, বিশেষ করিয়া বাংলার মুসলমানদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। এই সময়ে রাষ্ট্র হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্য অবধি সমাজের সর্বস্তরে যে অবসাদ ও গ্লানির ছায়া পড়িয়া যায়, তাহা এই শতাব্দীর সাহিত্যেও সুপরিস্ফুট। এই শতাব্দীর হিন্দু ও মুসলমান কাহারও সাহিত্য এই জাতীয় অবসাদের হাত হইতে মুক্তি পায় নাই বটে, তথাপি মেরুদণ্ড-ভাঙা বাঙলার মুসলমান সমাজ এই সময়ে বাংলা-সাহিত্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য যাহা করিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করা জাতীয় প্রবঞ্চনা মাত্র।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং ধীর ও সুস্থ মস্তিষ্কে বিচার করিয়া দেখা উচিত। এই সময়ের মুসলিম সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেকখানি পৃথক হইয়া গিয়াছে। খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র মুসলিমবঙ্গে সাহিত্যের ভাষা এক ছিল। এই ভাষা হিন্দুবঙ্গের ভাষা হইতে কোন অংশে তফাৎ ছিল না। ইহাকে অনায়াসে "সাধু-ভাষা" বা "অবিকৃত বাংলা-ভাষা" বলিয়া উল্লেখ করা যায়। এই ভাষা তৎসম, তদ্ভব ও খাঁটি দেশী শব্দের সংমিশ্রণে লিখিত হইত। অল্প-স্বল্প বিদেশী শব্দও (প্রধানতঃ ফারসী ও তৎসূত্রে আরবী) ভাষার প্রকৃতির সহিত তাল রাখিয়া ধীরে ধীরে বাংলার সহিত মিশিয়া যাইতেছিল। এই বিদেশী শব্দগুলি ছিল নূতন ভাব, বস্তু ও বিষেয়ের প্রকাশের পক্ষে আবশ্যক শব্দ। ইহারা বাংলা-ভাষার বন্ধু ও সহায়রূপে ভাষায় স্থানলাভ করিয়া এই ভাষার সহিত মিশিয়া ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছিল। প্রধানতঃ এই কারণেই বাংলার হিন্দু ও মুসলমান কবি আবশ্যকমত এইসমস্ত শব্দ সাহিত্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই জন্যই, এই শব্দগুলির আমদানীতে বাংলা-ভাষার সচল ও স্বচ্ছন্দ গতি এবং স্বাভাবিক স্ফূরণ-প্রকৃতি ব্যাহত না হইয়া, ধীরে ধীরে সবল, সচল ও পুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। বাংলা-ভাষার এই ব্যবস্থা খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে আসিয়া, হঠাৎ মুসলমানদের হাতে পরিবর্তিত হইয়া যায়। সম্ভবতঃ কবি মুহম্মদ এয়াকুবই তাঁহার "জঙ্গনামা" (১৬৯৪) রচনা করিয়া বাংলা-ভাষায় সর্বপ্রথম এই পরিবর্তন আনয়ন করিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোক।

দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া হইতেই পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা হিন্দী ও উর্দুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত এক প্রকারের বাংলা-ভাষা সাহিত্যে চালু করিয়াছেন। "মুসলমানী বাংলা"

www.pathagar.com

নামে পরিচিত এবং বটতলা হইতে প্রকাশিত বাংলা-পুঁথির ভাষায় এই নূতন বাংলা-ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মিলে। পশ্চিম-বঙ্গের এই মিশ্রিত বাংলাকে "হিন্দুস্থানী বাংলা" বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। ইহার একটু নমুনা এইরূপ ঃ

'মদমী জাহের যার আছে জাহানেতে।
তাঞ্জার নাগাত কেচ্ছা আছে কেতাবেতে ॥
আল্লার মকবুল শাহা গরীবুল্লা নাম।
বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম ॥
আছিল রওশন দেল শায়েরী জবান।
যাহারে মদদ গাজী শাহা বড়ে খান ॥
শায়েরী করিলেন পুঁথি আমীর হামজার।
না ছিল কেতাব রুজু তামাম কেচ্ছার ॥
যতদূর আছে তার কবিতার হার।
দেখিয়া শুনিয়া লোক হয় জার জার ॥
কেচ্ছার পহেলা আধা শুনিয়া আলম।
আখেরি কেচ্ছার তরে করে বড়া গম ॥"
(হামজার "আমীর-হামজা")

পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানেরা তখন, কি এখন, কোন সময়েই ঘরে কি বাহিরে এমন বাংলা-ভাষার ব্যবহার করিতেন বা করেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। তথাপি তাঁহারা সাহিত্যে এই ভাষা চালাইয়াছেন। ইহার কারণ কি?

পশ্চিম-বঙ্গীয় কবিদের পক্ষে সাহিত্যে এই ভাষার প্রয়োগ একটি linguistic via media বা "ভাষাগত মধ্যপথ" গ্রহণের প্রয়াস বলিয়া মনে হইতেছে। মুঘল শাসন-কালে বাংলা-সাহিত্যে কোন উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষকতার কথা জানা যায় না। মুঘলেরা বাংলা-সাহিত্যকে আমল দেন নাই বলিয়াই মনে হয়। তাঁহারা ছিলেন ফারসী বা উর্দু অর্থাৎ হিন্দুস্থানীর ভক্ত; মুসলমান হিসাবে আরবীতেও তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। ফারসী বা উর্দু ব্যতীত তাঁহারা আর কোন ভাষাকে পছন্দ করেন নাই বলিয়াই হউক বা অন্য কারণেই হউক, সাধু বাংলা-ভাষা তাঁহারা হয়ত বুঝিতেন না বা বুঝিলেও পছন্দ করিতেন না। তাঁহাদের এই মানসিক ভাব পশ্চিম-বঙ্গের লোকেদের মধ্যে অষ্টাদশ-শতাব্দীর গোড়া হইতেই অধিকভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ এই কারণেই বাংলা-ভাষায় সাহিত্য রচনা করিতে গিয়া এই সময়ের পশ্চিম বঙ্গীয় কবিগণ বাংলায় আরবী, ফারসী, উর্দু বা হিন্দী শব্দের অধিক ব্যবহার করিয়া একটি মধ্যপথ গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ হিন্দু কবি ভারতচন্দ্রের (১৭১২-১৭৬০) একটি উক্তি হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"মানসিংহ পাতসার হইল যে বাণী।
উচিত সে আরবী, পারসী, হিন্দুস্থানী ॥

www.pathagar.com

পড়িয়াছি সেই মত বণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি কথা যাবনী মিশাল ॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য-রস লয়ে ॥"

পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানেরা যখন "হিন্দুস্থানী-বাংলা"য় গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, পূর্ববঙ্গের মুসলমান কবিগণ তখনও "সাধু-ভাষা"য় পুঁথি লিখিতেছিলেন। এই কবিদের কাব্যই এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুস্‌লিম কাব্য। মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্বের পূর্বঙ্গীয় শ্রীওয়ারিস কাজী নামক কোন পুঁথি-নকলকারকের ভাষার সামান্য অংশ নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"পুস্তক লিখিনু মুই প্রভু প্রণামিয়া।
গুরুর পদের রেণু শিরেতে লইয়া ॥
গুণী সকলের পদে মাগি পরিহার।
বিভঙ্গ হইলে পদ বান্ধিয়া দিবার ॥"

শুধু এইরূপ নহে, ইহার চেয়েও বহু অংশে শ্রেষ্ঠ বাংলা-ভাষায় অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ মুসলিম কাব্য রচিত। এই কাব্যের খুব কম অংশই বটতলার ছায়া মাড়াইয়াছে। বটতলায়-ছাপা কতকগুলি সে-দিনের পুঁথি দেখিয়া যাঁহারা মুসলমানদের বাংলা-ভাষা ও বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে নিতান্তই নীচ ধারণা পোষণ করেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মুস্‌লিম সাহিত্যের কোন সাহিত্যিক মূল্য নাই বলিয়া প্রকাশ্যে অভিমত ব্যক্ত করেন, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া পূর্ববঙ্গীয় হাতের লেখা পুঁথিগুলির আলোচনা করেন। তাঁহাদের যদি সে-আলোচনার অবসর অথবা প্রবৃত্তি না থাকে, তবে তাঁহারা এই বিষয়ে নীরব থাকিলেই ভাল হয়।

আমাদের মধ্যে এমন একদল সাম্প্রদায়িক সমালোচক আছেন, যাঁহারা মনে করেন, পশ্চিম বঙ্গীয় মুসলমানদের "হিন্দুস্থানী-বাংলা"ই বাঙালী মুসলমানদের জাতীয় ভাষা। বটতলার সাহিত্যই যে তাঁহাদের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, পলাশীতে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্যবিপর্যয় না ঘটিলে, বাংলা-ভাষা এতদিনে এইরূপ হইয়া যাইত* । ইংরেজীতে যাহাকে wishful thinking বা "আত্মবাসনা চরিতার্থ-চিন্তা" বলে, তাহা ছাড়া, এই অভিমতকে আর কিছুই বলা যায় না।

---

* লেখক 'হিন্দুস্থানী বাঙ্গলা' নামে অভিহিত করিয়া যে-বাঙ্গলা-ভাষার নিন্দা করিয়াছেন, আমরা তাকে নিন্দাযোগ্য মনে করি না। উহাই বাঙ্গালার-অন্ততঃ মোছলেম বাঙ্গলার স্বাভাবিক ভাষা। তথাকথিত 'সাধুভাষা' হিন্দু-বাঙ্গলার ভাষা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু মোছলেম বাঙ্গলার ভাষা নিশ্চয়ই নয়। বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত 'সাধুভাষা' বাঙ্গলাভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন বাধাগ্রস্ত করিয়া ভাষাকে বিকৃত করিয়াছে। মোছলেম বাঙ্গলার সাহিত্যিক ভাষা তথাকথিত 'হিন্দুস্থানী বাঙ্গলা'র অবিকল অনুসরণ না করিতে পারে, কিন্তু তারই বিবর্তিত ধারা নিশ্চয়ই অনুসরণ করিবে। নতুবা মোছলেম বাঙ্গলার মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হইবে না। — সম্পাদক, মাসিক মোহাম্মদী।

www.pathagar.com

যাহা হইয়া যায় নাই, তাহা কি হইত বা না হইত, তৎসম্বন্ধে নিজের সুবিধামত অনুমান করিয়া লইয়া মত প্রকাশ করার পশ্চাতে ব্যর্থ-মানসিকতারই অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

মোটের উপর এই "হিন্দুস্থানী-বাংলা", তখনও যেমন অচল ছিল, আজও তেমন অচল। ইহার উৎপত্তি ও সাহিত্যিক প্রয়োগের সহিত বাংলা-ভাষায় "ব্রজবুলি"র উৎপত্তি ও সাহিত্যিক প্রয়োগের তুলনা করা চলে। "ব্রজবুলি" যেমন ব্রজধাম অথবা বাংলাদেশের ভাষা নহে, বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত কতকগুলি বিশিষ্ট কবির কাব্যের ভাষা, পশ্চিম বঙ্গের "হিন্দুস্থানী-বাংলা"-ও তেমন সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের বাংলা-ভাষা নহে, কতিপয় পশ্চিম বঙ্গীয় মুসলিম কবির কাব্যের ভাষা। "কাজীর গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নাই" অথবা "ন ঘর্‌কা ন ঘাট্‌কা" ইত্যাকার প্রবাদের সাহায্যে যাঁহারা এই ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত কথাগুলি সমভাবে "ব্রজবুলি" ও "হিন্দুস্থানী-বাংলা"র প্রতিও প্রযোজ্য। বাংলা-ভাষার ক্রমবিকাশের হাজার বছরের ইতিহাসে এই দুই প্রকারের বাংলা-ভাষাকে linguistic episode বা "ভাষাগত উপ-ঘটনা" নামে অভিহিত করিতে হয়। "ব্রজবুলি"র ব্যবহারে যেমন বাংলা-সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, "হিন্দুস্থানী-বাংলা"-র ব্যবহারেও তেমনই বাংলা-সাহিত্যের উন্নতি ঘটিয়াছে। খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার মুসলিম-সাহিত্য ও সমাজে বটতলার "হিন্দুস্থানী-বাংলা"-র প্রভাব অত্যন্ত বেশী। যাঁহারা শুধু এই ভাষা দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে অভ্যস্ত এবং এই ভাষায় লিখিত কোন কাব্যের "সাহিত্যিক মূল্য" নাই বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা "সাহিত্যিক মূল্য" বলিতে কি বুঝেন জানি না। যদি রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়া ধরিতে হয়, তবে এই হিন্দুস্থানী-বাংলায় লিখিত পুঁথিতেও যে রস আছে, সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। "হিন্দুস্থানী-বাংলা"-র প্রধান প্রধান কবিদের মধ্যে, মুহম্মদ এয়াকুব (১৬৯৪), সৈয়দ হামজা (১৭৯৩), গরীবুল্লা (১৭৯৪) প্রভৃতি কবির নাম পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কেবল ভাষা-বিভ্রাটের ফলে ইঁহাদের কাব্যে কোন "সাহিত্যিক মূল্য" যাঁহারা দেখিতে পান না, তাঁহাদের রসগ্রহণ-ক্ষমতার প্রশংসা করা যায় না। কেননা, "যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য-রস লয়ে" বলিয়া স্বয়ং ভারতচন্দ্রও মত প্রকাশ করিয়াছেন।

খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা-ভাষা লিখিতে বাংলা-বর্ণমালার পরিবর্তে আরবী-হরফের ব্যবহার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যাঁহারা মনে করেন যে, বাংলার মুসলমানেরা সাহিত্য-সাধনার গোড়া হইতেই বাংলা-বর্ণমালার পরিবর্তে আরবী-হরফের ব্যবহার করিতেছিলেন, এই ঘটনার প্রকৃত ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের কোন পরিচয় নাই। বস্তুতঃ ঘটনাটি এই শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হয়। এ-পর্যন্ত আরবী-হরফে বাংলা-লেখা-পুঁথির যতগুলি আমরা দেখিয়াছি, তাহার কোনটিই দেড়শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে বা প্রাচীন বলিয়া মনে করিবারও কোন কারণ ঘটে নাই। আবার কাছাকাছি সময়ে লিখিত একই পুঁথির দুই পাণ্ডুলিপির একটি বাংলা ও অপরটি আরবী হরফে লিখিত আছে। ইহা হইতে মনে হয়, মুসলমানদের মধ্যেও সকলে এইরূপে বাংলা-বর্ণমালার

www.pathagar.com

আরবী-প্রতিবর্ণায়ন-রীতি গ্রহণ করেন নাই। "হিন্দুস্থানী-বাংলা"র ভক্ত যে কয়জন পশ্চিম বঙ্গীয় মুসলমান কবির নাম করিয়াছি, তাঁহাদের কাব্যগুলির কোন কোন কাব্য আরবী-হরফেও দেখা যায়। পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান কবিদের পুঁথির মধ্যে প্রায় কবির ইসলাম-শাস্ত্রীয় পুঁথিগুলির আরবী হরফে লিখিত পাণ্ডুলিপি বর্তমান। এতদ্ব্যতীত পূর্ববঙ্গীয় সাধুভাষায় রচিত কাব্যজাতীয় পুঁথির দু'চারটি পাণ্ডুলিপিও আরবী হরফে আছে। ইহা হইতেই বাংলা-ভাষায় বাংলা-বর্ণমালা ব্যবহারের পরিবর্তে আরবী-হরফ ব্যবহারের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। "হিন্দুস্থানীয়-বাংলা" আরবী, ফারসী ও হিন্দী শব্দে পরিপূর্ণ এবং ইসলাম-শাস্ত্রীয় পুঁথিগুলিও মুখ্যতঃ আরবী এবং গৌণতঃ ফারসী শব্দের বাহুল্য লইয়া রচিত। এই দুই জাতীয় পুঁথি বাংলা-বর্ণমালায় লেখার চেয়ে আরবী-হরফের লেখা-সুবিধাজনক বলিয়া নিশ্চয়ই বিবেচিত হইয়া থাকিবে। খুব সম্ভব, এই কারণেই বাংলায় আরবী-হরফ ব্যবহারের প্রবর্তন ঘটে। নিম্নের নমুনা দেখিলেই এই উক্তির সারবত্তা উপলব্ধ হইবেঃ

مَرْدَمِیْ ظَلْهِرْ زَاْرااسِ جَهَانِتِ-
تَنْزَارْ نَاگَاتْ قِصَّهْ اس کِتَابِتِ*
اَللّٰهْ مَقْبُوْل شَاهَاغَرِیْبُ اَللّٰه نَامْ-
بَالِّیَا حَافِظْپُوْرْ زَاهَارْ مُقَامْ.

মর্দমী জাহের যার আছে জাহানেতে।
তাঞ্জার নাগাত কেচ্ছা আছে কেতাবেতে ॥
আল্লার মকবুল শাহা গরীবুল্লা নাম।
বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম ॥

এই দুই জাতীয় পুঁথি ব্যতীত "সাধু-ভাষায়" রচিত কাব্যজাতীয় পূর্ববঙ্গীয় পুঁথির যে দুই-চারটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা উপযুক্ত লিখন-রীতির অক্ষম নকল বা অনুকরণ মাত্র। এইরূপ রীতি "সাধু-ভাষায়" রচিত বাংলা-ভাষা ও তাহার বর্ণমালার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এই কারণে ইহা বাংলা-লেখায় চলে নাই। যদি এই রীতি জনসাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিত, কিংবা বাংলাকে এইরূপে লেখার রেওয়াজে দাঁড়াইয়া যাইত, তবে শেষযুগের অনুলিখিত

www.pathagar.com

যাবতীয় পুঁথি আরবী হরফে পাওয়া যাইত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই, কিংবা ঘটিবার বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল, তেমনও বুঝা যায় না।

বলা বাহুল্য, কেহ কেহ এই রীতিকে দক্ষিণী উর্দুর "রেখ্‌তা" রীতির সহিত তুলনা করিয়া ইহাতে ব্যবহৃত বর্ণমালাকে ফারসী-হরফ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা আদবেই ভুল করেন। ইহাতে ফারসী "পে", "চে", "গাফ্" প্রভৃতি অক্ষর বাংলা-স্বর-প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার লিখন-রীতির বা লিখন-ভঙ্গির কোনটিই ফার্সী-ঢঙে নহে। ভারতের বা বাংলার ফারসী-লেখার ভঙ্গি "নস্‌তালীক্"- ঢং নামে পরিচিত। এই "নস্‌তালীক" ঢঙে লেখার বৈশিষ্ট্য হেলান অক্ষর এবং স্বর-বিভেদক মাত্রাবিহীন শব্দ। ইহার কোনটিই আমাদের আলোচ্য পুঁথিগুলিতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে আরবী লিখন-রীতি ও লিখন ভঙ্গি ফারসী-ভাষা হইতে পৃথক; ইহার অক্ষরগুলি খাড়াভাবে লেখা হয় এবং শব্দগুলিও স্বরবিভেদক মাত্রাযুক্ত হইয়া থাকে। বাংলা-ভাষার জন্য ব্যবহৃত আরবী-হরফে যদি দুই-চারিটি ফারসী-হরফ দেখিয়া ইহাকে ফারসী হরফে লিখিত বলা হইয়া থাকে, তবে এই অক্ষরগুলির মধ্যে "টে", "ডে", "ডাল" (অর্থাৎ "ট", "ড়", "ড") প্রভৃতি হিন্দী অক্ষর দেখিয়া ইহাকে হিন্দী-হরফ যে কেন বলা হইল না, তাহা ভাবিয়া পাইনা। অথবা উর্দু হরফ বলিলেই বা ক্ষতির কি কারণ ছিল? মোট কথা, বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত আরবী-হরফে, ফারসী, হিন্দী, উর্দু যে-হরফই থাকুক, ইহাতে আরবী লিখন-রীতি ও লিখন-ভঙ্গিই গৃহীত হইয়াছিল। বলিতে কি আরবী লিখন-রীতি ও লিখন-ভঙ্গি ব্যতীত ফারসী লিখন-রীতি ও লিখন-ভঙ্গিতে বাংলা-ভাষা লিখিত হইলে, ইহা পাঠ করা দুঃসাধ্য হইত। যাঁহারা এই চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহাকে আরবী রীতিতে খাড়া হরফে স্বর-বিভেদক মাত্রাযুক্ত করিয়া লিখিয়াছিলেন। তাই, আজও আমরা ইহা পাঠ করিতে পারিতেছি।

সে যাহা হউক, খ্রীস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া ইংরেজ-শাসনে নূতন রাষ্ট্র, নবীন ভাষা ও অভিনব পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে ও সংঘাতে প্রাচীন বাংলা-ভাষা ও প্রাচীন সাহিত্য আমাদের নিকট এক নব-মূর্ত্তিতে দেখা দিল। এই সময়ে বটতলার সাময়িক সাহিত্য ব্যতীত প্রাচীন বাংলার ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রকারের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। বটতলার এই সাহিত্য মুমূর্ষু প্রাচীন-বাংলার শেষ-নিঃশ্বাস মাত্র। ইহাতে প্রাচীন বাংলার জীর্ণ খোলসটি যে-ভাবে রহিয়াছে, তাহাকে দেখিলে শুধু করুণার উদ্রেক হয়, —ইহার প্রাচীন রূপের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সাহিত্যের পাঠক ও লেখকের সংখ্যা যে বহু ছিল, সে-কথা একশ'বার স্বীকার্য। কিন্তু, তাহা দিয়া সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করিতে যাওয়া মানসিক বিকৃতির পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা বটতলার সাহিত্যের নামে উৎসাহে মাতিয়া উঠেন এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া মাত্রাহীনতার পরিচয় দেন, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া মনে রাখেন যে, বটতলার সাহিত্য প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের শবদেহ মাত্র। ইহার স্রষ্টারা এই শবদেহ জোগাইয়াছেন বাংলার অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অনুন্নতমনা পাঠকশকুনির উদরপূর্তির জন্য। রুচির কথা, রসের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি

www.pathagar.com

শকুনি-জাতীয় জীবনে বাঁচাইয়াবার জন্য শবদেহের আবশ্যকতা আছে বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে, তবে অবনত মস্তকে স্বীকার করিব, বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বটতলার সাহিত্যেরও আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু, এ-কথা সকলেই জানেন যে, শবদেহের একটা সুব্যবস্থা করিবার জন্যই বিশ্বস্রষ্টা শকুনির সৃষ্টি করিয়াছেন, শকুনির জন্য শবদেহের সৃষ্টি করেন নাই।

মোটের উপর, উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই বলিলেই চলে। এই সময়ে বটতলা হইতে কোন কোন সত্যিকার প্রাচীন সাহিত্য বিকৃত অবস্থায় মুদ্রিত হইয়া বাংলার জনসাধারণের সহিত এদেশের প্রাচীন সাহিত্যের একটি যোগসূত্র রক্ষার সচেষ্ট হয়। বটতলার এই প্রচেষ্টার পশ্চাতে কোন সাহিত্যপ্রীতি নাই। যে-কোন প্রকারেই হউক, লোকের মন ভুলাইয়া রোজগারের পথ প্রশস্ত করাই ছিল এই প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য। এইজন্যই বটতলা হইতে প্রকাশিত প্রাচীন সাহিত্যে সাহিত্যিক সততা পরিলক্ষিত হয় না। ইহাকে ঠিক জাল-জুয়াচুরিও বলা চলে না; কেননা পরবর্তী পণ্ডিত-সমাজকে ঠকাইবার উদ্দেশ্য ইহাতে ছিল না; যাহাতে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের মন উঠে সেইদিকে নজর রাখিয়াই প্রাচীন-সাহিত্য বটতলায় পরিবর্তিত হয়। যে-ভাবেই হউক, এই সময়ে বঙ্গের প্রাচীন-সাহিত্য-রক্ষায় বটতলার একটি বড় রকমের দান স্বীকার করিতেই হইবে। এইজন্য বটতলাকে যাঁহারা তাহার উপযুক্ত প্রাপ্য দিতে অস্বীকৃত তাঁহারা নিশ্চয়ই মনের দিক হইতে কৃপণ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

বলিতে কি ইতঃপূর্বেই প্রাচীন বাংলা প্রায় মরিয়া গিয়াছিল। এই শতাব্দীতে আসিয়াই সেই মরা-সাহিত্য সমাহিত হইয়াছে। এই সমাধির উর্বর ভূমি হইতেই নবযুগের নূতন বাংলা-ভাষা ও নবীন সাহিত্য জন্মলাভ করে এবং পুরানো বাংলা-সাহিত্যের প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা শুরু হইয়া যায়; বাঙালীর দৃষ্টি আবার নূতন করিয়া অতীত গৌরবের আলোচনায় নিবদ্ধ হইতে থাকে। এই সময়েই নূতন পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙালীর জীবনে নূতন-প্রেরণা জাগিয়া উঠিতে থাকে এবং নবীন-জীবনে নূতন-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বাঙালী যে-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে থাকে, তাহাই বাংলার আধুনিক-সাহিত্য। বাংলা-সাহিত্যের এই ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইবে। ইহা আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের অন্তর্গত নহে।

এইবারকার মত এই আলোচনা এখানেই শেষ হউক। হয়ত এই প্রবন্ধে অনেকের প্রীতি ও অপ্রীতিকর অনেক কথাই বলিয়াছি। যাহাকে আমরা সত্য বলিয়া মনে করি, তাহাকে কাহারও প্রীতি বা অপ্রীতির জন্য পাশ কাটাইয়া গিয়া দুর্বলচিত্ততার পরিচয় দিতে অসমর্থ। ইহার জন্য নূতন করিয়া ক্ষমা না চাহিয়া আমি প্রাচীন কবি মুহম্মদ কবীরের (১৫৮৮) ভাষায় বিদায় গ্রহণ করিব ঃ

“পণ্ডিত জনের ঘৃণা মূর্খের গোহারি।
শিরে ধরি কাব্য কথা দিলাম সঞ্চারি ॥”

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা : উৎসের দিকে

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান

লেখক-পরিচিতি : জন্ম : ১৯০৬, বগুড়া। মৃত্যু : ২৩ আগস্ট ১৯৮২। পেশা : সাংবাদিকতা। সম্পাদক, ছায়াবীথি, কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : জীবনের জয়যাত্রা, দুর্বিপাক। গল্প : সোনালী স্বপন, পয়সা, স্বর্গীয় পলিটিক্স। গবেষণাগ্রন্থ : বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস (তিনখণ্ড)। ভ্রমণ কাহিনী : দূরে দূরান্তরে। বিবিধ : শিশু মানস বিজ্ঞান। পুরস্কার : নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক, বগুড়া সাংস্কৃতিক স্বর্ণপদক। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস' গ্রন্থের জন্য তিনি সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছেন।

লেখা-পরিচিতি : লেখাটি পৃথক কোনো শিরোনামভুক্ত প্রবন্ধ নয়। এটি নেয়া হয়েছে তাঁর রচিত বিশাল গ্রন্থ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস' [প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৯; তৃতীয় প্রকাশ : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা; প্রকাশকাল ১৯৯২] থেকে। উক্ত গ্রন্থের 'এক' ও 'দুই' অধ্যায় দুটি প্রাসঙ্গিক হওয়ায় বর্তমান শিরোনামে প্রকাশ করা হলো। প্রবন্ধ হিসেবে পূর্বে অপ্রকাশিত।

এক.

একই দ্রাবিড় জাতি সংস্কৃত ভাষার সাহায্য না লইয়াও যদি তামিল ও মলয়ালম ভাষায় উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া থাকিতে পারে–তবে বাংলা ভাষাতেও তাহা সম্ভব ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পরিবর্তন বাঙ্গালা দেশের দ্রাবিড় ভাষাকে ভিন্ন পথে চালিত করে। তাহারই ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। সে যুগ দীর্ঘ নয়শত বৎসরব্যাপী। এই অন্ধকার যুগের তুলনায় ইউরোপের মধ্যযুগ অতি সামান্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দীর্ঘ নয়শত বৎসরব্যাপী যে দুর্দ্দিন গিয়াছে তেমন আর কখনো হয় নাই। নয়শত বৎসরের দুর্দ্দিনের শেষে নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতি না ঘটিলে হয়ত ইতিহাসে আর বাঙ্গালা সাহিত্যের উল্লেখ থাকিত না।

মগধ ও বাঙ্গালা, আর্য্য-শাসনের অধীন হইয়া পড়াতেই বাংলা ভাষার এই দুর্দ্দিনের সূচনা হয়। বিদেশী রাজসভায় বাংলা ভাষার কোন মর্য্যাদা ত ছিলই না বরং অনার্য্য ভাষা বলিয়া ইহাকে ঘৃণা করা হইত।

অপরদিকে আদি বাংলা ভাষায় রচনা যে একেবারে বন্ধ হইয়া গেল তাহা নহে। আদি বাংলা ভাষা সংস্কৃতের সহিত মিশিয়া নূতন ভাষার সৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু এভাষা রাজসভার বাহিরে থাকিয়া গেল; রাজসভায় সংস্কৃতের মর্য্যাদা ইহা কখনো পাইল না। সুতরাং ইহা হইল অর্দ্ধশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের রচনার ভাষা।

পাটলিপুত্র যতদিন বঙ্গ ও মগধের রাজধানী ছিল ততদিন কোন বাংলা ভাষার কবিকে রাজসভা অলঙ্কৃত করিতে দেখা যায় নাই। রাজধানী যখন পালরাজাদের সময় পুন্ড্রবর্দ্ধনে আসিল তখনও রাজসভায় কোন বঙ্গভাষার কবি সম্মানিত হইয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা

www.pathagar.com

যায় না। পালবংশের রাজত্বকালে দুইজন সম্মানিত কবির নাম পাওয়া যায়। প্রথম হরিচরিত রচয়িতা চতুর্ভূজ। ইহার পূর্বপুরুষ স্বর্ণরেখ ব্রাহ্মণ হিসাবে গৌড়ের ধর্ম্মপাল দেবের নিকট হইতে বরেন্দ্রভূমির করঞ্জ নামক একখানি গ্রাম শাসনস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রামখানি করঞ্জা নামে আজিও বগড়া জেলায় বর্ত্তমান আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হরিচরিত কাব্যের একখানা পুঁথি নেপালরাজের গ্রন্থাগারে আবিষ্কার করেন। পুঁথিখানি সংস্কৃতে লেখা।

দেবপালদেবের রাজ্যকালে আর একজন বড় পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং অধ্যয়নের জন্য প্রাচীন পুরুষ পুরের কনিষ্ক বিহারে গিয়াছিলেন। দেবপালদেব ইহাকে নালন্দা মহাবিহারে সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার নাম বীরদেব, নগরহার নগরের (বর্ত্তমান জালালাবাদ, খাইবার গিরিসঙ্কটের নিকটবর্ত্তী) অধিবাসী। ইঁহার কোন বাংলা রচনা নাই। রামচরিত প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দী পুন্ড্রবর্দ্ধনের পুরের অধিবাসী হইলেও রামচরিত সংস্কৃত ভাষাতেই রচনা করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালাদেশের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেও বাংলা ভাষা দীর্ঘ অবহেলার ফলে এমনি অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পালরাজদের রাজত্বকালেও আর তাহার পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসে নাই। প্রকৃতপক্ষে মহাযানপন্থী বৌদ্ধরাই সংস্কৃতের প্রাথমিক যুগের সাহিত্য সৃষ্টি করেন। মগধের রাজাদের মত পালরাজারাও বাংলাকে গ্রাম্য কবির ভাষা করিয়াই রাখিয়া দিয়াছেন কিন্তু তাহাকে রাজোচিত সম্মান দেন নাই।

পালবংশের পর সেনবংশ বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। ইঁহাদের রাজত্বকালে যে সব প্রসিদ্ধ কবির নাম পাওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি শরণ, ধোয়ী, উমাপতি ধর ও জয়দেবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কবিদের কোন বাংলা রচনা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ইঁহারা সকলেই ছিলেন সংস্কৃত ভাষার কবি।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সমাজ ব্যবস্থার প্রভাবে বাঙ্গালাদেশে যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অবনতির আর একটি বিশেষ কারণ। বৌদ্ধ শাসনের কালে প্রত্যেক মানুষেরই প্রজ্ঞার সম্ভাবনা স্বীকার করা হইত। তাই জনসাধারণের ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে ও শিক্ষিত হইতে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শাস্ত্রানুশীলনে ব্রাহ্মণ ছাড়া অপরের অধিকার ছিল না। সেকালে শাস্ত্রচর্চ্চা ছাড়া শিক্ষার অপর কোন প্রেরণা ছিল না। ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতেন কিন্তু অব্রাহ্মণের সংস্কৃত চর্চ্চার অধিকার ছিল না। সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অপর ভাষার চর্চ্চা নিকৃষ্ট জ্ঞান করা হইত। ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে, জনসাধারণ শিক্ষা ও উচ্চ সংস্কৃতি হইতে বঞ্চিত হইল। তাহাদের মননশীলতার মুখপাত্র হইলেন ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণে যাহা বলেন তাহাই তাহাদের বেদবাক্য। ব্রাহ্মণের আদেশ তাহাদের শিরোধার্য। ব্রাহ্মণের সেবা করিলে তাহাদের মোক্ষপ্রাপ্তি কিন্তু আত্ম-শিক্ষার জন্য শাস্ত্র-চর্চ্চা মহাপাপ। চিন্তার স্বাধীনতা তাহাদের ভিতর হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। বড় ভাব ও উচ্চ চিন্তা ব্রাহ্মণদের জন্য ছাড়িয়ো দিয়া তাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণের পদসেবা করা। ব্রাহ্মণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সেদিন বাধা দেয় কাহার সাধ্য। "যাঁহার ক্রোধে কলঙ্কী হইল কলানিধি, যাঁহার ক্রোধে লবণ হইল সলিলধি" এমন যে ব্রাহ্মণ তাঁহার কি সেবা না করিয়া উপায় ছিল!

দেশের জনসাধারণ এইভাবে প্রথমে মাতৃভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ হারাইল। মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে যে ভাষার মহিমা তাহাদের কাছে কীর্ত্তিত হইল সে ভাষারও চর্চ্চা করিবার অধিকার সকলে পাইল না। নূতন বিদেশী ভাষা দেশের জনসাধারণকে শিখাইবার উপযুক্ত শিক্ষায়তন স্থাপিত হইল না। যাহা হইল তাহা শুধু শ্রেণী বিশেষের জন্য। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় জনসাধারণের কোন বক্তব্য না থাকায় চিন্তা হইতে তাহারা অব্যহতি পাইল। শাস্ত্রবাক্য ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়া বিনা তর্কে মানিয়া লইবার অভ্যাসের ফলে বুদ্ধি ও কল্পনার উৎকর্ষ হইতে পারিল না। সুতরাং দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে তাহাদের কোনরূপ কৃতিত্বই সম্ভব হইল না।

অপরদিকে সমগ্র দেশকে বঞ্চিত করিয়া দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শাস্ত্র গড়িবার গুরুভার মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেও মানুষ বিদেশী সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিয়া সেই ভাষায় দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতি করা তাঁহাদের ক্ষুদ্র সমাজের সাধ্যে কুলাইল না। মাতৃভাষাকে বর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের জীবন ভাষা আয়ত্ত করিবার অপূর্ব কসরতেই ব্যয় হইতে লাগিল। তাই শব্দাড়ম্বর ও শাস্ত্রবচনের দাসত্বকে অতিক্রম করিয়া বুদ্ধিকে দিকে দিকে নূতন জগত আবিষ্কার করিতে প্রেরণ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। কল্পনার ফানুসে চড়িয়া তাঁহারা কাব্যলোকের উচ্চমার্গে আরোহণ করিতে পারিলেন না। সূক্ষ্ম বুদ্ধির পুঙ্খানুপুঙ্খিক বিশ্লেষণে স্থিতি ও কাল, প্রত্যয় সাপেক্ষ করিয়া তুলিতে পারিলেন না। তাঁহাদের জীবন কাটিল দুরূহ সংস্কৃত শব্দ আয়ত্ত করিতে আর অনার্য্য বাংলা ভাষাকে প্রাণপণে মার্জ্জিত করিয়া আর্য্য পর্য্যায়ভুক্ত করিতে। আর্য্য-শাসনের এই দীর্ঘ সময় তাই এক বিরাট ব্যর্থতার ইতিহাস। বাঙ্গালা দেশের এমন দুর্দ্দিন আর কখনো হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

আর্য্য অধিকারের পূর্বে পুণ্ড্রবর্দ্ধন, গৌড় ও মগধের অনার্য্য রাজাদের সাম্রাজ্য বহুবার সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যেও বিস্তৃত হইয়াছে। খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত আর্য্যরা বাঙ্গালাদেশে প্রবেশের কোন পথই করিতে পারে নাই; কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্বেই উত্তরাপথ তাহাদের পদানত হইয়াছিল। এমন শক্তিশালী বলিষ্ঠ বাঙ্গালা রাষ্ট্র কোন মহাপাতকে এমন অপদার্থে পরিণত হইল যে, লক্ষ্মণ সেনের সময় সতের জন মুসলমান সেনার আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিল না—তাহা ঐতিহাসিকরা খুঁজিয়া দেখেন নাই। ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থাই এই মহাপাতক যাহা বাঙ্গালার বলিষ্ঠ দ্রাবিড়গোষ্ঠিকে কায়মনোবাক্যে নিষ্ক্রিয় দাসে পরিণত করিয়াছিল। শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া এই মানবগোষ্ঠি মনের দিক হইতে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, ধর্ম্মচর্চ্চার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া নৈতিক চরিত্র হারায়; প্রশ্ন করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া বুদ্ধি ও বিচার হইতে বঞ্চিত হয়; ব্রাহ্মণের আদেশ-নিষেধ পালন করিতে করিতে কর্ম্ম সূচনার সকল প্রেরণা হারায়। মানুষ হইয়া পড়ে আজ্ঞাবহ যন্ত্র-হুকুমের দাস। সমগ্র দেশকে এমনি দাসে পরিণত করিয়া মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ রাষ্ট্রের সকল

www.pathagar.com

উন্নতির ভার লইয়াছিল। রাষ্ট্র রক্ষার ভার পড়িয়াছিল আজ্ঞাবহ সীমাবদ্ধ ক্ষত্রিয় সমাজের উপর। দেশের অধিকাংশ লোক এই রাষ্ট্রের সহিত নিজদের স্বার্থের যোগাযোগ দেখিতে পাইত না। রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার তাই তাহাদের কোন অনুপ্রেরণা ছিল না। এই কারণেই মুসলমান সেনা লক্ষ্মণাবতী প্রবেশ করিলে দেশের কোন কোণেই একটু সামান্য বিপ্লবের ঝড়ও দেখা গেল না। সমগ্র দেশ ধীরে ধীরে নূতন শাসনতন্ত্রের অধীন হইয়া নূতনভাবে জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিল।

দুই.

ধর্ম্মের চিন্তা বোধ হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর চিন্তা হইতে আসে। ইহকাল সম্বন্ধে কম বা বেশী সংবাদ সকলেরই জানা আছে। এখানে ভালভাবে বাস করিতে গেলে কি কি বিষয়ের প্রয়োজন সে সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা ধারণা সকলেরই থাকে। এই ইহকালের শেষ মৃত্যু। মৃত্যুর পর কি—এ প্রশ্ন প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক। এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্য সকলে একভাবে দেয় না। কিন্তু যাহারা বলে মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়-ইহার পরও জীবন আছে, তাহারা মনে এ প্রশ্নটিও জাগায়—সে জীবনে কি ভাবে ভাল থাকা যাইবে? এ প্রশ্নের উত্তরেই আসে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচারনিষ্ঠা, শাস্ত্র পালন ইত্যাদি।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম যতদিন বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম ছিল ততদিন একভাবে জীবন চলিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ প্রভাবের শেষে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইল তখন আর পরকাল সম্বন্ধে লোকের একইরূপ ধারণা রহিল না। বৌদ্ধরা হয়ত বলিতেন–

> "শূন্য হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি।
> আপনি জল স্থল আপনি আকাশ।
> আপনি চন্দ্র-সূর্য্য জগত প্রকাশ॥

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম শূন্যকে দেবতা, দেবী, উপদেবতা, অসুর, রাক্ষস ইত্যাদিতে পূর্ণ করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, মৃত্যুর পর যে রাজ্য সে রাজ্যের শাসনভার দেবতা ও দেবীগণের উপরে। তাঁহারা খুশী থাকিলে পরকালে মুক্তি ত হইবেই এমন কি ইহকালেও সমূহ মঙ্গল। তাই বিধি হইল ষোড়শোপচারে এই দেবতাদিগের তুষ্টি বিধান করার—অর্থাৎ পূজার। কিন্তু সে পূজার ভার লইলেন ব্রাহ্মণ। দেবতার পূজা— সে দেবতা ব্রাহ্মণেই করিতে পারে— সাধারণ লোকের পূজা দেবতারা গ্রহণ করেন না। প্রচলিত প্রথা অনুসারে ইহা উচিত বলিয়া মনে হইত। কারণ রাজার কাছে আবেদন জানাইবার অথবা তাঁহার তুষ্টি সাধন করিবার অধিকার সর্ব্বসাধারণের থাকে না। তাঁহার কাছে পৌছাইতে হয়-উচ্চ পদস্থ অনেকের মধ্যস্থতায়। পৃথিবীর রীতি যখন এই তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেবতাদের কাছে যে, যে কেহ অপবিত্র শরীর লইয়া উপস্থিত হইবে, নিজের আবেদন জানাইবে-সেবা করিয়া তাঁহাদের তুষ্টি বিধান করিবে, তাহা কিভাবে হইতে পারে! সুতরাং দেবতা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কথা-বার্ত্তা চালাইবার জন্য একটি আবশ্যকীয় মাধ্যম ব্রাহ্মণকে স্বীকার করিয়া লওয়া

www.pathagar.com

একান্তই স্বাভাবিক।

কিন্তু নিজের পরকালের চিন্তা ব্রাহ্মণের উপরে ছাড়িয়া দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় কিরূপে! ব্রাহ্মণ না হয় তার পূজা-অর্চ্চনায় দেবতাদের তুষ্ট করিলেন কিন্তু তাহাতে যে নিজেরও আত্মার সদ্‌গতি হইবে এ ভরসা পাওয়া যায় কি করিয়া? দেবতাদের পূজার ব্যবস্থা নিজে না করিতে পারিলে মনে শান্তি আসা সহজ নয়।

শান্তি আসে নাই-জনসাধারণ সব ক্রিয়া-কর্ম্ম ব্রাহ্মণের উপর ছাড়িয়া দিয়া পরকাল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। তাই দেখা যায় বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার কিছু কালের মধ্যেই জনসাধারণ নিজেরাই পূজার ব্যবস্থা হাতে লইল। পাছে ব্রাহ্মণদের ইষ্ট দেবতাদের পূজা করিলে তাঁহারা কুপিত হন তাই প্রচলিত কোন দেবতা বা দেবীর পূজার আয়োজন তাহারা করিল না। তাহারা করিল সর্প দেবতা মনসার পূজার আয়োজন। এ আয়োজন শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বাহিরে সুতরাং কাহারো কিছু বলিবার থাকিতে পারে না।

"বাঙ্গালাদেশে সর্প দেবতা মনসার পূজা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। তবে মনসা-পূজার সমাদর নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বেশী ছিল। সে যুগে উচ্চবর্ণের লোকেরা মনসা দেবীকে বিশেষ আমল দিতেন বলিয়া বোধ হয় না।"

শিবের কন্যা মনসা, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন "অস্থানে"। তাহার ফলে জন্ম হইবার কিছুক্ষণের মধ্যেই মনসা পূর্ণাঙ্গী নারী হইয়া উঠিলেন। শিব তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলেন। এমন এক যুবতী নারীকে গৃহে লইয়া আসিতে দেখিয়া ঈর্ষায় শিবের গৃহিণীর গা জ্বলিয়া গেল। জ্বলিবারই কথা। মনসার সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিয়া গেল। বিবাদ হাতাহাতিতে পরিণত হইল। মনসা এই হাতাহাতির ফলে একটি চোখ হারাইলেন। চণ্ডীর উপর মহা কুপিত হইয়া তিনি শিবের গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পর জরৎকারু মুনির সহিত মনসার বিবাহ হইল। তাঁহাদের একটি সন্তানও হইল। কিন্তু শিবের গৃহিণী চণ্ডী, মনসাকে যে অপমান করিয়ছিলেন তাহা মনসা ভুলিলেন না। প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি শিব ও চণ্ডীর ভক্তদের ভাঙ্গাইয়া পূজা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

মনসার চেষ্টা ছিল চণ্ডী ও শিবের ভক্তদের পূজা আদায় করিয়া নিজের দল বাড়াইয়া শিব ও চণ্ডীর চেয়েও বড় হওয়ার। তাঁহার ভক্তরা যাহারা মানুষের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল তাহারাও হয়ত মনসার বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিব ও চণ্ডীর ভক্তদের চেয়েও মনসার পূজারী হিসাবে বড় হইবার গোপন অভিলাষ মনে মনে পোষণ করিত। কিন্তু এই বড় হওয়া, তাহারা নিজেদের শক্তি, সামর্থ্য ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া চাহিত না; তাহারা চাহিত কোন দেবতা বা দেবীকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে কিস্তিমাৎ করিতে। এই সহজিয়া পন্থাই বলিষ্ঠ মানুষকে জরাগ্রস্ত করিয়া দৈবের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করাইতে শিখাইল—যাহার ফলে লক্ষ্মণ সেনও নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন না। তাঁহার জানা ছিল দেবতারা বিরূপ-ব্যর্থ চেষ্টায় লাভ নাই—সুতরাং পশ্চাদদ্বার দিয়া পলায়ন করাই সমীচীন। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে একরূপ বিনা যুদ্ধেই

www.pathagar.com

বখ্‌তিয়ার গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিলেন।

সে কালের সাধারণ লোক যে শুধু মনসাদেবীর পূজাই করিত এমন নয়—তাহাদের জীবনের প্রত্যেকটি কাজের জন্যই তাহারা দেবতাদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল। আত্মবিশ্বাস বলিয়া কোন কিছুই তাহাদের ভিতরে অবশিষ্ট ছিল না। কৃষক নিশ্চেষ্ট হইয়া বরুণদেবের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিত। বহু পূজা অর্চ্চনায় তুষ্ট হইয়া বরুণদেব বারি বর্ষণ করিলে তাহার পরম সৌভাগ্য, নতুবা দেবতা অপ্রসন্ন-তাহার ভাগ্য-লিখা খণ্ডায় কাহার সাধ্য! শীতলাদেবীর প্রকোপে বসন্তে গ্রাম উজাড় হইয়া যায়। তাই তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য শীতলা পূজার ব্যবস্থা করিতে হইল। ওলাউঠা আর এক অদ্ভুত উপদ্রব একবার আরম্ভ হইলে আর রক্ষা নাই। এমন একটি ভয়াবহ কাণ্ড একি দৈবশক্তি ব্যতিরেকে সম্ভব!-ওলাদেবীই এই অনাসৃষ্টির মূল। সুতরাং তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহারও পূজার ব্যবস্থা হইল।

আধুনিক জগতে এসবই মানুষের শত্রু। সুতরাং ইহাদের পূজা না করিয়া ইহাদের ধ্বংসের উপায়ই মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কল্যাণে বাঙ্গালাদেশের মানুষের এমনি পরিণতি ঘটে যে, মানবগোষ্ঠির এই সাধারণ শত্রুদের দমন করিবার উপায়ও তাহারা চিন্তা করিতে পারে নাই; বুদ্ধির জড়তার জন্য দেবতা, উপদেবতা ও রাক্ষসের অনুগ্রহ ও নিগ্রহ ছাড়া প্রকৃতিতে আর কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই। দীর্ঘ নয়শত বৎসর ব্যাপী-তাহারা প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক নানা শক্তি, জীব ও বস্তুকে পূজা করিয়া তাহাদের অনুগ্রহ পাইবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু—আত্মশক্তিতে প্রকৃতিকে জয় করিয়া তাহার অকল্যাণকর শক্তিকে পঙ্গু করিয়া দিয়া-প্রকৃতির উপর মানুষের বিজয় পতাকা উত্তোলিত করে নাই।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাবে দুর্জ্জয় দ্রাবিড় ও মঙ্গোলগোষ্ঠির পতন এইখানেই সীমাবদ্ধ নহে। উপাস্য দেবতা যাহাদের সর্ব্বদা কলহ করিতেছে একে অন্যের প্রাধান্য দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইতেছে, তাহাকে উচ্চস্থান হইতে নামাইয়া নীচু স্থানে ফেলিবার সর্ব্বপ্রকার উপায় চিন্তা করিতেছে-সামান্য ক্রটিতে অভিশাপ দিয়া অথবা তপস্যার ফলে প্রাপ্ত কোন বিশেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া-অপরের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করিতেছে—তাহাদের নৈতিক উন্নতি কখনোই তাহাদের উপাস্য দেবতাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। বাঙ্গালী চরিত্রের পরশ্রীকাতরতা ও কলহপ্রিয়তা—তাহার আদর্শ দেব চরিত্রেরই অনুকরণ।

সমাজে স্ত্রীজাতির কোন মর্যাদা ছিল না। তাহারা মানুষ বলিয়া স্বীকৃত হইত না। স্বামী নামক পুরুষের প্রয়োজনেই তাহাদের বাঁচিতে হইত। স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার সহমরণে যাইতে হইত। কিন্তু স্ত্রী মরিলে কোন স্বামীকে সহমরণে যাইতে হইত না। স্ত্রী বর্ত্তমানে একাধিক স্ত্রী গ্রহণেও স্বামীর কোন বাধা ছিল না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কুল রক্ষা করিতে অনেক ব্রাহ্মণকেই পরপারের যাত্রী বৃদ্ধ পাত্রের হাতে তরুণী কন্যা সঁপিয়া দিতে হইত। এই বৃদ্ধের হয়ত ইহাই প্রথম বিবাহ নয়। কিন্তু কন্যার পিতার ধর্ম্ম রাখিতে যে কোন কুলীন ব্রাহ্মণকেই-দশ পনেরটি বিবাহ ত করিতেই হইত-কখনো কখনো একশত বা

www.pathagar.com

তাহার চেয়েও বেশী বিবাহ্ করিতে হইত। সুতরাং সমাজের সবচেয়ে উচ্চ বংশ যাঁহার-তাঁহার বিবাহ্ করা ও শ্বশুরালয়ে ঘুরিয়া বেড়ান ছাড়া অপর কোন বড় কাজ ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই ব্রাহ্মণই ছিলেন সমাজের কর্ত্তা। তাঁহার আদেশ নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া কাহারো চলিবার উপায় ছিল না। শাস্ত্রপালনের ক্রটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়াই ছিল তাঁহার ধর্ম্ম-সংক্রান্ত প্রধান কর্ত্তব্য।

সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। মন্দিরে প্রবেশও ছিল তাহাদের নিষেধ। সুতরাং তাহাদের শ্রেণীর উপযুক্ত যে নীতি তাহারা নিজ হাতে গড়িয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণী ব্রাহ্মণের যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তাহাতে বাংলা ভাষাভাষীকে শিখিতে হইত সংস্কৃত, সংস্কৃত ব্যাকরণ, ন্যায় ইত্যাদি। এই শিক্ষা সম্বন্ধে বহুকাল পরে রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন—

The Sanscrit language, so difficult that almost a life time is necessary for its perfect acquisition, is well known to have been for ages a lamentable check on the diffusion of knowledge; and the learning concealed under this almost inpervious veil is far from sufficient to reward the labour of acquiring it ....

...No improvement can be expected from inducing young men to consume a dozen of years of the most valuable period of their lives in aquiring the nicietis of vyakaran or Sanscrit grammar...

"Again the student of Nyaya shastra cannot be said to have improved his mind after he has learned from it into how many ideal classes the objects in the Universe are divided and what speculative relation the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear etc."

এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, শ্বশুরালয় ও যজমানের গৃহে পরান্নভোজী অলস জীবন যাপন করিয়া শুধু অভিশাপের ভয় দেখাইয়া ব্রাহ্মণ যে ভাবে সমাজের সাধারণ মানুষকে দীর্ঘ নয়শত বৎসর ব্যাপী শোষণ করিয়াছেন জগতের ইতিহাসে সেরূপ ঘটনা বিরল। জগতের সবচেয়ে হীন ও নির্দ্দয় পুঁজিবাদীও কখনো এমন করিয়া সমাজের অধিকাংশকে অশিক্ষা, কুসংস্কার, দুর্নীতি ও নিষ্ক্রিয় জীবনের গভীর পঙ্কে ফেলিয়া দেবতার পূজা পায় নাই। পুঁজিবাদীরা যাহা করিয়াছেন তাহা ধর্ম্ম ও পরকালের নামে করেন নাই। তাই সে শোষণকে বুঝিতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু ইহপরকালের কাণ্ডারী ব্রাহ্মণ যাঁহার কথায় বৈকুণ্ঠের জমিদারীতে দখলী স্বত্ব পাওয়া যাইতে পারে অথবা একটি অভিশাপে সাতজন্ম কুকুর বিড়াল ও সাপের হীন জীবন যাপন করিতে হইতে পারে সেই ব্রাহ্মণকে শোষণকারী বলিবে কে?

শিক্ষা ও উন্নত জীবন হইতে বঞ্চিত হইয়া দেশের জনসাধারণ কি অবস্থায় আসিয়া

www.pathagar.com

পৌঁছিয়াছিল তাহার পরিচয় দীনেশ চন্দ্রের লেখাতেই আছে—

"We find the people of rustic villages... revolting against all rigour of asceticism and yeilding to profilgacy and sexual pleasures. We find the courts of kings steeped in these vices, and favouring libertinism in the name of religion by a quite royal indulgence in sensuous pleasures. We find tantrics, originally imbued with the object of attaining a high spiritual goal, sinking low in debauchery. Men and women sat freely around the chakra or the circle where all moral laws were set at naught. King Ballala Sen (1100-1169) had a mistress of the Chandal caste named Padmini whom he openly raised above the status of his chief queen.

The inscriptions (in geneological records) openly praise Lakshmaan Sen for intriguing with the beautiful Kalinga women. Abhiram Goswami born in 1095 A.D. a devout Vaisnava, kept a mistress named Malini and his woman is publicity applauded in the Vaisnava tradition, Jayadev himself counts it a point of glory to mention the name of Padmini in his songs...

"The poets of this period sang panegyrics of their patrons the Kings, for their licentiousness; and the copper-plate inscriptions also unmistakably indicate the tendencies of the age by describing the situations of Siva and Parvati in close embrace, in a language not quite becoming or decent.... In the groundfloor of the Shahitya Parisad buildings, an image of Siva embracing Parvati is preserved in the gallery of statues; this image of Siva is shockingly vulgar and evidently belongs to the age of which we have been speaking.... The lays of Jayadev... are indecent in many places and the same should be said of the Pavana Duta by the Poet Dhoi of Lakshman Sen's court. This country is prone to indulge in religious speculations and there is not lack of subtle interpretations attempting to glorify what a moralist would justly condemn. We must admit... that the standard of morality had become low amongst our people... The indecency and predilection for sensuous life are manifest in populr literatures of the Krishna and Siva cults. In the Siva songs we have vulgar tales of the great God's

www.pathagar.com

gallantry, amongst the low class women of the Kuchni and Dome caste. The evil eyed jealousy of Parvati described by Rameshwar and other poets has undoubtedly some very gross humour in it. In one, of the poems we find her complaining that though she had tried to keep Siva at home at night by tying the edge of her Sari to his tigerskin, it proved of no avail, as the great God ran away to meet the Kuchni women as soon as she fell asleep."

এই যে রাজসভা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের ডোম, কুচনী পর্যন্ত দুর্নীতির স্রোত, এ নৈতিক অধঃপতনের কারণ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও নাথ সন্ন্যাসীদের দায়ী করিয়াই অধঃপতনের যথেষ্ট কারণ নির্দ্দেশ করা হইল বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু একথা তাঁহার একবারও মনে হয় নাই খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ শাসনের পতন হইয়াছে। কিন্তু সে ধর্ম্মের দুর্নীতির প্রভাব দশম দ্বাদশ শতকে দেখা দিবে কেন? দীনেশচন্দ্র এবং তাঁহার মত অনেকেরই কখনো মনে হয় নাই ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থার ভিতর কোথাও এমন কিছু থাকিতে পারে যাহার পরিণাম বাঙ্গালাদেশের অন্ধকার যুগের দুর্দ্দিন। সর্বপ্রকার চারিত্রিক উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া সমগ্র দেশের মানুষকে শ্রেণী বিশেষের দাসে পরিণত করিলে যাহা হওয়া একান্ত স্বাভাবিক-অন্ধকার যুগে তাহাই ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য শাসনের প্রভাবে দেশের জনসাধারণ মাতৃভাষার চর্চ্চা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে-কিন্তু অপর ভাষায় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায় নাই। দুরূহ সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করাই কঠিন ছিল-কিন্তু তাহারও অধিকার নিম্নশ্রেণীর ছিল না। উচ্চবর্ণ যাঁহারা তখনকার দিনের নৈতিক আচারের নেতা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, তাঁহাদের সহিত মিশিবার সুযোগ নিম্নশ্রেণীর ছিল না। সুতরাং শিক্ষার ভিতর দিয়া কিংবা মহৎ জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার অনুপ্রেরণায়-নৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিবার সুযোগ তাহাদের ছিল না। ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশের অধিকার তাহাদের ছিল না সুতরাং সেই মন্দিরের আবহাওয়ায় যতটুকু উন্নতি সম্ভব ছিল তাহাও ঘটে নাই; বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে নৈতিক প্রভাব তাহাদের জীবনে ছিল আর্য্য শাসন প্রতিষ্ঠার সহিত তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু নূতন প্রভাবের সকল দুয়ারই তাহাদের জন্য বন্ধ হইয়া গেল-কারণ তাহারা মানুষ হইলেও হীন নীচ জাতি-যাহার ছায়া মাড়াইলে পানীয় জল অপবিত্র হইয়া যায়। উচ্চ শ্রেণীর নৈতিক ও ধর্ম্ম জীবন পাইবার সুযোগ তাহাদের হইল না। কিন্তু তবুও পরকালের বিভীষিকা হইতে তাহারা মুক্ত হইতে পারিল না। তাই তাহাদের নৈতিক উন্নতি ও মানসিক বিকাশের সীমার মধ্যে তাহাদের নিজেদের ধর্ম্ম গড়িয়া লইল। সেই ধর্ম্মে যদি তাহারা শিবের নির্গুণতার চেয়ে গভীর রজনীতে পার্ব্বতীকে ছাড়িয়া কুচনী মেয়ের সন্ধানে বাহির হইবার গুণটিকেই বড় করিয়া দেখে, মানুষকে ঘৃণা করিয়া সাপ, বাঘ ও কুমীরকে দেবতা বলিয়া পূজা করে, জগতের সমস্ত সুন্দর বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া বীভৎস, কদাকার ও অশ্লীলের আখ্যায়িকায় তাহাদের সাহিত্য ভরিয়া তোলে তবে তাহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলে কি? বৌদ্ধ ধর্ম্মের অপরাধ থাকিতে পারে-কিন্তু নয়শত বৎসরের সুযোগ পাইয়াও একটি বিরাট

www.pathagar.com

মানবগোষ্ঠিকে সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন করিয়া না গড়িবার অপরাধ ত তাহার নয়। এই যে অবহেলিত নিপীড়িত সর্ব্বনিম্নস্তরে পরিত্যক্ত-বঞ্চিত মানবগোষ্ঠি-ইহারই বহুযুগের পুঞ্জীভূত বেদনার অভিশাপ সমগ্র জাতির অধঃপতন। একটি বিশাল দেশের সমস্ত মানুষের চারিত্রিক হীনতা একদিনে আসে না। বহু যুগের অভ্যস্ত অনাচার ও দুর্নীতির ফলেই তাহা সম্ভব। তাই ১১/১২ শত খৃষ্টাব্দে যে বাঙ্গালাদেশকে পাওয়া যায় তাহা সে যুগেরই সৃষ্টি একথা বলা চলে না। পাটলিপুত্র হইতে গৌড় ও মগধে আর্য্য শাসনের কাল হইতেই সমগ্র দেশের বিজিত দ্রাবিড় সম্প্রদায় শূদ্র শ্রেণীতে পরিণত হয়। তখন হইতেই তাহারা নিজেদের সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিচ্যুত হইতে থাকে কিন্তু তাহার স্থানে বিজয়ীদিগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাহারা নিজেদের জীবনে গড়িয়া তুলিতে পারে নাই—কারণ বিজয়ী জাতির ভাষা, শিক্ষানিকেতন ও মন্দির তাহাদের জন্য কখনো উন্মুক্ত হয় নাই।

পুণ্ড্র বর্দ্ধনে পাল রাজাদের রাজত্ব সময় অবশ্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব পুনরায় কিছুকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই বৌদ্ধ শাসন আর্য্য পূর্ব্ব বৌদ্ধ শাসন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

এই সময়ের ভিতরে বৌদ্ধেরাও অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন সংস্কৃতিকে ছাড়িয়া তাহারাও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অনুকরণে নিজেদের গড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। বৌদ্ধ রাজাদের রাজসভায় বাংলা হইতে সংস্কৃতের অধিক মর্য্যাদা দেখিয়া ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

মহাযানপন্থীদের আবির্ভাবে বুদ্ধের ধর্ম্ম অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মত হইয়া যায়। বৌদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে কোন দেবতা কিংবা উপদেবতার স্থান ছিল না। কিন্তু মহাযানপন্থীরা বৌদ্ধকে মানবের ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দৈবতার আসনে বসাইলেন। ইহার ফলে বৌদ্ধ ধর্ম্মেও পূজা-অর্চ্চনার সৃষ্টি হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পার্থক্য হইল শুধু দেবতা নির্ব্বাচনে ও পূজার পদ্ধতিতে।

পালরাজাদের সময় "বাঙ্গালাদেশের পণ্ডিতদের হাতে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য দর্শন ও অনুষ্ঠান লইয়া সংস্কৃত ভাষায় একটি বড় সাহিত্য গড়িয়া উঠে বটে, কিন্তু তখনও মাতৃভাষা বাংলা, রাজদরবারে উঁচু আসন পায় নাই। সংস্কৃত তখনো রাজভাষা এবং সংস্কৃত চর্চ্চার অধিকার বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণের। সুতরাং পালবংশের রাজত্ব কালেও দেশের জনসাধারণ মাতৃভাষার ভিতর দিয়া উচ্চশিক্ষা পাইবার কোনই সুযোগ পায় নাই, শৈবধর্ম্মের উপাসক সেনবংশের রাজত্বকালে যে পায় নাই তাহা না বলিলেও চলিতে পারে।

এমনিভাবে একটি বৃহৎ মানবসমষ্টি যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ মহেঞ্জোদারো হইতে পাটলিপুত্র ও পুন্ড্র বর্দ্ধন পর্য্যন্ত অসংখ্য সভ্যতার নির্দশন রাখিয়া গিয়াছে—যাহাদের দুর্দ্ধর্ষ বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া উত্তরাপথের আর্য্যগোষ্ঠি বহুযুগ তাঁহাদের পদানত ছিল-সেই বলিষ্ঠ উন্নত মানবগোষ্ঠি নয়শত বৎসরব্যাপী অবহেলায়, অশিক্ষায়, অবিচারে ক্রমে ক্রমে এমনি হীন দুর্নীতিপরায়ণ, বুদ্ধিহীন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুর্ব্বল জাতিতে পরিণত হইল যে, তাহারা যে কোনকালে সভ্য ছিল তাহা বুঝিবারও উপায় রহিল না।

বৌদ্ধ যুগে যে কিছুটা বাংলা ভাষার চর্চ্চা হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু

www.pathagar.com

বৌদ্ধযুগের পরে সে বংশের রাজত্বকালে অথবা পাল বংশের রাজত্বকালে বাংলা ভাষার যে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বৌদ্ধযুগের পর হইতে মুসলমান শাসনের কিছুকাল পর্য্যন্ত বাংলায় কোন উচ্চাঙ্গের রচনা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বাংলা সাহিত্য চর্চ্চার এই বন্ধ্যাকালকে সুনীতিকুমার ও সুকুমার সেন উভয়ে মুসলমান আক্রমণের ফল বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। সুনীতিকুমার লিখিয়াছেন- "বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইতে খ্রীষ্টিয় ১২৮০ পর্য্যন্ত হইল বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম বা আদিযুগ। তুর্কীদের বাংলা বিজয়ের কালে দেশের উপর দিয়া একটি ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। ১২০০ হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা দেশে সাহিত্য বা বিদ্যা চর্চ্চার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না।... এটি একটি যুগান্তরের কাল, দেশময় মারামারি, কাটাকাটি, নগর ও মন্দির ধ্বংস, অভিজাত বংশীয় ও পণ্ডিতদের উচ্ছেদ প্রভৃতি অরাজকতা চলিয়াছিল, এরূপ সময় বড়দরের সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব।"

সুকুমার সেন সুর আর একটু চড়াইয়া বলিয়াছেন "তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙ্গালীর বিদ্যা ও সাহিত্য-চর্চ্চার মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। প্রায় আড়াইশত বৎসরের মত দেশ সকল দিকেই পিছাইয়া পড়িল। দেশে শান্তি নাই সুতরাং সাহিত্য চর্চ্চা তো হইতেই পারে না। প্রধানতঃ এই কারণেই ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ এই দুই শতাব্দীতে রচিত কোন বাঙ্গালা পাওয়া যায় নাই।"

এর উভয় উক্তি হইতেই মনে হইতেছে তুর্কী আক্রমণের পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চ্চা ত হইতই এমনকি 'বড়দরের সাহিত্য'ও সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা তুর্কী আক্রমণের ফলে আর হইতে পারে নাই। ইহা হইয়া থাকিলে বাস্তবিকই সুখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ১০০০ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'বড় দরের সাহিত্য'টি কি এবং তুর্কী আক্রমণের ফলে কোন্ "সাহিত্য চর্চ্চার মূলে কুঠারাঘাত" পড়িয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা বড় সহজ নয়। কারণ বৌদ্ধযুগের দু'একটি বাংলা রচনা পাওয়া গিয়াছে তাহা ঠিক, তাহার পর হইতে তুর্কী আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ শাসনের যত্ন ও চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের যে যে উন্নতি ঘটিয়াছিল তাহা জানিতে না পারিলে-তুর্কী আক্রমণ কাহার মূলে কুঠারাঘাত করিল বুঝিতে পারা যাইবে না। যাহা ছিল না-তাহার যদি মূল থাকে তবে অবশ্যই সুকুমার সেনের কথা সত্য; আর যাহা ছিল না তাহা যদি বড় হয় তবে সুনীতিকুমারের কথা আরো বেশী সত্য। প্রকৃত পক্ষে বাংলা সাহিত্যের গতিকে যদি কেহ রুদ্ধ করিয়া থাকে তবে সে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধও নয় মুসলমানও নয়। প্রাচীন যুগে বাংলা ভাষার কি অবস্থা ছিল - তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। যে সামান্য চর্চ্চার আভাস বৌদ্ধ যুগে পাওয়া যায় তাহাও ব্রাহ্মণের প্রতাপে বন্ধ হইয়া যায়। পুনরায় যে দিন বাংলা সাহিত্যের বিকাশ নব উদ্যমে সম্ভব হয়, সেদিন ব্রাহ্মণ্য শাসন লুপ্ত হইয়াছে, সারা দেশ ব্যাপীয়া মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দীনেশ চন্দ্র লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ ভাষাগ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ইঁহারা "সর্ব্বনেশে" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদকগণের জন্য

www.pathagar.com

ইহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এদিকে গৌড়েশ্বরগণের সভায় সংস্কৃত পুরাণ পাঠ ও ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীর-এর ন্যায় পদাবলী প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত।... এই সমৃদ্ধ সভাগৃহে বঙ্গভাষা কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল?... আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

"It was the Muslim sultan rather than the Hindu raja that encouraged vernacular Literature."

মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বাংলা ভাষার এমন কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা সাহিত্য পদবাচ্য। বৌদ্ধ যুগের রচনা যে সামান্য কয়টি পাওয়া গিয়াছে - তাহা ধর্ম্মের দিক হইতে যতটা মূল্যবান সাহিত্যের দিক হইতে ততটা নহে, পালরাজাদের সময় যে সব মনসাদেবীর গান সারারাত জাগিয়া গ্রাম্য লোক গাইত তাহা সাহিত্য নয়-অশ্লীল গ্রাম্য সঙ্গীত। "They sang songs of Manasa Devi, and of Pal Kings for whole nights." তাছাড়া এই কালের "These songs, however generally speaking related to pastural life with all its crude love-makings." The tantrics not only became steeped in sexual vices but were dreaded for inhuman cruelties committed in the name of religion... Vicious Tantrics offered human sacrifices to Kali and danced with swords in hands before her image in horrid ecstacy."

এই সবকে যদি বলা হয় "বড় সাহিত্য ও উচ্চভাব যাহার মূলে তুর্কীরা কুঠারাঘাত করিয়াছিল", তবে অবশ্য বলিবার কিছুই নাই।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার পথ-পরিক্রম
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

লেখক -পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ২৫ অক্টোবর, ১৯০৬, লক্ষণশ্রী, সুনামগঞ্জ, সিলেট। পেশা ঃ অধ্যক্ষ, সুনামগঞ্জ কলেজ। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, আবুজর গিফারী কলেজ, ঢাকা। বর্তমানে অবসর।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তমুদ্দনের বিকাশ (১৯৪৯), ইতিহাসের ধারা (১৯৫২), সত্যের সৈনিক আবুজর (১৯৫২), জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম (১৯৫৯), দর্শনের নানা প্রসঙ্গ (১৯৭৭) প্রভৃতি। গল্প ঃ নতুন সূর্য (১৯৫৯)। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে এখনও লিখে যাচ্ছেন। জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে স্বীকৃতি ছাড়াও তিনি বহু জাতীয় পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হয়েছেন।

লেখা-পরিচিতি ঃ বাংলা ভাষার পথ-পরিক্রম, 'অগ্রপথিক' শহীদ দিবস সংখ্যা ১৯৮৮, ৩য় বর্ষ ৬ সংখ্যায়, প্রকাশিত। পরে 'অগ্রপথিক সংকলনঃ ভাষা আন্দোলন'-এ (প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৯৩) অন্তর্ভুক্ত।

এদেশে মুসলিম দরবেশদের বা সূফীদের আগমন আরম্ভ হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। তাঁদের সমসাময়িক আরব বণিকেরাও চট্টগ্রামের উপকূলে উপস্থিত হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের সংগে সংগে ইসলাম প্রচার করেছেন। তাঁরা খুব সম্ভব আরবী ভাষাভাষী লোকই ছিলেন। তবে প্রচার বা ব্যবসায়ের তাকিদে তাঁরা হয়তো এদেশীয় ভাষাও রপ্ত করেছেন। তাঁদের আগমনকালে ভারতসম্রাট ছিলেন হর্ষবর্ধন এবং বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন শশাংক। শশাংক ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী। এজন্য তিনি ইতিপূর্বে বাংলাদেশের আগত বৌদ্ধধর্মের উপস্থিতি মোটেই সহ্য করতে পারেন নি। তিনি নানাভাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নির্যাতন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় শতেক বছর বাংলাদেশে মাৎস্যন্যায় নীতি প্রচলিত ছিল অর্থাৎ জোর যার মুল্লুক তার। এ নীতির অনুসরণ করে প্রবল বা শক্তিশালী দুর্বলকে গ্রাস করতে পারতো। এ যুগের শেষে অষ্টম শতাব্দীতে পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাঁদের রাজত্বকালেই বিবর্তনের ধারায় বাংলা ভাষার উৎপত্তি। দেব ভাষা থেকে প্রাকৃত, পালি, শৌর সেনী প্রভৃতি স্তর পার হয়ে, বাংলা ভাষা তার আদি রূপ নিয়ে দেখা দেয়। পণ্ডিত হর প্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের মিউজিয়ামে যে বাংলাভাষার আদিরূপের পরিচয় পেয়েছেন-তাতে বৌদ্ধ চর্যাপদ রয়েছে। এতে সহজভাবেই ধারণা করা হয় বাংলা ভাষার আদি জনক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকেরা। তবে সে সময় বৌদ্ধ রাজাদের রাজত্ব থাকলেও শাসনকার্যে বাংলা ভাষা ব্যবহারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পাল বংশীয় রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে দিব্যক নামক এক সামন্ত সরদার নিহত করে সমগ্র বরেন্দ্রভূমি অধিকার করলে পাল রাজত্বের অবসান ঘটে। তবে অচিরেই বিদ্রোহী দিব্যককে উৎখাত করে একাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে সেন রাজগণ বংগদেশ অধিকার করেন। সেন রাজগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী। এজন্য তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী রাজা শশাংকের মত পুনরায় বৌদ্ধ নির্যাতনে আত্মনিয়োগ করেন। যেহেতু

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা দেব ভাষা থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছিল এবং তাতে বৌদ্ধদের অবদান ছিল সর্বপ্রধান, এজন্য তাঁরা এ ভাষাকে মোটেই আমল দেয়নি। তাঁদের রাজসভায় গীত-গৌড় গোবিন্দ দাসের রচয়িতা জয়দেব সংস্কৃত ভাষার এক নতুন রীতির প্রচলন করেছিলেন। তা এখনও সুধীমহলে গৌড়ীরীতি নামে প্রচলিত। তাতে দোষী প্রমুখ আরও কবিদের উপস্থিতি থাকলেও তাঁরা সকলেই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে তাদের ভাব প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা ভাষা ছিল ইতরজন বা সর্বসাধারণের ভাষা। অবিভক্ত বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে সপ্তম শতাব্দী থেকে সূফী-দরবেশদের আগমনের পরে তাঁরা তাঁদের বাসস্থানে বা আস্তানায় খানেকাহ্ বা আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে সে অঞ্চলের লোকদের ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করতেন। যেহেতু সমগ্র অঞ্চলই ছিল বাংলা ভাষাভাষী। খুব সম্ভব তাঁরা কুরআন-উল করীম ও হাদীস শরীফের নানা বাণীকে এদেশীয় ভাষার মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রচার করেছেন।

১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখ্তিয়ার খিলজী কর্তৃক এদেশ অধিকৃত হলে এদেশীয় মুসলিম সুলতানদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁরা রাজভাষা হিসাবে ফারসীকে গ্রহণ করেন। তেমনি ধর্মীয় ভাষা হিসাবে আরবীকে এবং তাঁদের খাসমহলে তাঁদের মাতৃভাষা তুর্কীকে বজায় রাখেন। তবে সর্ব সাধারণের মধ্যে প্রচলিত বাংলা ভাষাকে তাঁরা অবজ্ঞা করেন নি। তখনকার দিনে যারা বাংলা ভাষার চর্চা করতো, তাদের উৎসাহ দান করেন। তাঁদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রাচীন যুগের কবিগণ কাব্য রচনা করতে প্রবৃত্ত হন। এ সুলতানগণের মধ্যে গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দীন (যাঁর কবর সোনার গাঁয়ে বর্তমান) এবং সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। সুলতান গিয়াসউদ্দীন কেবল বাংলা ভাষার লোকদের কাছেই প্রিয় ছিলেন না, তিনি ব্রজবুলি ভাষার সুপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতির নিকটও অতিশয় প্রিয় ছিলেন। তার নিদর্শন বিদ্যাপতির কাব্যে রয়েছে। সে যুগে এদেশে মুসলিম সুলতানদের রাজত্ব থাকার ফলে তাঁদের দ্বারা ব্যবহৃত আরবী, ফারসী ও তুর্কী শব্দাবলী অবলীলাক্রমে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে। বাংলা ভাষায় সে যুগের লেখকদের মধ্যে যদিও হিন্দু সমাজের লোকেরাই অগ্রণী ছিলেন, তবুও তাঁদের লেখায়ও যথেষ্ট আরবী, ফারসী ও তুর্কী শব্দের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে মুসলিম সুলতানদের আধিপত্য বঙ্গদেশে থাকলেও তাঁরা দিল্লীর সুলতানদের অধীনে ছিলেন বলে এবং দিল্লীর সুলতানদের সংগে বাংলা ভাষার তেমন কোন যোগ না থাকার ফলে বাংলা ভাষা রাজসভায় মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। বাংলা ভাষা পূর্বাপর বংগদেশের নাগরিকদের কথ্য ভাষার পর্যায়ে থেকে যায়।

বাংলা ভাষার মুসলিম কবিগণের রচনা আরম্ভ হয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। তাঁদের কাব্য পাঠে দেখা যায় তাঁরা বেমালুম আরবী, ফারসী শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। এতে যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করার কারণ রয়েছে যে, তখনকার দিনে এ দেশীয় মুসলিম সমাজে এ দেশীয় ভাষা ছিল জীবন্ত। যেহেতু এ সকল কবিদের অধিক সংখ্যক লোকেরাই ছিলেন পল্লীবাসী, এজন্য তাঁদের পক্ষে আরবী বা ফারসী লেখক বা অভিধান

www.pathagar.com

সামনে রেখে কাব্য রচনা করা সম্ভবপর ছিল না। অপরদিকে যদিও হিন্দু সমাজে আরবী ফারসীর এরূপ চর্চা ছিল না, তবু দীর্ঘকাল ফার্সীকে রাজভাষা হিসাবে গ্রহণ করার ফলে তাঁদের কথ্য ভাষায় অনেক আরবী, ফারসী শব্দাবলী প্রবেশ লাভ করেছিল। ১৭৫৭ সাল থেকে এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সূচনা থেকে ১৯৪৭ সালে এদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত যেভাবে নানাবিধ ইংরেজী শব্দ আমাদের কথ্য ভাষায় বা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে, তেমনি মুসলিম সুলতানদের দীর্ঘ পাঁচশ' বছরের রাজত্ব কালে অসংখ্য আরবী ও ফারসী শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। এখনও পুরাতন দলিল দস্তাবেজের ভাষা পাঠ করলে বোঝা যায়–তখনকার দিনের বাংলা ভাষায় পূর্বোল্লেখিত কত শব্দের প্রয়োগ রয়েছে।

ইংরেজরা অত্যন্ত চতুর জাতি হিসাবে রাজ্য লাভের সংগে সংগেই পুরাতন ধারার পরিবর্তন করেনি। ধীরে ধীরে তাদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এক একটা করে নতুন ব্যবস্থার প্রয়োগ করে এদেশীয় মুসলিম সমাজকে পর্যুদস্ত করেছে। সর্ব প্রথম ১৭৬৩ সালে দিল্লীর নামেমাত্র বাদশাহ্ শাহ্ আলমের নিকট থেকে দেওয়ানী সনদ গ্রহণ করে মুসলিম আমলাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়, তার ফলে বাদশাহী আমলের রাজস্ব বিভাগের লোকদের অপসারণ করে তাদের স্থানে হিন্দু কর্মচারী ও আমলা নিয়োগ করে একটা মস্ত বড় শ্রেণীকে বেকার করে ফেলে। তার অব্যবহিত পরে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার প্রবর্তন করে আবার মুসলিমদের জীবনে ভীষণ সংকটের সৃষ্টি করে। বাদশাহী আমলে জমিদার বা চৌধুরীগণ জমির মালিক ছিলেন না। তারা ছিলেন সরকারের অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। জমিদারগণ এক বা একাধিক পরগণার শাসন নির্বাহ করতেন। চৌধুরীগণ ছিলেন কর আদায়কারী অফিসার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ পুরুষানুক্রমে জমির মালিক হয়ে পড়েন। লর্ড কর্ণওয়ালিশের শাসনকালে তাঁর অধীনস্থ মুসলিম আমলাদের নানাভাবে পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে জমি বন্দোবস্ত দেয়ার সময় হিন্দুদের নামেই অধিক তালুক বন্দোবস্ত দিয়েছেন। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সুলতানী আমলে মুসলিম জমিদারদের কর্মচারী–কোম্পানী আমলে মুন্সি বেনিয়া বা মুৎসুদ্দি। তার ফলে পুরনো আমলের সরকারী আমলাদের যেমন পদচ্যুতি হয়, তেমনি সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে তাদের সর্বনাশ হয়। তবে কোম্পানী সরকার এখানেই থেমে যায়নি। ১৮৩৭ সালে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজীকে অফিস আদালতের ভাষা হিসাবে প্রবর্তন করে, মুসলিম আমলে যারা ফারসী ভাষাভিজ্ঞ বা যারা ফার্সী-নবিস হিসাবে অফিস আদালতে যথেষ্ট উপার্জন করতে সমর্থ ছিলেন, তাদের জীবনকে নিতান্ত অসহনীয় করে তোলে। ইংরেজদের এই দারুণ জুলুমের সর্বশেষ উদাহরণ দেখা দেয় ১৮৪৭ সালে Rosumption বা বাজেয়াপ্ত আইন পাস করার ফলে। এ আইনের কবলে পড়ে মুসলিমদের বরাবরে সুলতানী বা নওয়াবী আমলে যতগুলো জায়গা, জায়গীর, চেরাগী বা ওয়াকফ্ সম্পতি ছিল তা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। এ বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি পরিশেষে হিন্দুদের বরাবরে বন্দোবস্ত হয়। ইংরেজ শাসকগণ কর্তৃক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মুসলিমদের এভাবে নাস্তানাবুদ করার পূর্বে ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার

www.pathagar.com

পরে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে চরম দুর্বিপাক দেখা দেয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল সদ্য-নিযুক্ত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখাবার উদ্দেশ্য। এজন্য পণ্ডিত রামজয় তর্কালংকার, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আদর্শপাঠ্য পুস্তক লেখার জন্য আহ্বান করা হয়। তারা কোম্পানী সরকারের নির্দেশক্রমে এমন সব পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন যে গুলোকে অনুস্বর-বিসর্গবর্জিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক বলা যায়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত সীতার বনবাস, কথামালা প্রভৃতি পুস্তক পাঠে এ বক্তব্যের সত্যতা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে।

মুসলিম সমাজ এ ভাষাকে তাদের নিজস্ব ভাষা বলে গ্রহণ করেনি। তারা এতদিন পর্যন্ত যে ভাষার আওতায় লালিত-পালিত হয়েছিল, সদ্য প্রস্তুত ভাষার মধ্যে তার কোন দূর সম্পর্কও আর আবিষ্কার করতে পারেনি। কাজেই এ ভাষাই স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ভাষা হলেও তা বাংগালী হিন্দুদের ভাষা হিসেবেই এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকার লাভ করলো। যদিও এ ভাষার প্রতিবাদস্বরূপ প্যারী চাঁদ মিত্র, টেকচাঁদ ঠাকুরের ছদ্মনামে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতুম প্যাঁচার নক্শা' বলে দু'খানা সুখপাঠ্য পুস্তক লিখেছিলেন, তবুও তার ভাষা স্কুল-কলেজের পুস্তকাদিতে কোন স্থান পায়নি। মুসলিম সমাজের লোকদের পক্ষে ইংরেজদের দ্বারা স্থাপিত স্কুল-কলেজ বর্জন করার ফলে এ ভাষার বিভ্রাট ছিল আরও একটি কারণ। অপর কারণ ছিল তারা তাদের এ দুশমনদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকার জন্য ছিলেন বদ্ধপরিকর।

অবিভক্ত ভারতের বুকে দিল্লীর সম্রাট বুলবনের শাসনকালে উর্দু ভাষার উৎপত্তি হয়। তাঁর সভাকবি আমির খসরু ফার্সী ভাষার সংগে দিল্লীর চতুর্দিকে প্রচলিত সড়িবুলের যোগসাজশ করে যে ভাষার সৃষ্টি করেন তাই কালে শনৈঃ শনৈঃ বিকাশ লাভ করে, উর্দু ভাষায় পরিণত লাভ করে। যদিও বাদশাহী বা নওয়াবী আমলে উর্দু ভাষা রাজভাষার মর্যাদা লাভ করেনি, তবুও নানা অঞ্চলের প্রতিভাশালী লেখকগণের অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে এ দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই উর্দু ভাষা এক উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়। ইংরেজ শাসনের সূচনায় কোলকাতা রাজধানী স্থাপিত হলে, অবিভক্ত ভারতের নানা অঞ্চল থেকে নানা ভাষাভাষী মুসলিম সমাজের লোকেরা নানা কর্ম উপলক্ষে কোলকাতাতে এসে বাস করতে বাধ্য হন। তারা একে অপরের ভাষা বুঝতে পারতেন না বলে তাদের সাধারণভাষা Lingua Franca হিসাবে উর্দুকে গ্রহণ করেন। ফলে উর্দু তাদের মাতৃভাষায় পরিণত হয়।

অপরদিকে ফার্সী ভাষাকে স্থানান্তর করার ফলে মুসলিম সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা ফার্সীর স্থলে উর্দুকে তাদের সংস্কৃতির ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন। কোলকাতা রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মফস্বলের লোকদের পক্ষে কোলকাতার তমদ্দুনের অনুকরণ করা ফ্যাশনে পরিণত হয়; এজন্য একদিকে যেমন হিন্দু সমাজের লোকেরা কোলকাতার মুসলিমদের হাবভাব, ভাষা প্রভৃতির অনুকরণ করতে অভ্যস্ত হয়, তার ফলে বাংলাদেশের মধ্যে তৎকালীন মুসলিম প্রধান অঞ্চলের উঁচু মহলে রীতিমত উর্দু ভাষার চর্চা ও উর্দুতে পুস্তক-পুস্তিকা প্রণয়নের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, চট্টগ্রাম,

www.pathagar.com

মোমেনশাহী, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলের জেলা সদরে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত চালু ছিল।

একে তো নব-গঠিত বাংলা ভাষার প্রতি মুসলিম সমাজের মোটেই আস্থা ছিল না, অপরদিকে মুসলিম সমাজের উঁচু মহলে উর্দুর চর্চা ব্যাপকভাবে দেখা দেওয়ায় নব-গঠিত বাংলা ভাষার সমাদর মুসলিম সমাজে ছিল না। নওয়াব আবদুল লতীফের মত নেতাকেও বাংলা ভাষার প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করতে দেখা যায় নি। নওয়াব আবদুল লতীফের পরে যে সব জননেতা কর্তৃক মুসলিম সমাজ পরিচালিত হয়েছিল তাদের মানসেও এ দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল ছিল। ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ্ তথা তাঁর পরিবারের লোকেরা উর্দু ভাষাভাষী ছিলেন। এমন কি শের-ই বাংলার ঘরোয়া ভাষা ছিল উর্দু। এঁরা সকলেই বাংলার চেয়ে উর্দু ভাষাকেই অধিকতর পছন্দ করতেন। এঁদের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের মধ্যে অধিকাংশের বার্নাকুলার ছিল উর্দু। সিলেটের মরহুম সৈয়দ আবদুল মজিদ খান (খান বাহাদুর ও সি আই ই) তখনকার দিনে আসামের সর্বজনমান্য নেতা ছিলেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইনের ডিগ্রীও লাভ করেছিলেন। তবে ডিগ্রী শ্রেণী পর্যন্ত ভার্নাকুলার হিসাবে তিনি উর্দুকে গ্রহণ করেছিলেন।

১৯১৯ সালে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমন্ত্রিত হয়ে সিলেট আগমন করলে বিপুল সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। এ সম্বর্ধনা সভার সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আবদুল মজিদ। তিনি তাঁর ভাষণ উর্দু ভাষায় পাঠ করেছিলেন। এতে স্পষ্টই বোঝা যায় নওয়াব আবদুল লতীফের ঘোষণার পূর্বেই মুসলিম সমাজের মধ্যে একটা ভাগ দেখা দিয়েছিলো। একদল উর্দুকেই তাদের ভার্নাকুলার হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার প্রতি মুসলিম সমাজের ঝোঁক দেখা দেয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে। যদিও উঁচু মহলে বাংলার আদর ছিল না। তবুও পল্লী অঞ্চলের মুসলিম কবিগণ পূর্বাপর বাংলার মাধ্যমেই তাদের মনে ভাব প্রকাশ করেছেন। তবে শহুরে অঞ্চলে তাদের নাম ধাম সম্বন্ধে অনেকেই ছিলেন অজ্ঞ। এ পল্লী অঞ্চলের মুসলিম জনসাধারণকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে যশোরের বুকে পাদরী সাহেবগণ যে উৎপাত আরম্ভ করেন, তাকে প্রতিহত করার মানসে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ নবগঠিত বাংলা ভাষায় ছোট ছোট পুস্তিকা প্রণয়ন করতে থাকেন। মুসলিম জনসাধারণের মনে আবার ইসলামের আলোক প্রতিভাত হয়। তাঁর এ শুভ সূচনার পরে মীর মশাররফ হোসেন 'বিষাদ সিন্ধু' নামক সুবিখ্যাত উপন্যাস রচনা করে মুসলিম মনীষাকে বাংলা ভাষাপ্রবণ করে তোলেন। এভাবে মরহুম মাওলানা আকরম খাঁ, মরহুম মাওলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মরহুম মাওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ও তাঁর ভাই মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী বাংলার মাধ্যমে ইসলামের নানাবিধ বিষয় পাঠক সমাজে পেশ করতে থাকলে ক্রমশঃ মুসলিমদের তথাকথিত অভিজাত মহলেও বাংলা ভাষাপ্রীতি দেখা দেয়। তবে নজরুলের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সত্যিকারভাবেই মুসলিমদের ভাষা কি-না এ সম্বন্ধে উচ্চ মহলে জমাট-বাধা সন্দেহ ছিল।

www.pathagar.com

কাজেই ভারত বিভাগের পরে কেবলই যে পশ্চিম দেশীয় মুসলিমেরা উর্দুকে এদেশের বুকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল তা নয়, উর্দুর সমর্থক বাংলাদেশের মধ্যেও উপস্থিত ছিলেন। এদের বক্তব্য ছিল, অবিভক্ত ভারতের বুকে যখন একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, ভারতের সাধারণ ভাষা কোনটা? তখন কংগ্রেস তথা হিন্দু সমাজের সকল লোকই একবাক্যে বলেছিল, হিন্দী। অপরদিকে মুসলিম সমাজের লোকেরা বলেছিল উর্দু। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সারা ভারতের রাষ্ট্রভাষা যদি হিন্দী হতে পারে তবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে না কেন? যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় বলে উর্দুকে গ্রহণ করতে আপত্তি দেখা দেয় তা হলে অবিভক্ত ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসাবে হিন্দীকে গ্রহণ করতে আপত্তির কারণ ছিল কি? তাদের অপর যুক্তি ছিল, দেশ বিভাগ হচ্ছে ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে, কাজেই আরবী অক্ষরে লিখিত এবং ইসলামী ভাবধারায় বাংলা থেকে অধিকতর অনুরঞ্জিত উর্দু ভাষাকে প্রত্যাখ্যানের মূলে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করা ব্যতীত কি থাকতে পারে? তখনকার দিনে পাকিস্তানী শাসকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অত্যন্ত স্পর্ধার অধিকারী। এদের বাসনা ছিল ইংরেজরা যেভাবে এদেশ শাসন করে গেছে, তারাও ইংরেজদের উত্তরাধিকারী হিসাবে এ দেশ শাসন করবেন। উর্দু রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে মর্যাদা লাভ করলে, তাদের ছেলেমেয়েরা অবাধে সে ভাষার দক্ষতা অর্জন করে শাসিতের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারবে।

তবে এদের এ যুক্তির ভিত্তিও সুদৃঢ় ছিল না। বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে উর্দুর পার্শ্বে স্থান দান করলে ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদের মূলে কোন ফাটল দেখা দেওয়ার কারণ ছিল না। কারণ বিভিন্ন দেশে মুসলিম সমাজের লোকেরা অবস্থান করে বিভিন্ন ভাষায় কথা বললেও তাদের জীবনে আদর্শিক ঐক্যের ত্রুটি দেখা দেয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কুরআন-উল-করীমের অক্ষরে উর্দু ভাষা লিখিত হলেও তা যে সর্বোতভাবে ইসলামী আদর্শেই গঠিত হয়েছে তাও বলা যায় না। বাংলা ভাষাও ইসলামী আদর্শে গঠিত হতে পারে।

কাজেই যাঁরা ভাষা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং যাঁরা এ আন্দোলনে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁরা এ ভাষাকে তৃতীয় সংকট থেকে মুক্ত করেছেন। বাংলা ভাষার প্রথম সংকট দেখা দিয়েছিল সেন রাজাদের রাজত্বকালে। তারা কিছুতেই এ ভাষাকে যথাযথভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেননি। বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সংকট দেখা দিয়েছিল, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে। পণ্ডিতদের হাতে এ ভাষা অস্বাভাবিক রূপ লাভ করেছে। বাংলা ভাষার তৃতীয় সংকট দেখা দিয়েছিল, যখন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করা থেকে বঞ্চিত হতে চলেছিল। যে দূরভিসন্ধি এ বাংলাদেশের বুকে উর্দুকে প্রতিষ্ঠিত করে মুসলিম সমাজেও তথাকথিত আশরাফ্ ও আত্‌রাফ শ্রেণী সৃষ্টি করে এ সমাজকে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল, তাকে নস্যাৎ করেছেন বলেও সে আন্দোলনের হোতা ও আত্মদানকারীগণ আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা

সৈয়দ আলী আহসান

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ২৬ মার্চ, ১৯২২, আলোকদিয়া, যশোর। শিক্ষা ঃ এম. এ. (ইংরেজী), ১৯৪৪। পেশা ঃ উপাচার্য, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়; উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান। বর্তমানে অবসর। জাতীয় অধ্যাপক।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কবিতা ঃ অনেক আকাশ (১৯৫৭), একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬৩), উচ্চারণ (১৯৬৮), সহসা সচকিত (১৯৬৮), আমার প্রতিদিনের শব্দ (১৯৭৩) প্রভৃতি। প্রবন্ধ ঃ কবিতার কথা (১৯৫৩), কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা (১৯৬৮), নজরুল ইসলাম (১৯৫২), কবি মধুসূদন (১৯৬৪), Essays in Bengali Literature (1958.) আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ শব্দের অনুষঙ্গে (১৯৭০) প্রভৃতি। গবেষণা ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (মুহম্মদ আবদুলহাই সহযোগে (১৯৫৬)। অনুবাদ ঃ প্রেমের কবিতা (১৯৫৮), ইডিপাস (১৯৬২), হুইটম্যানের কবিতা (১৯৬৫), ইকবালের কবিতা (১৯৬২), ইভান গলের কবিতা। সম্পাদনা গ্রন্থ ঃ পদ্মাবতী (১৯৬৮), মধুমালতী (১৯৭১, তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আশিটির উর্ধে। পুরস্কার ঃ কবিতায় বাংলা একাডেমী পুরস্কার, দাউদ সাহিত্য-পুরস্কার, বাংলা সাহিত্য পরিষদ গুনীজন সম্বর্ধনা ও পদকসহ বহু জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

লেখা-পরিচিতি ঃ 'কলম' ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।

মানুষের জীবন তার ভাষার সাথে অঙ্গীকার-বদ্ধ। ভাষাকে গ্রহণ করেই মানুষ, মানুষের প্রকাশ, মানুষের অভিব্যক্তি, মানুষের অগ্রসরমানতা, মানুষের জীবনযাপন সব কিছুই কিন্তু তার ভাষাকে কেন্দ্র করে। অবশ্য সমগ্র পৃথিবীতে একই ভাষা বিদ্যমান নেই। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ভাষার সীমাবদ্ধতার ফলেই এক-একটি ভাষার প্রকাশ-রূপ এক এক রকম হয়ে থাকে। কিন্তু গুরুতরভাবে আমরা যদি পরীক্ষা করি এবং বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাই, মানুষের যে অভিব্যক্তিগুলো সে অভিব্যক্তি সর্বক্ষেত্রেই এক। বেদনার-অভিব্যক্তি, আনন্দের অভিব্যক্তি, উল্লাসের অভিব্যক্তি, হতাশার অভিব্যক্তি—যত রকম অভিব্যক্তি আছে সেই অভিব্যক্তিগুলো কিন্তু সব জায়গায় একই। কিন্তু অভিব্যক্তির ভাষার রূপ এক এক অঞ্চলে এক এক রকম। তাহলে আমার বক্তব্য যেটা সেটা হচ্ছে এই, মানুষ ভাষাকে গ্রহণ করেই বেঁচে থাকে, ভাষাকে গ্রহণ করেই তার উপলব্ধি, ভাষাকে গ্রহণ করেই তার স্বস্তি, এবং তার সম্ভ্রম, তার প্রকাশ। ভাষাকে অস্বীকার করে কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। আমাদের বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একটা কথা বলা যায় যে, বহুদিন, বহু আগে থেকেই বাংলা ভাষার উদ্ভব যখন, তখন থেকেই বাংলা ভাষার কবি এবং সাধকরা এ ভাষার উন্নয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং এ ভাষার মাধ্যমে তাদের ধর্মীয়বোধকে, তাদের চিন্তাকে তারা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। আমরা এর প্রথম নিদর্শন পাই সরহপার দোহাকোষে, সরহপা আমাদের এই বাংলাদেশেরই কবি। যে এলাকা নিয়ে আজ বাংলাদেশ, সেই এলাকারই পূর্বাঞ্চলের দিকে কোন একটি জায়গায়

www.pathagar.com

তার জন্ম হয়েছিল। স্পষ্টভাবে তিনি বলেননি কোথায় তার জন্ম হয়েছিল। তিনি পূর্বদিশার কথা বলেছেন। তৎকালীন ভারতবর্ষের মধ্যে পূর্বদিশা বলতে বাংলাদেশের এই অঞ্চলকেই বুঝায়। যাই হোক সে সময়ে এ অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অনেক সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। এবং জৈনদের অনেক ধর্মগ্রন্থও সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। সেই সময় সরহপা এলেন, তিনি সংস্কৃতের একজন বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃততেও লিখেছেন অনেক কিছু। কিন্তু তিনি অকস্মাৎ উপলব্ধি করলেন যে, সাধারণ মানুষের কাছে পৌছতে হলে তাকে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বরকে জানতে হবে এবং তার কণ্ঠস্বরের সাথে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বরকে মেলাতে হবে। তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও এই সাধনা করে গেছেন। তিনি ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। পরে সকলের একজন হবার জন্য তিনি বৌদ্ধ হলেন, বৌদ্ধ হয়েও তিনি পরিচিতি লাভ করলেন না। তিনি দেখলেন বহু মানুষ নিম্নশ্রেণীর এবং সমাজে অশিক্ষিত। ডোম, চণ্ডাল, মুচি-এ রকম আরো আছে। তিনি তাদের মধ্যে চলে গেলেন এবং একটি ডোম রমণীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করলেন, নিজের সঙ্গীনী হিসাবে গ্রহণ করলেন। সকল মানুষ এই রকম একজন মহাপুরুষ, একজন বিরাট সাধক, বিরাট কবি তার এই অধঃপতন দেখে রাজা পর্যন্ত বিচলিত হলেন, সেই সময়কার রাজা। শেষে রাজা তাকে ফিরে আনবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি ফিরে আসেননি। তিনি বলেছিলেন,

'আমার গৃহ হচ্ছে সাধারণ মানুষের গৃহ, আমার দরজা সাধারণ মানুষের দরজা, সাধারণ মানুষ এই গৃহে প্রবেশ করবে। সাধারণ মানুষ প্রবেশ করতে পারে না, এই রকম গৃহে আমি বাস করতে পারব না।'

এই সাধারণ মানুষের কাছে এগিয়ে সরহপা সাধারণ মানুষের ভাষায় কবিতা লিখলেন। তার সেই সময়কার ভাষা ছিল অপভ্রংশ। যখন এই অপভ্রংশটা কোন অঞ্চলভিত্তিক, মানে অঞ্চলের ভৌগোলিক নামকরণভিত্তিক কিন্তু নয়। অপভ্রংশটা পূর্বে অপভ্রংশ, পশ্চিমে অপভ্রংশ, দক্ষিণে অপভ্রংশ—এই রকমভাবে নামাঙ্কিত হয়েছে। তাতে একটা সুবিধা হয়েছে যে, পশ্চিমাঞ্চল সুস্পষ্টভাবে কোনটা তা না জানলেও আমরা বুঝতে পারি যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, তারপরে পাঞ্জাব এ সমস্ত এলাকা মিলে পশ্চিমীয় অপভ্রংশের জায়গা আর পূর্বে অপভ্রংশ হচ্ছে আসাম, বাংলা ইত্যাদি। এই পূর্বীয় অপভ্রংশতে তিনি তার কাব্য রচনা করেছেন। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে, এই পূর্বীয় অপভ্রংশই বাংলা ভাষার আদিরূপ। কেননা বাংলা ভাষা, পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার যে রূপটা আমরা পাই সে রূপটা পূর্বীয় অপভ্রংশের মধ্যেই প্রথম লক্ষ্য করি। যেমন অন্য ভাষার রূপের মধ্যে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন এ রূপটা আছে, কিন্তু পূর্বীয় অপভ্রংশের মধ্যে আমরা পাই একবচন এবং বহুবচন। বাংলাতেও একবচন এবং বহুবচন। তাছাড়া এই যে 'দন্ত্য-স, মূর্ধন্য-ষ', এই 'স'-এর উচ্চারণের মধ্যে বাংলাতে যে উচ্চারণটা এসেছে পূর্ব অপভ্রংশের মধ্যে অবিকল সেই উচ্চারণটা আছে। এবং গঠনপ্রকৃতির দিক থেকে পূর্বীয় অপভ্রংশের সঙ্গে বাংলার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এই সূত্রে একটি কথা বলে নেওয়া ভাল যে, পালরাজত্বের ধ্বংসের

www.pathagar.com

পর যখন বহিরাগত সেনরা এল, তখন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তারা দূরে সরে গেল। এবং সাধারণ মানুষের ভাষাকে বিনষ্ট করবার চেষ্টা করল— সংস্কৃত ভাষা এই দেশের উপর আরোপ করে। এখানকার সাধারণ মানুষ সংস্কৃত ভাষাটা বুঝত না। সুতরাং সংস্কৃত ছন্দ, সংস্কৃত গান— এই সমস্ত নৃত্য— এগুলো আরম্ভ করে তারা সংস্কৃত প্রচলনের প্রয়াস করে। পরবর্তীকালে যখন মুসলমানরা এলেন, তখন মুসলমানরা আবার সাধারণ মানুষের ভাষার উন্নতির দিকে লক্ষ্য দিলেন। এই যে ভাষা, আমরা আমাদের জীবন-কথা অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের জীবন-কথা যদি আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই— আমাদের বিকাশের প্রথম সময় থেকেই অদ্যবধি আমরা আমাদের মাতৃভাষার প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছি। এবং এই মাতৃভাষার মধ্যে দিয়েই আমাদের জীবনের প্রকাশ, জীবনের প্রতিষ্ঠা, জীবনের অগ্রসরতা। এই মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে আমরা কখনো নিজেদের প্রকাশ করতে পারব না, আর নিজেদের কখনো গুরুত্ব দিতে পারব না। আমরা দেখেছি আলাওল মাতৃভাষায় যে কাব্য রচনা করলেন— বাংলা কাব্য, সেটা একটা অসাধারণ, অনন্য সাধারণ কাব্য হয়ে দাঁড়াল। সেই পদ্মাবতী, পদ্মাবতীর মধ্যে তিনি যদিও সুফীতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস পেয়েছেন কিন্তু সেখানেও দেখা যায়— এবং সেখানে রাজা, রাণী, এবং রাজদরবারের অমাত্যদের কথা আছে। কিন্তু এ কথার মধ্য দিয়েও সাধারণ মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছে। এবং সাধারণ মানুষকে কাছে টেনে নেয়ার একটা প্রয়াস আলাওল করেছেন। এভাবে দেখা যায়, বাংলা ভাষা আদি থেকেই মানুষের ভাষা, সাধারণ মানুষের ভাষা। বাংলা ভাষা এমন কোন ভাষা নয়, যে ভাষায় সাধারণ মানুষের ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে অন্য উচ্চারণ মিলবে না। কথাটা হচ্ছে, আর একটু সুস্পষ্টভাবে বলি, অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই অতীতে শালীন-সম্ভ্রান্ত একটা ভাষার উচ্চারণগত রূপ ছিল। আবার সাধারণ মানুষের উচ্চারণেরও একটা রূপ ছিল। তাই যখন সংস্কৃত ভাষা এ দেশে প্রচলিত হলো, সাহিত্যের ভাষা হিসাবে ভারতবর্ষে, তখন দেখা যায় এ ভাষায় কিন্তু সাধারণ মানুষ কথা বলতো না। এ ভাষা ছিল ব্রাহ্মণদের ভাষা, এ ভাষা ছিল রাজাদের ভাষা, এ ভাষা ছিল মন্ত্রীদের ভাষা, অমাত্যদের ভাষা। কালিদাসের নাটকগুলো পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাই যে, কালিদাস তার নাটকের মধ্যে কয়েক রকমের ভাষা দেখিয়েছেন। সাধারণ মানুষ মানে বিদুষক, জেলে, রমণী এবং এই ধরনের মানুষ যারা তারা কিন্তু বলছে প্রাকৃত ভাষায় অর্থাৎ রমণীরা বলছে মাগধি প্রাকৃতিতে, তারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলছে না। সংস্কৃত ভাষায় কথা বলছে কিন্তু রাজা, রাজার প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী এবং রাজার অনুচরবৃন্দ, এরা। তাতে দেখা যায়, সাধারণ মানুষের যে একটা ভাষা ছিল সে ভাষার সম্মান কিন্তু কালিদাসও করেছেন। অতীতের সমস্ত পণ্ডিতরাই এটা করেছেন। এর প্রথম সম্মান দেখালেন অবশ্য সরহপা। সংস্তৃততে লেখা বন্ধ করে তিনি এদেশের মানুষের ভাষায় লেখা আরম্ভ করলেন। যাই হোক, আমি ইতিহাস আলোচনা করছি না। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের জীবনধারার সংগে, আমাদের জীবনচর্চার সংগে, আমাদের ভাষার চর্চা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি যদি ধর্মের দিক থেকে পরীক্ষা করি, তাহলে দেখতে পাই যে, ধর্মটা যেখানে আবির্ভূত হয়েছে, একটি ধর্ম

www.pathagar.com

মধ্যপ্রাচ্যের ধর্ম বলেই ধরি, যে অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছে সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের যে কথা, সাধারণ মানুষের যে বুলি, সাধারণ মানুষের যে উচ্চারণ— সেই উচ্চারণেই তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো তৈরী হয়েছে। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ যাকে আমরা তৌরাত বলি। তৌরাত সম্পর্কে একথা বলা যায়, কোরআন শরীফ সম্পর্কেও এ কথা বলা যায়। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মানুষের কথায় মানুষের কণ্ঠস্বরে, মানুষের সংগে কথা বলেছেন। মাতৃভাষা যে কত গুরুত্বপূর্ণ এইগুলোর দ্বারাই বুঝা যায়। আল্লাহ তায়ালা এমন এক আশ্চর্য ভাষায় কথা বলেননি, যে ভাষা সাধারণ মানুষের ভাষা নয়।

কিছু কিছু জায়গায় যেমন প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যখন বেদ রচিত হয়, তখন ব্রাহ্মণরা এমন এক ভাষায় তাদের বেদ রচনা করেছিলেন, যে ভাষাটা কিন্তু সেই সময়ের সাধারণ মানুষের ভাষা ছিল না। একটা অস্বাভাবিক ভাষা আরোপ করা হয়েছিল সেই সময়। যারা নির্মাণ করেছিলেন তারা পবিত্রতার সন্ধান করেছিলেন। এমন একটা ভাষা তাদের জন্য দরকার ছিল, যে ভাষা সাধারণ অবস্থা থেকে উর্ধতর। যে ভাষা অনেক উচ্চমানের ভাষা কিন্তু আমরা তৌরাত এবং কোরআন শরীফ দেখে বুঝতে পারি আল্লাহ তায়ালার ভাষাও উচ্চমানের ভাষা কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাষাটাকে তিনি গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেছেন। এই যে প্রবণতা, এই প্রবণতা দ্বারা একটি সত্য প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে এই যে, ভাষার সঙ্গে মানুষের জীবন চূড়ান্তভাবে অঙ্গীকার-বদ্ধ।

আমি একটি ইতিহাসের কথা বলব, ইউরোপের, সেটা হচ্ছে বুলগেরিয়ার। বুলগেরিয়া বহুদিন পর্যন্ত ওসমানী তুর্কীর অধিকারে ছিল। তুর্কীরা বুলগেরিয়াকে শাসন করত। বুলগেরিয়ায় স্বায়ত্তশাসন বলতে কিছু ছিল না। পুরোপুরিভাবে তুরস্ক থেকে এদের শাসন করা হতো, তুরস্কের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক গভর্নর নিযুক্ত করত। এবং সেখানে তারা যে ভাষণ আরম্ভ করেছেন, যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন সে ভাষা হচ্ছে তুর্কী ভাষা, আরবী হরফে লেখা, পুরনো দলিল-পত্রের মধ্যে এর নিদর্শনগুলি পাওয়া যায়। কিন্তু যখন স্থানীয় অধিবাসীরা, তারা ওসমানী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করল, তখন তাদের ভাষার প্রয়োজন হলো। তখন তারা তো তুর্কীদের ভাষায় কথা বললে, তুর্কীরা জানতে পারবে। সুতরাং তাদের গির্জার মধ্যে দু'জন গির্জা-ভ্রাতা-পাদ্রী-ভ্রাতা নেথোডিয়াস এবং কিরিল-এরা দু'জন গোপনে একটা লিপি তৈরী করলেন। সেই লিপিটার, গ্রীস লিপির সাথে কিছুটা মিল আছে। রুশ লিপির সাথেও বর্তমানে কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তারা অনেকগুলো হরফ এবং ধ্বনির শব্দরূপ আবিষ্কার করেছিলেন। এগুলো করে তারা নিজেদের শ্রাবণিক ভাষায়, বুলগেরীয় ভাষায়, চিঠিপত্র লিখে এক গির্জা থেকে অন্য গির্জায় পাঠালেন। এবং তুর্কী শাসকরা এগুলোতে বাধাও দেয়নি। কারণ তারা পড়তেও পারেনি, তাই এগুলোয় বাধাও দেয়নি। এভাবে করে আস্তে আস্তে সমগ্র দেশে তুর্কীদের বিরুদ্ধে, ওসমানী রাজ্য শাসনের বিরুদ্ধে একটা বিক্ষোভ তৈরী হলো। এ বিক্ষোভটি চরমে পৌঁছে তুর্কী শাসকদের অজ্ঞাতসারে। এবং শেষ পর্যন্ত ওসমানীয় তুর্কীরা পরাজিত হয়। অবশ্য পরাজিত হওয়ার আরও কতকগুলো কারণ ছিল। কারণ রুশরা বুলগেরীয়দের সাহায্য করেছিল। খৃস্টান সম্প্রদায়, সকলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিল ইত্যাদি অনেক কিছু আছে। তবে মানুষকে সংঘবদ্ধ করবার এই যে একটা প্রবণতা

www.pathagar.com

বুলগেরীয়দের, সেই প্রবণতার পেছনে ভাষার একটা অঙ্গীকার আছে। আমরা মনে করি ভাষা এবং নিজস্ব ভাষার একটা লিপিরূপ, একটা অঙ্গীকার আছে। এই দিবসটি ওরা প্রত্যেক বছরই পালন করে। এরা স্মরণ করে কিরিল-কে এরা স্মরণ করে নেথোডিয়াসকে। এই লিপির নাম হচ্ছে কিরিলিক লিপি। কারণ কিরিলের নাম থেকেই কিরিলিক লিপি হয়েছে।

বাংলাদেশে আমরা যখন শহীদ দিবস, ভাষা দিবস পালন করি, একুশে ফেব্রুয়ারী, তেমনি বুলগেরীয়রাও কিন্তু তাদের একটি ভাষা দিবস পালন করে। এই ভাষা দিবসে ঐ প্রাচীন কাহিনীগুলো তারা স্মরণ করে। আনন্দ-উৎসব করে সমস্ত রাস্তায় রাস্তায়, গ্রামে গ্রামে, অঞ্চলে-অঞ্চলে। আমাদের যে একুশে ফেব্রুয়ারী উৎসবটা, আনন্দটা, একুশে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলন, সেই আন্দোলনের পেছনের কারণটা ছিল নিজের ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এবং ভাষাকে মর্যাদা দেওয়া। কারণ তখনকার দিনে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম এটা যে, আমাদের এই ভাষা যদি আমাদের রাজভাষা না থাকে, রাষ্ট্রীয়ভাষা না থাকে বাংলা ভাষাকে ব্যাখ্যা করার, তাহলে আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে নিপীড়িত হব, রাজনৈতিক দিক থেকেও নিষ্পেষিত হব। সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের নিজের ভাষাকে আমাদের আঁকড়ে ধরতে হবে। এই ভাষাকে আঁকড়ে ধরেই, এই ভাষার মাধ্যমে আমরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারব। সেই জন্যই এই আন্দোলনটা। প্রথম থেকেই এই আন্দোলনটা যে সর্বসাধারণের আন্দোলন ছিল তা নয়। কিন্তু ক্রমশ এই আন্দোলন সর্বসাধারণ গ্রহণ করে বসল। একটিমাত্র কথায়, একটিমাত্র বিষয়ের জন্যে, সেই বিষয়টা হচ্ছে— ভাষা জীবনের অঙ্গীকারকে বহন করে। যেহেতু ভাষা জীবনের অঙ্গীকারকে বহন করে সুতরাং মাতৃভাষা, সেই মাতৃভাষা যদি আমার না থাকে, মাতৃভাষার উপর যদি আমার অধিকার না থাকে, তাহলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। এখন আমরা যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন, আগের সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাই— এখানে বহু জাতি আছে, মুসলমান জাতিরা আছে অনেক। যেগুলো পরবর্তীকালে স্বাধীন হয়ে গেল। এদের ভাষা ছিল আলাদা। আর রুশ ভাষা ছিল রুশ দেশে। এই রুশ ভাষা এবং শ্রাবণিক লিপি তারা সকলের উপর আরোপ করে দিল। দলিল দস্তখত রুশ ভাষায় হতে লাগল। এর বিরুদ্ধেও মানুষের বিক্ষোভ ছিল। আজ যে অঞ্চলগুলো স্বাধীন হয়ে গেল— তার একটি মাত্র কারণ যে, এদের কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিল তারা। তাদের উপর একটা ভাষা আরোপ করে, যে ভাষা তাদের নিজের ভাষা ছিল না। সুতরাং আমাদের উপরে যখন অন্য ভাষা আরোপের একটা প্রয়াস করেছিল, তার পেছনে একটা বিরাট ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাস আমি এখানে পর্যালোচনা করব না। সেই যে একটা চেষ্টা নিয়েছিল সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলাম। আমি সব সময় একটি কথা বলে থাকি আমাদের যে ভাষা আন্দোলনটা, এই ভাষা আন্দোলন কিন্তু আমাদের আত্ম-আবিষ্কারের আন্দোলন। আমরা কিন্তু এর আগে, বহু আগে নিজের ভাষার কথা ভেবেছি সত্য কিন্তু এত গভীরভাবে ভাষাকে আমাদের মর্মমূলে অতীতে কখনো নেইনি। এই ভাষা আমরা শিখব কিন্তু আমাদের নিজস্ব ভাষা আমরা এই কারণে গ্রহণ করব যে, এই ভাষার মধ্য দিয়ে আমাদের যথার্থ চিত্তের স্ফূর্তি ঘটবে। অন্য কোন ভাষার মধ্য দিয়ে সেটা কখনো ঘটবে না।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার বিকাশে মুসলমানদের অবদান

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ১ জানুয়ারী, ১৯২৭, রূপসী, রূপগঞ্জ, ঢাকা। শিক্ষা ঃ বি. এ(অনার্স), এম. এ. (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ১৯৪৯। পি. এইচ. ডি., লণ্ডন, ১৯৬১। পেশা ঃ অধ্যপনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ। বর্তমানে অবসর।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সাহিত্য ভাণ্ডার (১৯৬৫), সাহিত্য শিল্প (১৩৭৫), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম-৪র্থ খণ্ড), ১৯৬৮, মানব জীবন (১৯৭০), জীবন সৌন্দর্য (১৯৮১), সুফীবাদের গোড়ার কথা (১৯৮১), ইসলামী সংস্কৃতি (১৯৭০), প্রতি বর্ণায়ন (১৯৮২), প্রবাত (কবিতা সংকলন ১৯৮২)।

লেখা-পরিচিতি ঃ 'বাংলা ভাষার বিকাশে মুসলমানদের অবদান', 'অগ্রপথিক' অমর একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত। 'অগ্রপথিক সংকলন ঃ ভাষা আন্দোলন' ১৯৯৩ অন্তর্ভুক্ত।

আল-কুরআনের সূরা ইবরাহীমের চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন ঃ আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১৪ঃ৪)

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা আরো বলেছেন ঃ তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে। (৫৫ ঃ ৩-৪)

তিনি আরো বলেন ঃ আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন– মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। (৯৬ ঃ ৩-৫)

মানুষকে বলা হয়েছে 'হায়ওয়ানে নাতিক' বা ভাষাভাষী প্রাণী। সে জন্য মানুষ অন্য জীব থেকে পৃথক। তাই ভাষাই মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে সহায়ক হয়েছে। সেই ভাষার সম্বন্ধে কথা অনেক। এখানে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা ভাষার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধিতে মুসলিমদের অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বাংলাদেশের তথা বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিশ্বের ইতিহাসে আধুনিক এশিয়ায় এটি একটি লক্ষণীয় অবদান। বৃটিশ শাসনামলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী কোন এক ইংরেজ মনীষী লিখেছেন, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের দু'টি মাত্র ভাষায় প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পাওয়া যায়। সে দু'টি ভাষা হলো, ইংরেজী ও বাংলা। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, গ্রীক, লাতিন, চীনা, জার্মান, ফরাসী, স্পেনিশ, ইংরেজী প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্য এক কাতারে স্থান করে নিয়েছে। আধুনিক জগতে এর আসন অতি উচ্চে। বাংলা ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক থেকে এ ভাষা বিশ্বে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে।

এদেশে দশ হাজার বছর আগে মনুষ্য বসতি ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

অনেকে মনে করেন, এদেশ সমুদ্র গর্ভ থেকে ধীরে ধীরে পলিমাটি পড়ে গড়ে উঠেছে। কিন্তু ঐতিহাসিকদের অনেকের ধারণা, এদেশের সবটুকুই সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত হয়নি। কারণ এখানে যে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, এখানে আর্যদের আসার আগে অন্তত আরো চারটি জাতির বসতি ছিল। নেগ্রিটো, অষ্ট্রো এশিয়াটিক, দ্রাবিড় ও ভোট চীনীয় বা মঙ্গোলীয় এ চারটি জাতি পর্যায়ক্রমে এদেশের আদিম অধিবাসী ছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

হযরত ঈসার (আ) জন্মের দেড় হাজার বছর আগে মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপের কোন এলাকা, কারো কারো মতে, ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে একদল লোক পূর্ব দিকে আসেন। তাদের বলা হয় আর্য। তারা যে ভাষায় কথা বলতেন তার নাম ছিল আর্য ভাষা। পথে একদল ইরানে রয়ে গেলেন। তারাই বর্ত্যমান ইরানীদের পূর্বপুরুষ। তাদের ভাষার নাম ইরানীয়। আর একদল চলে এলেন ভারতে। তাদের বলা হয় ভারতীয় আর্য [Indo Arjan], সংক্ষেপে আর্য। আর্যদের সঙ্গে এলো তাদের ধর্মবিশ্বাস, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি ও ভাষা। তারা যে ভাষায় কথা বলতেন সে ভাষার নাম দেয়া হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা। এ ভাষা কালের বিবর্তনে ক্রমে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা-পালি-প্রাকৃত অপভ্রংশ এবং তা থেকে নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষায় রূপান্তরিত হয়। বাংলা ভাষা এই নব্য বা আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলোর অন্যতম।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষা যখন সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল, তখন পণ্ডিত ও মার্জিত লোকদের যে পোশাকী ভাষায় বেদ শাস্ত্রাদি ও কাব্য রচিত হয়, তাকে আখ্যা দেয় হয় 'বেদ-ভাষা' বা 'বৈদিক ভাষা'। প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্যরীতির সংস্পর্শে এসে স্বভাবতই বৈদিক ভাষার উচ্চারণ, রূপতত্ত্ব ও বাগবিধি ইত্যাদির শুচিতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। শাস্ত্রকার ও যাজক পণ্ডিতদের কঠোর শাসন সত্ত্বেও ধর্মশাস্ত্র বেদের ভাষায় 'আঞ্চলিকতা' বা 'গ্রাম্যতা' প্রবেশ লাভ করে। বৈদিক ভাষায় তথা দেব ভাষায় এ ধরনের মিশ্রণ ও দূষণ বেশি দিন ধরে চলতে থাকলে দেব ভাষার পবিত্রতা রক্ষিত হবে না মনে করে পণ্ডিতরা কথ্যরীতির সামান্য মিশ্রণ ও পরিবর্তন মেনে নিয়ে বৈদিক ভাষার বর্ণনামূলক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন এবং বৈদেকি সাধু ও চলিত উভয় রীতির সমন্বয় সাধন করে পণ্ডিত বা সাধুরীতির একটি নিয়ম বেঁধে দেন। এভাবে প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষা ও বৈদিক ভাষার সংমিশ্রণজাত ভাষার সংস্কার করা হয়েছে বলে এ ভাষারীতির নাম দেয়া হয়েছে 'সংস্কৃত বৈদিক ভাষা'। পরে এ ভাষা সরাসরি সংস্কৃত ভাষা বলেই পরিচিতি লাভ করে।

অনেকের ধারণা, বাংলা ভাষাও 'সংস্কৃত' ভাষা থেকেই উদ্ভুত। এ কথা ঠিক নয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা সাধারণ জনগণের অর্থাৎ প্রাকৃতজনের ভাষা বলে, ভাষার এ স্তরকে বলা হয় 'আদিম প্রাকৃত স্তর'। জনগণের ভাষা যখন আদিম প্রাকৃত সে সময়ে কাব্য নাটক ইত্যাদি রচনার বাহন ছিল সংস্কৃত। ক্রমে সাধারণের ভাষা বিবর্তিত হয়ে 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা' 'মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা'য় রূপ নেয়। 'মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা' প্রাচীন প্রাকৃত স্তরে এসে 'পালি ভাষা'য় সাহিত্য রচিত হয়। সে সময় প্রাকৃতজনের ভাষা ছিল

www.pathagar.com

অর্বাচীন প্রাকৃত। অঞ্চল ভেদে এ অর্বাচীন প্রাকৃতের রূপভেদ দেখা দেয়। এ স্তরের 'প্রাকৃত'কে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধ মাগধী, গৌড়ী- এ সব নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ স্তরের বিভিন্ন প্রাকৃতে যখন সাহিত্য সৃষ্টি হতে লাগল, তখন এসব প্রাকৃতের আঞ্চলিক পরিবর্তিত রূপ 'অপভ্রংশ' হলো দেশের লোকের মুখের ভাষা। আবার অপভ্রংশও যখন থেকে কাব্য নাটকাদির বাহন হয়ে উঠল, তখন থেকে নব্য - ভারতীয় আর্য ভাষাগুলো জনসাধারণের কথা বলার ভাষা বলে গৃহীত হলো। এ স্তরেই প্রাচীন বাংলার উদ্ভব। প্রাচীন বাংলা ক্রমে মধ্য বাংলার স্তর পেরিয়ে আধুনিক বাংলার রূপ লাভ করে। কাজেই 'সংস্কৃত' ভাষা বাংলা ভাষার জননী—এ ধারণা ভিত্তিহীন।

বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতীয় অর্ধস্তর থেকে ক্রমশঃ বিবর্তন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে নানা স্তর পেরিয়ে বাংলা ভাষা তার নিজস্ব রূপ লাভ করে। কালের বিবর্তন ও ভাষা বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতীয় আর্য ভাষাকে তিন স্তরে ভাগ করা যায় ঃ

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা [Old-Indo-Arjan] এবং আদিম প্রাকৃত খৃস্টপূর্ব ১২৫০ থেকে খৃস্টপূর্ব ৫০০ অব্দ পর্যন্ত।

২. মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা [Middle-Indo-Arjan] খৃস্টপূর্ব ৫০০ থেকে খৃস্টীয় ৬০০ অব্দ পর্যন্ত।

৩. নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষা [Neo-Indo-Arjan] খৃস্টীয় ৬৫০ অব্দ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত। খৃস্ট-পূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে খৃস্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত কালকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার যুগ বলা হয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার নিদর্শন বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। কালানুক্রমিকভাবে এ সাহিত্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ ১. বেদ বা সংহতি, ২. ব্রাহ্মণ এবং ৩. উপনিষদ।

খৃস্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খৃস্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার যুগ। এ স্তরের নিদর্শন মেলে অশোক অনুশাসন ও অন্যান্য প্রত্ন লিপির ভাষায় এবং পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায়। কালের ধারাবাহিকতায় এবং ভাষা বৈশিষ্ট্যের পারম্পর্যে এ যুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীন স্তর। এ স্তর খৃস্ট-পূর্ব ৫০০ অব্দ থেকে খৃস্টীয় ২০০ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ কালের ভাষাকে আমরা প্রাচীন প্রাকৃত স্তরের ভাষাও বলতে পারি। অশোকের অনুশাসন লিপি, সাচি ও বাহুর্তের প্রস্তুত লিপি, মারবেল লিপি প্রভৃতিতে এ স্তরের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। এ স্তরের অন্যতম সাহিত্যিক রূপের নিদর্শন পাওয়া যায়; বৌদ্ধজাতক ও ত্রিপিটক ইত্যাদির ভাষায় এ স্তরের সাহিত্যিকরূপ বিধৃত। সংস্কৃত ছিল এ যুগের ব্রাহ্মণ্য সমাজের সাহিত্যিক সাধু ভাষা। মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার দ্বিতীয় বা মধ্য স্তর খৃস্টীয় ২০০ অব্দের পর থেকে খৃস্টীয় ৪০০ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ স্তরের ভাষাকে বলা যায় মধ্য প্রাকৃত ভাষা। এ কালের পরবর্তীকালে সংস্কৃত নাটক ও জৈন ধর্ম সংক্রান্ত সাহিত্যে এ মধ্য প্রাকৃতের ব্যবহার দেখা যায়। এ কালে অঞ্চল ভেদে প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রীয়, মাগধী, গৌড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতের ব্যবহার এ যুগের বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার তৃতীয় স্তর খৃস্টীয় ৪৫০ থেকে ৬৫০ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। নাটকীয় প্রাকৃত ও অপভ্রংশ এ যুগের সাহিত্যের ভাষা। প্রথমদিকে বৌদ্ধ ও জৈন সমাজের অপভ্রংশ ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত সহজিয়া মতের বৌদ্ধগণ সবার আগে অপভ্রংশ ভাষা ব্যবহার করেন। পরে ব্রাহ্মণ্য সমাজেও এ ভাষার ব্যবহার প্রচলিত হয়। অপভ্রংশেও অঞ্চল ভেদে বিভিন্নরূপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রীয়, মাগধী, গৌড় প্রভৃতি অপভ্রংশ স্তরের প্রচলিত সাহিত্যের ভাষা।

এরপর নব্য-ভারতীয় স্তর। এ স্তর খৃস্টীয় ৬৫০ অব্দ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। অপভ্রংশ স্তর থেকে নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষার বিভিন্ন রূপের উদ্ভব হয়েছে। শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী, গৌড়ী ইত্যাদি অপভ্রংশ থেকেই পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটি, সিন্ধী, উড়িয়া, অহমিয়া, বাংলা ও হিন্দী-উর্দু প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার উদ্ভব।

অপভ্রংশের পরেই বাংলা ভাষার প্রাচীন স্তর। গৌড়ী প্রাকৃত থেকে গৌড় অপভ্রংশের উৎপত্তি এবং গৌড় অপভ্রংশ থেকে প্রাচীন বাংলার উদ্ভব। ভাষার উৎপত্তি, বিকাশ ও তার বিবর্তন এবং সাহিত্যের সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিম্নরূপ যুগ বিভাগ করতে পারি ঃ

১. প্রাচীন যুগ ঃ ৬৫০ খৃস্টাব্দ থেকে ১২০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত।
২. মধ্য যুগ ঃ ১২০০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত।
৩. আধুনিক যুগ ঃ ১৮০০ খৃস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত।

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার শেষ যুগ অপভ্রংশ স্তর। এ স্তর থেকে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার পীঠিকার কাল মোটামুটি সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন যুগ এ সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত। এ যুগেই বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়। এ সময় বাংলা সাহিত্যের তো দূরের কথা, বাংলা ভাষার নিজস্ব রূপটিও পুরাপুরি সৃষ্টি হয়নি। এ যুগের ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শনস্বরূপ বৌদ্ধ ধর্ম-যাজকদের রচিত সহজিয়া মতের কতগুলো প্রহেলিকাপূর্ণ পদ পাওয়া যায়। এগুলো বৌদ্ধ গান ও দোহা বা চর্যাপদ নামে পরিচিত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি রূপের অতি মূল্যবান নিদর্শন হিসেবে এগুলোই ইতিহাসে চিত্রিত হয়ে আছে।

এ বৌদ্ধ গান ও দোহাগুলো রচিত হয় বাংলাদেশের পাল রাজাদের শাসনামলে। পালদের সময় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ও প্রচারের জন্য। এসব গান ও দোহা বা উপদেশ জনসাধারণের কথ্য বাংলাতেই প্রচারিত হয়েছে। এর ফলে একটি লোক-সাহিত্য গড়ে ওঠার সুযোগ হয়েছে। একাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে আগত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী আচারনিষ্ঠ গোঁড়া হিন্দু সেন রাজারা বাংলাদেশ দখল করেন। তারা বাংলাদেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের উৎখাত করে সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রচলন করেন। এ রাজবংশের বল্লাল সেন কনৌজ থেকে কয়েকজন উচ্চ কোটি ব্রাহ্মণ এনে বংশ বৃদ্ধির জন্য হিন্দু সমাজে ছেড়ে দিলেন। এতে হিন্দু সমাজে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি হলো। সেনরা তাদের রাজকার্যে সংস্কৃত ভাষা চালু করেন। সুতরাং রাষ্ট্রভাষায় ও সাহিত্যে শাস্ত্রালোচনা ও সাহিত্য

www.pathagar.com

নিম্নে প্রদত্ত পীঠিকা থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে আধুনিক বাংলা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর পর্যায়ের অবস্থান সহজে বোঝা যাবে ঃ

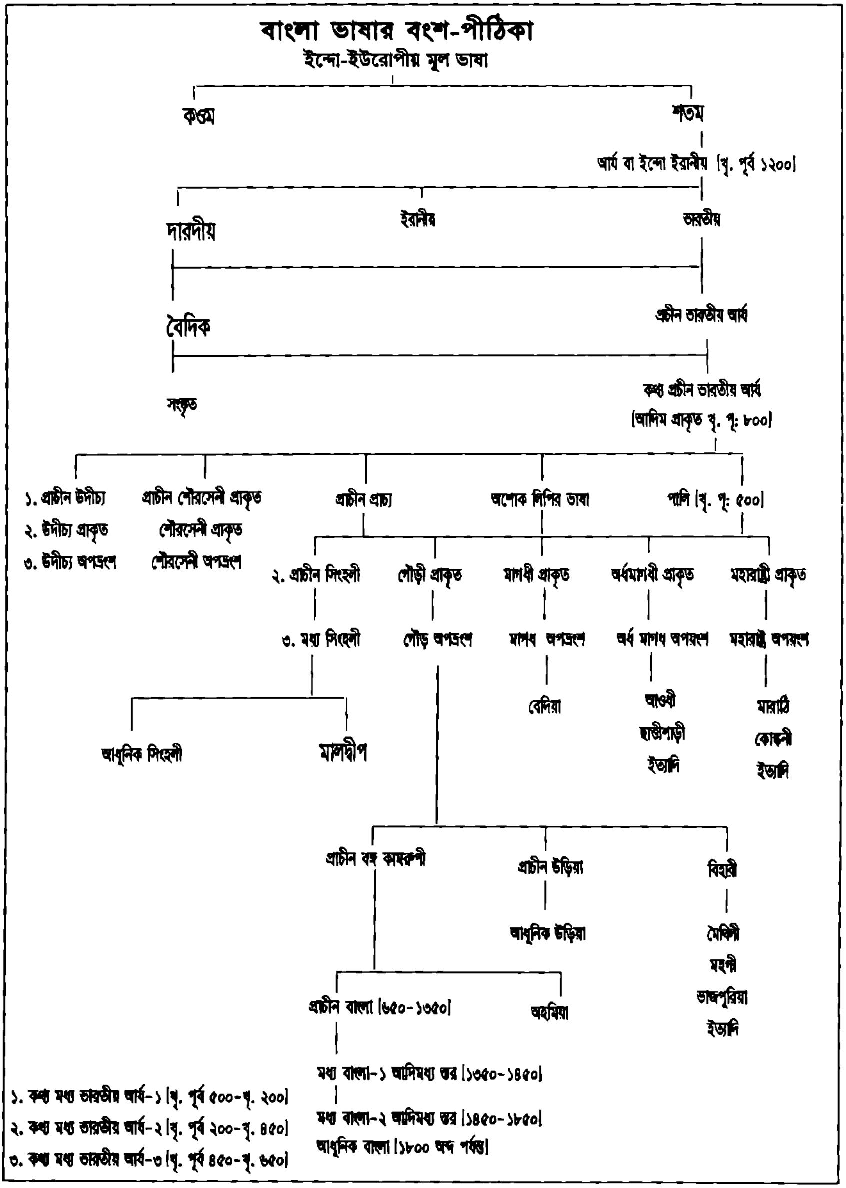

www.pathagar.com

চর্চা রহিত হলো। শৈশবেই বাংলা ভাষার উপর হামলা এলো। রাজাদের অনুসরণ করে শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণও দেবভাষা সংস্কৃত ছাড়া লোকভাষায় শাস্ত্রালোচনা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। তারা ফতোয়া দিলেন ঃ

অষ্টাদশ পুরাণমনি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবং শ্রুত্বা রৌর বং নরকং ব্রজেৎ ॥

অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ, রামচরিত ধর্মশাস্ত্র লোকভাষায় আলোচনা ও শ্রবণ করলে রৌরব নরকে যেতে হবে।

কাজেই বলা চলে, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও লালন হয়েছে বৌদ্ধ আমলে, বিশেষ করে বৌদ্ধ বাঙ্গালী পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। প্রাচীনকালে প্রায় সব সাহিত্যই রাজা ও রাজ-অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতো। বাংলায় বৌদ্ধ শাসনকালেও তাই ঘটেছিল। কিন্তু পরবর্তী হিন্দু সেন রাজাদের আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অদৃষ্টে সেই পৃষ্ঠপোষকতা তো মিলেইনি; বরং তা মুছে দেয়ার অপচেষ্টায় ত্রুটি হয়নি। সেন রাজাদের আমলে,কঠোর ব্রাহ্মণ্য অস্পৃশ্যতা ও নিষ্ঠুর শাস্ত্রীয় শাসনে যখন সর্বসাধারণের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সে সময়েই বাংলায় মুসলিম রাজত্বের সূত্রপাত হয়।

বাংলা ভাষার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মুসলমানের অবদানের বিষয় বিবেচনা করতে গিয়ে দিকদর্শন হিসেবে মোটামুটি কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে নেয়া যায়ঃ

১. মুসলিম শাসক ও অমাত্যদের অনুগ্রহ, পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ দান।
২. মুসলিম সাহিত্যিকদের অবদান।
৩. মুসলিমদের মাধ্যমে আগত ভাষার নানা উপাদান বাংলায় সংযোজন।
৪. বিভিন্ন সংস্থার অবদান।
৫. বিভিন্ন ভাষা কমিটির মাধ্যমে ভাষার সমীক্ষণ ও প্রয়োগবিধি প্রণয়ন।
৬. বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে ভাষার লালন।
৭. পুরস্কার, স্বীকৃতি সনদ, বৃত্তি ও উৎসাহ দান।
৮. বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অবদান।
৯. সাংবাদিকদের ভূমিকা ও অবদান।
১০. বুদ্ধিজীবী সমাজের ভূমিকা ও অবদান।
১১. বিবিধ।

মুসলিম শাসক ও অমাত্যদের অনুগ্রহ, পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ দান

সেন আমলে যখন ব্রাহ্মণ্য কঠোরতায় ও ধর্মীয় অস্পৃশ্যতায় জনজীবন অতিষ্ঠ, সে সময়েই ১২০১ খৃস্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দীন বখতিয়ার খিলজী বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে বাংলাদেশ দখল করেন। বাংলায় মুসলিম আগমন বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির দুয়ার খুলে দিল। এদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সবাই একবাক্যে

www.pathagar.com

স্বীকার করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তুর্কী আগমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। বাংলায় মুসলিম শাসনামলই মুসলিম সুলতানদের ও তাঁদের অধীনস্থ হিন্দু ও মুসলিম উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সন্তানদের পৃষ্ঠপোষকতায়, উৎসাহ ও আদেশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবজন্ম হয় এবং নবতর সমৃদ্ধির পথে এর অগ্রগতি সূচিত হয়।

এ সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সূচনা। তখন থেকে বাংলা সাহিত্যে আরবী ও ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ যুগের কাব্যধারা প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

১. অমুসলিম কবি রচিত সাহিত্য ঃ এ শ্রেণীর সাহিত্য মোটামুটি চারটি ধারায় প্রবাহিত ঃ বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গল কাব্য, অনুবাদ সাহিত্য ও জীবন চরিত। এ যুগের শেষপ্রান্তে রচিত হয়েছে কবি গান, টপ্‌পা ইত্যাদি।

২. মুসলিম কবি রচিত সাহিত্য ঃ এ শ্রেণীর সাহিত্য মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত। আরবী, ফারসী ও হিন্দী থেকে অনূদিত কাহিনী কাব্য এবং ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধীয় কাব্য। এছাড়াও এ যুগের শেষের দিকে সৃষ্টি হয়েছে উর্দু, আরবী, ফারসী মিশ্রিত ভাষায় পুঁথি সাহিত্য।

এ সময়কার রাষ্ট্রভাষা ছিল ফারসী। এ যুগে মুসলিম সুলতানগণ ও তাঁদের অমাত্যবর্গ বাংলায় সাহিত্য রচনায় যে অকৃত্রিম উৎসাহ দান ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তার নজির বিরল। আর এ পৃষ্ঠপোষকতার প্রায় সবটুকুই পেয়েছেন অমুসলিম কবি-সাহিত্যিকরা। মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের কাছ থেকে তেমন কোন উৎসাহ লাভ করছেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলতে হয় যে, সম্ভবত একমাত্র আরাকান রাজসভায় বৌদ্ধ অধিপতিগণই মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের স্বাধীনভাবে সাহিত্য রচনা করার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন। মুসলিম বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে হিন্দু অধিপতিগণ এদেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উৎখাত করার ফলেই বোধ করি বাংলার পূর্ব সীমান্তে আরাকান রাজ দরবারের বৌদ্ধ শাসকগণ স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুদের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন এবং বিজয়ী মুসলিমদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাই দেখি, আরাকান রাজসভায় কবি-সাহিত্যিক ছাড়াও রাজমন্ত্রী সেনাপতিগণের অনেকেই ছিলেন মুসলিম।

বাংলাদেশে স্বাধীন পাঠান সুলতানদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলে তাঁরা বাংলাদেশকেই স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। এ দেশকে বিদেশ ও এ দেশবাসীকে বিদেশী মনে করে তাঁরা লুটপাট ও শোষণের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেননি। তাঁরা এ দেশের জনসাধারণের ভাষাকে রাজদরবারে সমাদর করতে আরম্ভ করেন। এ সঙ্গে তাঁরা হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, শাস্ত্র, পুরাণ ও কাব্যগ্রন্থাদি জানার জন্য আগ্রহান্বিত হন। তাঁরা সংস্কৃত ভাষা থেকে নানা গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। রাজ দরবারের অনুকরণে ক্রমে ক্রমে সমাজেও বাংলা ভাষার সমাদর হওয়ায় উচ্চবর্ণের কবিগণ এ ভাষায় অনুবাদ কর্মে উৎসাহী হন। গৌড়ের সুলতানদের আদেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু ভাগবতের বিশেষ অংশ অনুবাদ

www.pathagar.com

করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর বা শ্রীকর নন্দী অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। কৃত্তিবাস ওঝাও গৌড়েশ্বরের আদেশেই সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করেন। বাংলায় ও বিভিন্ন অনুবাদের মাধ্যমে সাহিত্যের প্রশংসনীয় উদ্যম পরিলক্ষিত হয়।

মুসলিম সাহিত্যিকদের অবদান

মধ্যযুগের হিন্দু গ্রন্থকারদের রচিত সমস্ত সাহিত্যই একান্ত ধর্মকেন্দ্রিক। এমন কি বিদ্যা সুন্দরের মত রোমান্টিক কাব্যও ধর্মের মোড়কে পরিবেশিত। একমাত্র মুসলিম কবিগণই এ যুগের মানুষের সুখ-দুঃখ ও প্রেম-প্রীতি নিয়ে রোমান্টিক কাহিনী-কাব্য সাহিত্যের প্রবর্তন করেন। কেবলমাত্র রস সৃষ্টির জন্য রচিত রচনাগুলো পরিপূর্ণভাবে রসোত্তীর্ণ এবং অনুপম কাব্য সৌন্দর্য্যমণ্ডিত। মানুষ ও মানুষের জীবন সাহিত্যে এই প্রথম স্বীকৃতি পেল। মানুষের মনুষ্যত্বকে দেব-দেবীর ধাঁধাঁ পরিমণ্ডল থেকে উদ্ধার করে মুসলিম কবিগণই বাংলা সাহিত্যের গতি এক সম্পূর্ণ নতুন খাতে বইয়ে ছিলেন। তাঁদের রচনায় ফারসী প্রভাব সুস্পষ্ট। সে সাহিত্যের তৎকালীন সমাজ মানসের প্রতিচ্ছবি বর্ণাঢ্যরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। পনের শতকের কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর এ ধারার প্রাচীনতম কবি। এ যুগের আরো একজন বিখ্যাত কবি যৈনুদ্দীন।

ষোল শতকে শাহ বারিদ খান, দৌলত উজির বাহরাম খান, শেখ ফয়যুল্লাহ, শেখ পরান, আফজাল আলী, সৈয়দ সুলতান, শেখ চান্দ, দোনাগণজ চৌধুরী, মুহম্মদ কবীর, মুজাম্মিল, হাজী মুহাম্মদ প্রমুখের রচনা একক বৈশিষ্ট্য বিরাজমান।

আরাকান রাজ সভায় বেশ কয়েকজন কবি কাব্যচর্চার সুযোগ পান। তাঁদের মধ্যে কাজী দৌলত ও আলাওল কবিত্ব শক্তি ও ভাবের মৌলিকত্বে শ্রেষ্ঠ। কাজী দৌলত 'ফতী ময়না ওলোর চন্দ্রানী' নামক কাহিনী কাব্যের রচয়িতা। আলাওল-এর শেষাংশ রচনা করেন। এ ধারার কবিদের মধ্যে বিষয়বস্তু, বৈচিত্র্যে, কাব্য সুষমা সংযোজন, পাণ্ডিত্য ও কবিত্বে আলাওল নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন। তিনি 'পদ্মাবতী' নামে কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দী কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ করেন। আলাওলের কাব্যানুবাদে অনেকাংশে মৌলিকত্বের পরিচয় রয়েছে। তাঁর রচনায় সৌন্দর্য আড়ষ্টতাবিহীন ও সুনিয়ন্ত্রিত এবং তা মৌলিক রচনার মতই উৎরে গেছে। নিঃসন্দেহে বলা চলে, বাংলা কাব্য সাহিত্যে মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলিম সব কবির মধ্যেই আলাওল অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত এ কবির ভাষাও অত্যন্ত মার্জিত ও সুসংহত। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বলিষ্ঠ প্রতিভা, অপরিসীম পরিশীলন ক্ষমতা ও বহুদর্শিতা কবিকে সে যুগের কবি সভার মধ্যমণি করে তুলেছে। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে পদ্মাবতী, হপ্ত পয়কর, দারা সিকান্দারনামা, তোহফা, সয়ফুল মুল্লুক বদিউজ্জামাল ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তিনি বৈষ্ণব পদাবলীও রচনা করেছেন।

সতের দশকে আরো যে সকল কবি বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে কোরেশী মাগন ঠাকুর, মরদল, মুহম্মদ খান, নসরুল্লাহ্ খান, শেখ মোত্তালিব, শেখ সকীর, আবদুল হাকিম, সৈয়দ মুহম্মদ আকবর, মুহম্মদ

www.pathagar.com

নওয়াজিশ খান, মঙ্গল চাঁদ, কমর আলী, আবদুল নবী ও শেখ শেরবাজ চৌধুরী প্রমুখের নাম অগ্রগণ্য।

আঠার শতকেও এ ধারার প্রবাহ অব্যাহত থাকে। এ সময় দোভাষী পুঁথি নামক আরবী-ফারসী-উর্দু-হিন্দী মিশ্রিত ভাষায় একটি নতুন কাব্যধারার সৃষ্টি হয়। রামায়ণ মহাভারতের অনুকরণে মুসলিম বীরগাঁথার এই বিশেষ আঙ্গিক একদা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ ধারার অন্যতম প্রধান কবি ফকির গরিবুল্লাহ, হায়াত মামুদ, সৈয়দ হামযা প্রমুখ। এ যুগের সাহিত্য কাননে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ কাশিম, কাজী শেখ মনসুর, মুহম্মদ উজির আলী, শেখ সাদী, আলী রাজা ওরফে বালু ফকীর, মুহম্মদ রাজা, সমশের আলী, শাব্বির মাসুদ, আবদুল করিম খোন্দকার সৈয়দ নূরউদ্দীন, মুহম্মদ রফীউদ্দিন, মুহম্মদ আকীল, সৈয়দ নাসীর, মুহম্মদ মুকীম, মুহাম্মদ নবী, আবদুস সামাদ, পরগল বা পরাগল, হাজী আলী, মুহাম্মদ আলী, গোলাম রসুল, বুরহানুল্লাহ্ প্রমুখের নাম অক্ষয় হয়ে আছে।

উনিশ শতকেও এ ধারার প্রবাহ চলতে থাকে। এ শতকে যাঁরা এ ধারায় সাহিত্য সাধনা করতেন তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ চুহর, মালে মুহম্মদ, আরিফ, মুহম্মদ দানেশ তমিজী, মুহম্মদ খাতের, জোনাব আলী, কাজী হাসনত আলী চৌধুরী, আমিরুদ্দিন, আব্দুর রহীম প্রমুখের নাম করা যায়।

মধ্যযুগের আর একটি ধারা, বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোক সাহিত্যের ধারাটি এ দেশের সর্বত্রই প্রবাহিত। অসংখ্য ছড়া, ধাঁধাঁ, কিংবদন্তীর গাল-গল্প, করুণ কাহিনীর বেদনা নিবিড় পল্লীগাঁথা ও পল্লীগীতিকা আমাদের সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। এ সব গাঁথা ও গীতিকায় যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে মনসুর বয়াতি, জমায়েতুল্লা, ফকির ফৈজু এবং আরো অনেক নাম না জানা কবি-গায়কের নাম ছড়িয়ে রয়েছে। এ ধারা বর্তমানকাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে সূফী সাধক, বাউল ও বিভিন্ন মরমিয়া সাধক-দরবেশদের মাধ্যমে। হাসন রাজা, লালন ফকির, ফকির মজনু শাহ্ প্রমুখ সাধন পদ্ধতির পরিভাষায় মারেফাতি ও দেহতত্ত্বমূলক সংগীত ও গানের ব্যাপক প্রচারে সাধারণের মধ্যে বাংলাভাষা এ ধারার চর্চা ও সমৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

পলাশীর প্রান্তরে ১৭৫৭ সালে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর ইংরেজ শাসন এ দেশে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শতাধিক বছর রাজনৈতিক অশান্তির কারণে রসোত্তীর্ণ কোন সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারেনি। এ সময় সমাজ ও শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছিল এক বিশৃংখলা। পরাজিত মুসলিমরা ইংরেজদের সাথে হাত মেলাতে পারলেন না। পারলেন না নির্বিবাদে তাদের শাসন মেনে নিতে। তাঁরা নানাভাবে নানা স্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আন্দোলন করতে লাগলেন। তাঁরা নানাভাবে ইংরেজদের ক্ষমতা সম্প্রসারণনীতি প্রতিহত করতে চেষ্টা করলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, ইংরেজ দুশমন, তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য আমাদের জীবনের অনুপযোগী; আমাদের দেশ, জাতি, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরোধী। ইংরেজদের কারসাজিতে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, প্রশাসনিক কাজ-কর্মে সকল

www.pathagar.com

ক্ষেত্র থেকে মুসলিমরা বিচ্যুত হলেন এবং প্রতিবেশী হিন্দুরা তাদের স্থান দখল করলেন। বিজিত মুসলিম বহুদিন পর্যন্ত ক্ষোভে-দুঃখে ইংরেজ প্রচারিত শিক্ষা-দীক্ষা থেকে দূরে রইলেন। অপর পক্ষে হিন্দুরা সুযোগ বুঝে ইংরেজদের পক্ষে গিয়ে ইংরেজ সাহিত্য, সংস্কৃতি এমনকি ধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করলেন। সুচতুর ও দূরদর্শী ইংরেজী বুঝতে পেরেছিল যে, শুধু অস্ত্র বলে বা পশু শক্তি দ্বারা কোন জাতিকে পরাধীন করে রাখা যায় না। কোন জাতিকে বিশেষ করে পূর্বতন শাসক জাতিকে পদানত করে রাখার একমাত্র পথ হলো সে জাতির ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং এ সবের মাধ্যমে সাহিত্যকে ধ্বংস করে দেয়া। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা একদিকে ফারসীর বদলে ইংরেজীকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিল। আরেক দিকে আরবী, ফারসী মিশ্রিত ও ইসলামী ভাবধারাসমন্বিত বাংলা গণ-সাহিত্যকে দূর করে দিয়ে তার জায়গায় সংস্কৃতবহুল হিন্দু ভাবধারা প্লাবিত সাহিত্য সৃজনে সব রকমের সাহায্য ও উৎসাহ দিল। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হলো। প্রধানতঃ এ কলেজের পণ্ডিতদের চেষ্টায় সংস্কৃত যে বাংলা ভাষার জন্য হুমকি, কয়েক দশকের মধ্যেই এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। ১৭৭৮ সাল থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপ পুরোপুরি পাল্টে গেল।

সব কিছুর ভাল-মন্দ দু'টি দিক রয়েছে। ভারতে ইংরেজদের আগমনেও যে কেবল মন্দ হয়েছে একথা বলা যায় না। তাদের আগমনে কিছু মঙ্গলও হয়েছে। তাদের সঙ্গে এসেছে তাদের ভাষা ও সাহিত্য। এ সবের পঠন ও অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। এতে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ হয়। এর প্রভাবে আমাদের সাহিত্যে সৃষ্টি হয় আধুনিক গীতিকবিতার; মহাকাব্যের; উদ্ভব ঘটে বাংলা গদ্য রীতির; সৃষ্টি হয় কথা সাহিত্য, উপন্যাস, নাটক, ছোট গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি নানা আঙ্গিকের। এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি যে, পলাশীর পরাজয়ের পর মুসলমানগণ শতাব্দীকাল পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলেন। হঠাৎ রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে পরাজয়ের গ্লানির ক্ষোভ ও দুঃখে মূহ্যমান হয়ে পড়লেন। অভিমানে ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে তাঁরা কুণ্ঠাবোধ করলেন। তার উপর ফারসী ভাষা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা হারিয়ে ফেলল। সুতরাং ফারসী শিক্ষার উৎসাহেও ভাটা পড়লো। এভাবে শিক্ষার পথ রুদ্ধ হলে তাঁরা আত্মবিস্মৃত হয়ে অশিক্ষার অতল গহ্বরে আত্মগোপন করলেন। সুতরাং আঠার শতকের শেষ ভাগ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হিন্দু বাংলার ইতিহাস, হিন্দু সংস্কৃতির ইতিহাস। এ সময় মুসলিম সমাজের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক অধঃপতন চরমে পৌঁছে গিয়েছিল, যার জের পরবর্তী দুশো বছরেও মেটেনি। বাঙালী মুসলিম সাহিত্যে জীবনীশক্তির রস পেলই না; বরং তার নিজের চেহারার বিকৃত রূপ দেখে বিক্ষুব্ধ হলো। ফলে হিন্দু-মুসলিমের পরস্পরের মধ্যে বিরোধের উদ্রেক হলো; পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস সন্দেহে পরিণত হলো। মুসলিম সমাজ, ধর্ম ও জীবন নিয়ে বিদ্রুপ করার ও মুসলিম রাজত্বকালের অলীক কাহিনী প্রচারের অবশ্যম্ভাবী ফলেই পরবর্তীকালে বাঙালী মুসলিম তরুণ সমাজ সুখ-দুঃখের সমভাগী হয়েও প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে অন্তরের মিল

www.pathagar.com

খুঁজে পেল না। কাজেই যে শিক্ষা ও সাহিত্য বাঙালী হিন্দু সমাজের চিন্তা চেতনার জাগরণের সৃষ্টি করে, আযাদী আন্দোলনে রত ক্লান্ত পরাজিত মুসলিমদের পক্ষে তা হয়েছে আঘাতস্বরূপ। দেশ স্বাধীন করার ব্যাপারে ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকেই ভিত্তি হিসেবে ধরে আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং পরে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়।

যা হোক, রাজ্যহারা মুসলিম যখন পরাজয়ের গ্লানি ঝেড়ে ফেলে ইংরেজী শিক্ষায় মন দেন তখন প্রতিবেশী হিন্দুরা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। পলাশী যুদ্ধের এক শতাব্দী পর ১৮৫৭-এর সিপাহী বিপ্লবের পর যখন মুসলিমের পক্ষে দেশ পুনরুদ্ধারের আর কোন পথ খোলা রইল না তখন ধীরে ধীরে ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে এ বিলম্বিত প্রবেশই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের স্বল্পতার জন্য দায়ী। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে পর্যুদস্ত ও বিড়ম্বিত মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজে কতিপয় প্রতিভাবান সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে এ সময়ে। বিলম্ব হলেও মুসলিমদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি, তাহজীব ও তমদ্দুন সম্বন্ধে সচেতন মনোভাব নিয়ে ইসলাম ও মুসলিম জীবন ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে এঁরা নবপ্রেরণার সঞ্চার করেন। এঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন, মওলভী মোহাম্মদ নঈমউদ্দীন কায়কোবাদ, দাদ আলী, শেখ আবদুর রহীম, মোজাম্মেল হক, শাহ মোহাম্মদ করীম, মুন্সি মেহেরুল্লাহ্, মুন্সি রিয়াজ উদ্দিন, আহম্মদ মাশহাদী, হামিদ আলী, মওলানা রুহুল আমীন, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রমুখের নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মওলানা শাহ সূফী আবুবকর সিদ্দীকী (রহ)-এর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও তাঁর অনুসারীদের সাধনায় ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামী অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

মীর মশাররফ হোসেন মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাস, নাটক, জীবনী-কাব্য, প্রবন্ধ, গান, সাহিত্যের সব শাখায় তাঁর প্রতিভার ছাপ রাখেন। মহাকাব্য ধারায় কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন শিরাজী, কাব্য উপন্যাসে মীর মশাররফ হোসেন, শেখ ফজলুল করীম, মোজাম্মেল হক, প্রবন্ধে ইয়াকুব আলী চৌধুরী, মওলানা আকরম খাঁ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডাঃ লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মুজিবুর রহমান খাঁ, শেখ ফজলুল করিম, কাজী ইমদাদুল হক, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, কবি শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, জসীম উদ্‌দীন প্রমুখের গল্প, উপন্যাস, কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ সাহিত্যে বাঙালী মুসলিমদের চিন্তা-চেতনার উন্মেষ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ ধারাই সমৃদ্ধ হয় মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, শেখ হাবিবুর রহমান, আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মাহবুবুল আলম, আবুল ফজল, ইবরাহীম খাঁ, এনামুল হক প্রমুখের সাহিত্য সাধনায়।

এ কালেই আবির্ভূত হন যুগনায়ক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর আবির্ভাবে কেবল মুসলিম সাহিত্যের নয় সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মোড় ফিরে গেল। এ যুগ প্রবর্তক কবি রবীন্দ্র যুগের অবসান ও আধুনিক যুগের আগমন বার্তা ঘোষণা করলেন।

www.pathagar.com

তাঁর প্রেরণায় বাঙালী মুসলিম জেগে উঠল। তাঁর ভাষায় স্ফূর্তি ঘটল। শতাব্দীর সুপ্ত জাতি তাঁর আত্মার খোঁজ পেল। নজরুল ইসলাম কবিতা ও গীতি রচনায় সাহিত্য ভাবধারায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনলেন। ভাষায় সংস্কৃত বহুলতার যে আড়ষ্টতা মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের কাছে অনপনেয় ছিল, তিনি নির্দ্বিধায় তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুসলিম ঐতিহ্য, তাহজীব ও তমদ্দুনের অভিব্যক্তিসঞ্জাত আরবী-ফারসী শব্দ বাংলা ভাষায় সার্থকভাবে প্রয়োগ করলেন।

স্বাভাবিক কারণেই বাংলার অত্যাধুনিক ধারায় সাম্যবাদী চিন্তাধারা ও ইউরোপীয় সাহিত্যের নব নব আঙ্গিকের প্রয়োগ কৌশল নিয়ে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং পাশাপাশি প্রচলিত ধারা ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কাব্যচর্চার গতি অব্যাহত রয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ঘটেছে। এ ক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের উত্তরসূরী ফররুখ আহমদ, শাহাদাৎ হোসেন, আবদুল কাদির, আহসান হাবীব, বেগম সুফিয়া কামাল, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, বেনজীর আহমদ, আবুল হোসেন, শাহেদ আলী, রশীদ করীম, আবু রুশদ, সৈয়দ আলী আহসান, তালিম হোসেন, মহিউদ্দীন এবং আরো পরে এসে শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্, আল মাহমুদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আফজাল চৌধুরী, আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখের হাতে নবতর রূপ পেয়েছে। কথা-সাহিত্যে শাহেদ আলী, শওকত ওসমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, রশীদ করীম, শহীদুল্লাহ কায়সার, আবু ইসহাক প্রমুখের রচনায় আমাদের সমাজের নিখুঁত চিত্র অংকিত হয়েছে। নাটকে নূরুল মোমেন, জসিমউদ্‌দীন, মুনীর চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ, সেলিম আল দীন, হুমায়ুন আহমেদ, প্রবন্ধ সাহিত্যে মুহম্মদ এনামুল হক, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, মুজিবুর রহমান খাঁ, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, মুহম্মদ আবদুল হাই, কাজী দীন মুহম্মদ, হাসান জামান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

একালের সাহিত্যের বিষয়বস্তু মুসলিম জীবনমুখী সমাজের মানুষ ও তার সুখ-দুঃখ ফুটে উঠল বাঙালী মুসলিম সাহিত্যিকদের হাতে। এতদিন এদেশে বাস করেও তাদের চেহারা হিন্দু রচিত সাহিত্যে অনুপস্থিত এবং বিকৃত দেখে ক্ষুব্ধ মানসিকতার সান্ত্বনা খুঁজে পেল। এ যুগেও ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, ধর্মীয় বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক গ্রন্থ। অনুবাদ হয়েছে প্রচুর। আল কুরআন, আল হাদীস, ফিকাহ্ ও দীনিয়াত সম্পর্কীয় বহু অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ লেখা হয়েছে।

এ ধারায় আবুল হাশিম, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা ফজলুল করীম, আবদুল হাকিম, সৈয়দ আলী আহসান, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, মুহাম্মদ আয়ুব আলী, মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, আমিনুদ্দীন আহমদ, তসলীমুদ্দীন, আবদুর রহমান খাঁ, রকিবুদ্দীন, মাওলানা আমিনুল ইসলাম, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, হাসান জামান, কাজী দীন মুহম্মদ, মজিবর রহমান, আবদুল মান্নান তালিব, শামসুল আলম, আবদুল গফুর, হাফেজ মইনুল ইসলাম প্রমুখের দান বাংলা ভাষায় অক্ষয় অবদান রেখেছে।

www.pathagar.com

মুসলিমদের মাধ্যমে আগত ভাষার নানা উপাদান বাংলায় সংযোজন

বাংলা ভাষার উপাদান

রূপের দিক থেকে বিবেচনা করে বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ ১. দেশজ ২. তৎসম, ৩. অর্ধ-তৎসম, ৪. তদ্ভব ও ৫. অন্যান্য ভাষার শব্দ। আমাদের ব্যবহৃত সাধু রীতির ভাষার প্রতি একশ' শব্দের মধ্যে দু'টি দেশজ, চুয়াল্লিশটি তৎসম, পঞ্চাশটি অর্ধ-তৎসম ও তদ্ভব এবং চারটি অন্যান্য ভাষার শব্দ। আদর্শ চলিত রীতির [Standrad Colloquial Bengali] ভাষার শব্দ-সম্ভারে পাঁচটি খাঁটি দেশজ, দশটি তৎসম, পাঁচটি অর্ধ-তৎসম, সত্তরটি তদ্ভব, আটটি অন্যান্য ভাষার এবং দুটি অজ্ঞাতমূলক ভাষার শব্দ।

অন্যান্য ভাষার শব্দ

রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ ও ব্যাকরণগত উপাদান বাংলায় এসে স্থান করে নিয়েছে। যে সমস্ত ভাষার কম-বেশী সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষা সে সব ভাষার শব্দ ও অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ করেছে, সেগুলোর মধ্যে প্রধান হলো ঃ ১. ফারসী, ২. আরবী, ৩. পর্তুগীজ, ৪. ওলন্দাজ ও ৫. ইংরেজী। এছাড়া তুর্কী, ফরাসী এবং গ্রীক ভাষার কিছু শব্দ এবং এদিকের ভারত, ব্রহ্মদেশ, মালয়, চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এসব দেশের ভাষারও কিছু উপাদান এসে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

খৃস্টীয় তের শতকের শুরুতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীরা পশ্চিম বঙ্গ আবিষ্কার করেন। সমগ্র বাংলাদেশে মুসলিম অধিকার বিস্তৃত হতে আরো প্রায় শতেক বছর লেগে যায়। এ সময় থেকে গৌড়ের পাঠান সুলতান ও তাঁদের অমাত্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। প্রায় ছয়শ' বছরব্যাপী মুসলিম শাসনামলে রাষ্ট্রভাষা ফারসী থাকার ফলে দেখা যায় যে, সতের শতক থেকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে শিক্ষিত সমাজ ও জনসাধারণের ভাষা অনেকটা আরবী, ফারসীবহুল হয়ে পড়েছে। রাজকার্যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী অসংখ্য আরবী, ফারসী শব্দ এমনভাবে বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করেছে যে, এসব শব্দ বাংলা ভাষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

সম্রাট আকবরের সময়ে (১৫৪২-১৬০৫) বাংলাদেশ মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তখনও সরকারী ভাষা ছিল ফারসী। ইংরেজ আমলে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংয়ের শাসনকাল পর্যন্ত এদেশে ফারসী ভাষার প্রভাব ছিল। ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে যখন ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজী সরকারী ভাষারূপে গৃহীত হয়, তখন থেকে বাংলা ভাষায় ফারসী প্রভাবের অবসান ঘটে। দীর্ঘ ছয়শ' বছরের মুসলিম প্রভাবের ফলে বাংলা ভাষায় কয়েক হাজার ফারসী এবং ফারসীর মাধ্যমে ও স্বাধীনভাবে প্রচুর আরবী আর কিছু তুর্কী ও পশতু প্রবেশ লাভ করে। বাংলায় সে সব শব্দের উচ্চারণও অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ফারসীর প্রভাবে আরবী শব্দের এবং পরে বাংলার প্রভাবে ফারসীর মারফতে আগত আরবী শব্দের

www.pathagar.com

ধ্বনিতেও বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক সময় এগুলোকে অন্য ভাষার শব্দ বলে মনেই হয় না। ফারসী থেকে আগত শব্দগুলোকে প্রধানত সাত ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

১. রাজ্য ও যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধীয় শব্দ ঃ কামান, খাজনা, খাস, খেতাব, খেলাত, জখম, জমি, জমিদার, জাহাজ, তখত, তহশীলদার, তালুক, তালুকদার, তীর, তোপ, নবাব, ফৌজ, বাদশাহ, বাহাদুর, বেগম, রশদ, শহর, সেপাই ইত্যাদি।

২. আইন-আদালত সংক্রান্ত শব্দ ঃ আইন, আসামী, কয়েদ, কানুন, জরিমানা, জেরা, তামাদি, দারোগা, নাজির, নালিশ, পেয়াদা, পেশকার, ফয়সালা, ফরিয়াদ, মিয়াজি, মোকদ্দমা, মোয়াক্কেল, মোক্তার, রায়, শালিশ ইত্যাদি।

৩. ধর্ম সম্বন্ধীয় শব্দ ঃ ওযু, খোদা, গুনাহ, জায়নামাজ, দরবেশ, দোযখ, পেশ ইমাম, ফিরিশতা, বেহেশত, মোল্লা, মৌলবী, মরদ, মুসলমান, রোযা ইত্যাদি।

৪. শিক্ষা সম্বন্ধীয় শব্দ ঃ আদব, আদাব, আরব, আলেম, কাগজ, কেচ্ছা, খবরদার, গযল, পীর, বুজুর্গ, সরফরাজ ইত্যাদি।

৫. সভ্যতার উপকরণ সংক্রান্ত শব্দ ঃ আচকান, আতর, আয়না, কালিমা, কোপ্তা, সুলিস্তা, গোলাপ, চশমা, জামা, দালান, পোলাও, বরফ, বাগিচা, বাদাম, মখমল, মিছরী, রুমাল, হালুয়া, শিরনী ইত্যাদি।

৬. জাতি ও ব্যবসায় সংক্রান্ত শব্দ ঃ ইহুদী, কলাইকর, কসাই, কারিগর, খানসামা, খানা, খিদমত, খিদমতগার, চাকর, দরজী, দোকানদার, নফর, ফিরিংগী, বাজীকর, ভিস্তি, মেথর, যাদুকর, সহিস, হিন্দু ইত্যাদি।

৭. সাধারণ দ্রব্যভাব বিষয় ইত্যাদি সম্বন্ধীয় শব্দ ঃ আওয়াজ, আখরোট, আব, আতশ, আফসোস, কম, কিসমিস, কোর্মর, পরম, তাজা, দরবার, নরম, নাম, পছন্দ, কশা, বদল, বাহবা, বেশি, মজবুত, লাল, সবুজ, সফেদা, সেপায়া, সেতার, হযম, হরদম হাওয়া, হুশিয়ার ইত্যাদি।

এমনকি বাংলা ব্যাকরণেও ফারসী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নর পায়রা, মাদী পায়রা, মদাবী মদ্দা কুকুর-মাদী কুকুর ইত্যাদি রূপে শব্দের লিঙ্গ নির্দেশনা ফারসী প্রভাবের ফল। ফারসীতে নর ও মাদা অর্থ জ্ঞাপক শব্দ বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয়। যথাঃ গাও নর (ষাঁড়), গাও মাদী (গাভী)। বাংলা স্ত্রী বা পুরুষ বাচক শব্দ বিশেষ্যের আগে প্রযুক্ত হয়। এ প্রয়োগ বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সমগোত্রীয় কোল বা মুণ্ডা ভাষায়ও এ লক্ষ্য বিদ্যমান। ফারসীতে 'মুরগ' মানে পাখি। এর সঙ্গে স্ত্রী বাচক প্রত্যয় ঈ যোগ করে বাংলায় 'মুরগী' শব্দটি তৈরী হয়েছে। বাংলায় মোরগ মানে পুরুষ মোরগ, আর মুরগী মানে স্ত্রী মোরগ। ফারসীতে মুরগী নেই। কতগুলো ফারসী তদ্ধিত প্রত্যয় ও উপসর্গ বাংলায় বেমালুম মিশে গিয়েছে।

ফারসী থেকে গৃহীত তদ্ধিত প্রত্যয়

ঈঃ ইরনী, দেশী, বিলাতী ইত্যাদি।

কর ঃ যাদুকর, ধুনাইকর, কলাইকর ইত্যাদি।

www.pathagar.com

খোর ঃ আফিমখোর, গাঁজাখোর, গুলিখোর, চশমখোর, হারামখোর ইত্যাদি।
গিরি ঃ কেরানীগিরি, বাবুগিরি, বাবুর্চিগিরি, বাজীগিরি ইত্যাদি।
দান ঃ পানদান, পিকদান ইত্যাদি।
দানী ঃ আতরদানী, পিকদানী, নিমকদানী, ফুলদানী, সুরমাদানী ইত্যাদি।
দার ঃ তহশীলদার, দোকানদার, পোদ্দার, সিকদার ইত্যাদি।
দারী ঃ আয়মাদারী, তহসিলদারী, মনসবদারী ইত্যাদি।
বাজ ঃ ধড়িবাজ, ফন্দিবাজ, মামলাবাজ ইত্যাদি।

ফারসী থেকে গৃহীত উপসর্গ

কম (স্বল্প অর্থে) ঃ কম আক্কেল, কমজোর, কমবখত, কমপোখ্‌ত ইত্যাদি।
কার (কাজ অর্থে) ঃ কারখানা, কারচুপি, কারবার, কারসাজী ইত্যাদি।
দর (অধীন, মধ্যস্থ অর্থে) ঃ দরকার, দরখাস্ত, দরদালান, দরপত্তনী, দরপাট্টা ইত্যাদি।
না (না অর্থে) ঃ নাকাম, নাখোশ, নাচার, নামঞ্জুর, নামরদ, নারায, নালায়েক ইত্যাদি।
নিম (অধি অর্থে) ঃ নিমখুন, নিমমোক্কা, নিমরাজী ইত্যাদি।
ফি (প্রতি অর্থে) ঃ ফি-বছর, ফি-মাহিনা, ফি-হপ্তা, ফি-রোজ, ফি-সন ইত্যাদি।
ব (সহিত অর্থে) ঃ বকলম, বনাম ইত্যাদি।
বদ (মন্দ অর্থে) ঃ বজ্জাত, বদবখত, বদমেজাজ, বদমাশ, বদরাজী, বদহাল ইত্যাদি।
বর (বাইরে, মধ্যে) ঃ বরখাস্ত, বরখেলাপ, বরদাশত ইত্যাদি।
বা (সহিত অর্থে) ঃ বা-কায়দা, বা-অযু, বা-তালিক ইত্যাদি।
বে (না অর্থে) ঃ বে-আক্কেল, বে-আদব, বে-ঈমান, বে-কসুর, বে-কায়দা, বে-কার, বে-খবর, বে-গতিক, বে-তার, বে-নজীর, বে-মওকা, বে-মালুম, বে-লেহাজ, বে-শরম, বে-হাতা, বে-হায়া, এমনকি বে-হেড ইত্যাদি।
তে (তিন অর্থে) ঃ সেতার, সেপায়া ইত্যাদি।

এসব শব্দ ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত উপাদান বাংলা ভাষার অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। অনেক সময় এগুলোকে অন্য ভাষার শব্দ বলে মনেই হয় না।

ফারসী থেকে গৃহীত অব্যয়

ও (সংযোগ অব্যয়) ঃ জান ও মাল।
বাহ্ (বিস্ময়সূচক অব্যয়) ঃ বাহ্, কী সুন্দর।

আরবী প্রস্তাব ঃ

বাংলায় ব্যবহৃত আরবী শব্দের বেশীর ভাগই ফারসীর মাধ্যমে বাংলায় এসেছে। তাই এইগুলোর উচ্চারণ প্রায় সর্বত্রই বিকৃত হয়ে গেছে। বাংলায় আগত আরবী শব্দগুলোকে প্রধানত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. প্রশাসনিক ও আইন-আদালত সম্পর্কীয় শব্দ ঃ আদালত, আরবী, আলামত, উকিল, এসলাস, ওজর, কসম, কানুন, খারিজ, মহকুমা, মুন্সিফ, রায়, হাজত ইত্যাদি।

www.pathagar.com

২. ধর্ম সম্বন্ধীয় শব্দ ঃ আল্লাহ, ইসলাম, ঈদ, ঈমান, কুরআন, কুরবানী, কিয়ামত, জামাত, জাহান্নাম, তওবা, তেলাওয়াত, তাসবীহ্‌, যাকাত, রাসূল, হাদীস, হারাম, হালাল ইত্যাদি।

৩. শিক্ষা সংক্রান্ত শব্দ ঃ ওস্তাদ, কলম, কাবিল, কিতাব, কিচ্ছা, কুরসী, খাতা, গায়েব, জামায়াত, তওহীদ, তফসীর, দাখিল, দোয়াত, নগদ, ফাজিল, বাকী, বিদায়, মুর্শিদ, মুসলিম, হাজির ইত্যাদি।

৪. সংস্কৃতি ও বিবিধ বিষয়ক শব্দ ঃ আক্কেল, আখিরাত, আদম, আদমী, আদাব, আতর, আরয, কবর, কিসমাত, খাক, তওফীক, তসলীম, তাজ্জব, তামাদ্দুন, তালীন, তাহযীব, দফা, দুনিয়া, বিদায়, মনজিল, মাকসুদ, মাহফিল, মিলাদ, হাশর ইত্যাদি।

এছাড়া কিছু আরবী শব্দ উপসর্গরূপে বাংলায় প্রবেশ লাভ করেছে। এগুলো ফারসী থেকে আগত উপসর্গের মতোই বাংলা শব্দের সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে।

আরবী থেকে গৃহীত উপসর্গ

আর সাধারণ অর্থে ঃ আম দরবার, আম মোখতার ইত্যাদি।

খয়ের (ভাল অর্থে) ঃ খয়ের খা ইত্যাদি।

খাস (বিশেষ অর্থে) খাস কামরা, খাস দখল, খাস দরবার, খাস মহল ইত্যাদি।

গর, গায়ের (অভাব অর্থে) ঃ গরমিল, গরমওসুম, গররাজি, গরহাজির ইত্যাদি।

বাজে (খারাপ অর্থে) ঃ বাজে কথা, বাজে খবর, বাজে নাম, বাজে লোক ইত্যাদি।

লা (না অর্থে) ঃ লাওয়ারিশ, লাখেরাজ, লাজওয়াব, লাপাত্তা, লামাযহাব ইত্যাদি।

তুর্কী শব্দ

আলখাল্লা, ওজবুক, উর্দু, কাচি, কুলী, কাতুন, খাঁ, খানম, গালিচা, চাকর, চাকু, তাক, তুর্ক, তোপ, দারোগা, বাবুর্চি, বাহাদুর, বেগম, বিবি, বেগকা, মুচলেকা, লাশ, সওগাত ইত্যাদি।

পশতু শব্দ

পাখতুন, পোশত, পোস্তান (বইয়ের), শেরওয়ানী, করা, ইখাম ইত্যাদি।

বিভিন্ন সংস্থা ও সংঘের অবদান

১৯৪৭-এর পর পাকিস্তান আমলে নিম্নোক্ত সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বাংলা ভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলেছে ঃ

১. বাংলা একাডেমী (১৯৫২) ঃ বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর ভূমিকা অনন্য। গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদের মাধ্যমে এবং মৌলিক ও সৃষ্টিশীল সাহিত্য প্রকাশনায় বাংলা একাডেমীর অবদান অবিস্মরণীয়। এই সংস্থা বিগত প্রায় দুই কুড়ি বছরে তিন হাজারেরও মতো ছোট-বড় গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। বহু দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ ও সম্পাদনা, লোক সাহিত্য ও অভিধান ইত্যাদি প্রকাশনায় যথেষ্ট অবদান রেখেছে।

www.pathagar.com

২. কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (১৯৬৪) ঃ বাংলা ভাষায় উচ্চতর শিক্ষার প্রসারে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য, প্রকৌশল, ভেষজ, কৃষি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানাবিধ পাঠ্য পুস্তক ও পরিভাষা প্রণয়ন এ সংস্থার প্রধান কাজ। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এই সংস্থা বাংলা একাডেমীর সঙ্গে আত্মীকৃত হয়। বাংলা একাডেমী এখন দুই সংস্থারই কাজ করে যাচ্ছে।

৩. ইসলামিক একাডেমী, পরে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (১৯৫৯) ঃ আল কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ও অন্যান্য ইসলামী প্রকাশনার ব্যাপারে এ সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ১৯৭১ সালের পর এ সংস্থার কার্যক্রম বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের শাখা এখন সকল জেলায় রয়েছে এবং সাহিত্য সাধনায় বিশেষ করে ইসলামী-সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দানের প্রশংসনীয় উদ্যমের সাক্ষ্য রাখছে। এ সংস্থার অনুবাদ, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে দুই হাজারের মতো গ্রন্থ শিরোনাম এ সংস্থার গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

৪. নজরুল একাডেমীও পাকিস্তান আমল থেকে বিভিন্ন গবেষণার কাজ করে যাচ্ছে। এ সংস্থার কার্যক্রম ব্যাপকভাবে দেশব্যাপী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে।

৫. শিল্পকলা একাডেমী, ৬. শিশু একাডেমী, ৭. লোক সাহিত্য একাডেমী এসব সংস্থার প্রত্যেকটিই বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

৮. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের কাজ করেছে পাকিস্তান আমল থেকে 'জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো'। পরে সংস্থাটি 'পাকিস্তান কাউন্সিল' নামে প্রকাশনায় উদ্যম প্রকাশ করে।

৯. সরকারী তথ্য পরিদপ্তর ও পাকিস্তান পাবলিকেশন্স বেশ কয়েকটি মূল্যবান তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশ করেছে।

১০. বাংলা ভাষায় বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন ও ভাষার স্তরভিত্তিক সমতা বিধান বিষয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান টেকস্ট বুক বোর্ড, বর্তমান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক সংস্থা একক ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেছে। স্কুল-কলেজের গ্রন্থাদিতে ভাষা প্রয়োগের ব্যাপারে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রশংসনীয়।

১১. অধুনালুপ্ত লেখক সংঘও এ ব্যাপারে উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা পালন করেছে।

১২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৪. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫. ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব প্রকাশনা বিভাগ থেকে দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, কৃষি, বাণিজ্য ও অন্যান্য নানাবিধ সমস্যা নিয়ে প্রচুর গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে।

এছাড়া ১৬. জাতীয় যাদুঘর, ১৭. এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৮. সরকারী কৃষি তথ্য সংস্থা, ১৯. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২১.

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচার সমিতি, ২২. বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, ২৩. ইতিহাস সমিতি, ২৪. উচ্চতর মানব বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ২৫. ভাষা সমিতি, ২৬. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ২৭. শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২৮. উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দফতর প্রভৃতি সংস্থা বাংলায় গ্রন্থাদি প্রকাশ করে ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় এগিয়ে এসেছে। ২৯. বৃটিশ আমলে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, ৩০ পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি, ৩১. তমদ্দুন মজলিস, ৩২, কায়কোবাদ স্মৃতি সংসদ, ৩৩. পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, ৩৪. পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য মজলিস, ৩৫. ভাষা সংগ্রাম পরিষদ, ৩৬. ইতিহাস পরিষদ ৩৭. আহছানিয়া মিশন, ৩৮. জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, ৩৯. বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ৪০. হাইকোর্ট মাজার সমিতি, ৪১. সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, ৪২. দিনাজপুর সাহিত্য সংগ্রাম, ৪৩. বাংলা সাহিত্য পরিষদ ঢাকা– এ সব সংস্থার অসংখ্য প্রকাশনা ছাড়াও ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক উদ্যোগে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক, গবেষণা ও সৃষ্টিশীল সাহিত্য প্রকাশে বাংলাদেশের পাঁচ শতাধিক প্রকাশনা সংস্থার অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। এদের মধ্যে, ভাষা আন্দোলন সংগঠনে ও ভাষা সংস্কার আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও কিছু সংস্থা বা ফাউণ্ডেশন, যেমন মতিউর রহমান ফাউণ্ডেশন, সাইদুর রহমান ফাউণ্ডেশন, কাজী হাবিবুল্লাহ ও জেবুন্নিসা ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ ইত্যাদি স্মৃতি রক্ষণমূলক বক্তৃতা, গবেষণা পত্র রচনা ও পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করে।

বিভিন্ন ভাষা কমিটির মাধ্যমে ভাষার সমীক্ষণ ও প্রয়োগ বিধি প্রণয়ন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ

বাংলা ভাষার উপাদান গ্রথিতকরণ, বিদেশী ভাষার প্রতিবর্ণায়ন ও পরিভাষা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়েছে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণে নৈরাজ্য ও অনিয়ম দূর করে শৃংখলাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এ সকল কমিটি কাজ করে ঃ

১. ১৯৪১ সালে পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি গঠিত হয়।

২. ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক ভাষা উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা কমিটি গঠিত হয় ১৯৫৭ সালে। বাংলা ভাষার বানান, ব্যাকরণ ও বর্ণ ইত্যাদি বিবেচনার উদ্দেশ্যে বৃহত্তর পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ মহলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত এই কমিটির সুপারিশমালাই ভাষা প্রয়োগ ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

৪. পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড ১৯৬৭ সালে ভাষাবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। বস্তুত টেকস্ট বুক বোর্ড ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৭ এক বছরে কয়েক বার ভাষা সম্পর্কীয় কমিটি গঠন করে বিভিন্ন কমিটির সমন্বিত সুপারিশক্রমে আরবী, ফারসী বর্ণের ও বাংলা বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করে।

৫. ভাষা সংগঠন ও বানান সম্পর্কে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৭৮ সালে একটি ছোট কমিটির মাধ্যমে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এরপর আবার ১৯৭৮ সালে

www.pathagar.com

বৃহত্তর সমাজের বিভিন্ন অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের সমন্বয়ে একটি প্রতিবর্ণকরণ কমিটি গঠন করে বিদেশী ভাষায় প্রতিবর্ণায়নের নীতি নির্ধারণ করে এবং তার ভিত্তিতে 'প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা' শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। এসব ভাষা কমিটির সুপারিশ বাংলা ভাষার যথাযোগ্য ব্যবহার ও যথাবিহিত পরিমার্জন ও পরিযোজনসহ প্রয়োগ বিধি নির্ধারণ করে ভাষা উন্নয়নে ও চলমান জীবনে তার সম্যক প্রয়োগে সহায়ক হয়েছে।

ভাষার উন্নয়ন ও সোজা বানানা প্রবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও ভাষা আন্দোলনের জনক অধ্যাপক আবুল কাসেম। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। পরে তিনি তাঁর মত পাল্টান। বানান ও বর্ণাদি সংস্কারে যাঁরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই, কাজী দীন মুহম্মদ, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, আবদুল কাইউম, রফিকুল ইসলাম, জামীল চৌধুরী, আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে, বিশেষ করে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় এঁদের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তদানীন্তন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা বানান, মুদ্রাক্ষরিক লিপি ও সাঁটলিপি নিয়ে গবেষণা করে। বোর্ডের চেষ্টায়ই গৃহীত হয় 'মুনির অপটিমা'। বর্ণ ও টাইপ রাইটার নিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গবেষণা করেন ইঞ্জিনিয়ার জয়নুল আবেদীন এবং টাইপিস্ট আলী আহমদ। এঁদের সবারই প্রচেষ্টার উৎস রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মুদ্রাক্ষরিক লিপি ও সাঁটলিপি। তাঁরই প্রবর্তিত বর্ণমালার কিঞ্চিৎ হেরফের করে তাঁদের মতামত উপস্থিত হয়। উন্নয়ন বোর্ডের টাইপ রাইটার সংক্রান্ত চিন্তাভাবনায় পূর্বসূরী সবার মতামত বিবেচনা করা হয়।

সম্প্রতি যশোর জেলার এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ভুবন মোহন দাস বাংলা লিপির আমূল সংস্কার করে এক নতুন লিখন পদ্ধতির প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তাঁর মতামত ও পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক ও উদ্ভট।

বিভিন্ন দিবস উদযাপনের মাধ্যমে ভাষার লালন

১. অমর একুশে ফেব্রুয়ারীঃ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রথম ভাষা সংগ্রাম কমিটির মাধ্যমে একুশে ফেব্রুয়ারী মিছিল বের করা হয়। কার্ফূ থাকায় গুলি করা হয়, অবশেষে বাংলা ভাষার বিজয় কেতন ওড়ে। বেশ কয়েকজন শহীদ হন। একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার সরকারী জেদ পরাজিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক নজিরবিহীন ঘটনা। বর্তমান বিশ্বের জানা ইতিহাসে ভাষার জন্যে এতখানি সংগ্রামমুখী হওয়ার দৃষ্টান্ত বিশ্বের আর কোথাও নেই। প্রতি বছর এদিন উপলক্ষে বহু পত্র-পত্রিকা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। এ দিনটিকে সামনে রেখে এগিয়ে চলার প্রেরণা যোগাবে। এ দিনটি জাতীয় শোকের দিন। এ দিনটিকে বিষয়বস্তু করে বিপুল সাহিত্য নির্মিত হয়েছে।

www.pathagar.com

এদেশ, এজাতি যতদিন থাকবে, যতদিন এ ভাষা থাকবে, ততদিন বাংলার সর্বত্র এ দিনটিকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-সম্ভার সজ্জিত হবে।

২. পয়লা বৈশাখ ঃ বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশী জাতীয়তা বোধের প্রেরণায় বাংলা সন বাঙালীর জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ প্রয়াসে বাংলা সনের প্রথম মাসের এ প্রথম দিনটিকে স্মরণ করা হয়। এ উপলক্ষে অন্যান্য ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে সাহিত্য কর্মের অনুশীলন হয়। দেশব্যাপী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলো এ দিনে কর্মসূচী পালন করে।

৩. ধর্মীয় উৎসব ঃ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা, রমজান, মহররম, রজব (লাইলাতুল মিরাজ), শাবান (লাইলাতুল বারাত), লাইলাতুল কদর, ঈদে মিলাদ-উন্নবী প্রভৃতি মুসলিম ঐতিহ্য ও তাহজীব-তমদ্দুন সংশ্লিষ্ট সব ব্যাপারে দিবস পালন করা হয় এবং এ উপলক্ষে অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ ছাড়াও বেশ কিছু সাহিত্য সৃষ্টি হয় এবং পত্র-পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা বের হয়।

৪. সাহিত্য সাধক দিবস ঃ কবি-সাহিত্যিক ও সাধক-মনীষীদের জন্ম-মৃত্যু দিবস প্রতিপালনের মাধ্যমে তাঁদের কর্ম ও জীবনী আলোচনা, বৈঠক, মজলিস, সংগঠন, সাহিত্য সৃষ্টি, ক্রোড়পত্র প্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে সাহিত্যের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়; ভাষা নব নবরূপে পত্র পল্লবে লতিয়ে ওঠে পুরস্কার, স্বীকৃতি-সনদ, বৃত্তি ও উৎসাহ দানের মাধ্যমে।

মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যেমন রাজ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে আধুনিক সাহিত্য বৃটিশ আমলে সে ধারা রক্ষিত হয়নি। ইংরেজরা নিজেদের গরজে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকেন্দ্রিক বাংলা ভাষা উন্নয়ন কর্মে উৎসাহ দিয়েছে। পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বর্ধমান ধর্মবিধান সভা জাতীয় যে সব সংস্থা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করেছে তার সবই প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের হিন্দু সাহিত্যকেন্দ্রিক। পরে মুসলিম জাগৃতির ফলে বংগীয় মুসলমান সাহিত্য পরিষদ, মুসলিম রেনেসাঁ সোসাইটি প্রভৃতি গড়ে ওঠে। এ সবের মাধ্যমে মুসলিম ঐতিহ্য ও কৃষ্টি রূপায়ণের সুযোগ মিলে।

১৯৪৭ সালের পরে পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক মুসলিম সাহিত্য সংস্থা গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। আর সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কবি সাহিত্যিকদের সম্মান প্রদর্শন, স্বীকৃতি প্রদান, পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা হয়। প্রেসিডেন্ট পুরস্কার, প্রাইড অব পারফরমেন্স, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পুরস্কার, ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার, ফরিদপুরের আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, দিনাজপুরে নওরোজ সাহিত্য মজলিস পুরস্কার, কুমিল্লার অলক্ত, কাজী মাহবুবুল্লাহ ও জেবুন্নেসা ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ এবং আরো অনেক পুরস্কার ও দুঃস্থ সাহিত্যিকদের এককালীন ও মাসিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এ সব ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবের ব্যাপার এবং অগ্রগতির সহায়ক।

এছাড়াও উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভ তৈরীর জন্য বহু সংখ্যক উচ্চমানের বৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থ দিয়ে ভাল লেখকদের ভাল লেখা প্রণয়নে ও প্রকাশনের এসব ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের সহায়ক। এ বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অবদান অনস্বীকার্য।

www.pathagar.com

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অবদান

উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে মুসলিম পত্র-পত্রিকার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মীর মশাররফ হোসেন 'আজীজন নাহার' প্রকাশ করেন ১৮৭৪ সালে। এরপর 'হিতকরী' প্রকাশিত হয় ১৮৯০ সালে। এরপর প্রকাশিত হয় সুধাকর (১৯৮৯), মিহির (১৮৯২), মিহির ও সুধাকর (১৮৯৫), হাফেজ (১৮৯৭), মোসলেম প্রতিভা, মোসলেম হিতৈষী (১৯১১), আখবারে এসলামিয়া (১৮৮৩), আহমদী (১৮৮৬), মুসলমান (১৮৮৪), নব সুধাকর (১৮৮৬), ইসলাম (১৮৩১), পারিল বার্তাবহ (১৮৭৪), মুহাম্মদ আখবার (১৮৭৭), হিন্দু মুসলমান সম্মিলনী (১৮৮৭), টাঙ্গাইল হিতকরী (১৮৯২), মোসলেম পত্রিকা (১৯০১), সোলতান (১৯০১), ইসলাম সুওদ (১৯০৪), লহরী (১৮৯৯), মোসলেম ভারত (১৯০২-২১), নূর অল ঈমান (১৯০০), বাসনা (১৯০৮), আল এখলাস (১৯১৫), বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (১৯১৮), সওগাত (১৯১৮), শিখা (১৩৩৩), মোহাম্মদী (১৩৩৪)।

এসব পত্রিকা একদিকে যেমন জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণের সহায়ক হয়েছে, মুসলমানের সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনায় দীক্ষিত করার প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় ঐতিহ্য ও বিবিধ বিষয়কে কেন্দ্র করে বিশুদ্ধ সাহিত্যও সৃষ্টি করেছে। ভাষার সৌকর্য বিধানের অনুশীলন ও বিকাশ ধারায় আধুনিক সমাজের মুসলিম বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলোর দান অস্বীকার করার উপায় নেই।

এরপর এ অঞ্চলে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯৪৭-এর পর নব উদ্যমে ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত পত্র-পত্রিকা গড়ে তোলে নিজস্ব পরিমণ্ডল। গবেষণা ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাহিত্য-পত্রিকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পত্রিকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগর পত্রিকা সাহিত্যিকী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পাণ্ডুলিপি, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, মাহে নও, শিল্পকলা একাডেমী পত্রিকা, শিশু একাডেমী পত্রিকা, সিলেটের আল ইসলাহ, সুন্নতুল জামায়াত, পৃথিবী, কলম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। এছাড়া বাংলা একাডেমীর উত্তরাধিকার, ধানশালিকের দেশ, সচিত্র বাংলাদেশ, শিশু একাডেমী পত্রিকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের অগ্রপথিক ও সবুজ পাতা ভাষার সেবায় নিয়োজিত। বর্তমানে সারাদেশে প্রায় একশ' দৈনিক ও অর্ধশত সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং অসংখ্য স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার মুখপত্র, শিশুপত্র ও লিটল ম্যাগাজিন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত। গবেষণা ও সৃষ্টিশীল সাহিত্য সৃজন বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে আমাদের দেশের হাজারো পত্র-পত্রিকায়। ভাষার শক্তি আর প্রসারণ ক্ষমতা কত সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পারে বাংলা ভাষাই তার প্রমাণ।

www.pathagar.com

সাংবাদিকদের ভূমিকা ও অবদান

বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি সাধনে সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। ভাষা আন্দোলনের আগে ও পরে এবং আন্দোলনের সময়, আন্দোলন জিইয়ে রাখার জন্যে সাংবাদিকদের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলা ভাষার মধ্যযুগের পর যখন থেকে মুসলিম সমাজে সাংবাদিকতার বীজ উপ্ত হয় তখন থেকে সাংবাদিকরা নানাভাবে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন। এ যুগে এসে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন শিরাজী এঁদের শুশ্রুষায় বাংলার অনেকখানি শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। সার্থক সাংবাদিকতায় দৈনিক আজাদ, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী ও মাসিক মোহাম্মদীর সাংবাদিক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মাসিক সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এঁদের নামের সঙ্গে যাদের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী, মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং পরবর্তীকালে আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুজিবুর রহমান খাঁ, মোফাজ্জল হোসেন, আফাজউদ্দীন, আহসান হাবীব প্রমুখ। অতি আধুনিককালে শামসুর রাহমান, আখতার-উল-আলম, মহীউদ্দীন, আহমেদুল কবীর, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, তালিম হোসেন, আখতার ফারুক প্রমুখ অনেকেই সাংবাদিকতায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন এবং বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সচেষ্ট হয়েছেন।

বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নয়নে মুসলিমের অবদানের ব্যাপারে সাংবাদিকদের সঙ্গে যাঁদের নাম উচ্চারিত হওয়ার যোগ্য তাঁরা হলেন ঃ বুদ্ধিজীবিমহল। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বাংলা ভাষার উন্নয়নে যে ভূমিকা পালন করেন, তার সম্যক বিচার বিশ্লেষণ এখানে হয়নি। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ইসমাইল হোসেন শিরাজী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, গোলাম মোস্তফা, বেনজীর আহমদ, আবদুল কাদির, মাহবুবুল আলম, আবুল ফজল, মনসুর উদ্দীন, এনামুল হক, আবুল মনসুর আহমদ, জসীম উদ্‌দীন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, কাজী আকরাম হোসেন, সৈয়দ শাহাদাত হোসেন, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, শাহেদ আলী, মুনীর চৌধুরী, আহমদ শরীফ, আনিসুজ্জামান, মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আশরাফ সিদ্দিকী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আবদুল গণি হাজারী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, সুফিয়া কামাল, কবির চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবদুর রশীদ,আবু হেনা মোস্তফা কামাল, নীলিমা ইব্রাহীম, সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, সৈয়দ আলী আশ্‌রাফ, মাজহারুল ইসলাম, আবদুল গফুর, মুহম্মদ আবূ তালিব, রফিকুল ইসলাম, আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ প্রমুখ অনেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদানে বাংলা সাহিত্য ও সংবাদ পত্র সমৃদ্ধ হয়েছে, বাংলা ভাষার নানামুখী অনুশীলনী এঁদের মারফতে উজ্জীবিত হয়েছে। দেশ ও জাতির শিক্ষা সংস্কৃতি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে নানাজনের সাধনা বাংলা ভাষাকে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে।

www.pathagar.com

বিবিধ

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম রেডিও, টেলিভিশন, জাতীয় গণশিক্ষা মাধ্যম এবং তথ্য ও শিক্ষা প্রচার মাধ্যমসমূহই আমাদের ভাষার বিকাশে কার্যকর অবদান রাখছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে এবং মনীষীদের জন্ম-মৃত্যুর স্মরণে অনেক সেমিনার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিত ব্যক্তি এতে অংশগ্রহণ করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে ভাষা ও সাহিত্যের সৌকর্য বিধানে সহায়তা করেন।

এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার স্তর পর্যন্ত যাঁরা শিক্ষা দেন ও শিক্ষা গ্রহণ করেন, নানাভাবে তাঁরা ভাষার বিকাশে নিজ নিজ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। আরো একটি কথা। এ কথাটি না বলা হলে আমাদের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সমগ্র দেশের আনাচে-কানাচে যে নাম পরিচয়হীন জনগোষ্ঠী রয়েছেন, যাঁদের বেশীর ভাগই লেখা-পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন ও সহায়তা ভাষা আন্দোলনের উদ্দীপনা জাগিয়ে রাখতে সহায়তা করেছে, সে অগণিত নাম পরিচয়হীন জনগণের আন্তরিক ইচ্ছায় ভাষা যুদ্ধের বিজয় এগিয়ে দিয়েছে। তাঁদের সমবেত ও ব্যক্তিগত আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা না থাকলে বাংলা ভাষা আজ যে পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত, সে পর্যায়ে পৌঁছতে পারত কি না সন্দেহ। কাজেই বাংলা ভাষার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের ইতিহাসে তাঁদের নামের অনুপস্থিতি অত্যন্ত শরমের কথা এবং তা জাতির জন্য কলংকস্বরূপ।

প্রসঙ্গত এও না বললে চলবে না যে, একদা উচ্চ কোটির স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই এ দেশের গলায় পরাধীনতার জিঞ্জির পড়েছিল। ফলে ভাষা ও সাহিত্যের ঘটেছিল অপমৃত্যু। আর একদিন পরার্থপর শিক্ষা-দীক্ষা বঞ্চিত মুসলিম জনগণের ত্যাগের বিনিময়ে ভাষার জিঞ্জির মুক্তি ঘটেছিল। যার ফলে শৃঙ্খল মুক্ত হতে পেরেছিল দেশ ও জাতি। আবার বেঁচে থাকার প্রত্যয়ে শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বাংলার অধিবাসী। একদা সিংহাসনের সঙ্গে গিয়েছিল দেশ, আর দেশের সঙ্গে গিয়েছিল ভাষা। আবার ভাষার সঙ্গে এসেছে দেশ, এসেছে সিংহাসন। তাই বাংলা ভাষার বিকাশের ইতিহাস বাংলাদেশের অগণিত, অশিক্ষিত জনগণের কার্যকর ভূমিকার কথাও এই সময় কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হয়।

উপসংহার

সাহিত্য তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনের ও রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা এক সংগ্রাম-মুখী জীবনের ইংগিত বহন করে। প্রতি বছর, প্রতি মাস, প্রতি সপ্তাহ এমনকি প্রতি দিনকার আমাদের সকলের মুখের ভাষা ও পরিশীলনীর ও আমাদের সংগ্রামী চেতনার অন্তর্নিহিত মর্মবাণীর পরিচিতি বিধৃত এ একুশের আন্দোলন তথা বাংলা ভাষা-ভাষীর জীবনের সামগ্রিকতায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও আদর্শ চেতনা শিল্প-সৌকর্যে সমন্বিত হোক আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্যও এ ভাষার উৎসব মুহূর্তে।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার বিকাশে মুসলমানদের অবদানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এখানে যা বলা হয়েছে, এই শেষ কথা– এমন মনে করার কারণ নেই। যা বলা হয়েছে এর বাইরে আর কিছু বলার নেই, তা নয়। তবে এটি একটি বিনীত প্রয়াস মাত্র। শুধু স্থূল পরিচিতির আভাস মাত্র। স্বরূপ বিশ্লেষণ নয়, বলা যায় সংশ্লেষণ। বিশাল সমুদ্র কুজায় ধারণের কিংবা বলা যায়; শিশিরে সমুদ্র দর্শনের মতো।

'বাংলা ভাষার বিকাশে মুসলমানদের অবদান ঃ একটি বিনীত সমীক্ষা'–এ ধরনের নাম দিলে যথা বিচার হতো, মনে করি। যাঁরা জানেন, তাঁদের জন্য নতুন খবর এতে নেই। আর যাঁদের কাছে শুনতে নতুন মনে হবে, তাঁদের পক্ষে কিছু ভাবনার খোরাক পরিবেশ করতে সক্ষম হয়ে থাকলেই আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। আর বিষয় বিন্যাস ও বিভাগে বিভক্তকরণ একান্তই স্বেচ্ছাকৃত। যে কেউ যে কোন রকম এ বিধানগুলির সমীকরণ বা বিসমীকরণ করতে পারেন।

যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সাধনায় বাংলা ভাষা আজ বাংলাদেশবাসীকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হয়েছে, তাঁদের সবার প্রতি জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাঁদের মধ্যে যে সব জ্ঞানী সাধক পুরুষ নিহত হয়েছেন, তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করি, আর যাঁরা এখনও সাধনায় ব্রতী, তাঁদের কর্মমুখর জীবন দীর্ঘ হোক, তাঁদের সাধনা সফল হোক, এ কামনা করি। সবশেষে যাঁরা ভাষার জন্যে, সাহিত্যের জন্যে এবং দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

www.pathagar.com

বাংলা লিপি ও বাংলা ভাষার আদি নীড়

মুহম্মদ আবূ তালিব

লেখক -পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ১ এপ্রিল ১৯২৮, গোয়ালখালি গ্রাম, খুলনা। শিক্ষা ঃ এম.এ (বাংলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২। পেশা ঃ অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে অবসর।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রবন্ধ ঃ সাহারার ফুল (১৯৪১), লোক সাহিত্য (১৯৫২), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৯৫৫), মুসলিম বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নমুনা (১৯৬৭), বাংলা সাহিত্যের ধারা (১৯৬৮), লালন শাহ ও লালন গীতিকা (১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৬৮), লালন পরিচিতি (১৯৬৮), বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায় (১৯৬৮), বাংলা সাহিত্যের একটি হারানো ধারা (১৯৭০), বাংলা সনের জন্ম কথা (১৯৭৭), মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, ভাষা লিপি ও সাহিত্য প্রভৃতি।

লেখা-পরিচিতি ঃ 'বাংলা লিপির উদ্ভবকাল' শিরোনামে 'অগ্রপথিক' শহীদ দিবস সংখ্যায় ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত। লেখাটি পরে 'অগ্রপথিক সংকলন ঃ ভাষা আন্দোলন'-এ অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় অংশটি 'বাংলা ভাষার আদি নীড় ঃ বরেন্দ্রভূমি ও বরেন্দ্র ভাষা' শিরোনামে মুহম্মদ আবূ তালিব রচিত 'ভাষা লিপি ও সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশক ঃ সৃজন প্রকাশনী লিঃ ঢাকা। প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ১৯৯০। দুটি অংশকে এখানে একটি শিরোনাভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলা লিপির উদ্ভবকাল

বাংলা লিপির জন্ম-ইতিহাস আজও তমসাচ্ছন্ন। নানা মুনির নানা মত। তবে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, পনেরো শ' খৃস্টাব্দের দিকে অনুলিখিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে বিধৃত বাংলা লিপির পূর্বতন পূর্ণাঙ্গ লিপির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য এই মত যে নিতান্তই বাসী সাম্প্রতিক অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে তা প্রমাণিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আলোচ্য তাম্রশাসন দু'খানিও তার সাক্ষ্য বহন করছে। বর্তমান লেখক দিনাজপুর জেলার রাণীশংকৈল থানা থেকে আবিষ্কৃত খৃস্টীয় দশম শতাব্দীর একটি শিলালেখের (গোরকোই শিলালেখ) দৃষ্টান্তে বলেছেন যে, ৯২০ শকাব্দ/৯৯৮ খৃস্টাব্দের ১৭ই মাঘ তারিখে উৎকীর্ণ এই শিলালেখটি এ যাবত প্রাপ্ত বাংলা লিপি লেখনের প্রাচীনতম নমুনা।[১] কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাচীন ভারতীয় লিপিবিশারদ ডক্টর শ্রী দীনেশ চন্দ্র সরকার প্রমুখ ব্যক্তি গোরকোই শিলালেখের লিপিকে বাংলা বলে স্বীকার করলেও শিলালেখে উল্লেখিত কাল সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন।[২] সিলেটের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মি.কে.কে গুপ্তও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[৩] কিন্তু কৌতূহলের ব্যাপার, সম্প্রতি বেশ কয়েকটি প্রাচীন তাম্রশাসনের সন্ধান মিলেছে, যেগুলো উৎকীর্ণ হয়েছে বিভিন্ন সময়ে এবং যার উৎকীর্ণ হওয়ার কাল খৃস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে শুরু করে নিম্নতম অষ্টম শতক। ভুলক্রমে এই তাম্রশাসনগুলোকে প্রাক-বাংলা (Proto Bengali) লিপির নমুনা বলে এতকাল মনে করা হয়েছিল। আজ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর ভাষা সংস্কৃত, তবে লিপি বাংলা ব্যতীত নয়। এই তাম্রশাসনগুলির মধ্য থেকে আজ দু'টি তাম্রশাসনের অনুলিপি সুধী সমাজের অবগতির জন্য পেশ করা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

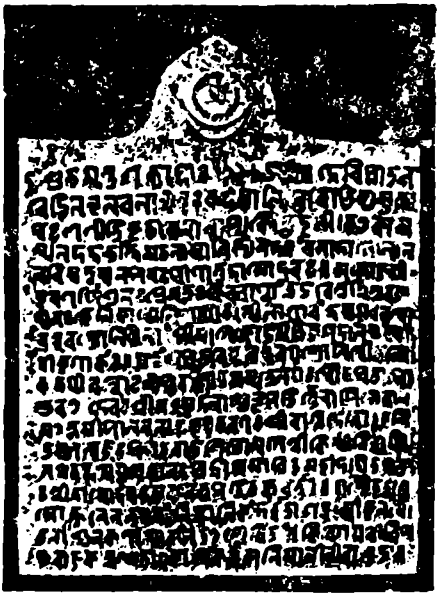

দামোদর দেবের তাম্রলিপি, চট্টগ্রাম, ১১৬৫ শক, ১২৪৩ খৃষ্টাব্দ

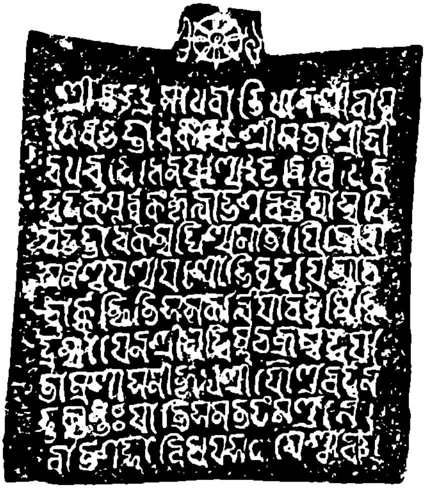

বীরধর দেবের তাম্রশাসন, ময়নামতী, আনুমানিক ৭৫০-৮০০ খৃষ্টাব্দ

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, এই দু'টি তাম্রশাসন যথাক্রমে অষ্টম ও ত্রয়োদশ শতকে উৎকীর্ণ হয়েছিল বলে (তাম্রলিপি সূত্রে) জানা যায়।

'শহর চট্টগ্রামের ইতিকথা'র লেখক জনাব আবদুল হক চৌধুরীর সৌজন্যে তাম্রশাসন দু'টির ফটোস্ট্যাট কপি সম্প্রতি বর্তমান লেখকের হস্তগত হয়েছে।

প্রথম তাম্রশাসনটির এখনও পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয়নি, তবে প্রথম নজরেই বোঝা যায়, এগুলো প্রাচীন বাংলা হরফ ব্যতীত কিছু নয়। বিশেষ করে প্রথম চরণের শেষে শ্রী বাসু দেবস্য নবম চরণে, (১০ম চরণ)– তাম্রশাসন, সমতট মণ্ডলে ইত্যাদি শব্দগুলো যে বাংলা হরফে লেখা তাতে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। দ্বিতীয় অনুলিপিটির প্রথমাংশের মূল পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ওঁ শুভমস্তু শকাব্দা ঃ ১১৬৫।

শ্লোক–১ ॥ দেবি প্রাতরবেহি নন্দন বমান্নন্দঃ কদম্ব নীলা ব্যতিব্যস্তকর ঃ শশীতি কৃত কেনালাপ্য কৌতূহলী ॥ তৎকালঙ্খল দঙ্গভঙ্গি মঞ্চলা মালিম্বা লক্ষ্মী বলদালোলানন বিম্বচুম্বন পরঃ প্রীনাতু দামোদরঃ ॥

শ্লোক–২ ॥ অন্তৌজ শ্রী মুষম পিশুনঃ প্রেমভুঃ কৈরবানাং চূড়া রত্নং ত্রিপুর জয়িম কেলিকারো নিশায়াঃ॥

লীলাগারং কুসুম ধনুবো বন্ধু রত্নো নিখিনং শ্রী মানেকো জয়তী জগদানন্দ করী মৃগাঙ্কঃ

শ্লোক–৩ ॥ যদ্বংশ প্রভাবেন্দু সুন্দর যশো নিধৌতলোক ত্রয়ীবন্দো ঃ শ্রী পুরুষোত্তমস্য তনয়ঃ প্রৌঢ় প্রতাপোহ ভবৎ দেবঃ শ্রী মধুসূদনাখ্য নৃপতিয়ে নাপি সেবানমৎ ভূমীপাল ললাট খৃষ্ট চরণঃ শ্রী বাসুদেবোহ জনি॥

শ্লোক–৪ ॥ তন্মাত্মজঃ পুণ্যরাজ শিরোমণি শ্রী (কির্মিরা তা গ্রীন?) খচন্দ ময়ূখমালাঃ

প্রজ্ঞা প্রশারিত মহী দয়িত পুত্র ঃ শ্রী দামোদর ঃ সকল নৃপতি চক্রবর্তী। পাঠান্তর 'সকল ভূপতি চক্রবর্তী'।[৪]

বিখ্যাত 'Inscription of Bengal' vol III গ্রন্থের লেখক শ্রী ননীগোপাল মজুমদার চতুর্থ শ্লোকের ব্রাকেটে উক্ত অংশের 'কির্মিরী তাগুগ্রী' পাঠ কেন দিতে চেয়েছেন, আমার বোধগম্য নয়। পাঠটি দুষ্পাঠ্য হলেও ননীগোপাল বাবুর পাঠ থেকে ভিন্নতর হবে মনে করি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার স্থান এ নয়।[৫]

পরবর্তী চরণের পাঠেও ননীগোপাল বাবু ভিন্নতর পাঠ দিয়েছেন, যথা, "প্রজ্ঞা প্রসারিত মহী দয়িত পুত্র" স্থলে তিনি "প্রজ্ঞা প্রসারিত মহীদয়িতেশ্বর" পাঠ নিতে চান। এ পাঠ হতেই পারে না। উক্ত শ্লোকের আরও একটি ভিন্নতর পাঠ দিয়েছেন তিনি। যথা, 'সকল নৃপতি চক্রবর্তী ' স্থলে তিনি 'সকল ভূপতি চক্রবর্তী, বলতে চান। মনে হয়, সেটিও ঠিক নয়। অবশ্য 'নৃপতি' আর 'ভূপতি' পাঠ অর্থের দিক দিয়ে কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

তাম্রশাসনের ভাষা সংস্কৃত, তবে লিপি স্পষ্টতঃ প্রাচীন বাংলা। ননীগোপাল বাবু একে প্রাক–বাংলা (Proto-Bengali) বলেছেন, তবে কৌতূহলের বিষয়, এর পাঠ লিপিবদ্ধ করেছেন, দেব নাগরী হরফে। কারণ উল্লেখ করেন নি। অবশ্য তাঁর বই–এ প্রদত্ত সকল

www.pathagar.com

পাঠই তিনি দেব নাগরীতে দিয়েছেন। লিপির কাল ১১৬৫ শক/১২৪৩ খৃষ্টাব্দ। এ সময়ে বখ্‌তিয়ার খিলজীর উত্তরসূরী তুর্কী জাতীয় রাজগণ বাংলা শাসন করছিলেন। তাই তাম্রলিপিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশ তখন নিতান্তই মেঘাচ্ছন্ন। বাংলাদেশের ও বাংলাভাষা–সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ যুগটিকে 'অন্ধকার যুগ' বলেছেন (১২০৩–১৩৫০ খৃঃ), যা আদৌ 'অন্ধকার' ছিল না।

সেই কল্পিত 'অন্ধকার' যুগে এরূপ একখানি তাম্রশাসনের মাধ্যমে ভূমিদানের বিবরণটি অত্যন্ত কৌতূহলজনক।

আরও কৌতূহলের ব্যাপার, দত্তক এই হিন্দু রাজবংশ তখনও সমতট-চট্টগ্রামে প্রবল প্রতাপের সংগে রাজত্ব করছিলেন। তাম্রশাসনে এই রাজবংশের অন্তত চারজন রাজার নাম মিলেছে। তাঁরা হলেন যথাক্রমে পুরুষোত্তম, মধুসূদন, বাসুদেব ও দামোদর দেব।

দামোদর দেবই বর্তমান তাম্রশাসনের প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা। চট্টগ্রাম এলাকার জনৈক ব্রাহ্মণকে পাঁচদ্রোম জমি দানের কথা এই তাম্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে। জনাব আবদুল হক চৌধুরী তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত শহর চট্টগ্রামের ইতিকথায় (১৯৮৫) দামোদর দেবের আরও একখানি তাম্রশাসনের উল্লেখ করেছেন (মেহার তাম্রশাসন)। সেটি না কি ১১৫৬ শক/১২৩৪ খৃস্টাব্দে উৎকীর্ণ। তাই যদি হয়, দামোদর দেবের কাল মুটামুটি ১২৩৪–১২৪৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে ফেলা যায়। তিনি যে চক্রবর্তী রাজা ছিলেন, রামপুর তাম্রলিপিতে তাও ঘোষণা করা হয়েছে। তাম্রশাসনটি বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার পাহাড়তলী (ডবলমুরিং) থানার রামপুর মৌজা থেকে প্রাপ্ত। উদ্ধারকারী জনৈক মুসলিম মজুর, নাম বদলা বা বয়্‌লা। একটি প্রাচীন পুকুর পুনঃ খননের সময়ে এটি আবিষ্কৃত হয়। কাল ১২৮০/১৮৭৪ খৃঃ। তাম্রশাসনটি সমকালীন এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতায় সংরক্ষিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতই পরবর্তীকালে সেটি খোয়া যায়। তবে সৌভাগ্যক্রমে সমকালীন পত্র–পত্রিকায় তার অনুলিপিসহ বিশদ বিবরণী প্রকাশিত হয়। সেগুলি অবলম্বনেই বর্তমান বিবৃতিটি রচিত হল।

ইতিহাস বিশেষজ্ঞ নই, তাই ইতিহাসের কথা বলতে পারব না; তবে বাংলা ভাষা ও লিপির ইতিহাসে তাম্রশাসনখানির মূল্য অপরিসীম। এ থেকে তথাকথিত অন্ধকার যুগের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করা যাচ্ছে। আর সমকালে যে বাংলা লিপি সর্বত্র ব্যবহারযোগ্য হয়েছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ মিলছে।

প্রথম তাম্রশাসনখানির পূর্ণ পাঠোদ্ধার না হলেও দত্তা যে কুমিল্লার 'আনন্দ–বিহার' প্রতিষ্ঠাতা আনন্দ দেবের পিতা বীরবর দেব বা বীরধর দেব প্রামাণ্য সূত্রে তা জানা যাচ্ছে। এই বংশের রাজগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁদের রাজত্বকাল ছিল ৭৫০–৮০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত।

মোটকথা, বাংলা ভাষা ও লিপির ইতিহাসে এ তাম্রলিপি তথা তাম্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে আমাদের ঐতিহাসিক গবেষকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার আদি নীড়ঃ বরেন্দ্র ভূমি ও বারেন্দ্র ভাষা

বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন অংশের নাম বরেন্দ্র বা বারেন্দ্রী। খ্রীস্টীয় দশম শতকের সংস্কৃত কবি শ্রী সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিতম' কাব্যে বরেন্দ্র বা বারেন্দ্রীকে 'বসুধাশিরো' এবং তার কেন্দ্রভূমি পুন্ড্র বর্ধনপুরকে 'বরেন্দ্রমণ্ডল চূড়ামণি' নামে অভিহিত করেছেন।[৬]

বারেন্দ্রী শুধু বাঙালীদের আদি বাসভূমিই নয়—এক কালে এই বারেন্দ্রী এলাকাতেই বাংলা ভাষার আদি অঙ্কুরও উদ্গত হয়েছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রে জানা যাচ্ছে।

প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডক্টর জর্জ গ্রীয়ার্সন স্পষ্টই বলেছেন, গৌড়ী ভাষায় বিবর্তনে প্রথম উত্তরবঙ্গে বাংলা এবং অসমীয়া ভাষার উদ্ভব ঘটে, পরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গিয়ে মাগধী ভাষা গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার বাংলা ভাষার জন্ম দেয় এবং সূর্যোদয়ের দিকে আরও অগ্রসর হয়ে (ঢাকা অঞ্চলীয়) মাগধী 'ঢক্কী' নাম ধারণ করে আধুনিক পূর্বাঞ্চলীয় বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটায়।[৭]

এ থেকে আমরা 'গৌড়ী', 'মাগধী' ও 'ঢক্কী' নামক প্রত্ন বাংলা আঞ্চলিক ভাষা-সমূহের নাম পাই। ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'গৌড়ী' অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয় বলে উল্লেখ করেছেন। এই সঙ্গে তিনি 'বারেন্দ্রী' নামে আরও একটি ভাষার নাম করেছেন। 'প্রাকৃত পিঙ্গল'-এর বিখ্যাত টীকাকার রবি করের বরাত দিয়ে তিনি এ কথা বলেছেন। "পূর্ব প্যাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, '১ম খণ্ড" গ্রন্থে এই বারেন্দ্রী ভাষার নমুনাও পেশ করা হয়েছে। যথা ঃ

"মানিনি মানহি কাঁই ফল এওজে চরণ পড়ু কন্ত।
সহজে ভূঅঁ গম জই নমই কিং করি এ মণিমন্ত।"

অর্থাৎ
মানিনি, মানে কি ফল? এ যে কান্ত চরণে পতিত।
সহজ ভুজঙ্গম যদি নত হয়, মণি মন্ত্রে কি করো।।[৮]

বারেন্দ্রী ভাষা যে বরেন্দ্রভূমির লোকভাষা, এ কথা সহজেই অনুমান করা যায়। মনে হয়, গৌড় ভাষা নামকরণের আগে এই 'বারেন্দ্রী' ভাষা নাম প্রচলিত ছিল অথবা এই নামে একটি স্বতন্ত্র শাখারই অস্তিত্ব ছিল। খুব সম্ভব 'বারেন্দ্রী' দেশ 'গৌড়' দেশ নামে পরিচিত হওয়ায় তার ভাষাও 'গৌড়' নামে পরিচিত হয়েছিল। এভাবে প্রাচীন বাংলা লিপির নামও 'গৌড়ী লিপি' হয়েছিল। খ্রীস্টীয় উনিশ শতকের প্রথম ভাগেও বাংলা ভাষা গৌড়ী ভাষা নামে পরিচিত ছিল। তাই দেখতে পাই, ১৮৩৩ সালেও রাজা রামমোহন রায় তাঁর বাংলা ব্যাকরণের নামে রেখেছিলেন 'গৌড় ভাষার ব্যাকরণ'।[৯] বাংলা ভাষার 'বাংলা' নামকরণ যে নিতান্তই অর্বাচীন কালের, এ কথা বলাই বাহুল্য। ডঃ সুকুমার সেনের মতে বাংলা ভাষার 'বাঙ্গলা' বা 'বেঙ্গালা' নামকরণ উনিশ শতকের আগে হয়নি। অবশ্যি সতের-আঠার শতকের মুসলিম কবিগণ তাঁদের রচনায় 'বঙ্গবাণী', 'বঙ্গভাষা' ইত্যাদি উল্লেখ করলেও 'বাঙ্গালা' ভাষা নামকরণের ইতিহাস নিতান্তই অর্বাচীন কালের। বাংলা ভাষার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যায়-বাংলা চর্যাপদও, যাকে বাংলা ভাষার প্রাচীতম নমুনা বলে চিহ্নিত করা হয়, বাংলা নামে পরিচিত ছিল না। তার আদি নীড় কোথায় ছিল স্থির

www.pathagar.com

নিশ্চিত না হ'লেও চর্যাপদের সর্বপ্রধান ও সর্বাধিক লেখক কাহ্নপা ওরফে কানুপা ছিলেন বারেন্দ্রী এলাকার কবি। জানা যায়, তিনি সাবেক রাজশাহী জেলার অন্তর্গত 'সোমপুরীবিহার' বা পাহাড়পুরের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর গুরু জালন্ধরীপা ওরফে হাড়িপার 'গোফা' বা সাধনভূমি বর্তমান দিনাজপুর জেলার খোলাহাটিতে অদ্যাপি বিদ্যমান। নাথ-সাহিত্য ধারায় কানুপার গুরু হাড়িপা-গোপীচন্দ্রের বৃত্তান্ত বিশেষ বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত তাঁর সমকালীন শবরী পা, সরহ পা, এমন কি লুয়িপাকেও বারেন্দ্রী এলাকার লোক বলে সনাক্ত করা যায়। তাই চর্যাপদের ভাষাকেও অতি সঙ্গত কারণেই 'বারেন্দ্রী ভাষা' নামে অভিহিত করা যায়। খ্রীস্টীয় সতেরো শতকের বারেন্দ্রী কবি শুকুর মামুদের 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস' কাব্যের আবহ, এমন কি ভাষা-রীতিতেও প্রাচীন চর্যাপদের প্রভাব লক্ষণীয়।[১০]

ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর অনুসারিগণ বর্তমান ভারত রাষ্ট্রভুক্ত পশ্চিমবঙ্গকে বাংলা ভাষার আদি নীড় বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেই এলাকার কোন অঞ্চলের নামেই প্রাচীন ভাষা-প্রবাহের কোন নামকরণ হতে দেখা যায়নি। আরও একটি কথা, চর্যাপদের অব্যবহিত পরে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন'কে অদ্যাবধি প্রাপ্ত মধ্য বাংলার প্রাচীনতম বাংলা কাব্যের নমুনা বলে মনে করা হয়, কিন্তু তার ভাষা-রীতির সঙ্গে বারেন্দ্রীর, কি প্রাচীন, কি আধুনিক, ভাষা-রীতির মিল বিস্ময়কর। প্রায় সমকালে রচিত 'ইউসুফ জোলায়খা' কাব্যেও এই মতের সাক্ষ্য মেলে। শুধু তাই নয়, শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের জন্ম যেখানেই হোক না কেন, তাঁর কাব্য নেহায়েৎই গৌড় কাব্য। ভাষার দিক দিয়ে শুধু নয়—রুচি ও রসের দিক দিয়েও বারেন্দ্রীর প্রাচীন লোক-গীতি 'জাগের গান' বা কানাই ধামালীরই তা সমতালীয়।[১১] এতদ্ব্যতীত কাব্যকারও সমকালীন গৌড় দরবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন রচনা কাল সম্পর্কেও কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে বারেন্দ্রী এলাকার কবি প্রখ্যাত অধ্যাত্ম-সাধক হযরত নূর কুতবি আলমের (মৃত্যু ৮১৮ হিঃ, ১৪১৬ খৃীঃ) ফারসী-বাংলা মিশ্রিত যে 'রেক্‌তা' বা রেখতাহ্ কবিতাটি সম্প্রতি ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কল্যাণে উদ্ধারকৃত হয়েছে, তার রচনাকাল চর্যাপদের অব্যবহিত পরেই পড়ে এবং তার ভাষাও চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের ভাষার সাযুজ্য রক্ষা করেছে। কবিতাটি চতুর্দশ শতকের শেষ ও পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পূর্ববর্তী কালের রচনা বলে জানা যায়। এ হিসেবে কবিতাটিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন সন-তারিখযুক্ত নমুনা বলে মনে করা যায়। রচনাদর্শের একটু নমুনা এই ঃ

"উহ্ চে কর্দম রু-এ তু দিদম
    উমত পাগল ভৈলু (হৈলু)।
হাম চু মজনু বাহরে লাইলী
    ভাবত বেকল ভৈলু (হৈলু) ॥
মু-এ কুশাদী জানম বুদি

www.pathagar.com

বলিয়া পিটালু মোরে।
শব ণ খুপতম রোজ ণ খুর্দম
কতেক গোড়সি মোরে ॥ ”

আধুনিক বাংলায় ঃ

বাঃ কি করলাম? মুখ তোমার দেখলাম,
উন্মত্ত (হলাম) পাগল হলাম
যেমন মজনু আমি লায়লার জন্য
ভাবে বিকল হলাম ॥
চুল এলায়েছ পরাণ কেড়েছো
সবলে পিটিয়েছ মোরে।
রাতে ঘুমাইনি দিনে খাইনি
কত পোড়াস আমারে ॥[১২]

এই শ্রেণীর মিশ্র রচনার নাম উর্দুতে 'রেখ্‌তাহ' মতান্তরে 'মোলাম্মা'। বাংলাদেশে ফারসী ও উর্দু ভাষার মিশ্রণে সর্বপ্রথম এই শ্রেণীর রচনার সূত্রপাত করেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খুসরু (মৃঃ ১৩২৫ ইং)। হযরত কুতুব-উল-আলম তাঁরই উত্তরসূরি (মৃঃ ৮১৮ হিঃ, ১৪১৬ খ্রীঃ)। কুতুব-উল-আলমের অব্যবতি পরে আমরা কবি শেখ জাহিদ ও তাঁর 'আদ্য পরিচয়' (১৪২০ শক/১৪৯৮ ঈ) কাব্য পাচ্ছি। 'আদ্য পরিচয়ে'র রচনাকালকে যথার্থ বলে মেনে নেওয়া যায়। সম্ভবত 'আদ্য পরিচয়' কাব্যেই সর্বপ্রথম ইসলামসম্মত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকটিত হয়েছে। এই ধারা এসে আধুনিক কালে লালন শাহী সুফী বা মরমী গীতি ধারায় এসে মিশেছে। উল্লেখ্য, হিন্দী সাহিত্যে কবীর-দাদূর কাব্যধারাও এই শ্রেণীর।[১৩] চর্যাপদ থেকে শুরু করে বড়ুচণ্ডীদাস, শাহ মোহাম্মদ সগীর, হযরত নূর কুতুবি আলম, শেখ ফয়েজুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান প্রমুখের মধ্য দিয়ে এই ধারা প্রবাহিত হয়েছে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, বাংলার শ্রীচৈতন্য যে ভাব-আন্দোলনের জোয়ার এনেছিলেন (গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন) তারও মৌল উৎস ছিল ইসলামী সুফীবাদ। তাই দেখা যায় যে, বৈষ্ণব 'প্রেম-গীতি হার নর-নারীর মিলন-মেলায়' গাঁথা হয়, তার মূলে ফারসী সুফী কবি মওলানা জালালউদ্দীন রুমীর 'মসনবী-এ মানবী' সুর যোগায়। পরবর্তীকালে বাগেরহাটের হযরত খান-ই-জাহানের প্রধান অমাত্য ও সুফী সাধক হযরত আবূ তাহির ওরফে পীরালী প্রবর্তিত পীরালী সুফী ধারা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এক মিলন-মেলার উদ্বোধন করে। ফলে দেখতে দেখতে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী অচলায়তন ধ্বসে পড়ে এবং নয়া একেশ্বরবাদী (মুআহিদ) মানবভাবনার দ্বারোদ্ঘাটিত হয়।[১৪] সত্যি কথা বলতে কি, উনিশ শতকের রাজা রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-রাজ নারায়ণ-রবীন্দ্রনাথের নব্য ভারত তথা নব্য বাঙালীবাদের মর্মমূলে এই পীরালী ভাববাদই প্রধান শক্তি যোগায়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, চর্যাপদের লেখকগণ তান্ত্রিক ও যোগবাদী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাধক ছিলেন। ইসলাম গ্রহণান্তর এই সাধকদের অনেকেই ইসলামী সুফীবাদের সঙ্গে একত্রে মিলিয়ে এক নয়া ভারতীয়

www.pathagar.com

সুফীবাদের জন্ম দিয়েছিলেন। তাই দেখা যায়, গৌড় দরবারের সুফী সাধক রুকনউদ্দীন সমরখন্দী বৌদ্ধ (সংস্কৃত) যোগবাদী 'অমৃতকুণ্ড' গ্রন্থের প্রথম আরবী, পরে ফারসী অনুবাদ করতেও ইতস্তত করেন নি। এভাবে মুগল যুবরাজ সাধক দারাশিকোহ্ সংস্কৃত উপনিষদের ফারসী তরজমা করেন (সিররুল-আস্‌রার) এবং ইসলাম ও হিন্দুত্বের আপোষে লেখেন- 'মাজমাউল বাহ্‌রাইন' বা দুই সাগরের সংগমস্থল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে না। তাই বলে তাঁরা যোগবাদী হিন্দু বা বৌদ্ধ হয়ে যান না। তাঁরা সেই যোগ সাধনার প্রক্রিয়াগুলিকে ইসলামী একেশ্বরবাদী চিন্তা-চেতনার সামিল করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চর্যাপদের লেখক 'জয়ানন্দ' ইসলাম গ্রহণ করে যেমন নাম ভাড়িয়ে জয়নুদ্দীন বা জয়নুল আবেদীন হতে পারেন, তেমনি বৌদ্ধ ভাবনার নিরঞ্জন (শূন্যতা/Voide) নাম ভাড়িয়ে একেশ্বর বিশ্বাসী আল্লাহ্ বা খোদাতালায় রূপান্তরিত হতে দোষ কি? এভাবে বৌদ্ধ নিরীশ্বরবাদী শূন্যতা-চেতনা বা 'ধর্ম' (ঠাকুর) পূর্ণ ব্রহ্ম বা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতীক হয়েছে দেখা যায়। তবে লক্ষ্যযোগ্য বিষয়, মুসলিম সাহিত্যে 'নিরঞ্জন'- এক আল্লাহ্‌রূপে গৃহীত হলেও হিন্দু পৌত্তলিক ঈশ্বর বা ভগবান শব্দগুলি আদৌ গৃহীত হয়নি। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্ব ভাষাতাত্ত্বিক আধারে নফী-ইসবাত' বা আস্তি-নাস্তিরূপে গৃহীত হয়েছে, যেমন-লালন ফকীরের ভাষায়-

"লা ইলাহা তন ইল্লাল্লাহ জীবন
আছে প্রেম যুগলে।
লালন ফকীর কয় যাবি মন কোথায়
আপনারে আপনি ভুলে ॥"

এখানে যুগল প্রেম বলতে কবি রাধাকৃষ্ণ নয়- 'নফী-ইসবাত' বুঝেছেনে। এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে শেখ জাহিদের 'আদ্য পরিচয়'কে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন দিগ্‌দর্শনী (milestone) বলা যায়।

'আদ্য পরিচয়' লেখক বৌদ্ধ দেহতত্ত্ববাদের আধারে ইসলামী সুফীতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। এই যোগবাদী সুফী চেতনার উৎস অনুসন্ধান করলে পূর্বোক্ত সুফী সাধক রুকনউদ্দীন সমরখন্দী অনূদিত সংস্কৃত অমৃতকুণ্ডের কথা সহজেই মনে আসে। মওলানা সমরখন্দী বৌদ্ধতাত্ত্বিক অমৃতকুণ্ড যথাক্রমে আরবী ও ফারসীতে (হাউজ-উল-হায়াত ও বাহরুল হায়াত) অনুবাদ করেন কিংবা করান। উল্লেখ্য, সুফী সাধক ইবনুল আরবীও এর একটি তরজমা করেন বলে জানা যায়। এই অনুবাদ গ্রন্থে বৌদ্ধ যোগবাদকে ইসলামী সুফীবাদী ফ্রেমে এঁটে এক নতুন সুফীবাদের জন্ম দিয়েছে। পরবর্তীকালে সুফীতত্ত্ববিদগণ একই আধারে যোগ-কলন্দর অর্থাৎ 'কলন্দরীয়া' ইত্যাদি সুফী পন্থার জন্ম দিয়েছে। শুধু বাংলাদেশে নয়— সারা উপমহাদেশেই এই মতবাদী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহু সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। হিন্দী সাহিত্যের হযরত কবীর, কামাল, দাদু (দাউদ) রজ্জবজী, গুরু নানক, রামানন্দ প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। এখানে স্মরণযোগ্য যে, এঁদের মধ্যে কবীর, কামাল, দাদু, রজ্জবজী ছিলেন মূলত ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এঁদের অনুসরণে

www.pathagar.com

বহু অমুসলিম সাধকও এই পন্থে আসেন। এঁদের মতে রাম ও রহীম পৃথক নয়– একই খোদার নামান্তর মাত্র। তাঁরা অবশ্য নিজেদেরকে মুসলমান বলেন নি, তবে ইসলামী সাম্য মৈত্রীর আদর্শে নবীন ধর্মপন্থ বলে ঘোষণা করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন— পূর্ব-দক্ষিণ ভারতের রামানন্দ, গুরু নানক, নামদেব, রামদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি। বাংলাদেশের শ্রী চৈতন্য এবং গুরু গোরখপন্থী কবি-সাধকগণকেও এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়। উল্লেখ্য, এই নামের সংগে 'দাস' শব্দটি আল্লাহ্‌র বান্দা (আব্দুল্লাহ) শব্দকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাষাচার্য ডক্টর সুনীতি কুমারও স্বীকার করেছেন, "পূর্ব ভারতে মধ্যযুগের বাংলায় রচিত "গোরখ বোধ' প্রভৃতি গ্রন্থে নাথপন্থী সাহিত্য সুদূর রাজস্থানে ও পাঞ্জাবে অনুলিখিত হ'ত... উত্তর ভারতে বৈষ্ণব কবি রামানন্দের পদ, নির্গুণ ব্রহ্মবাদী কবি ও সাধক কবীরের ও মারাঠী কবি নাম দেবের পদ, শিখগুরু অর্জুন দেব কর্তৃক সংকলিত গুরুপন্থ (বা আদিগ্রন্থ) মধ্যে গৃহীত হইয়াছিল এবং ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর আবশ্যক মত তাঁহার বাঙ্গালা মহাকাব্য 'অন্নদা মঙ্গল' গ্রন্থে পশ্চিমা ভাটের মুখে পশ্চিমা হিন্দী ব্রজ ভাষায় বর্ণিত পদও দিয়াছেন।"[১৫]

বলা বাহুল্য, সুনীতি বাবু সাধক কবীরকে নির্গুণ ব্রাহ্মবাদী বলেছেন, কিন্তু আসলে তিনি একজন মুসলিম সুফী সাধক। তাঁর পুত্র কামাল, শিষ্য দাদূ (দাউদ) ও রজ্জবজীও মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। পক্ষান্তরে রায়গুণাকর নিতান্তই পৌত্তলিক হিন্দু। সুনীতি বাবু এখানে শাহ গরীবুল্লাহ প্রভৃতি কোনো মুসলিম কবি-সাধকদের নাম করেন নি। এঁদের কাব্যে ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কেও সুনীতি বাবু বলেন, "সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃত, বিশেষত সারা উত্তর ভারতে প্রসৃত প্রায় সমস্ত জনগণের অল্প-বিস্তর বোধ্য একপ্রকারের প্রাকৃত ও পরে তাহার পরিবর্তিত রূপে অপ্রভ্রংশ অবহট্ট (অপভ্রষ্ট) ও পরে সংস্কৃতের সঙ্গে এই প্রাকৃত ও অপভ্রংশ অপভ্রষ্টের কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ একপ্রকারের ভাষা তাহার বিকাশে গঠিত হইল সর্বগ্রাহী 'পশ্চিমা হিন্দী'। এই ভাষা বা পশ্চিমা হিন্দীর সঙ্গে ব্রজ ভাষা, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, অবধী, ভোজপুরী, মৈথিল প্রভৃতির মিশ্রণ ছিল। এই বহুরূপী ভাষার নাম দেওয়া হয় ফারসীতে 'হিন্দবী, হিন্দী' এবং হিন্দুস্থানী এবং জবানে উর্দু। এবং মুসলমান রাজ সরকারের (বিশেষ করিয়া মোগল যুগে) বহুল প্রচলিত রাজভাষা ও সাংস্কৃতিক ভাষা ফারসীর পাশে দাঁড়াইয়া যায়।"[১৬]

এখানে ভারতীয় ফারসী ভাষা তথা ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের একটি ধারাবাহিক ইতিহাসও পাওয়া যাচ্ছে। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় কথাটি এড়িয়ে গেলেও হিন্দবী > হিন্দী > হিন্দোস্তানী ও জবানে উর্দুর উল্লেখ থেকে কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য, মধ্যযুগে 'জবানে বাঙ্গালা' নামে একটি বিশেষ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, ভারতীয় জবানে উর্দু বা হিন্দুস্থানীর সংগে তার সাযুজ্য রয়েছে। 'যবান' শব্দটি ফারসী অর্থ 'ভাষা'। এর পরে আসে ইংরাজি। শুধু রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে নয়– নতুন যুগে ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞানার্জন, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিকাশের জন্যও ইংরাজি ভাষা প্রধান ও অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। প্রাক-ব্রিটিশ আমলে যে স্থান ছিল ফারসীর, ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ রাজশক্তির কল্যাণে তা সহজেই ইংরাজির অধীন হয়ে যায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ফারসী ও ইংরাজির অবর্তমানে হিন্দী (সেই সঙ্গে উর্দু ও হিন্দুস্তানী) তার

www.pathagar.com

স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, দিল্লী আগ্রা (রাজধানী) থেকে দূরে সুদূর বাংলাদেশে ভিন্নতর পরিবেশে বাংলা ভাষা ইংরাজির পরিত্যক্ত আসন দখল করে এবং বর্তমানে বাংলা ভাষা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাতেও অধিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য বাংলা ভাষার এই মর্যাদা হঠাৎ করে আসেনি। যুগযুগ ধরে নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে তাকে এই পর্যায়ে আসতে হয়েছে। সে ভিন্ন কথা। আমরা দেখেছি, সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ইত্যাদি স্তর পার হয়ে হিন্দী বা উর্দু ভাষা বিবর্তনের যে সব স্তর আছে, বাংলা ভাষার ইতিহাসও তা থেকে আলাদা নয়। বর্তমান বাংলা ভাষার ইতিহাস একটু ভিন্নতর, এ কথা বলাই বাহুল্য। মুগল শাসনের প্রাক্কালে দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলের খড়ীবোলি হিন্দুস্তানীর খোলস ত্যাগ করে 'হিন্দুবী-হিন্দুস্তানী' বুলি যখন হিন্দী-হিন্দুস্তানী, জবান-ই-উর্দু ইত্যাদি নামে আত্মপ্রকাশ করছিল, সুদূর পূর্বাঞ্চল বাংলাদেশে তখন 'জবান-ই-বাঙ্গালী' নামে একটি স্বতন্ত্র ভাষার জন্ম হয়। এই 'জবান-ই-বাঙ্গালা'ই আধুনিক বাংলা ভাষার আদি জননী।

বাঙ্গালাদেশ যেহেতু তখন স্বাধীন বাঙ্গালার মুসলিম সুলতানের অধীনে ছিল, তাই এটি 'জবান-ই-বাঙ্গালা' নামে প্রতিষ্ঠিত হলেও জবান-ই-উর্দুর মত হরফ বদলের কথা ভাবতেও পারেনি। আর বলা বাহুল্য, ইতিপূর্বেই বাংলা হরফ রীতিমত প্রকাশক্ষম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গলিপি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে সাম্প্রতিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে জানা যাচ্ছে (মৎলিখিত প্রবন্ধ–'দামোদর দেবের রামপুর তাম্রশাসন ঃ প্রত্ন বাংলা লিপি ও কিছু কথা' পাণ্ডুলিপি দ্রষ্টব্য)।[১৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উর্দু ও ফারসী ভাষার বিখ্যাত কবি আমীর খসরু (১২৫২–১৩২৫ খ্রীঃ) থেকে জানা যাচ্ছে, তখন বাংলাদেশে শুধু বাংলা ভাষারই জন্ম হয়নি— উর্দু-ফারসীর মত ফারসী-বাংলা মিশ্রিত রেখতাহ কবিতারও জন্ম হয়েছে। বলা বাহুল্য, ফারসী-উর্দু মিশ্রিত রেখতাহ কবিতার স্রষ্টা ছিলেন স্বয়ং আমীর খসরু। সম্প্রতি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কল্যাণে আমরা খসরুর উত্তরসূরি হযরত নূর কুত্‌বি আলমের লেখা ফারসী-বাংলা মিশ্রিত একটি রেখতাহ কবিতারও সন্ধান পেয়েছি।[১৮]

এর পরে মুগল আমলে বাংলাদেশেও ব্যাপকভাবে ফারসী ও উর্দুর চর্চা হয়। সেই সঙ্গে বাংলা ভাষাতেও ব্যাপকভাবে ফারসী-উর্দু-হিন্দীর প্রভাব ব্যাপ্ত হয়। বাংলা সাহিত্যে দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল, সৈয়দ গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা প্রমুখের আবির্ভাবও হয় এ কালে। অবশ্য বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী, বিশেষ করে ফারসী ভাষার প্রভাব যে আদিকাল থেকেই শুরু হয়েছিল, রামাঈ পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, বিজয়গুপ্ত বিপ্রদাস পিপলাই, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রভৃতির রচনাতেও তার স্বাক্ষর মেলে। উল্লেখ্য, বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের আবির্ভাবের ফলে একেশ্বরবাদী ইসলামী চেতনা প্রকট হলেও হরফের ক্ষেত্রে তারা বঙ্গাক্ষরের প্রতি বরাবরই অনুগত ছিলেন। শুধু বঙ্গাক্ষর কেন, প্রয়োজন বোধে তারা আরবী-ফারসী হরফকে ব্যবহার করেছেন, তবে বাংলা হরফের প্রতিও শ্রদ্ধা হারাননি। তাই দেখা যাচ্ছে আরবী হরফে লেখা কিছু বাংলা কলমী পুঁথিও মিলেছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে শাহ গরীবুল্লাহ রচিত 'আমীর হামযা' কাব্যের একটি পুঁথিও আরবী

www.pathagar.com

হরফে মিলেছে।[১৯] শুধু বাংলাতে কেন, হিন্দী সাহিত্যেও এরূপ ঘটেছে। অনুমিত হয়, ফারসী রাজভাষা হিসেবে হিন্দু-মুসলমান সমাজে আদৃত হওয়ায় মুসলিম লেখকগণ সুবিধা হিসেবে এরূপ লিখেছেন। মনে করা যেতে পারে, বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে এই প্রবণতা থেকেই আরবী হরফে বাংলা লেখার একটি বিশেষ আন্দোলন এবং তারই নমুনাস্বরূপ চট্টগ্রাম থেকে আরবী হরফে বাংলা সংবাদপত্রও (আল কুরআন) নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। মওলানা জুলফিকার আলীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'আল কুরআন' নামে একটি পত্রিকাও প্রাক-পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত হয় (১৯৩৬)। বেশ কিছুকাল চলেও। শুধু বাংরাদেশে নয়, সারা ভারতেই বিভিন্ন সময়ে হরফ পরিবর্তনের নানা প্রয়াসও চলছে। উর্দু বা আরবী হরফ নয় শুধু, ব্রিটিশ ভারতে রোমান হরফে উর্দু বা হিন্দী লেখারও প্রয়াস (বিশেষ করে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে) দেখা দিয়েছিল। উনিশ শতকের ভারতীয় হিন্দু-সমাজে ফারসীর বদলে দেব-নাগরী হরফ প্রচলনের আন্দোলন ও জোরদার হয়েছিল। এ ব্যাপারে বাঙ্গালী হিন্দু পণ্ডিত ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগের কথা স্মরণযোগ্য। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, বর্তমান ভারত রাষ্ট্রে হিন্দীকে সর্ব ভারতীয় ভাষা হিসেবে প্রচলনের সমন্বয়ী প্রয়াসের ফলে দেব-নাগরী হরফকেই একমাত্র রাষ্ট্র ভাষার বাহন হিসেবে গৃহীত হয়েছে যার ফলে উর্দু ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের অনুপযুক্ত বলে বর্জিত হয়েছে। অথচ ইতিহাসবেত্তাদের অজানা থাকার কথা নয়, বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা চিরদিন বাংলা হরফেই লিখিত হয়েছে, ক্বচিত অন্য হরফে। অবশ্য সংস্কৃত ভাষার কোন নিজস্ব হরফও নেই এবং কোনোদিন ছিলও না। সম্প্রতি প্রাপ্ত বাংলা তাম্রলিপিও তাই সাক্ষ্য দিচ্ছে। চৈতন্যাদি কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তাকিদে ইসলামী চেতনা প্রবল হলেও বাংলা ভাষার সংস্কৃত প্রাধান্য ক্ষুণ্ন হয়নি বটে, তবে চৈতন্যোত্তরকালে সৈয়দ সুলতান, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রভৃতির রচনায় মুসলমানীয় চেতনা নবায়িত হয়, আলাওল, কাজী দৌলতেও তার ধারা চলে, তবে খ্রীস্টীয় সতেরো শতকের শেষার্ধে পশ্চিমবঙ্গের শাহ গরীবুল্লাহ ও পরবর্তী ভারতচন্দ্র, সৈয়দ হামযায় ইসলামী চেতনা জাগ্রত হওয়ার ফলে ভাষায় আরবী-ফারসী প্রভাব বন্যার বেগে প্রবেশ করে। বৈশিষ্ট্যের খাতিরে তথাকথিত দোভাষী বা মুসলমানী বাংলা (যাবনী মিশাল) বলে অবহেলার ভাব দেখালেও ডক্টর সুকুমার সেনের ভাষায় এ ভাষা পশ্চিমবঙ্গের ভরশুট মান্দারাম থেকে উড়িষ্যার বালেশ্বর পর্যন্ত একটি ভাষা-সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে।[২০] ডক্টর শহীদুল্লাহ যথার্থই বলেছেন, আঠারো শতকের শেষভাগে পলাশীর বিপর্যয় সংঘটিত না হলেও এই ভাষা (জবানে উর্দু বা হিন্দুস্তানীর মত) সমগ্র সাধু বাংলা ভাষাকে গ্রাস করে বসত।[২১]

কিন্তু এ কথা সত্য, ইংরেজ রাজত্বের অবসানে এই জবান-ই-বাঙ্গালাই আবার অন্য নামে (সলিস/চলিত বাংলা) আত্মপ্রকাশ করেছে। আধুনিক বাংলা কাব্যে কবি নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, এমন কি কবি কালিদাস রায়, মোহিত লাল মজুমদার, সত্যেন দত্ত প্রমুখ হিন্দু লেখকদের উপরেও তার দোলা লেগেছে। উনিশ শতকীয় মরমী কবি লালন শাহ (১৭৭২-১৮৯০), কবি জামালউদ্দীন, (১৮৫৩), কবি মোহাম্মদ মুনশী প্রভৃতির রচনাতেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি প্রাপ্ত রাজশাহীর বিখ্যাত দরবেশ হযরত

www.pathagar.com

শাহ মখদুম (র)-এর জীবনী 'তোয়ারিখ' থেকেও তার সাক্ষ্য মিলছে।[২২] এ থেকে আরও জানা যাচ্ছে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ যুগে 'আরবী-ফারসী নিসূদন যজ্ঞ' সত্ত্বেও বাংলা ভাষা থেকে ইসলামী আবহ বিদূরণ সম্ভব হয়নি, সমকালীন 'ভারত পথিক' নামে কথিত রাজা রামমোহনই পবিত্র আল-কুরআনের আদর্শেই অবগাহিত হয়েছেন। বাইবেল বর্ণিত যিশু তাঁর প্রিয়পাত্র হলেও সে যিশু ছিলেন কুরআন বর্ণিত হযরত ঈসা (আ)। তিনি খোদার পুত্র নন– মরিয়ম পুত্র কুরআনের আদর্শ মানব। [২৩]

আরও মনে রাখতে হবে রামমোহনের যুগান্তরকারী ফারসী কিতাব 'তুহফাত-উল-মুআহহিদীন' রচনাকালে পুঁথি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি সৈয়দ হামজার 'হাতেম তাই' কাব্য প্রকাশিত হয় (১৮০৩) এবং লালন শাহেরও আবির্ভাব ঘটে। আরও কৌতূহলের ব্যাপার, কুরআনী আদর্শ গ্রহণ করেও শেষ নবী রহমাতুল্লিল আলামিনকে বর্জনের কথা ভেবেছেন রামমোহন। কিন্তু তথাপি বলতে বাধা নেই, বিশ্বনবীর নামের স্বীকৃতি না দিলেও বিশ্ব নবীর আদর্শকে পরোক্ষভাবে হলেও স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ কুরআন ও বিশ্বনবী অচ্ছেদ্য। সমকালীন কবি লালন ফকীর তাই কটাক্ষ করে বলেছেন ঃ

"নবী না মানিল যারা
মোয়াহেদ কাফের তারা
এই দুনিয়ায়।
ভজনে তার নেই মজুরী
দলীলে সাফ লেখা যায়।"

এ আদর্শ কুরআনের। বলা বাহুল্য, কুরআন-বিশ্বাসীকে তাই কুরআনের বাণী-বাহক রসূল-নবীদেরকেও স্বীকার করা জরুরী। লক্ষ্যযোগ্য বিষয় এই যে, রামমোহন নবী-বর্জিত যে তৌহীদবাদ (তাঁর মতে মুআহিদবাদ) কল্পনা করেছেন, তা নিতান্তই ভ্রান্ত। বাইবেলে বর্ণিত যিশু ত্রীশ্বরবাদী, মানে পৌত্তলিক। কিন্তু রামমোহন মুখে যাই বলুন, তিনি কুরআনী হযরত ঈসা (আ)-এর কথা ভেবেছেন এবং সেই পথে চলেছেন। তাই বলতে বাধা নেই, রামমোহনের আদর্শ পুরুষ খ্রীস্টানী যিশু নয়– ইসলামী নবী হযরত ঈসা (আ)। প্রমাণস্বরূপ রামমোহনের উত্তরসূরি– মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উক্তি স্মরণ করা যায়ঃ "আমরা চাই ঈশ্বরকে পূজা করিতে। আমরা যেমন পৌত্তলিকতা বিরোধী তেমনি অদ্বৈতবাদেরও বিরোধী।"[২৪]

কবি রবীন্দ্রনাথেও এই আদর্শবাদ প্রকটিত হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত করেছে এবং বলতে কি উপমহাদেশের সকল ভাষা ও সাহিত্যকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে, তার মূলেও ইসলামী চিন্তা-চেতনার প্রভাব আছে এ কথা অনস্বীকার্য। জার্মান মনীষী মি. স্রাইন তাই বাংলা ভাষায় মধুরতা ও প্রকাশ ক্ষমতার কথা বলতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন "Bengali united the mellefluousness of Italians with the power possessed by Greman of rendering complex ideas"[২৫] অর্থাৎ ইতালী ভাষার মধুরতা ও

www.pathagar.com

জার্মান ভাষায় প্রকাশ ক্ষমতা বাংলা ভাষাতে একত্র হয়েছে। অবশ্য মি. স্ক্রাইনের এই উক্তির সঙ্গে বোধ হয় এই কথাটিও যোগ করা যেতে পারত যে, এ ব্যাপারে বাংলা ভাষা মূলত আরবী ও ফারসী সাহিত্য থেকেই বিশেষ শক্তি অর্জন করেছে, বিশেষ করে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আদর্শ থেকে দুর্বার শক্তির অধিকারী হয়েছে। সেই সংগে ফারসী ও উর্দু ভাষার মাধুর্যও যুক্ত হয়েছে। বাংলার ঐতিহাসিক ও কবি কাজী আকরাম হোসেনের ভাষায় বলা যায়, বিশ্বসভায় উর্দু ভাষাকে 'রানীর ভাষা' যদি বলা যায়, তা হলে ফারসী হবে 'ভাষার রাণী'। সহস্র বর্ষব্যাপী ফারসী ভাষা কবির এই উক্তিকে সার্থক বলে প্রমাণিত করে চলেছে।[২৬]

পরিশেষে বলে রাখা ভালো যে, বাংলা ভাষার জন্মলগ্ন থেকেই ইসলাম একটি নিয়ন্ত্রী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমান বাংলাদেশে এই বিশেষ চিন্তাধারাই বিবর্তিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে পুনর্গঠিত নয়া ভারতের চিন্তাধারা পুরানা পথেই অগ্রসর হচ্ছে। বিষয়টি সম্পর্কে তাই একটু ভালো করে ভেবে দেখার সময় এসেছে। প্রথমেই বলে রাখা ভালো, হিন্দু ভারত মূলত পৌত্তলিক। জগতকে তাঁরা ভিন্ন দৃষ্টিকোণে বিচার করেন। তাঁরা বলেন, ভারতীয় হিন্দুরা মূলত আর্য সভ্যতার উত্তরাধিকারী, এক প্রধান মহাজাতি। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাক্সমূলর সাহেবই তাঁদের এ ধারণা দিয়েছেন। তাই তাঁরা মনে করেন, ভারতীয় সভ্যতা তাঁদের নিজস্ব সভ্যতা, বহিরাগত খ্রীস্টান-মুসলমান জাতিসমূহ এ দেশে অনধিকারী বা জবর দখলকারী হিসেবে বসবাস করছে। তাঁরা তাঁদের সভ্যতারও অনেক ক্ষতি সাধন করেছে, যা আজও পূরণ সম্ভব হচ্ছে না। অবশ্য আধুনিক ভারতীয় উদারনৈতিক পণ্ডিতগণ এরূপ মতও পোষণ করেন যে, বহিরাগতগণও এ দেশীয় সভ্যতার অধিকার মেনে নিলে ভারতীয় এক মহাজাতির অঙ্গীভূত হতে পারেন। এমন কি হয়েও গেছেন— যেমন, ভারতীয় কবিগুরুর ভাষায়–

'শক হুন দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।"

অবশ্য কথাটি পুরাপুরি সত্য নয়, শক হুন দল ভারতীয় সভ্যতার দেহে লীন হলেও খ্রীস্টান ও মুসলমানগণ স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে এ দেশে সহ-অবস্থান হয়ত করতে পারেন, তবে এক দেহে লীন হতে পারেন না। হিন্দু-ভারতও বর্তমানে এ কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করতে শুরু করছেন বলা যায়। বিষয়টি একটু খোলাসা করে বলার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

অধ্যাপক সুনীতি কুমারের মতে খ্রীস্টপূর্ব কাল পর্যন্ত একটানাভাবে ভারতীয় আর্যগণ তাঁদের প্রভুত্ব বজায় রেখেছিলেন, পরিবর্তন এল পরবর্তীকালে। পর্যায়ক্রমে মুসলমানগণ ও খ্রীস্টানগণ এ দেশে আধিপত্য বিস্তার করে এ দেশে নতুন চেতনা ও সভ্যতার উদ্ভব ঘটালেন, যা থেকে হিন্দুগণ বিশেষ ফায়দা ওঠাতে পারলেন না, উপরন্তু তাঁদের প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। একদিন এ দেশে গ্রীক ও রোমানগণও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, কিন্তু এ দেশে তাদের সে আসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গ্রীকবীর

www.pathagar.com

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ ও বিজয় এ দেশে স্থায়ী হল না। ইংরেজ খ্রীস্টানগণ শেষ পর্যন্ত ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে দেশে ফিরে গেলেন। কিন্তু বহিরাগত মুসলমানগণ এ দেশে স্থায়ী বসতি স্থাপন করলেন শুধু নয়, তাঁরা তাঁদের স্বতন্ত্র জীবন-দর্শন নিয়েই এ দেশে রয়ে গেলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও হিন্দুগণ তথাকথিত আর্য সভ্যতাকে আঁকড়ে রইলেন এবং আজ তাঁরা এক মহাজাতিরূপেও পুনর্গঠিত হওয়ার চেষ্টায় আছেন। মাঝখানে বিশাল ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ শুধু নয়–বার্মা, সিংহল, নেপাল ইত্যাদি দেশ গঠন করে সভ্যতার এক নতুন জীবন-যাত্রার দিশারী হয়েছেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিও এর মুকাবিলায় এক নতুন মহাজাতির পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। ভারতীয় মহাজাতি এককালে আর্য বলে পরিচিত ছিলেন, মুসলমানগণ আরব্-ইরান-আফগানীস্তান-তুরস্ক হয়ে এসে এ দেশে নতুন বসতি স্থাপন করে এক নতুন ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁদের ইরানী প্রতিনিধিগণ ভারতবর্ষকে হিন্দুস্তান ও তার বাসিন্দাদেরকে হিন্দু বলে আখ্যায়িত করলেন। তাঁদের ভাষাও হল হিন্দু (হিন্দবী > হিন্দী) ভাষা। সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও তাঁরা নতুন আধিপত্য বিস্তারে তৎপর হলেন। এককালে ফারসী ছিল অবিভক্ত ভারতের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা, সংস্কৃত/বৈদিক ভাষা তার আসনচ্যুত হল। কিন্তু আর্য সভ্যতা তার মধ্যেও নতুনভাবে উজ্জীবিত হতে শুরু করল। বৈদিক, সংস্কৃত, পালি-প্রাকৃত সমন্বয়ে এক নতুন ভাষায় জন্ম হল; নাম হল— হিন্দুবী> হিন্দ্বী> হিন্দী। এতে আরবী-ফারসীর মিশ্রণ ঘটল বটে, তবে এর পার্শ্বে জবানে উর্দু (বা হিন্দুস্তানী) বলেও আর এক রূপান্তর প্রকটিত হল। দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে যাঁরা হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করতে রাজী হলেন না, তামিল, তেলেগু, মলয়ালম ইত্যাদি ভাষার আধারে তাঁরাও নিজেদেরকে সংগঠিত করতে শুরু করলেন। হিন্দু-সভ্যতার সঙ্গে তাঁরা এখনও সংগ্রামে লিপ্ত। উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তাই এই ভাষা আন্দোলনও জোরদার হয়ে উঠল। উর্দু এখন হিন্দীর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা (জবান-ই-উর্দুর সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীও আছে)। এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব ভারত, মানে বর্তমান বাংলাদেশে বাঙ্গালা বা বাংলা ভাষাও নতুন করে গড়ে উঠেছে। এই বাংলা ভাষাকে প্রাক-পাকিস্তানী আমলে একমাত্র সাধারণ ভাষার মর্যাদা দেওয়ার কথাও উঠেছিল। বলা বাহুল্য বর্তমানে হিন্দু-ভারতে যেমন হিন্দী, মুসলিম ভারতে উর্দু, পূর্বাঞ্চলে 'জবান-ই-বাঙ্গালা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ভারতীয় হিন্দীর মত বাংলা ভাষাও তেমনি স্বাধীন বাংলায় রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। প্রাক-মুসলিম আমলে বাংলা ভাষা তো দূরের কথা, সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা, যাকে মাতৃভাষা বলা হয়, উপেক্ষিত হয়েছিল। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে সে ভাষা সঞ্জীবিত হয়ে নবীন বাংলা ভাষার জন্ম দিল।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় আর্য-সভ্যতা গর্বী সেন–শাসকগণ মাতৃভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করতে রাজী হয়নি, ফলে মাতৃভাষা হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা হতে দেরী হয়। কিন্তু মুসলিম শাসন আমলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে গৃহীত না হলেও সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাংলা ভাষার সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আর্যভাষী ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হয়ে তারা জনসাধারণের স্তরে নেমে এসে মাতৃভাষাকে সাহিত্য তথা ধর্ম চর্চায় মনোনিবেশ করে। এভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে। দেখা যায় ব্রাহ্মণ-সমাজে

www.pathagar.com

অগণতান্ত্রিক বিধানও ধ্বসে যেতে থাকে। অনূদিত হয়– রামায়ণ-মহাভারত– (অষ্টাদশ পুরাণ ও রামের চরিত্র)। ব্রাহ্মণ্যবাদী তথাকথিত শাস্ত্রকারগণ যে শাস্ত্রব্যূহ রচনা করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দুয়ার রুদ্ধ করে দিয়েছিল, ইসলাম ধর্মীয় মূল্যবোধ তা ধূলিসাৎ করে নতুন জীবনের সূচনা করে। সৈয়দ সুলতান তাঁর বৃহৎ মহাকাব্য 'নবী বংশ' দিয়ে এ গণতান্ত্রিক স্রোতের উৎস মুখ খুলে দেন। বাংলা সাহিত্যের নবযাত্রা শুরু হয়। সৈয়দ সুলতান বলেন, বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারতের পৌত্তলিক সংস্কৃতির প্রসার ঘটলেও ইসলামিক চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটছে না, মুসলমান বাদশাহরাও সেদিকে নজর দিচ্ছেন না, অথচ ইসলামী তৌহীদবাদী চেতনার প্রসার ছাড়া গত্যন্তর নেই। জগত কারো একার নয়। তিনি শুধু বলেই খালাস হন না, নিজেই সে কথা লিখতে অগ্রসর হন। কারণ তিনি এটিকে তাঁর জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষায় স্ব স্ব ধর্ম-কথা প্রচার করা পবিত্র আল-কুরআনেরও নির্দেশ, সৈয়দ সুলতান বলেন। তিনি আরও লেখেন ঃ

> "আল্লাহ্ বুলিছে মুঞি যে দেশে যে ভাষ।
> সে দেশে সে ভাষে কৈলু রসূল প্রকাশ॥
> এক ভাষে পয়গম্বর এক ভাষে নর।
> বুঝিতে ণ পারিব উত্তর–পদুত্তর॥[২৭]

সৈয়দ সুলতানের পথ ধরে একে একে আসেন আরাকান-চট্টগ্রামের সৈয়দ আলাওল, দৌলত কাজী প্রমুখ। এ ইতিহাস এ কালের কম বেশি সকলেরই জানা। এর পরেই আসেন পশ্চিমবঙ্গ ভারতের ভুরশুট-মান্দারনের কবি সৈয়দ শাহ গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামযা প্রভৃতি। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রকেও এঁদেরই উত্তরসূরি বলা যায়।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, সৈয়দ সুলতান মুসলমানী কথা (আল্লাহ-রসূলের কথা) প্রচারের তাকিদ অনুভব করেছিলেন, কিন্তু সৈয়দ শাহ গরীবুল্লাহ সাহিত্যে মুসলমানী প্রকাশ-ভঙ্গির দিকেও দৃষ্টি দিলেন। বলা বাহুল্য, সমকালে বাংলাদেশে মুগল শাসনের নওয়াবী আমল চলছিল। মুর্শিদাবাদে তখন সুবে বাংলার রাজধানী শুধু নয়, রাজভাষা হিসেবে ফারসী (সেই সঙ্গে আল কুরআনের আদর্শও) ভাষা চালু ছিল। তাই ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও আরবী-ফারসী তথা ইসলামের বিশ্বজনীন মানবীয় আদর্শও জোরদার হয়ে উঠছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আরবী-ফারসীকে মুসলমানীর প্রতীক হিসেবে ধরে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মধ্য ভারতে মুগল-সাম্রাজ্যের রাজধানী থাকায় ইতিপূর্বে সেখানেও এক মিশ্র 'হিন্দী' (হিন্দবী, সেই সঙ্গে জবান-ই-উর্দু ও হিন্দুস্তানী) ভাষারও জন্ম হয়েছিল। বাংলাদেশে অবশ্য দেব-নাগরী হরফে হিন্দীর মত আরবী হরফে জবান-ই-উর্দুর মত কোনো প্রতিবাদী ভাষার প্রবর্তন হয়নি, তবে হিন্দু সাহিত্য ও সংস্কৃতির পার্শ্বে প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী সংস্কৃতিসমৃদ্ধ জবান-ই-বাঙ্গালার জন্ম হয়েছিল এবং জবান-ই-বাঙ্গালা থেকেই সর্বগ্রাহী স্বাধীন বাংলা ভাষার জন্ম হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার উপরে

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িক রঙ চড়িয়ে পরবর্তী ব্রিটিশ আমলে যে তথাকথিত সাধু ভাষার (Purest Bengali) নামে বাংলা নিধনের নতুন যাঁতাকল বসানো হল, ঐতিহাসিক সজনীকান্ত দাসের ভাষায় সে ছিল "আরবী-ফারসী নিধনযজ্ঞ"।[২৮] ব্রিটিশ শাসনের সর্বশেষ পর্যায়ে অর্থাৎ দেশ বিভাগের কালে এই মনোভাব আরও জোরদার হতে দেখা যায়। এই ধারা এখনও বিদ্যমান।

প্রসঙ্গত, এবার বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসের দিকে একটু নজর দেওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে আমরা কি দেখি? মধ্যপ্রাচ্যের জেরুজালেম উদ্ধারকে কেন্দ্র করে খ্রীস্টান ও মুসলিম ক্রুসেড-জিহাদের বেদীমূলে 'ইসলামের ঔরসে এবং খ্রীস্ট ধর্মের গর্ভে' সেদিন যে নবজাত সন্তানের জন্মলাভ ঘটে, জগতের ইতিহাসে তা প্রটেস্টানটিজ্‌ম বা একেশ্বর চেতনাসমৃদ্ধ নতুন খ্রীস্ট ধর্ম (Uniterianism) নামে অভিহিত হয়।[২৯] ভারত উপমহাদেশেও দেখা যায়, অনুরূপভাবে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের আড়ালে তৌহীদবাদী (মুআহিদ) হিন্দু ধর্মের আবির্ভাব হয়, এখানে শ্রী চৈতন্য বা রাজা রামমোহন রায় উপলক্ষমাত্র।[৩০] সম্প্রতি ভারতীয় সাগর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আবিষ্কৃত প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত দ্বারকানগরী কথাটিকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যেন।[৩১]

বলা বাহুল্য, কি মোহেঞ্জোদাড়ো-হারাপ্পায়, কি দ্বারকায়, সর্বত্রই এই মানবতাবাদী চেতনা বার বার ধাক্কা খেয়ে মূলের দিকে ফিরে আসছে। এতে না ত্রীশ্বরবাদী খ্রীস্ট ধর্মের, না পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মের গর্ব ও গৌরব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আখেরী নবী রসূলুল্লাহ (সা) প্রচারিত ইসলাম ধর্ম তো এই কথাটিই জগৎ-সভ্যতায় বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কেউ তা যেন দেখেও দেখছে না। পবিত্র আল কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে, "হে মানুষ– তোমরা স্মরণ করো, আমি (আল্লাহ) তোমাদেরকে এক মণ্ডলীভুক্ত করে সৃষ্টি করেছি এবং মনে রেখো, আমিই তোমাদের একমাত্র প্রভু বা রব।"

কুরআন আরও বলছে, "(হে মানুষ), তোমরা আমার শান্তি-নিকেতনের (দারুস্ সালাম) পানে এসো।[৩২] আর (মনে রাখো) তিনি (আল্লাহ) নিত্য নব নব রূপে নিজেকে প্রকাশমান করে রেখেছেন (কুল্লু ইয়াওমিন, হুয়া ফী শান)।" বলা বাহুল্য, দূর সমুদ্র তীর থেকে আবার নতুন আজান ধ্বনি ভেসে আসছে। পাশ্চাত্য জগৎ থেকে পাদরী ওয়ালেসা বলছেন, "সাম্যবাদ (Communism) আর নয়– আমরা স্রষ্টার রাজ্যে (এক আল্লাহর দিকে) আবার ফিরে যেতে চাই।"

পাদটীকা

১. মুহম্মদ আবু তালিব। উত্তর বঙ্গে সাহিত্য সাধনা। রাজশাহী ১৯৭৫ (সংযোজন অংশ। পৃষ্ঠাঃ ৪৭০-৭৩)।

২. Jurnal of Ancient Indian History, vol VI, parts 1-2. 1972-73. ডক্টর সরকার ও কমলাকান্ত গুপ্তের গোরকোই শিলালেখা সম্পর্কিত প্রবন্ধ।

৩. পূর্বোক্ত। মিঃ গুপ্তের প্রবন্ধ।

৪. আবদুল হক চৌধুরী। শহর চট্টগ্রামের ইতিকথা। চট্টগ্রাম, ১৯৮৫। (কথামালা, ১১৫, নবাব সিরাজদ্দৌলা রোড,

www.pathagar.com

চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের প্রচ্ছদের প্রদত্ত ছবি ও প্রারম্ভ ভাগে প্রচ্ছদ পরিচিতি অংশে প্রদত্ত মূল পাঠ অবলম্বনে রচিত)।

৫. ননীগোপাল মজুমদার প্রণীত 'Inscriptions of Bengal, Vol. III, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজশাহী, ১৯২৯। পৃষ্ঠাঃ১৫৮-১৬৩। দুঃখের বিষয় পূর্ণচন্দ্র চৌধুরীর চট্টগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থখানি হস্তগত না হওয়ায় সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা গেল না।

৬. রামচরিতম। সন্ধ্যাকর নন্দী। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম। রাজশাহী, ১৯১৯। পৃঃ ১১৩।

৭ দি লিঙ্গুস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া ১ খণ্ড, পার্ট-১। জর্জ,. জে. গ্রীয়ার্সন। দিল্লী, ১৯৬৮। পৃঃ ৫। উদ্ধৃত। উত্তরবঙ্গে সাহিত্য সাধনা। মুহম্মদ আবূ তালিব। রাজশাহী, ১৯৭৫। প্রসঙ্গ কথা। পৃঃ ১৩।

৮. পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান। ১ম খণ্ড। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। বাংলা একাডেমী, ১৩৭৪/১৯৬৪। পৃঃ ছ।

৯. গৌড় ভাষার ব্যাকরণ। রামমোহন রায় রচনাবলী। ডক্টর অজিতকুমার সম্পাদিত।

১০. গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস। আ. কা. মো. যাকারিয়া সম্পাদিত। বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।

১১. (ক) উত্তরবঙ্গে সাহিত্য সাধনা। আবূ তালিব। রাজশাহী ১৯৭৫। পৃঃ ২৩০-৩২।
(খ) সাহিত্য প্রসঙ্গ। ডক্টর প্রিয় রঞ্জন সেন। কলিকাতা, ১৩৫৩/১৯৪৬। পৃঃ ৪-৬।

১২. (ক) ইসলাম প্রসঙ্গ। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ঢাকা, ১৯৬২। পৃঃ ১০৩-১০৯।
(খ) আবূ তালিব। পূর্বোক্ত। পৃঃ ১৭১-১৭৭।

১৩. দাদূ। ক্ষিতি মোহন সেনগুপ্ত। কলিকাতা, ১৩৪২/১৯৩৫।

১৪. (ক) খুলনা জেলায় ইসলাম। আবূ তালিব। ঢাকা, ১৯৮৮।
(খ) আত্মচরিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী ১৯৬২। পৃঃ ৩০০।

১৫. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সম্মেলন, ১১ই জানুয়ারি, কলকাতা, ১৯৭৬।
(ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণ। পৃঃ ৪)।

১৬. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সম্মেলন, ১১ই জানুয়ারি, কলকাতা ১৯৭৬।
ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণ। পৃঃ ৬।

১৭. আবূ তালিব। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ (দামোদর দেবের রামপুর তাম্রশাসন ঃ প্রত্ন বঙ্গলিপি ও কিছু কথা)।

১৮. শহীদুল্লাহ। পূর্বোক্ত।

১৯. শাহ গরীবুল্লাহ সংস্কৃতি মেলা স্মারক পত্রিকা (শাহ সংবাদ)। মুনশীপাড়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ৪/৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১।

২০. ইসলামি বাংলা সাহিত্য। ড. সুকুমার সেন। বর্ধমান, ১৯৫১।

২১. আমাদের সমস্যা। শহীদুল্লাহ। ঢাকা, ১৯৪৯। পৃঃ ৬-৭।

২২. হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ)-এর জীবনেতিহাস। ১ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৬৯।

২৩. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কুরআনের প্রভাব। আবূ তালিব। ই-ফা, ঢাকা, ১৯৮১, পৃঃ ৮২।

২৪. (ক) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মচরিত। পৃঃ ৩০০। (খ) আবূ তালিবা। খুলনা জেলায় ইসলাম।

২৫. (ক) ভারতের সাধারণ ভাষা। শহীদুল্লাহ, ডঃ মুহম্মদ। ভাষা ও সাহিত্য ঢাকা, ১৩৩৮/ ১৯৩১।
(খ) শহীদুল্লাহ শত বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ। উদ্ধৃত। বা-এ, ঢাকা, ১৯৮৫। পৃঃ ২৪৮।

২৬. ইসলামের ইতিহাস। কাজী আকরাম হোসেন।

২৭. নবী বংশ। সৈয়দ সুলতান। ১৫৮৪-৮৬ সম্পাদিত- ডঃ আহমদ শরীফ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৮. বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস। ১ম খণ্ড। সজনীকান্ত দাস। সংস্কৃতিকরণ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৯. পারস্য প্রতিভা। ১ম খণ্ড। মোঃ বরকতুল্লাহ। ঢাকা, ১৯৬০। পৃঃ ৫৮।

৩০. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কুরআনের প্রভাব। আবূ তালিব। পূর্বোক্ত।

৩১. ভারত বিচিত্রা। ডঃ এস আর রাও। মার্চ, ১৯৮৮। পৃঃ ২৪-২৮।

৩২. নবী বংশ। সৈয়দ সুলতান। ১৫৮৪-৮৬ সম্পাদিত।- ডঃ আহমদ শরীফ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার বিকাশে মুসলমানদের অবদান

সিরাজুল ইসলাম

লেখক-পরিচিতি ঃ সিরাজুল ইসলাম, মননশীল প্রবন্ধ লেখক।

লেখা-পরিচিতি ঃ বাংলা ভাষার বিকাশে মুসলমানদের অবদান, 'অগ্রপথিক', শহীদ দিবস সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে লক্ষ প্রাণ ও এক সাগর রক্তে অর্জিত স্বাধীনতার এতগুলো বছর অতিক্রান্ত হলেও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাঙালীর বাংলা যথার্থ রূপ পায়নি। সর্বস্তরে বাংলা আজও দাবী এবং শ্লোগানের বিষয়। এই সুদীর্ঘ সময়েও রচিত হয়নি ভাষা আন্দোলনের কোন বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর ইতিহাস। উপরন্তু চলছে ইতিহাস বিকৃতির অপপ্রয়াস। ফলত প্রকৃত ভাষা সংগ্রামীরা তলিয়ে যাচ্ছেন বিস্মৃতির অতল তলে, সংগ্রামী হিসেবে বাহবা পাচ্ছে অসংগ্রামীরা। প্রগতিবাদী বলে পরিচিত একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও রাজনীতিক এ আন্দোলনকে কম্যুনিস্ট পরিচালিত হিসেবে প্রমাণ ও কৃতিত্ব নেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত তাদের বক্তব্য, লেখা ও অনুষ্ঠানমালা সবকিছুতেই এ প্রচেষ্টার ছাপ বিধৃত। তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠী ও তাদের বংশধরদের বাংলাবিরোধী ভূমিকাকে হাতিয়ার করে এসব প্রগতিবাদীরা চাইছেন এ তত্ত্ব প্রমাণ করতে যে, ইসলাম ও মুসলমান ভাষা আন্দোলন–এমনকি বাংলা ভাষা বিরোধী। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের অবতারণা তাদের এ তত্ত্ব প্রমাণের এক জোড়াতালি প্রয়াস।

প্রকৃত সত্য হলো, যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছেন তাঁরাই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা করেছেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন। পরবর্তীতে অন্যান্যরা এ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রসংগে সবচেয়ে বড়কথা হলো, শুধু ভাষা সংগ্রামই নয়; বরং বাংলা ভাষা হিসেবে আজ বিশ্বসভায় যা প্রতিষ্ঠিত তার সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটেছে মূলত মুসলমানদের মাধ্যমে। বাংলাদেশে মুসলিম বিজয় ও ইসলামের আগমন না ঘটলে আজও সংস্কৃতই থাকত এদেশের ভাষা। বাংলা নামক কোন ভাষার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না। এদিক থেকে এ নিবন্ধের লক্ষ্য ভাষা হিসাবে বাংলার বিকাশ এবং ভাষা সংগ্রামে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদানের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন।

বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও বাংলা ভাষার বিকাশ সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। তের শতকের গোড়াতে তুর্কী মুসলমান কর্তৃক বাংলা বিজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'সংস্কৃত'ই ছিল বাংলা–ভারতের ধর্মের, শিক্ষার দরবারের, সাহিত্যের সংস্কৃতির ও নানা অঞ্চলের জনগণের ভাব-বিনিময়ের বাহন। এ সময় সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দৌর্দণ্ড প্রতাপের মুখে বাংলা ভাষা চর্চাকারীরা অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় নিপতিত ছিল। আঠারো শতক পর্যন্ত ব্রাহ্মণ সমাজের এহেন বাংলা বিদ্বেষ ও বিরোধিতা অব্যাহত থাকে। যার প্রমাণ মিলে একটি বাংলা ছড়ায় যাতে রয়েছে কাশীরাম দাসের নাম ঃ

www.pathagar.com

"কৃত্তিবেসে কাশীদেশে আর বামুন ঘেঁষে–এ তিন সর্বনেশে।" হিন্দু–সংস্কৃত পণ্ডিতদের বাংলা বিরোধিতা সম্পর্কে শ্রী দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্য ঃ "ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ ভাষা প্রচারে বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীরামকে ইহারা সর্বনেশে উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদের জন্য রৌরক নামক নরকে স্থান নির্ধারণ করিয়াছিলেন।" হিন্দুদের এ দীর্ঘ বাংলা বিরোধিতার সংগে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানদের একটি অংশের অপবিত্র হওয়ার আশংকায় কোরআন–হাদীস বাংলায় অনুবাদে বাধা দানের অপচেষ্টা আংশিক তুলনীয়। অবশ্য এ সময় মুসলমানদের একটি শ্রেণী গোঁড়ামীর বশীভূত হয়ে নিজেদের অজ্ঞতা ঢাকতে গিয়ে বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানী বলার ধৃষ্টতা দেখাতেও পিছপা হননি। তবে এদের প্রায় সবাই অবাঙ্গালী অথবা তাদের দ্বারা প্রভাবিত। মুসলমানদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিরোধিতার ক্ষেত্রে এটাই হলো তথাকথিত প্রগতিবাদীদের উপলক্ষ।

সত্যিকারার্থে তুর্কীরাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গোড়াপত্তন করেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি লাভ হয়েছে এ এক ঐতিহাসিক সত্য। বারো শতক পর্যন্ত বহু বিতর্কিত বাংলা ভাষা বলে কথিত চর্যাপদগুলো সৃজ্যমান অবস্থায় ছিল। এই চর্যাপদগুলো বাঙ্গালিত্ব প্রাপ্ত হয় তুর্কী আমলে। বাংলা ভাষায় তুর্কীদের অবদান সম্পর্কে ডক্টর আহমদ শরীফ বলেন ঃ "তুর্কী আমলে রাজশক্তির পোষকতা পেয়ে বাঙলা লেখ্য শালীন সাহিত্যের বাহন হলো। আর এর দ্রুত বিকাশের সহায়ক হলো চৈতন্য প্রবর্তিত মত।" এ প্রসংগে শ্রী দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্যঃ "মুসলমানগণ ইরাক, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হতেই আসুন না কেন, এ দেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দু প্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মহররম, ঈদ, শবেবরাত প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল।–এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাস নিবন্ধন বাংলা তাহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বর্ণযুগ হলো পাঠান যুগ। এ যুগের ব্যাপ্তি ছিল দুইশ' তেত্রিশ বছর। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম পৃষ্টপোষক শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দিল্লীর সম্রাটদের শাসন হতে বাংলাদেশকে মুক্ত করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা বাংলা সাহিত্যে স্বাধীন বাংলা নামে পরিচিত। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ তাঁর পনের বছরের শাসনামলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের পথকে যেভাবে মুক্ত করেন, তা একে একে তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ্, দৌহিত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ হতে শেষ পাঠান সুলতান দায়ুদ খাঁর আমল পর্যন্ত চলে এবং পরবর্তীকাল পর্যন্ত এর অনুপ্রেরণা অন্যান্য মুসলমান সুলতানদের অনুপ্রাণিত করে।

ইলিয়াস শাহী আমলের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ। বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সমৃদ্ধির কারণে ঐতিহাসিকগণ এ যুগকে 'হোসেনী আমল' নামে অভিহিত করেছেন। সমকালীন অনেক কবি তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। বরিশালের ফুল্লশী গ্রামের কবি বিজয় গুপ্ত (১৪৯৪ সালে) তাঁর "মনসা

www.pathagar.com

মঙ্গল" কাব্যের মুখবন্ধে হোসেন শাহের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শ্রীখণ্ডের কবি যশোরাজ খান তাঁর গুণকীর্তন করে বলেছেন ঃ

"শ্রীযুক্ত হুসন জগতে ভূষণ
সোহ্ এ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভনে যশোরাজ খান।"

হোসেন শাহের আমলে বাংলার লৌকিক কাহিনী, ব্রজবুলিপদ, বাংলা মহাভারত, পৌরাণিক গল্প বাংলায় রচিত হয় এবং তাঁর আমলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিত্তি। ফলে বাংলা সাহিত্য এক নতুন রাজ্যের সন্ধান পায়।

সপ্তম শতাব্দীতে হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফত কালে বাংলায় আগত প্রথম ইসলাম প্রচারক দল থেকে এদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে। সূফী সাধক, মুসলিম শাসক ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে বাংলায় ইসলাম প্রচারিত হয়। এ সময় মুক্তি ও মানব ধর্ম ইসলামের সংস্পর্শে এসে স্রোতের বেগে হিন্দু সম্প্রদায় ইসলামে দীক্ষা লাভ করে। সে কারণে বাংলাদেশের প্রায় সবাই দেশজ মুসলমান। তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্মেষ যুগে সুলতান-সুবাদারদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে হিন্দু–মুসলমান উভয়ই কলম চালিয়েছে। এবং সৃষ্টি করেছে সাহিত্য। সুলতানী আমলের বিশিষ্ট কবি–সাহিত্যিক হলেন শাহ্ মুহম্মদ সগীর, কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, মালাধর বসু, জয়নুদ্দীন, ধ্রুবনন্দ প্রমুখ। এ সময়ের বিশেষ অবদান কৃত্তিবাস কর্তৃক রামায়ণের বঙ্গানুবাদ, মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়",কবি জয়নুদ্দীনের "রসূল বিজয়", ধ্রুবনন্দ মিশ্রের সামাজিক ইতিহাস "মহাবংশাবলী"। এসবই গৌড়ের সুলতানদের কৃতিত্ব। তাঁদের অবদান সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, "খাঁটি বাঙ্গালী মুসলিম সুলতানদের স্বাভাবিক মাতৃভাষা–প্রীতি এই ভাষাকে শাহী দরবারে যে প্রতিষ্ঠা দান করিল, তাহা হুসৈনী বংশের উদার দৃষ্টিভঙ্গী, শিল্প ও সাহিত্য-প্রীতির সহিত মিশিয়া বাংলা–সাহিত্য চর্চাকে দেশময় ছড়াইয়া দিল। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গৌড়ীয় সুলতানদের এই দানকে পরোক্ষ দান বলা চলে না। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ দানে গৌড়ীয় সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতাও অন্যতম। এই সময়ে বাংলা–সাহিত্য তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিলে, বনফুলের ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে ঝরিয়া পড়িত।" ডক্টর সুশীল মণ্ডলের মন্তব্য, "এই হুসেন শাহী বংশের সমকালে দেশে ধর্মের প্রচার ও প্রসার হইয়াছিল। বাংলা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়া জনগণের নিকট ধর্মের নতুন আবেদন সঞ্চারিত করিয়াছিল। এই যুগের বঙ্গের জাগরণ ইউরোপীয় রেনেসাঁর সঙ্গে ন্যূনাধিক তুলনীয়।" শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন মুসলমান শাসকদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে অবদানের প্রশংসা করে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ "আমাদের বিশ্বাস

www.pathagar.com

মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন, সেই যুগে যদি মুসলমান শাসকগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে উদ্যোগী না হইতেন তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মৃত্যু সূতিকাগারেই হইয়া যাইত। কারণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের পথ নানাভাবে যুগে যুগে দুর্গম করার প্রচেষ্টা চলিয়াছে।" এ সময়ে মুসলমানদের সৃষ্ট সাহিত্যের মান সম্পর্কে ডক্টর আহমদ শরীফ বলেন, "মধ্যযুগের বাঙ্গালী মুসলমানদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, দেব-ধর্ম প্রেরণাবিহীন নিছক সাহিত্যরস পরিবেশনের জন্যে তাঁরাই লেখনী ধারণ করেন। আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধ সাহিত্য পেয়েছি তাঁদের হাতেই। কাব্যের বিষয়বস্তুতে বিচিত্রদানের গৌরবও তাঁদেরই।" মোগল শাসনের শেষাবধি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ অবদান অব্যাহত থাকে। উপমহাদেশে ইংরেজী শাসন চালুর পর উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা ও মুসলিম বিদ্বেষের প্রেক্ষাপটে হিন্দুরা বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। এ সময় ইংরেজদের কোপানলে নিক্ষিপ্ত রাজ্যহারা মুসলিম সমাজ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। তাই জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় তারা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। এমনকি হিন্দুদের ইংরেজ তোষণ ও মুসলিম বিদ্বেষের কারণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কেউ কেউ হিন্দুদের সাথে একাত্ম করে দেখতে শুরু করেছিল। অবশ্য এ অবস্থা দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকেনি। জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রগতির সাথে সাথে তার পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

মুসলমান শাসনামলে বাংলা-ভারতের সরকারী ভাষা ছিল ফারসী। ইসলাম যেমনি উপমহাদেশের জনগণের ধর্ম ও জীবনবোধ পাল্টে দিয়েছিল, তেমনি ফারসী ও আরবী তাদের ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ সময় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলে রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে ফারসী চর্চা করতো। এ সময়ের হিন্দু-সমাজের বিদ্যা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গে জয়ানন্দ লিখেছেন ঃ

"ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে।
মোজা-পাত্র নড়ি-হাতে কামান ধরিবে ॥
মনসবি আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর।
ডাকা-চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর ॥"

সৈয়দ সুলতানের ভাষায় ঃ

"হিন্দু মুসলমান তাও ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রসূলের কথা কেহন সোঙরে।"

প্রকৃত প্রস্তাবে এ সময় যারা কাব্য বা সাহিত্য চর্চা করেছেন তাঁরাই ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। ফারসী শব্দের উত্তরোত্তর ব্যবহারে তা আমাদের নিজস্ব শব্দ সম্ভারে পরিণত হয়ে গেছে। ফারসী শব্দের সাথে এসেছে তুর্কী ও আরবী শব্দ। হিন্দু হোক মুসলিম হোক

www.pathagar.com

যাঁরা সাহিত্য যশঃপ্রার্থী তাঁরা সকলেই ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন সাহিত্যকে শিল্পময় ও জনচিত্তহারী করতে। সপ্তদশ শতকের চিহ্নিত কবি আলাওল, অষ্টাদশ শতকের ভারত চন্দ্র, উনবিংশ শতকের মাইকেল মুধুসূদন ও বিংশ শতকের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য রচনায় আরবী-ফারসী শব্দের চাতুর্যময় ব্যবহার করেছেন। আরবী-ফারসী শব্দ বেপরোয়া ব্যবহার করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যে সব শক্তিধর লেখক ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরপর উগ্র-আধুনিক বলে কথিত কল্লোল যুগেরও, স্বাধীনতা-উত্তর কবি সাহিত্যিকরাও আরবী-ফারসী শব্দ প্রচুর ব্যবহার করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার ও সৈয়দ মুজতবা আলীকে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের নিপুণ শিল্পী বলা হয়। তারপর যাঁদের নাম করতে হয় তাঁরা হলেনঃ অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, বিমল মিত্র, ফররুখ আহমদ, মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, শওকত ওসমান, সরদার জয়েনউদ্দীন প্রমুখ। অপেক্ষাকৃত তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যেও আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের নতুন নতুন প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কয়েক শতক ধরে হিন্দু-মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকদের দ্বারা বহুল প্রচলিত আরবী-ফারসী বিরাট শব্দ সম্ভারকে তাড়িয়ে যারা আচার্য-উপাচার্য, ন্যায়াধিপাল ও মহানারধিপালেও বাংলা নামক সংস্কৃতির আমদানির প্রচেষ্টায় লিপ্ত তাদের উদ্দেশ্যে জনাব আবুল ফজল ও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ সম্পর্কিত পত্রালাপের উল্লেখ করতে চাই। কবি রবীন্দ্রনাথ আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে মৃত্যুশয্যা থেকে আবুল ফজল সাহেবকে লিখেছেনঃ "প্রয়োজনের তাগিদে ভাষা বহুকাল থেকে বিস্তর নতুন কথার আমদানি করে এসেছে। বাংলা ভাষায় পারসী সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তারা সহজে স্থান পেয়েছে। 'খুনখারাবি' শব্দটা ভাষা সহজেই মেনে নিয়েছে, আমরা তাকে যদি না মানি তবে তাকে বলব গোঁড়ামী।" আবুল ফজল সাহেব এ প্রসঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথকে যা লিখেছেন তা হলোঃ "মুসলমান নায়িকা মুসলমান নায়ককে দস্তরখানা বিছিয়ে নাস্তা পরিবেশন করেছে, বহু ভেবেও এ রকম বাক্যকে বিশুদ্ধ বাংলায় পরিবর্তিত করতে পারিনি। অথচ দস্তরখানা মুসলমান পরিবারে রোজ দু'বেলাই ব্যবহার করা যায়। নাস্তার প্রতিশব্দ হয়তো জোর করে 'জল খাবার' করা যায়। কিন্তু তা করলে মুসলমানদের কানে তা শব্দের শুদ্ধিকরণের মতই শোনাবে। আর নিশ্চিত মুসলমান জীবনেও শব্দের ব্যবহার ঘরোয়া না হয়ে পোশাকী হয়েই থাকবে।" ডক্টর সুনীতি কুমারের মতে প্রায় আড়াই হাজার ফারসী শব্দ এবং ফারসীর মাধ্যমে আরবী শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়েছে। আর এভাবেই আরবী-ফারসী বাঙালীর জাতীয় জীবনে ইসলামের ন্যায় ভাষা ও সাহিত্যের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই শুধুমাত্র পৃষ্ঠপোষকতা বা সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে মুসলমানদের অবদান সীমাবদ্ধ থাকেনি। উপরন্তু নতুন শব্দ-সম্ভার সরবরাহ করেও তারা এক্ষেত্রে প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। বর্তমানে যারা ইসলামের প্রতি স্বভাবজাত বিদ্বেষের কারণে এ বিশাল শব্দ সম্ভারের বিরুদ্ধে শুদ্ধি

www.pathagar.com

অভিযান চালাচ্ছেন তারা মূলত বাঙলা ভাষার বিরুদ্ধেই শুদ্ধি অভিযান চালাচ্ছেন। তারা বাঙলা ভাষার বন্ধু হতে পারেন না।

ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীতে রাষ্ট্রভাষা বাঙলা ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের ভূমিকার আলোচনা "মুসলিম বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ন" শীর্ষক গ্রন্থের লেখক জনাব আমিনুল ইসলাম সাহেবের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করতে চাই। তিনি মন্তব্য করেন, "মুসলমান সম্রাটগণ একদিন বাঙালীকে সাহিত্য দিয়াছিলেন, ভাষা দিয়াছিলেন আর দিয়াছিলেন স্বতন্ত্র সংস্কৃতিবোধ, তাই হাজার বছর পর আবার বাঙালী মুসলমানগণ তাহাদের ঐতিহ্যকে রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়াছে– তবু বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর সাহিত্যের ঐতিহ্যের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিতে দেয় নাই।"

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসলেও এদিনেই রাষ্ট্রভাষা বাঙলা ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেনি। মূলত এদিন ভাষা সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটেছিল। ভাষা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের পর হতেই। তখন থেকেই হিন্দুদের হিন্দী–প্রীতি ও অবাঙালী মুসলমানদের উর্দূ–প্রীতির মোকাবিলায় পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা চালু রাখার প্রশ্নে আলোচনা–পর্যালোচনা শুরু হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের যে সম্মেলন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সংসদের সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের বাহন বাঙলা ভাষা হবে এ প্রশ্ন বহু পূর্বেই চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয়ে গেছে। এতদিন পরে উর্দূ–বাংলা প্রশ্নের উত্থাপন করা পণ্ডশ্রম ও হাস্যকর বলেই বিবেচিত হবে।.... পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলমানের কাছে উর্দূ বিদেশী ভাষার সমতূল্য।" (মাসিক মোহাম্মদী, ফাল্গুন, ১৩৪৯)। এ প্রসঙ্গে কবি ফররুখ আহমদ রচিত ১৩৫২ সালের মাসিক মোহাম্মদীতে উর্দূ–প্রেমিক বঙ্গ–সন্তানদের উদ্দেশ্যে লিখিত "উর্দূ বনাম বাঙলা" শীর্ষক ব্যঙ্গ সনেট বিশেষভাবে উল্লেখ্য। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ জিয়াউদ্দীন আহমদ স্বাধীন ভারতে হিন্দীর মোকাবেলায় পাকিস্তানে একমাত্র উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিলে বাংলার খ্যাতনামা পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। অতএব দেখা যায় পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব থেকেই রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা এবং লেখালেখি চলছিল।

পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়াতেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের অফিস আদালতের ভাষা ও শিক্ষার বাহন করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রস্তাব এবং আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল প্রগতিশীল ইসলামী সাংস্কৃতিক সংস্থা "তমদ্দুন মজলিস"। পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র দু'সপ্তাহ পর ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিসের জন্ম এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মজলিসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় ভাষা আন্দোলনের সর্বপ্রথম পুস্তিকা "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাঙলা না উর্দূ"। এ পুস্তিকার লেখক সর্বজনাব

www.pathagar.com

অধ্যাপক আবুল কাসেম, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন এবং আবুল মনসুর আহমদ। এছাড়া তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপদানের জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিজ্ঞানের লেকচারার নূরুল হক ভূঁইয়াকে কনভেনর নিযুক্ত করে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এ সংস্থার উদ্যোগে বহু সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ১৫ই নভেম্বর কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক উর্দূকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব এবং পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের গণপরিষদ কর্তৃক বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম ভাষা করার দাবী প্রত্যাখ্যান নতুন করে ভাষা সংগ্রামকে উচকিয়ে দেয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংগ্রাম পরিষদের এক সভায় মজলিস সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জনাব শামসুল আলমকে আহ্বায়ক করে সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ এবং বিভিন্ন হলের প্রতিনিধিকে সংগ্রাম পরিষদে কো-অপ্ট করে নেয়া হয় এবং ১১ই মার্চ সংগ্রাম পরিষদের ডাকে প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট ও প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ১৯শে মার্চ কায়েদে আজমের ঢাকা আগমন উপলক্ষ করে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ভাষা সংগ্রামীদের সাথে এক চুক্তির প্রেক্ষিতে তা আপাতত স্তিমিত হয়। কিন্তু কায়েদে আজম কর্তৃক রাষ্ট্রভাষা উর্দূ হবে ঘোষণা দেয়ায় সেখানে প্রতিবাদ ওঠে। তাৎক্ষণিক নতুন আন্দোলন গড়ে না উঠলেও ক্ষোভ সঞ্চারিত হতে থাকে। কিন্তু ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ঢাকার পল্টন ময়দানে এক বক্তৃতায় যখন ঘোষণা করলেন একমাত্র উর্দূই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা তখন নতুন করে চাপাপড়া ক্ষোভ আগ্নেয়গিরির লাভার ন্যায় বেরিয়ে আসলো। ৩০শে জানুয়ারী ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী হলে জনাব আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম ছাত্র লীগের অন্যতম নেতা কাজী গোলাম মাহবুবকে কনভেনর করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। এ কমিটিতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব আবুল হাশিম, অধ্যাপক আবুল কাসেম, জনাব অলি আহাদ, জনাব শামসুল আলম, জনাব শামসুল হক চৌধুরী, মীর্জা গোলাম হাফিজ, অধ্যাপক আবদুশ শুকুর, জনাব মোহাম্মদ তোয়াহাসহ আরো অনেকে ছিলেন। সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী সারা পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট ও প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে এমাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করলে পরদিন তা উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমায়েত ছাত্ররা গ্রুপে গ্রুপে পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করে। এক পর্যায়ে পুলিশের গুলীতে বরকত, রফিক ও সালামসহ কতিপয় তাজাপ্রাণ তরুণ শাহাদাতবরণ করেন। সংগ্রাম পরিষদ এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরদিন দেশব্যাপী শোক দিবস ঘোষণা করলে জনাব আলী আছাদ উক্ত সভায় শোক দিবসে রোযা রাখার ঘোষণা দেন। এভাবে ২২শে ফেব্রুয়ারী হতে গোটা পূর্ব পাকিস্তান বিক্ষোভে ফেটে পড়লে ভাষা সংগ্রাম অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। তারপর হতে এ দাবীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলার লোক খুব কমই ছিল। তবে প্রকাশ্য কোন বিরোধিতা

www.pathagar.com

না আসলেও ভাষা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে কম্যুনিস্ট মহল থেকে উত্থাপিত "সকল ভাষার সমান মর্যাদা" শ্লোগানের মাধ্যমে বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পশতু প্রভৃতি ভাষার সমকক্ষরূপে বিবেচনা করার অবাস্তব দাবী উঠানো হলে ভাষা সমর্থকদের বিরোধিতার মুখে তা নস্যাৎ হয়ে যায়।

বায়ান্নর ফেব্রুয়ারীর চারটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে। এসব দল হলো খিলাফতে রাব্বানী পার্টি, গণতন্ত্রী দল, নেজামে ইসলাম পার্টি এবং কৃষক-শ্রমিক পার্টি। এ দলগুলোর সব ক'টিই ছিল মুসলিম লীগ বিরোধী এবং ভাষা আন্দোলনের সমর্থক। জমায়তে ওলামায়ে ইসলাম হতে বেরিয়ে আসা মাওলানা আতাহার আলী, মাওলানা সৈয়দ মুসলেহ্ উদ্দীন, জনাব আশরাফউদ্দিন চৌধুরী, মাওলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়া, মৌলভী ফরীদ আহমদ, মাওলানা সিদ্দিক আহমদসহ গুরুত্বপূর্ণ আলেমদের নেতৃত্বে গঠিত নেজামে ইসলাম ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে কাজ করে। "নেজামে ইসলাম" নামে মাওলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়ার লিখিত এই দলের এক পুস্তকে কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সমর্থন করা হয়। ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ একটি স্বল্পায়ু সংগঠন ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তমদ্দুন মজলিসের সমর্থক খিলাফতে রব্বানী পার্টিও এক্ষেত্রে তাৎপর্য ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৪ সালে শেরে বাংলা, ভাসানী প্রমুখের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগকে পরাজিত করলে ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদে পাকিস্তানের যে প্রথম সংবিধান রচিত হয় তাতে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হয়। আর এভাবেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আনুষ্ঠানিক বিজয় লাভ করে।

উপরোক্ত তথ্যাবলী আমাদের সামনে এ সত্যকেই সুস্পষ্ট করছে যে, কম্যুনিস্টরা নয়; বরং ইসলামপন্থীরাই সূচনা হতে এ আন্দোলনের সাথে বলিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এক্ষেত্রে তাদের অবদানই সর্বাধিক। এ প্রসঙ্গে "ঐতিহ্য" পত্রিকার ভাষা আন্দোলন স্মারক সংখ্যা ১৩৯২-এর সাথে প্রদত্ত কতিপয় ভাষা সংগ্রামীর সাক্ষাৎকার থেকে দু' একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই। বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী বলেন, "১৯৪৮ সালের প্রথম ভাষা আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তিই ছিল ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত সংস্থা তমদ্দুন মজলিস ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। তখন কম্যুনিস্ট ছাত্রদের সংখ্যা এত মুষ্টিমেয় নগণ্য ছিল যে, চালিকাশক্তি হওয়া তো দূরের কথা, কোন ফ্যাক্টরই তারা ছিল না।" ড. এ. এস. এম. নূরুল হক ভূঁইয়া বলেন, "ভাষা আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তারাই যারা পাকিস্তান আন্দোলন করে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করতে পেরেছিলেন। কাজেই তারা যখন দেখলেন যে, দেশের নেতৃবৃন্দ একে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি কলোনী করতে উদ্যত তখন একমাত্র তারাই উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করার সাহস দেখাতে পেরেছিলেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কম্যুনিস্ট পার্টির কোন কমিটি ছিল না।" তিনি আরও বলেন, "ডিসেম্বর '৪৭-এ যখন কমরেড মোজাফ্ফর ঢাকা বার লাইব্রেরীতে আসেন

www.pathagar.com

তখন তাঁকে সাহায্য করতে বলা হলে তিনি বলেন যে, যতক্ষণ জিন্নাহ সাহেব আছেন ততক্ষণ এ আন্দোলন করে কিছু করা যাবে না। এই পণ্ডশ্রম করতে আমরা রাজি নই"। অধ্যাপক আবদুল গফুর বলেন, "ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্বে এতে নেতৃত্ব দেয় তমদ্দুন মজলিস, যা ছিল একটি ইসলামী আদর্শবাদী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ এ আন্দোলনের নেতৃত্বে বলিষ্ঠভাবে অংশগ্রহণ করে। এ দু'টি সংগঠনের মেনিফেস্টোতেই ইসলামী নীতির সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল। সে হিসেবে ভাষা আন্দোলনের প্রথম দিকের নেতৃত্বে যে মূলত ইসলামপন্থীরাই অধিষ্ঠিত ছিলেন-একথা জোর গলায় দাবী করা যায়।

উপসংহারে একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, বাংলা ভাষার জন্ম ও বিকাশ মুসলমানদের হাতেই হয়েছে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন তাদেরই দ্বারা সূচিত ও প্রাথমিকভাবে পরিচালিত। ভাষার প্রশ্নে প্রথমে যাঁরা জীবন দিলেন-শহীদ হলেন তাঁরাও ছিলেন মুসলিম। তাই বাংলা ভাষার বিকাশ ও ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণী ও তাদের তাবেদারদের জনস্বার্থ বিরোধী ভূমিকাকে ইসলাম ও মুসলমানদের নামে চালিয়ে দেয়ার কোন সুযোগ নেই। এ জাতীয় প্রচেষ্টা নিছক বিদ্বেষপ্রসূত।

এ নিবন্ধ রচনায় প্রধানত সাহিত্য সাময়িকী ঐতিহ্য, আমিনুল ইসলাম সাহেবের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ন', ডক্টর এনামুল হকের, 'স্বাধীন মুসলিম বাংলার সাংস্কৃতিক পটভূমি' শীর্ষক প্রবন্ধ ও ড. আহমদ শরীফের 'মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ' নামক গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে। - লেখক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যে
মুসলিম অবদান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যিক জাগরণ

আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ

লেখক-পরিচিতি ঃ 'বাংলা ভাষায় মুসলিম অবদান' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
লেখা-পরিচিতি ঃ লেখাটি 'সওগাত' পত্রিকার ১৩৪৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যিক জাগরণ বাস্তবিকই বিস্ময়ের সামগ্রী। এই বিস্ময় শুধু আমার একার নহে, ইহা আমাদের প্রতিবেশী, হিন্দুভ্রাতৃগণকেও বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা নানাস্থানে- সাহিত্য-সম্মেলনে এবং কলিকাতার নানা কাগজে নানাভাবে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। মুসলমানেরা এইবার রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িকতা টানিয়া আনিল বলিয়া নানাদিক হইতে নানাভাবের হুঙ্কার কানে আসিতেছে। আমি রাজনীতিক নহি। রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালার মুসলমান কতখানি সাম্প্রদায়িক, সে-কথার বিচার বাঙ্গালী মুসলমান রাজনীতিকরা করিবেন। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানের জাগরণে সত্যই সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়াছে কিনা, সে কথা বলিবার অধিকার যতই সামান্য হউক— আমার আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। তাই আজ এই সম্বন্ধে আমি গোড়াতে দুই একটি কথা বলিব।

সাহিত্য জাতি-ধর্মের গণ্ডী আমি কখনও স্বীকার করি নাই, এখনও করি না, কিন্তু ইহার বৈচিত্র্য স্বীকার করি। সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান যে জাতিরই হউক ইহা সাহিত্য বিবেচ্য হইলেই সার্বজনীন হইয়া থাকে। এই সার্বজনীনতা নানা বৈচিত্র্যের মধ্য হইতে উদ্ভুত হয়। আমার ধারণায় সৌন্দর্য সার্বজনীন গুণ; ইহা মস্‌জিদ ও মন্দিরে সমভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে। মস্‌জিদ ও মন্দির সৌন্দর্য্য প্রকাশের স্বচ্ছ আধার মাত্র। সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের পরিসর বহু বিস্তৃতির সম্ভাবনায় পূর্ণ। শুধু জাতি-ধর্মের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে ইহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ইহার পরিসর সীমাবদ্ধ হয়, সৌন্দর্য্যের সকল দিক স্বতঃস্ফূর্ত হইতে পারে না। মুসলমানের সাহিত্য সার্বজনীন সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের বিচিত্র ভঙ্গীর একদিক মাত্র। হিন্দু-সাহিত্যও তদ্রুপ আর একদিক। এইজন্যই আধুনিক বঙ্গের সাহিত্যিক জাগরণকে আমি ভীতির চক্ষে দেখি না,—বরং প্রীতির নয়নেই নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। কারণ অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধা সুগভীর এবং পরিচয় প্রাচীন।

বঙ্গীয় মুসলমানদের বর্তমান সাহিত্যিক জাগরণ ও সম্প্রদায়ের প্রগতির পরিচায়ক ত বটেই, সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যেরও বৈচিত্র্য এবং সম্পদবৃদ্ধির একটি প্রধান চিহ্ন। বাঙ্গালা সাহিত্য শুধু বাঙ্গালী হিন্দু কিম্বা বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য নয়, ইহা উভয়েরই সম্মিলিত সাহিত্য। উভয় জাতি এই সাহিত্যকে আপন ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা দিয়া সৌষ্ঠবশালী করিয়া না তুলিলে এই সাহিত্য যে নিতান্তই একদেশদর্শী হইয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও

www.pathagar.com

মুসলমানগণ তাহাদের সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য দিয়া এই সাহিত্যকে পরিপুষ্ট না করিলে আজ মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা সাহিত্যকে শুধু শাক্ত হিন্দুদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় এত উন্নত অবস্থায় পাওয়া কখনই সম্ভব হইত না।

আমি বিশ্বাস করি, মুসলমানদের বর্তমান সাহিত্যিক জাগরণ অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যকে সম্পদশালী এবং বাঙ্গালা ভাষাকে শ্রীসম্পন্না করিয়া তুলিতেছে। একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, মুসলমানেরা আপন জাতীয়, ধর্মীয়, সংস্কৃতি ও সভ্যতাগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য লইয়া বাংলা ভাষার সেবা করিলে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য অপ্রতুল ও অনুমেয় মূর্তি ধারণ করিবে। যাঁহারা মুসলমানদের বর্তমান সাহিত্যিক প্রগতির পরিপন্থী, তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের মিত্রতার মুখোস পরিয়া তৎপ্রতি শত্রুতাই সাধন করেন মাত্র; কেন না তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যকে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ইহাকে ইহার স্বাভাবিক স্ফূরণের ও সম্প্রসারণের বৈচিত্র্য হইতে বঞ্চিত রাখিতে চেষ্টা করেন। এই জন্য আমি ইংরেজ আমলের প্রথম যুগের মিশনারী–রচিত বাঙ্গালা সাহিত্যকেও– তাহা যতই অকিঞ্চিৎকর হউক–অপ্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করি না। নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যাস্পদ হইলেও তাঁহারা আধুনিক যুগের বিচিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের বুনিয়াদ পত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ এই প্রকারের খেয়ালের বশবর্তী হইয়াই আমি আধুনিক মুসলিম সাহিত্যিক জাগরণকে মোটেই সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টি দিয়া দেখি না বা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া মনে করি না। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, মুসলমানগণ আজ স্বীয় ধর্ম বা সম্প্রদায় বুদ্ধিতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিচালিত হইয়াছেন, তথাপি ইহাতে ভীত হইবার কোন কারণ দেখি না। অষ্টাদশ শতকে মিশনারীরাও কি সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বুদ্ধিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করেন নাই? তাহাতেও বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষতির চেয়ে উপকারই হইয়াছে অধিক। আধুনিক মুসলিম সাহিত্যিক ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মিশনারী সাহিত্যিকদের মধ্যে সাহিত্যিক ও ধর্মীয় বুদ্ধিতে তফাৎ বিস্তর। মিশনারীরা সাহিত্য হিসাবে সাহিত্যের সেবা করেন নাই; কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানেরা আজ আপন সাহিত্য হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। ইহারা আপন সাহিত্য হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন বলিয়াই আজ হয়ত কতকটা তাঁহাদের স্বীয় আপনত্ব বা বৈশিষ্ট্য এই সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। ইহাকে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া চীৎকার করিলে চলিবে কেন? মুসলমান আপন বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়া বাঁচিতে পারে না। দুনিয়ার কোন জাতিই জাতি হিসাবে আপন বৈশিষ্ট্য ছাড়াইয়া বাঁচিতে পারে না– বাঁচেও নাই। সুতরাং মুসলমানের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? আর যাঁহারা মুসলমানদের সাহিত্যিক জাগরণকে বিভীষিকার দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, মেহেরবাণী করিয়া একটিবার বিচারের দৃষ্টিকোণ ফিরাইয়া লউন এবং উদার দৃষ্টিতে অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যকে দেখিতে থাকুন; দেখিতে পাইবেন, মুসলমানদের সাহিত্য–সাধনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়, উজ্জ্বল–বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবি ফল অমঙ্গলজনক নয়, মঙ্গল-প্রসূ। মুসলমানদের আধুনিক সাহিত্যিক জাগরণে বাঙ্গালা সাহিত্য–জগতের কোন কোন কেন্দ্রে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আমার এই আশ্বাসবাণীতেও যে বিদূরিত হইবে, তেমন

www.pathagar.com

বোধ হয় না। এই জন্যই বাঙ্গালী মুসলমানদের আধুনিক সাহিত্যিক জাগরণের বিশ্লেষণ ও তৎপ্রসঙ্গে প্রতিবেশী আতঙ্কিত জনগণের আশঙ্কার কারণ সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

মুসলমান আধুনিক সাহিত্যিক জাগরণের যে দিকটি সর্বাগ্রে প্রতিবেশীদের চোখে পড়িয়াছে, তাহা প্রধানতঃ ভাষা-সংশ্লিষ্ট। তাঁহারা বলিতেছেন, বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাঙ্গালা ভাষাকে দ্বি-খণ্ডিত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। এই অভিযোগ একেবারে অসার নহে। কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান লেখক (আমি ইচ্ছা করিয়াই সাহিত্যিক বলিলাম না) আজ যেন কোমর বাঁধিয়া কাজে-অকাজে বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত বা অপ-প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুলেখকদের অদ্ভুত সংস্কৃত শব্দের আমদানীর অত্যাচার বা সংস্কৃত ব্যাকরণের কচ্‌কচির জুলুমে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই প্রতিক্রিয়াশীলদের লেখায়ও বাঙ্গালা ভাষার সেই দুর্দশা উপস্থিত হয়। তবে আতঙ্কিত জনগণ নিজেদের দোষের প্রতি যেমন উদার, মুসলমানদের দোষের প্রতি তেমন অসহিষ্ণু। এই জন্যই তাঁহারা মনে করেন, বাঙ্গালা ভাষা দ্বি-খণ্ডিত হইতে উপক্রান্ত হইয়াছে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, প্রাকৃত ভাষাই বাঙ্গালা ভাষার জননী-সংস্কৃত নহে।

কারণে অকারণে বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃতের আমদানীতে যদি ভাষার প্রতি জুলুম করা না হয়, তবে আরবী বা ফারসীর আমদানীতে কেন তাহা ঘটে, তাহা সরল বুদ্ধিতে বুঝিতে পারা কঠিন।

এই প্রসঙ্গে মুসলিম সাহিত্য-সৃষ্টির কথা আসিয়া পড়ে। এখানেই প্রশ্ন উঠে, সাহিত্য ত সাহিত্যই, তাহার আবার জাতের বালাই কেন? আমি পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যে জাতি ধর্মের গণ্ডী আমি স্বীকার করি না, কিন্তু ইহার বৈচিত্র্য মানি। অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যকে যদি একটি পুষ্পরূপে কল্পনা করা যায় তবে বলিতে পারি, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য তার একটি দল বা পাপড়ী মাত্র। আর বাঙ্গালা সাহিত্যকে যদি বিশ্বের সার্বজনীন সাহিত্যের একটি দলরূপে কল্পনা করা হয়, তবে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য এই পুষ্পদলের অপরূপ বর্ণচ্ছটার একটি। আমার মনে হয় বঙ্গীয় মুস্‌লিম সাহিত্য আজ পর্যন্ত প্রকৃত সংজ্ঞা লাভ করে নাই বলিয়াই অপরের জন্য ইহার প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সাহিত্যের সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণার জন্যই গোলযোগের সৃষ্টি অস্বাভাবিক নহে। এতৎসম্বন্ধে আমার ধারণা একরূপ সুস্পষ্ট। আমার মতে বঙ্গীয় মুসলমান তাহার ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহার লইয়া যে সাহিত্যের সৃষ্টি করে অর্থাৎ বাঙ্গালা সাহিত্যের যে অংশে মুসলমানের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারের সুন্দর দিক ফুটিয়া উঠে, তাহাই "মুসলিম সাহিত্য"। এই সাহিত্য অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে পৃথক নহে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীতে, রূপে, রসে মুসলমান ব্যতীত অপরের সংস্কৃতিগত সাহিত্য হইতে অনেকখানি স্বতন্ত্র। মুসলমানের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারের বিশিষ্ট ভাবদ্যোতক শব্দ ও ভাবের স্পষ্ট ছাপ বহন করিলেও, ভাষায় এই সাহিত্য পূরাদস্তু বাঙ্গালী, প্রাণের স্ফুরণে এই সাহিত্য হইতে বাঙ্গালার ভিজা মাটির সম্মোহন গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে।

www.pathagar.com

কথায়, এই সাহিত্য ঈমানে ইসলামী, অঙ্গসৌষ্ঠব ও প্রাণের স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গীতে, বিশেষ করিয়া প্রেরণায়, গোটাটি হউক বা না হউক পনের আনি বাঙ্গালী।

আমি প্রধানতঃ এইরূপ মুসলিম সাহিত্যেরই পক্ষপাতী। কেন না মুসলিম সাহিত্য বলিতে আমার মনে যে-সাহিত্যের অপরূপ মূর্তি রূপায়িত হইয়া উঠে, তাহা এইরূপ। বঙ্গীয় মুসলমানদের এইরূপ সাহিত্যই আমার ধর্মবিশ্বাস সুদৃঢ় করে, আমার জাতিগত সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত আমাকে নিবিড়ভাবে পরিচিত করিয়া তোলে, বাঙ্গালী হিসাবে আমার প্রাণে অনন্ত প্রেরণা জাগায়; রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে আমাকে মাতাইয়া তুলিয়া আমার নিজের সহিত পরিচিত করিয়া দেয়। আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী মুসলমানের এইরূপ সাহিত্যই অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়া ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারে। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমার এই বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়। প্রাচীন বাঙ্গালার মুসলিম সাহিত্য সেই সময়ের অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যে যে বৈচিত্র্যের আমদানী করিয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ এইরূপ। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও যেটি আমার চোখে বড় করিয়া দেখা দিয়াছে, তাহা হইল প্রাচীন মুসলমান বাঙ্গালীয় কবিদের ইসলামী ভাব ও চিন্তাধারায় অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন। বিরাট প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য মুসলমানদের নিকট ইত্যাকার নানা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রচুর পরিমাণে ঋণী।

অধুনা বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য বলিতে এদেশের মুসলিম রচিত—তাহা যে প্রকৃতিরই হউক— বাঙ্গালা সাহিত্যই বুঝায়। কি কারণে জানি না, বঙ্গীয় মুসলমানদের দ্বারা রচিত আধুনিক প্রকৃতির ছাগতন্ত্রী সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন সাহিত্য আজকাল এদেশে মুসলিম সাহিত্য নামে পরিচিত হইতেছে। আমি কিন্তু এই নামীয় সাহিত্যের অধিকাংশকে মুসলিম সাহিত্য বলিতে নারাজ। কেননা, আমার মতে শুধু মুসলমান কর্তৃক রচিত হইলেই সে সাহিত্য "মুসলিম সাহিত্য" হয় না। যে-বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অভাব যে সাহিত্যে বর্তমান, তাহা মুসলমান কর্তৃক রচিত হইলেও মুসলিম সাহিত্য নয়। পক্ষান্তরে, যে সাহিত্যে তাহা পূর্ণমাত্রায় অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান, তাহা মুসলমান কর্তৃক রচিত না হইলেও মুসলিম সাহিত্য। আধুনিক মুসলমান লেখকদের মধ্যে পনের-আনি লেখকের লেখা ইসলামী বৈশিষ্ট্য-বর্জিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইসলামী সাহিত্যের এইরূপ দীনতা বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে শুভ বলিয়া মনে হইতেছে না। ইহাতে বিরাট বাঙ্গালা সাহিত্য চিন্তার বৈচিত্র্য ও ভাবের সমৃদ্ধির দিক হইতে ধীরে ধীরে বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে।

মুসলমানদের রচিত বাঙ্গালা সাহিত্য আজকাল ইসলামী বৈশিষ্ট্য হইতে এরূপ অধিকমাত্রায় বর্জিত হইয়া পড়িয়াছে কেন, তাহাও কি ভাবিবার বিষয় নয়? উত্তর-ভারতের উর্দু সাহিত্য এবং প্রাচীন বাঙ্গালার মুসলিম সাহিত্য সাধারণতঃ ইসলামী আদর্শ অনুসারী। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এই সাহিত্যের স্রষ্টাগণ ইসলামী সাহিত্য, সংস্কৃতি, আদর্শ ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধেও

www.pathagar.com

ইহাদের অধিকার বিশেষ শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য। আমার বিশ্বাস, ইসলামের সহিত প্রাচীন বাঙ্গালার মুসলিম লেখকদের প্রাণের গভীর যোগ ছিল বলিয়া এবং উত্তর-ভারতীয় মুসলমানদের সেই যোগ আজ পর্য্যন্ত নিবিড় বলিয়া, আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও উর্দু সাহিত্য সাহিত্যিক সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াও ইসলামী ভাব ও আদর্শে এতখানি অনুপ্রাণিত। আধুনিক বাঙ্গালার অধিকাংশ মুসলমান লেখকের সহিত ইসলাম ও ইসলামী সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারের নিবিড় যোগ আছে কি না তাহা বলা কঠিন। বোধ হয়, আধুনিক বাঙ্গালী মুসলিম লেখকগণ শিক্ষা-দীক্ষা ও মনে-প্রাণে ইসলামী ভাবাপন্ন নহেন বলিয়াই আজ বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহাদের এই জাতীয় অবদান হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে। অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যকে এই দীনতা হইতে রক্ষা করিতে হইলে, বাঙ্গালার মুসলমান লেখকদের সহিত ইসলামের সম্বন্ধকে সুনিবিড় করিয়া তুলিতে হইবে। তবে সম্প্রতি অমানিশার পর প্রভাত-আলোর বর্ণচ্ছটার ন্যায় বঙ্গীয় মুসলিম গগনে একটি শুভলক্ষণ দেখা দিয়াছে, ইহাই আশ্বাসের বিষয়। বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে এখন বহুপূর্বের সংস্কার আন্দোলন নূতনভাবে দেখা দিয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালার মুসলমানদের সহিত ইসলামের যোগ-নিবিড় হইবে বলিয়া মনে হয়। এই যোগ যতই ঘনিষ্ঠ হইবে, ততই বাঙ্গালা সাহিত্য ইসলামী ভাবাপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই প্রসঙ্গে হিন্দুদের প্রতি বঙ্গীয় মুসলমানদের একটি অভিযোগের কথাও মনে পড়ে। সম্প্রতি বাঙ্গালার মুসলমান সন্দেহ করিতেছেন, এদেশের হিন্দুগণ মুসলিম সংস্কৃতির সর্বনাশ সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে হিন্দু আদর্শ ও ভাবে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা শিক্ষার ভিতর দিয়া সেই আদর্শ ও ভাষাকে মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করিয়া মুসলমানদের সংস্কৃতিগত ভিত্তির সর্বনাশ সাধন করিতেছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে হিন্দু আদর্শ ও ভাবে পূর্ণ, সে কথা আমি মোটেই অস্বীকার করি না। হিন্দু "হরিনাম" না করিয়া "কালিমা" উচ্চারণ করিবেন, এমন চিন্তা করা শুধু অশোভন নহে, বরং একান্তই অস্বাভাবিক। আমরা যখন এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করি, তখন ভুলিয়া যাই যে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য যে সকল প্রতিভাবান হিন্দু দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে, তঁহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিগত ছাপ তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে থাকিবেই। কেননা তাঁহারা স্বীয় ধর্মীয় ও সংস্কৃতির গণ্ডী ছাড়াইয়া সাহিত্য রচনা করেন নাই— পৃথিবীর কোন সাহিত্যিক আজ পর্যন্ত তাহা করিতে পারেন নাই। আমার বিশ্বাস হিন্দুরা জোর করিয়া তাঁহাদের আদর্শ ও ভাবকে আমাদের স্কন্ধে যতটা চাপাইতেছেন না, আমরা তাঁহাদের প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের সৃষ্টির দ্বারা অজ্ঞাতসারে ততোধিক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের আদর্শ ও ভাবকে বরণ করিয়া লইতেছি।

আমাদের লেখকদের মধ্যে ধর্মীয় ও সংস্কৃতিগত আদর্শ একান্তই দুর্বল। প্রধানতঃ এই কারণেই আমাদের লেখকেরা অপর সংস্কৃতির জোরাল প্রকাশের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম হইতেছেন। সরল জাতীয় ও ধর্মীয় আদর্শ বুকে লইয়া প্রতিভার দ্যোতিতে ভাস্বর সাহিত্য সৃষ্টি করতে না পারিলে, মুসলমানদের এই অভিযোগ অরণ্য-রোদনে

www.pathagar.com

পর্যবসিত হইবে। আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, প্রতিভাবান হিন্দু-সাহিত্যিকগণই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রধানতঃ তাঁহাদের প্রতিভার আজ বাঙ্গালা সাহিত্য ভারতীয় ভাষার যে কোন সাহিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং বিশ্বের দরবারেও উহা স্থানলাভ করিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্য হিন্দু আদর্শ ও ভাবে পূর্ণ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? আমি ইসলামী আদর্শ ও ভাবপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টিতে যেমন আতঙ্কিত নহি, হিন্দু আদর্শ ও ভাববহুল সাহিত্যসৃষ্টিতেও তেমন শঙ্কিত নহি। আমরা চিন্তা, ভাব ও আদর্শে মুসলমান হইতে পারিলে হিন্দু সাহিত্য দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইবার কোন কারণ আমাদের নাই। হিন্দুগণ আমাদের ফরমায়েশ মত সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে নিয়মিতভাবে পরিবেশন করিয়া যাইবেন এইরূপ আশা করা প্রকৃতির বিপরীত ও বাতুলতা মাত্র। বাঙ্গালায় মুসলমান যতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার অবয়বে ইসলামী মস্তিষ্কপূর্ণ হইয়া সাহিত্য সৃষ্টি না করিবেন, এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহারা সেই সৃষ্টি সৃজন-মহিমায় মণ্ডিত হইয়া না উঠিবে, ততদিন সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে হিন্দুর বিরুদ্ধে অনৈসলামিকতার অভিযোগ আনিয়া কোন প্রতিকারের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে অভিযোগ যখন একবার উত্থাপিত হইয়াছে, তখন মনে করা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালী মুসলমান এখন স্বীয়-জাতীয় আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পূর্ব হইতে সজাগ হইয়া উঠিতেছেন। মুসলমানদের এই আত্মপ্রবুদ্ধ চৈতন্যকে অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে ভাবী মঙ্গলের পূর্বলক্ষণ বলিয়া মনে করি। ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন সম্পদে সম্পদশালী হইবে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আশা করি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি একজন এইরূপ আশাবাদী। সেই কারণেই বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের জাগরণে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমার মনে নিরাশার চেয়ে আশার আলোকই অধিক প্রতিফলিত হয়। এতৎসত্ত্বেও মুসলমানদের সম্বন্ধে আমার উদ্বেগ কম নহে। বড়ই আফসোসের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে ইসলামী আওতায় থাকিয়া ইসলামী আদর্শ লইয়া সাহিত্যসৃষ্টি করা চলে না বা সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। ইহাদের মতে ইসলামে উদারতা ও সহিষ্ণুতার গণ্ডী ক্ষুদ্র, বিশেষতঃ ইসলামী আবহাওয়া সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নহে। এইরূপ ধারণা ইসলাম সম্বন্ধে ধারণাপোষণকারীর অজ্ঞতার পরিচায়ক। ইহার মূলে কোন সত্য দেখিতে পাই না। ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষায় মণ্ডিত হইয়া ইসলামী আওতায় বাস করিয়া মুতনব্বী, হারীরী, আবু-আলাঅল মায়ারী, ইবন খলদূন, তরবী, সয়ুতী, আবুল ফারেজ, অল্ইদ্রিসী, আবু-রোশদ, ইমাম গাজ্জালী, অল-খারিজিমী, অল্বিন্দী, অল্ বিরূণী, ফিরদৌসী, রূমী, নেজামী, জামী ও সাদী প্রভৃতির ন্যায় কবি, লেখক, দার্শনিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, তাত্ত্বিক প্রভৃতি ব্যক্তি যদি ইসলামী সাহিত্যসৃষ্টি করিয়া বিশ্বকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া দিতে পারেন, তবে আমাদের বাঙ্গালী মুসলমান লেখকগণ কেন ইসলামী আওতায় ভীত, তাহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করা অতি সহজ। এখনও খ্রীষ্টানী বা হিন্দু আওতায় থাকিয়া খ্রীষ্টান বা হিন্দু আদর্শ লইয়া যদি বিশ্বের সেরা সাহিত্য সৃষ্ট হইতে পারে, তবে ইসলামী আওতা ও আদর্শ কি দোষ করিয়াছে বুঝা যায় না। এখনও কি ইকবাল ইসলামী আদর্শ-উদ্বুদ্ধ হইয়া

www.pathagar.com

ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া যান নাই? ফলকথা, ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করিতে ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত ও ইসলামী মস্তিষ্কযুক্ত প্রতিভাবন পুরুষের আবশ্যক। তাহা না হইলে এরূপ সাহিত্য সৃষ্টি হইতে পারে না।

ইতিমধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির কোন প্রচেষ্টা চলে নাই, তেমন নহে। এ প্রচেষ্টা কতখানি সবল বা দুর্বল, সে সমালোচনা করার সময় এখনও আসে নাই। মীর মোশররফ হোসেন "বিষাদসিন্ধু"র মধ্যে দিয়া বাঙ্গালার পানসীযোগে মুসলিম পরিবার বন্দরে আজও অফুরন্ত রসের বেসাতী বিলাইতেছেন। ইসলামী বিষয় লইয়া ইসলামী আওতায় থাকিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারা যায় কিনা, "নূরনবী" ও "শান্তিধারা"র মধ্য দিয়া এয়াকুব আলী চৌধুরী তাহার নজীর দেখাইয়াছেন। ফারসী পোষাকে ফারসী ভাব বুকে লইয়া বাঙ্গালার মুসলিম সাহিত্য কেমন সম্ভ্রান্ত ও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে, অসংখ্য বাঙ্গালা গজল ও বহু কবিতায় নজরুল ইসলাম তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। বাঙ্গালার বুক ইসলামের প্রাচীর সম্পদে কতখানি সম্পদশালী, বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অজ্ঞাত তথ্যের দ্বার গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় উদ্‌ঘাটন করিয়া ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক আমাদিগকে "বঙ্গে সুফী-প্রভাব," "বঙ্গে ইসলাম বিস্তার" ও "আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য" উপহার দিয়াছেন।

ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করেন, তাঁহাদের পক্ষে আরবী ও ফারসী ভাষার ইসলামী ভাবদ্যোতক বহু শব্দের ও নামের প্রয়োগ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে এইরূপ ইসলামী শব্দ ও নাম লিখিতে গেলে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত, তৎসম্বন্ধে একটি সার্বজনীনভাবে পালনীয় নির্দেশ থাকা আবশ্যক। আজ পর্যন্ত মুসলমান লেখকগণ কোন সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মে এই সমস্ত শব্দ ও নাম লিখিতেছেন না। অথচ ইসলামী সাহিত্যে ইহার আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী। যতদূর মনে পড়ে প্রায় একযুগ পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমানে একমাত্র মুসলমানদের দ্বারাই একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন সম্ভবপর হইতে পারে। তজ্জন্য এই বিষয়ে মুসলমান বিশেষজ্ঞদিগকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে চরম বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। আজ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইসলামী শব্দের যেরূপ অপলিখন প্রণালী অবলম্বিত হইতেছে, তাহা দেখিলে আমার ন্যায় আনাড়ীর মনেও ভারী দুঃখ হয়। এই অবস্থার আশু পরিবর্তন আবশ্যক। নতুবা মুসলমানদের বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাষা-ঘটিত দুর্দশা যে ধীরে ধীরে শুধু চরম সীমায় পৌছিবে তেমন নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচলিত ইসলামী শব্দাবলীর অভিধান রচনার কাজও চলিবে না।

www.pathagar.com

বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা

আবদুল গফুর সিদ্দিকী

লেখক-পরিচিতিঃ জন্ম ঃ ১৮৭২, চব্বিশ পরগনা, ভারত। **মৃত্যু ঃ** ৩ আশ্বিন, ১৩৬৬। **শিক্ষা ঃ** কলকাতা মাদ্রাসা, ডি. লিট। **পেশা ঃ** সাংবাদিকতা।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ইতিহাস ঃ বিষাদ সিন্ধুর ঐতিহাসিক পটভূমি, শহীদ তীতুমীর (১৯৬১)।

লেখা-পরিচিতি ঃ 'সওগাত', ১৩২৬ সালের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

অধুনা "বঙ্গ সাহিত্যের গতি এবং তাহার পরিণতি" শীর্ষক বহু প্রবন্ধ, সাহিত্য বিষয়ক সভাসমিতিতে পঠিত এবং মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠে তাহা প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনা করেন কিম্বা আলোচনায় অগ্রসর হয়েন, দুঃখের বিষয়, তাঁহারা কেবল সাহিত্যের একটা দিক্ই দেখিয়া থাকেন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহারা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া প্রবন্ধ রচনায় অগ্রসর হয়েন না। মাত্র দুই চারিখানি পুস্তক কিম্বা দুই একখানি মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠে প্রকাশিত দুই চারিটি প্রবন্ধ, তাঁহাদের কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে।

বিশেষত প্রবন্ধ লেখক মহোদয়েরা প্রবন্ধ রচনার পূর্বে অথবা প্রবন্ধ রচনার সময় বঙ্গ দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা ভাবিয়া দেখা বোধ হয় আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। এরূপ হওয়া যে নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়, চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবেন। এখন– বিংশ শতাব্দীর এই মিলনের যোগে, কেবল একতর্ফা ডিক্রি না দিয়া, দেশের কল্যাণার্থ ও দেশবাসীর কল্যাণার্থ হিন্দু মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ—সাহিত্য বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া যে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন, যদি কেহ তাহা অস্বীকার করেন তবে তিনি এক মহা ভ্রমে পতিত হইবেন সন্দেহ নাই।

মুসলমান সম্প্রদায় যে বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ অধিবাসী, সে কথা এখন আর নূতন করিয়া বলিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। তাহারা বর্তমান সময়ের উপযোগী শিক্ষায় বঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় অপেক্ষা পশ্চাৎপদ হইলেও, বহুদিন হইতে পৃথকভাবে তাহারাও সাহিত্য সাধনা দ্বারা আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছে। বঙ্গের মুসলমান সাহিত্যিকগণ এ পর্যন্ত যে সকল পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে—প্রায় সাড়ে নয় সহস্র।

"বঙ্গ সাহিত্যের গতি এবং তাহার পরিণতি" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, মুসলমান সাহিত্যিককে বাদ দিয়া হিন্দু সাহিত্যের কথা বলিলে চলিবে কেন? ইহাতে দেশের ও জাতির যে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন? হিন্দু সাহিত্যই কি কেবল বাঙ্গালীর সাহিত্য? হিন্দু কি কেবল বাঙ্গালী?

www.pathagar.com

এই শ্রেণীর প্রবন্ধ লেখক মহোদয়েরা কেবল যে মুসলমানদিগকে ও মুসলমানদিগের সাহিত্যকে বাদ দিয়া প্রবন্ধ রচনায় অগ্রসর হয়েন, তাহা নহে। তাঁহারা বঙ্গ সাহিত্যের আর একটা দিক্ সম্বন্ধেও চিন্তা করেন না। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে যাঁহারা পণ্ডিত-শিরোমণি বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে সকল সাহিত্যেরই দুইটি দিক্ আছে। সেই দুইটি দিকের একটি সাধারণ দিক্ আর একটি অসাধারণ দিক্।

বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলী সাহিত্যের এই সাধারণ দিক্কেই পল্লীসাহিত্য এবং অসাধারণ দিক্কেই 'সহরের' সাহিত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পাঠকবর্গ ইচ্ছা করিলে এই পল্লী সাহিত্যকে আট-পৌরী সাহিত্য এবং 'সহরের' সাহিত্যকে পোষাকী সাহিত্য আখ্যা প্রদান করিতে পারেন।

আমাদের এ কথা বলা বোধ হয় অন্যায় ও অসঙ্গত হইবে না যে, সাহিত্যের 'পোষাক দিক' হইতেছে, 'সহরের' খোষ-মেজাজী বাবু মিঞাদিগের কীর্ত্তি এবং আট-পৌরী হইতেছে, পল্লী-গ্রামের 'অন্নাভাবে' শীর্ণ ও চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ ব্যক্তিদিগের প্রাণের উচ্ছ্বাস।

যতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের সাহিত্যিক বন্ধুগণ মুসলমান সাহিত্য ও পল্লী-সাহিত্যের বিষয় অবগত হইতে না পারিবেন, আমাদের মনে হয় ততদিন "বঙ্গসাহিত্যের গতি এবং তাহার পরিণতি" শীর্ষক প্রবন্ধ রচনার সময় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে না। যতদিন সহরের সাহিত্যের অনুপাতে পল্লী-সাহিত্য সংগৃহীত না হইবে, ততদিন তুলনায় সমালোচনা করিবার সুযোগ ও সুবিধা হইবে না, এবং যতদিন তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখাইবার মত যথেষ্ট উপকরণ আমাদের হস্তগত না হইবে, ততদিন এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন হইবে না।

যে পল্লীবাসী দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ, অধুনা 'সহরের' খোষ-মেজাজী বাবু মিঞা আমরা তাহাদিগের সেই প্রাণ মাতান ও আবেগভরা সাহিত্যকে বাদ দিয়া "বঙ্গসাহিত্যের গতি এবং তাহার পরিণতি" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া, বাহাদুরী দেখাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু এ কার্য্য যে আমাদের পক্ষে নিতান্তই গর্হিত, কোনক্রমেই কেহ তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না।

তিন বৎসর পূর্বে, ১৩২৩ বাঙ্গালা সালের মাঘ মাসে, বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিক্ড়া গ্রামে সাহিত্যিকদের যে সম্মেলন হইয়াছিল সেই সভায় আমি আমার অভিভাষণে বলিয়াছিলাম—

"যতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের সাহিত্যিকদিগের অন্তরে পল্লীসাহিত্য সংগ্রহের ও মুসলমানী সাহিত্য আলোচনার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া না উঠিবে, ততদিন বঙ্গের-তথা বাঙ্গালী জাতির জাতীয় উন্নতির পথ সুপ্রশস্ত হইবে না।

"সাহিত্য ক্ষেত্রে ও সাহিত্যিক মহলে আর 'সখে' দল গড়িলে চলিবে না। এখানে কথা ও কার্য্য এক করিতে হইবে। 'মাতৃসেবক' ও মাতৃমন্দিরের সেবক বলিয়া দেশের ও দশের নিকট পরিচিত হইবে, অথচ সেবকের যাহা কর্তব্য-সেবকের যাহা করণীয়, তাহা

www.pathagar.com

করিবে না; এই ভাবের মাতৃসেবকের এখন আর আদৌ আবশ্যক নাই। কখন খাঁটী সোনার আবশ্যক। নীহারী সোনা দ্বারা গিনী সোনার অলংকার প্রস্তুত কার্য্য এখনও চলে নাই; এখনও চলিবে না।

"যদি মাতৃ-ভাষাকে, বিশ্ব-বাসীর সম্মুখে বড় করিয়া, নিজে বড় হইয়া, জাতির গৌরবশ্লাঘা বাড়াইতে চাও, তাহা হইলে সরল মনে ও সরল প্রাণে খাঁটী সেবকরূপে ভাষা–জননীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা যদি পার নিজে ধন্য হইবে এবং দেশ ধন্য হইবে।

" কিন্তু খাঁটি সেবক হইতে হইলে কেবল 'সহরের' 'পোষাকী সাহিত্য' লইয়া নাড়া-চাড়া করিলে চলিবে না। মুসলমানী সাহিত্য ও পল্লীর আট–পৌরী সাহিত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে। এ কার্য্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, ভাষা জননীর দক্ষিণ দিক্ পঙ্গু ও অচল হইয়া যাইবে।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে মুসলমানী-বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ সংগ্রহ, মুসলমানী সংবাদ-পত্রের ইতিহাস সংগ্রহ ও বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের আওলিয়া দরবেশদিগের জীবনকাহিনী সংগ্রহ কার্য্যে আমাকে অনেক সময় ব্যয় করিতে হইতেছে। কিন্তু তথাপি আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সাধ্য এই কার্য্যে সময় ব্যয় করিতে কৃত সংকল্প হইয়া, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, যশোহর ও খুলনা এই চারি জেলার 'পল্লী সাহিত্য' সংগ্রহে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। যদিও আমি এই কার্য্যে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই কিন্তু আমার আশা হইতেছে যে বিভু কৃপায় শীঘ্রই আমি এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে প্রবন্ধ লিখিতে সমর্থ হইব।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আপনারা সন্ধান করিলে শত শত লোকের– শত শত পল্লী সাহিত্যিকের সন্ধান পাইবেন। যদি আপনারা ভাষা ও সাহিত্যের কীর্ত্তিমান সন্তানরূপে জগৎবাসীর নিকট পরিচিত হইতে চাহেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে বঙ্গের প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া, ভূতপূর্ব ছোট, বড়, মাঝারী সকল কবি ও সকল সাহিত্যিকের লুপ্ত স্মৃতির উদ্ধার করিতে হইবে এবং এ কার্য্যে ক্লান্ত হইলে চলিবে না, ভাল মন্দের বিচার করিলেও চলিবে না। কারণ বিচারের সময় এখনও আসে নাই; সে সময় বহু দূরে ও বহু পশ্চাতে অবস্থান করিতেছে।

www.pathagar.com

বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী মুসলমান

এস. ওয়াজেদ আলী

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্মঃ ১৮৯০, বড়জাতপুর, শ্রীরামপুর মহকুমা, হুগলী, ভারত। মৃত্যুঃ ১৯৫১। শিক্ষা ঃ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. ও ব্যারিস্টারী। পেশা ঃ কলকাতার তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদে বহুদিন কাজ করেন।

প্রকাশিত-গ্রন্থ ঃ প্রবন্ধ ঃ ভবিষ্যতের বাঙালী, জীবনের শিল্প। আলোচনা ঃ আমাদের সাহিত্যঃ একবালের পয়গাম। ভ্রমণ ঃ মোটরযোগে রাঁচি সফর। ইতিহাস ঃ আকবরের রাষ্ট্র সাধনা, ইসলামের ইতিহাস। ঐতিহাসিক উপন্যাস ঃ গ্রানাডার শেষবার। গল্পঃ গল্পের মজলিস, ভাষা বাঁশী, দরবেশের দোয়া, গুলদাস্তা, মাশুকের দরবার।

লেখা-পরিচিতি ঃ 'বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী মুসলমান প্রথম প্রকাশ'ঃ 'সওগাত ঃ' বার্ষিক 'সওগাত' ১৩৩৪।

বাঙ্গালা ভাষার চর্চা আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য। তবে মাতৃভাষা আমাদের হাতে কি রূপ পরিগ্রহণ করবে তা নিয়ে মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়।

এ সমস্যার সমাধান "আমরা বাঙ্গালী মুসলমান" এই কথাটুকুর মধ্যেই রয়েছে। কোটি কোটি মানুষের স্বাভাবিক ভাষা যদি একটা সাহিত্যের বাহন না হয়, তা হলে কোন ভাষা যে সে গৌরবের অধিকারী তা বলতে পারি না।

ভাষার আকার প্রকার এবং জাতি বিচার নিয়ে হিন্দু এবং মোসলেম সাহিত্যিকের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় শ্রেণীর সাহিত্যিকেরাই অসংখ্য আরবী, ফার্সী এবং উর্দ্দু শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করতেন পরিপূর্ণ মনের ভাব অভিব্যক্ত করার জন্য।

সাহিত্যের ভাষা কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় একেবারে বদলে দিয়েছেন। তিনি আরবী, ফার্সী এবং উর্দ্দু শব্দসমূহকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে, তাদের জায়গায় সংস্কৃতমূলক শব্দের আমদানী করেছেন। ফলে পণ্ডিতি বাঙ্গালা তথা বর্তমান বাঙ্গালা হিন্দু-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যাসাগরের মত স্বজাতি প্রেমিক কোন মনীষী যদি আমাদের সমাজে থাকতেন, তা হলে তাঁর প্রচেষ্টায় আমাদের সেই প্রাচীন সাহিত্যেও নতুন রূপ পরিগ্রহণ করতো এবং যথাসময়ে বর্তমান কালোপযোগী ভাব এবং চিন্তার উপযোগী বাহন হয়ে দাঁড়াত। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উর্দ্দু এবং ফার্সীর মোহেই তখন মেতে রইলেন, মাতৃভাষার দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করলেন না। আমাদের জাতীয় সাহিত্য তাই নতুন যুগের উপযোগী হয়ে উঠতে পারলো না, লাঞ্ছিত, অনাদৃত হয়ে সে পল্লীর কুটিরেই পড়ে রইলো। পক্ষান্তরে হিন্দুদের জাতীয় সাহিত্য তাদের অক্লান্ত সেবায় সমৃদ্ধ এক সাহিত্যে পরিণত হল। তারপর দুই-একজন করে মুসলমানেরা যখন বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে

www.pathagar.com

নামতে আরম্ভ করলেন, তখন হিন্দুর ব্যবহৃত বাঙ্গালা ভাষা সমস্ত শিক্ষায়তনগুলিকে দখল করে বসেছে, দেশের সাহিত্যকে দখল করে বসেছে, সংবাদপত্র প্রভৃতিকে দখল করে বসেছে। জাতীয় ভাষা ব্যবহার করার মত সাহস, শক্তি এবং প্রতিভা আমাদের তখনকার সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিল না। হিন্দুর ব্যবহৃত ভাষাকেই তাঁরা রুচিসম্মত এবং ভদ্রতাসম্মত বলে মনে করলেন। মীর মশাররফ হোসেন, মুন্সী রেয়াজুদ্দীন, শেখ আবদুর রহিম প্রভৃতি হচ্ছেন সেই যুগের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সাহিত্যিক।

তারপর এসেছে আমাদের এই বর্তমান যুগ। বিদ্যাসাগরী গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে এবং মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখ সাহিত্যিকদের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তার বিরুদ্ধে এক স্বাভাবিক বিদ্রোহ বা Natural reaction দেখা দিয়েছে। সম্প্রতিকালে 'সওগাত'-এ প্রকাশিত "বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানী শব্দ", "মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য" প্রভৃতি প্রবন্ধই তাঁর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা আস্তে আস্তে এখন বুঝতে পারছি, আমাদের স্বাভাবিক জাতীয় ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করা লজ্জার বিষয় নয়, উপরন্তু সেই ভাষাতেই আমাদের প্রকৃত সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

আমাদের স্বাভাবিক ভাষা কি? ভাঙ্গালী মুসলমানের বাঙ্গালা যে বাঙ্গালী হিন্দুর বাঙ্গালা থেকে অনেকাংশে ভিন্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। আর এই প্রভেদ অহেতুক নয়। এর যথেষ্ট ঐতিহাসিক এবং কালচারগত কারণ বর্তমান আছে। সেই সব কারণের দরুন এক সময় পুঁথির ভাষা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অবশ্য এখন আমাদের ভাষাকে অনেকটা সহজবোধ্য করতে হবে। আমির হামজার দাস্তানের ভাষা আমাদের সাহিত্যে আর চলবে না। আমরা আমাদের স্বাভাবিক ভাষার অনুকরণ করে সরলতার পথে অগ্রসর হব। পরে হয়তো হিন্দু ও মুসলমানের দুই উপভাষায় মিলে ব্যাপকতার এক ভাষার সৃষ্টি করবে। তবে সে পরিণতি নির্ভর করবে আমাদের হিন্দু বন্ধুদের উপর, কেননা তাঁদের উপভাষা গ্রহণে এক্ষণে আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অগ্রসর হয়েছি। তাঁরা এখন এগিয়ে অর্ধ পথে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। সাহিত্যে কাজ হচ্ছে ব্যক্তির, জাতির, বিশ্বমানবের সুখ-দু:খ, আশা–আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-সমবেদনা প্রভৃতি অনুভূতিকে, মানুষের অন্তরের অন্তরতম সত্যকে, সুন্দর সরল মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করা। তবে প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির এবং প্রত্যেক যুগের সাহিত্যের দেশগত, জাতিগত, যুগগত, বৈশিষ্ট্য বর্তমান আছে। প্রত্যেক জাতির মধ্যে এবং প্রত্যেক সমাজের মধ্যে এইসব বিশেষত্ব আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। বিশ্বমানবতার সবচেয়ে বড় সমর্থক হচ্ছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বমানবতার বিষয় নিয়ে যত লিখেছেন, আর কেউ বোধ হয় তত লেখেন নি। তাঁরই লেখা পড়ে এবং বক্তৃতা শুনে একদল দেশপ্রেমিক আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছেন, আর তাঁরা ইসলামিক সভ্যতাকে বাঙ্গালাদেশ থেকে তাড়াবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন এবং হিন্দু ও মোসলেম সভ্যতার সমন্বয় করে নতুন একটা কিছু গড়বার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

www.pathagar.com

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা এ সব করছেন, তিনি অশেষ কষ্ট করে ভারতবর্ষ থেকে বড় বড় পণ্ডিত সঙ্গে নিয়ে ক্ষুদ্র বালী দ্বীপে যাচ্ছেন হিন্দু কালচারের পুনরুত্থানের জন্য; নটরাজের পালা লিখছেন, বাঙ্গালী ছেলেদের হিন্দু পৌত্তলিকতার আধ্যাত্মিকতা শেখাবার জন্য বেদমন্ত্র পাঠে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হচ্ছে প্রাচীন হিন্দু আদর্শকে জাগিয়ে রাখবার জন্য। যে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লিখলে দশবার তাতে উপনিষদের উল্লেখ করতে ছাড়েন না, তাঁরই নির্দেশিত পথের অনুসরণ করে আমাদের সমাজের কতিপয় সাহিত্যিক ইসলামিক কাল্‌চারের শত্রুতা সাধনে আত্মনিয়োগ করেছেন। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস!

এই সেইদিন মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, আত্মনিয়ন্ত্রণশীল ভারতে, মিশনারীদের তিনি খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করতে দেবেন না। কারণ, তাঁদের নিজস্ব ধর্মবাদই ভারতবাসীর পক্ষে যথেষ্ট। হিন্দুরা তাঁদের জাতীয় কাল্‌চারের প্রয়োজন কতটা অনুভব করেন, রবীন্দ্রনাথের এবং মহাত্মা গান্ধীর সাধনা এবং উক্তি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। হিন্দু সভ্যতা এবং স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন। সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য আজ সমস্ত হিন্দু সমাজ উঠে পড়ে লেগেছেন। হিন্দু যে ভবিষ্যৎ ভারতীয় কাল্‌চারের স্বপ্ন দেখেন, তা লুপ্ত হিন্দু সভ্যতার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাড়া আর কিছু নহে।

জাতীয় জীবনের সঙ্গে জাতির কালচারের ঠিক সেই রকম সম্বন্ধ–যেমন শরীরের সঙ্গে প্রাণের। যতদিন জাতীয় কাল্‌চার বর্তমান আছে, ততদিন জাতির মৃত্যু নেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সেই জাতীয় কাল্‌চারের সাহায্যেই জাতি সমস্ত বিপদ-আপদ অতিক্রম করে সিদ্ধির, মুক্তির উদার আকাশতলে এসে দাঁড়ায়।

বিপদের ঘনঘটায় জীবন আমাদের আচ্ছন্ন। আমাদের ভবিষ্যৎ যে বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী বিপদ-সঙ্কুল হবে, স্পষ্টই তা বোঝা যায়। সেই দুর্দিনে স্বতন্ত্র নির্বাচন আমাদের বাঁচাবে না, আর মিশ্র নির্বাচনও আমাদের বাঁচাবে না। আমাদের কাল্‌চারকে যদি আঁকড়ে ধরে থাকি, সেই কাল্‌চারের যদি উপযুক্ত সম্মান এবং সমাদর করি, তা হলেই সেই কালচারই আমাদের তখন একমাত্র রক্ষাকবচ হবে, আর সেই কাল্‌চারের সাহায্যেই আমাদের সমাজ-তরনী বিপদের উত্তাল তরঙ্গ-মালা অতিক্রম করে সালামতের বন্দরে পৌঁছতে পারে।

আমাদের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলে তিনটি সত্য একান্ত স্পষ্ট হয়ে আমাদের চোখের সামনে ধরা দেয়, যথা: ১. আমরা ধর্মে, কাল্‌চারে এবং রক্তে মুসলামন ২. রাষ্ট্রে এবং ভৌগোলিক বিভাগ হিসাবে আমরা ভারতবাসী, ৩. মাটি, ভাষা, স্বাভাবিক সহানুভূতি হিসাবে আমরা বাঙ্গালী। এই তিনটি বড় সত্য আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এর কোনটিকে অবহেলা করে কিছু সমাধান করলে তা আমাদের সমস্যার নিষ্পত্তি করবে না, আমাদের প্রাণে প্রেরণার সঞ্চার করবে না। আমাদের মুসলমান হিসেবেই সমস্যাকে দেখতে হবে, কেননা ভারতবর্ষে আমরা হচ্ছি বিশিষ্ট এক কাল্‌চার ইউনিট।

www.pathagar.com

তবে, সমস্যাকে যেমন মুসলমান হিসাবে দেখতে হবে, তেমনি ভারতবাসী হিসেবেও দেখতে হবে। মুসলমান ভারতবাসীর পক্ষে যা অনিষ্টকর, ভারতবর্ষের পক্ষেও তা অনিষ্টকর। ভারতীয় মুসলমান সমাজের স্বার্থ হচ্ছে ভারতবর্ষের স্বার্থ, আর যা ভারতীয় মুসলমানের স্বার্থের বিরোধী তা ভারতবর্ষের স্বার্থেরও বিরোধী।

আমাদের সাহিত্য, আমাদের মানবতা, আধুনিক পরিভাষায় বিশ্বমানবতা প্রকাশ পাবে। সে সাহিত্যে প্রকাশ পাবে মোসলেম কাল্‌চারের অনুসারী আমরা, সে সাহিত্যে প্রকাশ পাবে বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা, আর বাঙ্গলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। আমাদের সাহিত্যিকদের লেখা থেকে এই তিনটি সত্য সুপ্রকট হয়ে উঠুক।

সাহিত্যে দাস মনোবৃত্তি ও পরাজিতের মানসিকতা দূর করে যথেষ্ট সাহসের এবং নতুন আত্মসম্মানপূর্ণ মানসিকতার পরিচয় আমাদের দিতে হবে। যে দিন বঙ্গভাষাভাষী মুসলমানের লেখায় এই রকম আত্মসম্মানের পরিচয় পাবো, সেদিন সত্যই আমাদের মনে আনন্দের হিল্লোল উঠবে।

আমাদের বর্ত্তমান মানসিক এবং নৈতিক দুর্দশার জন্য প্রধানত: দায়ী হচ্ছে আমাদের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী। হিন্দু ছাত্র হিন্দুর উপযোগী শিক্ষা পায়, খৃষ্টান ছাত্র খৃষ্টান উপযোগী শিক্ষা পায়, আর মুসলমান ছাত্র খৃষ্টান এবং হিন্দুর উপযোগী শিক্ষা পেয়ে থাকে; মুসলমানের উপযোগী শিক্ষা পায় না। আমাদের ছেলেরা মুসলমানের উপযোগী শিক্ষা যাতে লাভ করতে পারে এবং তা নিয়ে তারা যাতে গৌরব অনুভব করতে শিখে তার আয়োজন করতে হবে। আর বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি যত শীঘ্র সম্ভব করতে হবে। এই দুইটি কাজ যদি আমরা সুচারুভাবে করতে পারি, তা হলে জাতীয় আদর্শকে তার উপযুক্ত আসনে পুন:প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো।

আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আমাদের সমাজের তরুণ এবং তরুণীদের উপর। আর কারো উপর নয়। তাঁরা যদি জাতীয় সাহিত্য রচনায় তাঁদের কর্তব্য পালন করেন, তাঁরা যদি সমাজকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসেন, তা হলে তাঁদের আন্তরিক সেবায় সব দু:খ, সব দৈন্য আমাদের কেটে যাবে, আশার এবং আনন্দের গানে জীবন আবার আমাদের মুখরিত হবে।

www.pathagar.com

সাহিত্যের রূপ

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

লেখক-পরিচিতি ঃ 'বাংলা ভাষায় মুসলিম অবদান' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

লেখা-পরিচিতি ঃ 'সাহিত্যের রূপ' (১) , 'সাহিত্যের রূপ' (২), এবং 'সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা' এই অংশকয়টির একত্রিত শিরোনাম 'সাহিত্যের রূপ'। 'সাহিত্যের রূপ' (১) মুসলিম সমাজের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সভাপতিরূপে ঢাকায় ১৩৩৫ সালে পঠিত অভিভাষণ থেকে উদ্ধৃত। 'সাহিত্যের রূপ' (২) ১৩৩৬ সালে নেত্রকোনা মুসলিম সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত। গ্রন্থঋণ ঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৫।

সাহিত্যের রূপ(১)

আজ দেশের মধ্যে মুক্তির ডাক এসেছে। কিন্তু সে ডাক অতি ক্ষীণ। দূরের বাঁশীর সুরের মত কখনও সে কানে এসে লাগে, কি না লাগে। অলস ভীরু কাপুরুষ আমরা, তার উপর তন্দ্রাঘোরে ভোর। চাই আমাদের জন্য তুরি ভেরীর তীক্‌খিন বিকট নিখাদ নাদ। তা না হ'লে জীবনের রাঙা পাতাকার নীচে দলে দলে মুক্তি ফৌজ এসে জম্‌বে না; তা না হ'লে মুক্তির লড়াই আমাদের চল্‌বে না, তা না হ'লে মুক্তি আমাদের মিল্‌বে না।

তাই চাই আমাদের বীর্য্যবন্ত সাহিত্য। মাত্র একখানি পুস্তক আরবের বহু যুগের কাল ঘুম ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত দুনিয়া তোলপাড় ক'রে এক নূতন প্রাণ গড়ে তুলেছে। মাত্র একটী গীত প্রাচীন ফরাসীর শিরায় শিরায় আগুনের শিখা জ্বালিয়ে যত পুরানকে ছাই ক'রে এক নূতন ভাবজগতে জাগিয়ে দিয়েছে। কলাম ও ক্বলমের বাণী ও লেখনীর এমনই অপূর্ব্ব ক্ষমতা! তাই কুরআন তার দৈবী ভাষায় ঘোষণা কর্‌ছে-" নূন্ ওয়া-ল্ ক্বলম, ওয়া মা য়স্‌তুরূন" (লক্ষ্য কর) দোয়াত, কলম এবং যা তারা লেখে" (সূরা ক্বলম)

সাহিত্য যদি সত্যিকার সাহিত্য হয় সে মুক্তি দিবেই— দেহের মুক্তি, মনের মুক্তি, আত্মার মুক্তি। এই তিনটী নিয়েই মানুষ। একটী ছেড়ে অন্যের মুক্তিতে মুক্তি নেই। সাহিত্যের সকল উদ্দেশ্যই ঘুরে ফিরে এসে দাঁড়ায় এখানে। এই মুক্তিকেই মাঝের বিন্দু ক'রে সাহিত্য চারিদিকে ঘুরবে। আলঙ্কারিক মম্মট ভট্ট কাব্যের ফল সম্বন্ধে বল্‌ছেন—

কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্য : পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিতয়োপদেশযুজে ॥

"কাব্য যশের জন্য, টাকা কড়ির জন্য, আচার ব্যবহার জান্‌বার জন্য, অমঙ্গল দূর কর্‌বার জন্য, সদ্য সদ্য পরম শান্তি লাভের জন্য, প্রেয়সীর ন্যায় উপদেশ দিবার জন্য।" সে সাহিত্য বিফল, ষোলআনাই বিফল, যা মুক্তির সন্ধান দেয় না।

আজ সাহিত্যের মার্কা নিয়ে একটা জিনিস বাজারে চল্‌ছে। শুনি তার কাট্‌তিও কম

www.pathagar.com

নয়, বিশেষ ক'রে যুবক মহলে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তরুণ তরুণীদের একটা অপূর্ণ দুর্দান্ত ইচ্ছাকে রক্তমাংসময় কল্পনা নিয়ে পূর্ণ করা। রহ্‌মানে ও শয়তানে যে তফাৎ, আঙুরে ও শরাবে যে তফাৎ, প্রেমে ও কামে যে তফাৎ, মুক্তি ও বন্ধনে যে তফাৎ, আসল সাহিত্য ও এই নকল সাহিত্যে সেই তফাৎ। হায়! অবোধ পাঠক জানে না সাইরেনের বাঁশরীর সুরের ন্যায় এই অসাহিত্য তাকে ধ্বংসের দিকে পলে পলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জাতির সমস্ত যৌব-শক্তি এই সাহিত্য জোঁকের মত নিঃসাড়ে চুষে নিচ্ছে।

সাহিত্যের হাটে যে কেবল এই কামাগ্নিসন্দীপনী বটিকাই বিক্রি হ'চ্ছে তা নয়। এর চেয়েও ভয়ানক ভয়ানক জিনিস-একেবারে সাক্ষাৎ বিষ-নানা মনোহর নামে ও রূপে কাট্‌তি হচ্ছে। পরখ ক'র্‌লেই অনায়াসেই দেখা যাবে সেগুলির ভিতর আছে কুসংস্কার, ধর্ম্মান্ধতা, জাতীয় বিদ্বেষ প্রভৃতি। এ সমস্ত জাতির আত্মা ও মনকে বিষাক্ত ক'রে দেশে কি অশান্তিই না ঘটাচ্ছে।

আমি অরসিক নই; আর্ট বুঝি। কিন্তু আর্টের নামে কি গণিকার উলঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গীকেও প্রশ্রয় দিতে হ'বে? তারীফ কর্‌তে হবে? আমি সাহিত্যের স্বাধীনতা বুঝি। কিন্তু তাই ব'লে কি সাহিত্যের পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রে অমৃতের নামে বিষ কিংবা রসের নামে প্রস্রাব বিক্রিরও লাইসেন্স দিতে হবে? আমাদের এক জিহাদ ঘোষণা করতে হবে এই অপসাহিত্যের বিরুদ্ধে। আজ সমস্ত বঙ্গ অনিমেষে চেয়ে আছে তার খিযরের জন্য যে তাকে পরাণ ভ'রে এই সত্যিকার সাহিত্যের "আবে-হয়াতের" পরিচয় ক'রে দেবে।

বাহন উপযুক্ত না হ'লে কেউ তার অভীষ্ট স্থানে পৌঁছুতে পারে না। লক্ষ্য লাভ কর্‌তে গেলে সাহিত্যের বাহন উপযুক্ত হওয়া চাই। সেই বাহন মাতৃভাষা। ডন কুইক্‌সোট একটা রোগা ঘোড়ায় চ'ড়ে বাহাদুরি জাহির কর্‌তে বেরিয়েছিলেন। তার চেয়ে বাহাদুরী বলতে হবে তাঁদের যাঁরা বিদেশী ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গড়তে চান।

এই প্রসঙ্গে উর্দ্দুর কথা উঠতে পারে। মানি উর্দ্দু শেখা দরকার। কিন্তু তার চেয়ে বেশী দরকার আরবী শেখা। যদি উর্দ্দুর সাহায্যে আব্রহ্ম ভারতে আমরা পরস্পরকে জান্‌তে পারি, আরবীর সাহায্যে ফিলিপাইন থেকে মরক্কো, সাইবেরিয়া থেকে যাভা পর্যন্ত সমস্তকে চিন্‌তে পারি। কিন্তু আরবী বা উর্দ্দু শেখা এক কথা, আর তাকে সাহিত্যের বাহন করা আর এক কথা। বলা হয় বাংলায় মুস্‌লিম সাহিত্য নেই। কিন্তু গোড়ায় উর্দ্দুতেই কি ছিল? পারসীর কথা ধরা যা'ক। তা'তে এক বিরাট মুস্‌লিম সাহিত্য আছে। অল্প বিস্তর তুর্কীতে আছে, সিন্ধীতে আছে, মালয় ভাষায় আছে। শুরুতে এদের কোনটাইত মুস্‌লিম সাহিত্যের ভাষা ছিল না। তবে বাংলার বেলা কেনই বা দোষ হবে? একটা মস্ত কথা আমরা ভুলে যাই যে আজ নূতন ক'রে নয় বরং প্রায় চা'রশ বছর ধ'রে মুস্‌লমান এই বাংলা সাহিত্যের সেবা কচ্ছে। শুধু তাই নয়। আমরা আরও জানি না যে মুসলমান আমীর ওমরার নেক নজরেই বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। সেই য়ুসুফ শাহ, হোসেন শাহ, নসরৎ শাহ, পরাগল খান, ছুটি খানের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকবে। কাযী দৌলত আরাকান-রাজ থিরি থুধম্মা রাজার সময়ে (১৬২২-১৬৩৮

www.pathagar.com

খৃ: অব্দে) "সতী ময়নামতী ও লোর চন্দ্রাণী" রচনা করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ক'র্‌বার পূর্ব্বেই মারা যান। তা পূরা করেন সৈয়দ আলাওল। সৈয়দ আলাওল মধ্যযুগের বাঙালী মুস্‌লিম সাহিত্যিকদের মাথার তাজ। তিনি আরবী, পারসী, উর্দ্দু, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রথম রচনা "পদ্মাবতী" আরাকান-রাজ থদো মিন্তার রাজার রাজত্ব সময়ে (১৬৪৫-১৬৫২ খৃ: অব্দে) খুব সেকেলে ব'লেই এদের নাম কর্‌লাম। এদের ছাড়াও অসংখ্য কবি, গায়ক ও লেখক বরাবরই বাংলা ভাষায়ই তাঁদের রচনা প্রকাশ ক'রে ধন্য হ'য়েছেন। শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের ও বন্ধুবর মৌলভী আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদের প্রসাদে তাঁদের অনেকের খবর আমরা পেয়েছি। আজ আমরা কেমন ক'রে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করতে পারি? তিন শতাব্দীর পূর্ব্বের কবি কাযী দৌলতের বাংলার নমুনা দেখুন!

"বিছ্‌মিল্লা প্রধানেক নাম নিরঞ্জন।
যে নাম স্মরণে কার্য্য সিদ্ধি সর্বক্ষণ ॥
কি করিব যমদূতে বিপক্ষ বিবাদ।
সর্ব্বসিদ্ধি জয় জয় সে নাম প্রসাদ ॥
রহমান নাম অর্থ করুণা সদায়।
যে নাম স্মরণে দুঃখ দারিদ্র্যখণ্ডায় ॥
সুজন দুর্জ্জন আদি যত জীব জান।
ভক্ষকের কুশলে করান্ত ভক্ষ দান ॥
রহিম নামের অর্থ কি কহিমু আর।
দীন দয়াময় প্রভু মহিমা অপার ॥
দয়ার সাগর প্রভু পতিত পাবন।
দুঃখী পাপী নৃপতির সহায় কারণ ॥
লীলায় পাপের মূল করয় বিনাশ।
তুলা রাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ ॥* "

এক শ্রেণীর কাছে বাংলা ভাষা বল্‌তে বোঝায় অনুস্বর বিসর্গ ছাড়া সংস্কৃত। বাংলার সৌভাগ্য সে শ্রেণী এখন এক রকম লোপ পেয়েছে। তেমনি অন্য দিকে আর এক শ্রেণী আছে তাদের কাছে বাংলা মানে আরবী-ফারসী-উর্দ্দু-বাংলায় এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী। দুই রকমের দুটো উদাহরণ দিচ্ছি।

১ নম্বর

চমকি বিশ্ব নব বীর্য্য-সূর্য্য-নৃপ রজনী-রাজ্য অবসন্নে,
উদিত উদয়-গিরি-কনক-মরু'পরি গঞ্জি মঞ্জুমণিবর্ণে।
দীপ্ত রশ্মিচয় সৈন্য নিচয়সম (বিষম যুগাগ্নি বিনিন্দে)
ভঙ্গিল হতকর-পতিত-রজনিকর-যোদ্ধৃ নিকর উড়ু বৃন্দে।

---

* বটতলা সংস্করণের বানান ভুল মাত্র শুধরে দেওয়া হয়েছে। —লেখক

www.pathagar.com

২ নম্বর

জাহান আলম বাদশা তক্তের উপরে।
সুখেতে বাদশাই ক'রে খোসাল অন্তরে ॥
সাত মুল্লুকের বাদশা জাহান আলম।
কেত্তো সরঞ্জাম তার আল্লাকে মালুম ॥

এই দু দলের হাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা কর্‌তে হবে। তবেই বাংলার প্রাণ বাঁচবে। তা না হ'লে বাংলা ম'রে ভূত হ'য়ে যাবে— একটা নয় দুটো। একটা বৃদ্ধ দৈত্যি, আর একটা মাম্‌দো। আমরা জীবন্ত বাংলাকেই চাই, তার ভূতকে নয়।

প্যারীচাঁদ, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষার অনেকটা সংস্কার হয়েছে। এখন কিছু বাকী ভাষার দিক্ দিয়ে। কিন্তু বাংলার বানান বিভীষিকা এখনও ঘোচে নি। সেখানে মস্ত বড় একটা সংস্কারের দরকার। সংস্কৃতের দু'টো ব বাংলায় একাকার হ'য়ে বানান সংস্কারের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে; তিনটে শ ষ স, দু'টো ণ ন, দু'টো জ য, এদেরও একাকারের দরকার আছে। বানান সংস্কারের নজীর পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে পাওয়া যাবে। কিন্তু কারো সাহসে কুলায় না। ব্রহ্মশাপের ভয়ে নাকি?

খালি বানানে নয়, অক্ষরেও তার সংস্কারের দরকার আছে। যুক্তাক্ষরগুলি অনেক স্থলেই রাসায়নিক মিশ্রণের মত হ'য়ে আছে। এতে যে খুট-আখুরে ছেলে-মেয়ের প্রাণান্ত হ'য়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বাংলা যখন ইংরেজি ফরাসী আদি ভাষার মতন পৃথিবীর একটা গণ্যমান্য ভাষা হ'য়ে উঠবে, তখন হয়ত লাটিন হরফ চালাতে হবে। আপাততঃ যুক্তাক্ষরের একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধির মতটা সকলে মেনে নিলেই গোলমাল চুকে যায়। কিন্তু আমরা এমনই প্রাচীনপন্থার দাস, যে এই সংস্কারটুকুও বরদাস্ত কর্‌তে প্রস্তুত নই।

আমরা অনেকবার ব'লেছি, মুস্‌লিম সাহিত্য। কেউ হয় ত বল্‌তে পারেন "কি গোঁড়ামি! সাহিত্যেও আবার জাত বিচার!" তাই একটু খোলাসা ক'রে বলা দরকার- মুস্‌লিম সাহিত্য বল্‌তে কি বুঝি। আমাদের ঘর ও পর, আমাদের সুখ ও দুঃখ, আমাদের আশা ও ভরসা লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য, তাই আমাদের সাহিত্য। কেবল লেখক মুসলমান হ'লেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুর্‌আন ও হাদীস, মুস্‌লিম ইতিহাস ও মুস্‌লিম জীবনী থেকে। হিন্দুর সাহিত্য রস সংগ্রহ ক'রে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য কর্‌বে মুস্‌লিম সমাজ থেকে। এই সাহিত্যের ভিতর দিয়েই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের চেনা পরিচয় হবে। চেনা হ'লেই ভাব হবে। To know is to love. এই সেদিন দীনেশ বাবু ব'লেছেন, "যদি মুসলমানগণ তাঁহাদের সমাজের উন্নত চরিত্রগুলি সুন্দর মহিমান্বিত বর্ণে চিত্রিত করিয়া বাংলা সাহিত্য উপস্থিত ক'রেন, তবে হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে তাহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবেন।" আমরা একেই বাংলার মুস্‌লিম সাহিত্য বলি। হিন্দু সাহিত্য ও মুস্‌লিম সাহিত্য, হিন্দুর মন্দির ও

www.pathagar.com

মুসলমানের মস্‌জিদের মত এক সম্প্রদায়ের এক চেটে জিনিস নয়। সুহৃদয় সত্যেন্দ্র দত্ত, ভক্তিভাজন গিরিশচন্দ্র সেন, মাননীয় শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রদ্ধেয় শ্রীজলধর সেন, মান্যবর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি হিন্দু লেখকও অনেক মুসলমান সাহিত্য রচনা ক'রেছেন। বাস্তবিক বাংলা সাহিত্য বাংলার হিন্দু-মুসলমানের অক্ষয় মিলন-মন্দির হবে। হিন্দু সাহিত্য ও মুস্‌লিম সাহিত্য হবে তার দুই কুঠরী। সর্ব্বত্রই সকলের অবাধ প্রবেশ-অধিকার। যে পর্য্যন্ত মুস্‌লিম সাহিত্য না গ'ড়ে উঠ্‌ছে সে পর্য্যন্ত মিলন মন্দির পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না।

তবে, এস হিন্দু ও মুসলমান! এস সাহিত্যিক ও সাহিত্য-ভক্ত! এস কবি ও গায়ক! এস ঐতিহাসিক ও দার্শনিক! আমরা এই মিলন মন্দির গ'ড়ে তুলি। এস কিশোর-কিশোরী, এস তরুণ-তরুণী, এস জরৎ-জরতী, এই মিলন-মন্দিরে এক মন প্রাণ হ'য়ে মুক্তি সাধনা করি।

সাহিত্যের রূপ (২)

আজ নানা জাতীয় দ্বন্দ্ব, নানা সাম্প্রদায়িক বিবাদ, নানা রাজনৈতিক মতভেদ, নানা দ্বেষাদ্বেষী রেষারেষির মধ্যে মানুষের অন্তরাত্মা হাহাকার ক'রছে। সে শান্তি চায়, সে মিলন চায়। কিন্তু কোথায় পাবে? সব ঠাঁই কেবলি স্বার্থের সংঘর্ষ, কেবলি অশান্তি, কেবলি ভেদ। আছে শুধু সাহিত্য—সকলকে মিলনের সোনার ডোরে বাঁধ্‌তে। তাই বিশেষ ক'রে দরকার হ'য়েছে আমাদের এই বর্ত্তমান অভাগা দেশে সাহিত্য সেবার।

সাহিত্যের প্রয়োজন এখানেই শেষ নয়। জাতির আত্মা যখন নানা দুঃখের ভারে একেবারে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে, যখন বারবার বিফলকাম হ'য়ে সে চিরতরে নৈরাশ্য-সাগরে ডুবে যেতে চায়, যখন আঘাতের পর আঘাত স'য়ে সে মুহ্যমান হ'য়ে যায়, তখন সাহিত্যই তাকে সান্ত্বনার তাজা বল, আশার নবীন উৎসাহ, জীবনের নূতন উদ্দীপনা এনে দেয়। এই জন্যই ফরাসী দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন অভিজাত সম্প্রদায়ের অত্যাচারে জনসাধারণ একান্ত অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠে মুক্তির জন্য আর্ত্তনাদ ক'রছিল, তখন তাহাদের মধ্যে রুসো, ভল্‌তেয়ার, দিদিরো, প্রভৃতি শক্তিশালী লেখকের উদ্ভব হ'য়েছিল। এই জন্যই গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন বৈদেশিক শাসনের নিষ্পেষণে ইতালীর আত্মা চীৎকার ক'রছিল, সেই সময়েই সেখানে মাৎসিনি, গারিবল্‌দি প্রভৃতি বীর সাহিত্যিকের সৃষ্টি হ'য়েছিল। গত শতাব্দীতে যে রুসিয়ায় টুর্গেনিভ টলষ্টয় প্রভৃতি মনস্বী লেখকের আবির্ভাব হ'য়েছিল, তাও এই কারণে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে প্রবল আত্মানুভূতি না জন্মালে রঙ্গলাল, বঙ্কিম, রমেশ, দীনবন্ধু প্রভৃতি লেখককে এবং অবশেষে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রকে আমরা পেতাম না।

জাতির অভাবের মধ্যে সাহিত্য জন্মায়; কিন্তু পূর্ণতায় তার পূর্ণ বিকাশ হয়। তাই গ্রীক সাহিত্যে পেরিক্লিসের সময়, লাতিন সাহিত্যে অগস্তাসের সময়, আরবী সাহিত্যে মা'মুনের সময়, হিন্দু সাহিত্যে বিক্রমাদিত্যের সময় গৌরবময় যুগ। এই রকম প্রত্যেক জাতির উন্নতি সময়ে তাদের সাহিত্যের ষোলকলা পূর্ণরূপ দেখা যায়। আমাদেরও সাহিত্য কখনও তার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে দেখা দিবে না, যে পর্য্যন্ত না আমাদের জাতীয় পূর্ণতা সাধিত হয়। তাই চাই আমাদের দেশমাতৃকার মুক্তি আমাদের সাহিত্যের পরিপূর্ত্তির জন্য।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে সাহিত্য ফলে ফুলে ভ'রে উঠে। অধীনতার বদ্ধ বায়ুতে সে কখন স্ফূর্তি পায় না। কিন্তু কেবলই দেশের মুক্তি সাহিত্যের উৎকর্ষ জন্মাতে পারে না। আরো কিছু চাই তার জন্য। সেটি হ'চ্ছে মনের মুক্তি। মনের মুক্তির অভিব্যক্তি হয় মৌলিকতায়। এই মৌলিকতাই সাহিত্যের প্রাণ। সাহিত্য সৃষ্টি-বিশেষ। মৌলিকতা ভিন্ন সৃষ্টি সম্ভবপর নয়, সাহিত্যও সম্ভবপর নয়।

আজকাল সাহিত্যের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কত রকম না উদ্ভট বীভৎস কল্পনাপূর্ণ গল্প উপন্যাস নাটক সাহিত্যের বাজারে দেখা দিচ্ছে। এইসব লেখকদের দেখলে মনে হয় যেন কতকগুলি বদ্ধ পাগল, তাদের হাতে পায়ে লোহার কঠিন শিকল, অথচ তারা নিজেরা স্বাধীন ব'লে বিকট চীৎকার ক'রে বীভৎস অঙ্গভঙ্গী করছে। এরা কতকগুলি জঘন্য মনোবৃত্তির দাস হ'য়ে নীতি ও শ্লীলতার বিরুদ্ধে তাদের কলম ক্রমাগত চালাচ্ছে। গলিত কুষ্ঠ রোগীর ছোঁয়ার মত তারা জাতির মনের স্বাস্থ্যকে একেবারে নষ্ট ক'রে দিতে উদ্যত হয়েছে। এদের শাসন না ক'রলে আর দেশের কল্যাণ নেই। এদের লেখা সম্বন্ধে কবির ভাষায় বলতে হয়—

"চাঁড়ালের হাত দিয়া পুড়াও পুস্তকে,
কর ভস্মরাশি, ফেল কর্ম্মনাশা জলে।"

এদের বাঁধা বুলি হচ্ছে "art for art's sake", "ললিত কলার জন্য ললিত কলা।" ঠিক কথা। কিন্তু ললিত কলা কি? কেবল প্রকৃতির অনুকরণই ললিত কলা নয়, তার সঙ্গে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি চাই। সৌন্দর্য্যের সৃষ্টির জন্য সংযম চাই। কণ্ঠ থেকে যে কোন রকমের শব্দ বা'র করলেই কেউ কখন তাকে গান ব'লে না; গানের জন্য চাই কণ্ঠস্বরকে যথানিয়মে সংযত করা। যেমন তেমন ক'রে হাত পা ছোড়ার নাম নৃত্য নয়, তার জন্যও চাই একটা সংযম। প্রকৃতিতে নানা কুৎসিৎ জুগুপ্সিত বিষয় আছে, চিত্রে বা মূর্ত্তিতে সেগুলি ফুটিয়ে তোলা, চিত্রকরের বা ভাস্করের চরম আদর্শ হ'তে পারে না।

"A thing of beauty is a joy for ever" "সৌন্দর্য্য চিরানন্দময়।"

সৌন্দর্যের সৃষ্টি না করতে পারলে কিছুতেই সাহিত্য সাহিত্য নামের যোগ্য হ'তে পারে না।

সাহিত্যের উৎপত্তি ভাবের অভিব্যক্তিতে। হাসি কান্না যেমন ভাবের অভিব্যক্তি, সাহিত্যও তেমনি। তবে সাহিত্যের সঙ্গে মনের বিকাশের বিশেষ সম্পর্ক আছে। সাহিত্য বিকশিত মনের প্রকাশ। করুণ-হৃদয় মুনি বাল্মীকি তমসার তীরে ক্রৌঞ্চ-যুগলের মধ্যে এককে শিকারীর তীরে হত হ'তে দেখে সহসা ব'লে উঠছিলেন—

"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"

"রে ব্যাধ, চিরকাল যেন তোর প্রতিষ্ঠা লাভ না হয়, কেননা তুই কামমোহিত ক্রৌঞ্চ যুগলের মধ্য এককে হত্যা ক'রেছিস্।

www.pathagar.com

এইরূপেই নাকি শ্লোকের উৎপত্তি হ'য়েছিল। সাহিত্যের উৎপত্তি ঠিক এইরূপই। এইজন্যই প্রাচীন সাহিত্যের ছন্দে গানের সুর আর নাচের তাল দেখা যায়। নৃত্য, গীত, বাদ্য ও কবিতা একই শ্রেণীর; তবে রকম ভেদ।

সকলের সহিত মিলে মিশে যা উপভোগ করা যায়, তাই সাহিত্য। সাহিত্যে সকল মনের সাহায্য থাকে। সাহিত্যের পাত্রপাত্রী সবই একটা type বা নমুনা। তারা কোন দেশে বা কোন কালে আবদ্ধ নয়। হেক্টরের মৃত্যুতে বৃদ্ধ প্রিয়ামের শোক সমস্ত দেশের সমস্ত সময়ের বৃদ্ধ পিতার শোক উপযুক্ত পুত্রের অকাল মৃত্যুতে, ফাউষ্টের জ্ঞানে অতৃপ্তি ও পদস্খলন সমস্ত জড়বাদী জ্ঞানীরই চিত্র, শাইলকের চিত্র প্রত্যেক অত্যাচারিত অত্যাচারীর চিত্র, য়ুসুফের চরিত্র প্রত্যেক মহানুভব পূত চরিত্র যুবকের প্রতিকৃতি, শকুন্তলার ক্রোধ প্রত্যেক প্রতারিতা সতীরই ক্রোধ, রতির শোক প্রত্যেক পতিব্রতা বিধবারই শোক। তাই এই সকল চিত্র বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ধর্মের কবির তুলিতে চিত্রিত হ'লেও, আমরা সেইগুলি সমস্ত কালের সকলের সহিত সমানভাবেই উপভোগ করতে পারি। সাহিত্যে যদি এই সার্বজনীনতা না থাকে, তবে সে সাহিত্য সাহিত্যই নয়, সে এক লেখক ছাড়া আর কারও মনে আনন্দ দিতে পারে কিনা সন্দেহ।

সাহিত্য বাস্তবমূলক [Realistic] হ'তে পারে, আদর্শমূলকও [Idealistic] হ'তে পারে। এক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ছাড়া প্রত্যেকের লক্ষ্য বিভিন্ন। বাস্তবমূলক সাহিত্য বর্ত্তমানের দোষ গুণ অণুবীক্ষণের মত বড় ক'রে চোখে ধ'রে দেয়, তাতে পরোক্ষভাবে তাদের সংস্কার সাধিত হয়। আদর্শমূলক সাহিত্য দূরবীক্ষণের মত লেখকের ঈপ্সিত ভবিষ্যৎকে নজরের সাম্‌নে এনে এক নূতন সুন্দর জগৎ গড়্‌তে সাহায্য ক'রে। আমাদের সাহিত্য এই দুই রকমেরই হওয়া চাই।

সাহিত্য জাতির মনোভাবের ছাপ বয়। জাতির ভাবধারা তার কাল্‌চারের সৃষ্টি। কাজেই এক বিশেষ কৃষ্টি [Culture] সম্পন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের সাহিত্য এক বিশেষরূপ ধারণ ক'রে। আমরা বাঙ্গালী যেমন সত্য আমরা মুসলমান তেমনি সত্য। আমাদের একটা বিশেষ কৃষ্টি আছে। যদি বাংলা সাহিত্যে আমাদের সেই কৃষ্টির ছাপ না থাকে, তবে সে সাহিত্য আমাদের কাছে বিজাতীয় সাহিত্যের মতনই ঠেকবে। যখন বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায় বাস ক'রে, বাংলা সাহিত্যেও এই দুই সম্প্রদায়ের কৃষ্টির ছাপ থাকবে। লেখক মুসলমান হ'লেই তার লেখা সাহিত্য মুসলমান সাহিত্য হ'তে পারে না, যদি না তাতে মুসলমানত্ব থাকে। মুসলমান কবিদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলী অনেক স্থ'লে উপাদেয় হ'লেও, সেগুলিকে মুসলমান সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। কিন্তু মুসলিম সাহিত্য মানে নয় সাম্প্রদায়িক সাহিত্য। আগেই বলেছি সাহিত্য—প্রকৃত সাহিত্য সার্বজনীন না হ'য়ে থাকতেই পারে না। রবীন্দ্রনাথের—

"হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!
ধুলায় ধূসর-রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃ ক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল

www.pathagar.com

কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!"

— হিন্দুত্বের তুলী দিয়ে আঁকা, কিন্তু সে কি চোখের সাম্‌নে বৈশাখের একটি জীবন্ত চিত্র ফুটিয়ে তুলে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সাহিত্যরসিক মাত্রেরই মন মুগ্ধ করে না? অন্যদিকে পল্লী কবি মনসুর বয়াতির মদীনা বিবির ছবিখানি একজন মুসলমানের হাতে আঁকা। কিন্তু তাই বলে কি রোমাঁ রোলাঁ প্রমুখ রসজ্ঞ সাহিত্যিক মাত্রকেই আজ মোহিত কর্‌ছে না। মুসলমান লেখকের "বিষাদ-সিন্ধু" কি মুসলমান ছাড়া হিন্দুরও চোখে বিষাদের সিন্ধু ধারা বওয়ায় না? কৃষ্টি সঙ্গে ব্যক্তিত্ব এমন ওতপ্রোতভাবে জড়ান, যে যেমন সম্মোহিত [Hypnotised] ছাড়া কেউ নিজের ব্যক্তিত্ব সহজে ছাড়ুতে পারে না বা চায় না, তেমনি কৃষ্টিও ছাড়তে পারে না বা চায় না। তাই শতাব্দীর ঘুমের শেষে সদ্য জাগরিত বাঙ্গালী মুসলমানের প্রাণ আজ চাচ্ছে বাংলা বীণায় হিজায ও শীরাযের অপূর্ব রাগিণী শুন্‌তে। তা না হ'লে তার প্রাণের পিপাসা মিটবে না। যে দিন বাংলা হিন্দু সাহিত্য ও বাংলার মুসলিম সাহিত্য গঙ্গা-যমুনার ন্যায় মিলিত হ'য়ে উভয়ের হৃদয়ের মিলন সম্পাদন কর্‌বে, সেই দিনই বাংলা সাহিত্য পূর্ণ হ'বে।

এই প্রসঙ্গে ইতিহাস চর্চ্চার দিকে মুসলমান সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিছুদিন আগ পর্য্যন্ত, এমন কি এখনও ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলমান রাজারাণীদের যে চরিত্র আঁকা হয়েছে এবং হ'চ্ছে সেটা সকল জায়গায় অসত্য না হ'লেও তাতে এমন একটা সহানুভূতির অভাব পাওয়া যায়, যে সহজেই মনে হবে যে, লেখক তাঁদের একবারে বিদেশী ব'লে যেন মমতাহীন হ'য়ে তাদের চরিত্র আলোচনা কর্‌ছেন। আমরা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হই না কেন, যে পর্য্যন্ত আমরা ভারতবাসী আমরা একই মহাজাতির অন্তর্গত-ভারতের ইতিহাস লিখ্‌তে ব'সে অনেকেই যেন এই সত্য ভুলে যান। মুসলমান লেখকগণ যদি নিজেরা গবেষণা ক'রে সত্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন, তবে ইতিহাসে নিশ্চয়ই নূতন আলো দেখা দিবে। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সাহিত্যের, বিশেষ ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনেক চমৎকার উপাদান পাওয়া যাবে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক গবেষণা ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পরলোকগত ভক্তিভাজন রামপ্রাণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কানুনগো প্রভৃতি অগ্রগণ্য। আক্ষেপের বিষয় যে একজনও মুসলমান তাদের মধ্যে নেই। শুধু বঙ্কিম বা নবীন সেনের নিন্দা ক'রলে চল্‌বে না, ইতিহাসের সার্চ লাইটে তাঁদের ভুল দেখান দরকার ছিল।

আগেই বলেছি সাহিত্য মনের বিকাশের উপর নির্ভর করে। এই মনের বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় যে বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে কেবল মাত্র শতকরা ৬ জন অক্ষরজ্ঞান-বিশিষ্ট। কাজেই কি করে তাদের ভিতর থেকে বড় বড় সাহিত্যিক বেরুবে? অথচ এই মুষ্টিমেয় লোকের শিক্ষা তিনটি পৃথক প্রণালীতে সম্পন্ন হ'চ্ছে। সাধারণ শিক্ষা প্রণালী [General Scheme], পুরাতন নিয়মের আরবী-পারসী

www.pathagar.com

প্রণালী [Old Scheme], নূতম নিয়মের ইঙ্গ-আরবী প্রণালী [New Scheme], সাধারণ ও পুরাতন নিয়মের মাঝামাঝি করে এই নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। তার মূলে একটা বড় রকমের সদুদ্দেশ্য ছিল। সাধারণ প্রণালীতে ধর্ম্ম শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত না থাকায়, ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান সাধারণ শিক্ষার সুবিধা উপযুক্তরূপে গ্রহণ করেনি। কেবল ধর্ম্মের আকর্ষণে দলে দলে ছাত্র পুরাতন প্রণালীর মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হ'ত, এখনও অনেকে হয়। কিন্তু তাদের জন্য পার্থিব উন্নতির পথ একরূপ অবরুদ্ধ থাকায় তাদের ভাগ্যে ঘটে শুধু দারিদ্র্য ও উপেক্ষা। তাই, যাতে ক'রে একই সঙ্গে "দীন ও দুনিয়া" [ধর্ম্ম ও সংসার] উভয়ই লাভ হয়, সেই উদ্দেশ্যে আরবী ও ইংরেজী-উভয়ই মিলিয়ে এই নূতন নিয়ম করা হয়। যে সময় এই নূতন নিয়ম করা হয়েছিল, সে সময় সুপারিশের জোরে বড় বড় চাকুরী পাওয়া যেত। এখন কিন্তু প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় পাশ না কর্‌লে এসব কপালে জোটে না। অথচ সাধারণ প্রণালীর চেয়ে এ অনেক গুরুভার। কাজেই ছাত্রেরা তেমনভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে না। এখন সকলেই মনে করেছেন এর সংস্কারের আবশ্যকতা হয়েছে। সে জন্য এক কমিটীও ব'সে গেছে। এই কমিটীকে দুটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। [১] ছাত্রেরা যেন সাধারণ প্রণালীর ন্যায় সকল বিষয়েই উপযোগী হয়। [২] যেন তাদের ধর্ম্ম শিক্ষাও পুরোপুরি হয়। এটী না হ'লে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে এর তফাৎ র'ল কোথায়? এর স্বতন্ত্র অস্তিত্বেরই বা কি প্রয়োজন? তবে হয়ত পাঠ্যপুস্তকের ভার হাল্‌কা কর্‌বার জন্য ধর্ম্ম শিক্ষা, মাতৃভাষার সাহায্যে (অন্ততঃ আংশিকরূপে) করতে হবে। মোট কথা নূতন প্রনালীকে সাধারণ প্রণালীর Faculty of Theology করতে হবে। যদি নূতন প্রণালীতে ধর্ম্মের সমস্ত বিষয় শিক্ষণীয় হয়, তবে পুরাতন নিয়মের অস্তিত্বের কোনই প্রয়োজন থাকে না। তবে যারা শুধুই ধর্ম্ম শিখবে, তারা পুরাতন নিয়মের মাদ্রাসায় পড়তে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে গবর্ণমেন্টের কোন সম্পর্ক রাখবার দরকার নেই। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে এই পুরাতন প্রণালীর ভিতর দিয়েই মৌঃ মোহাম্মদ আকরম খান, মৌঃ মনীরুয্যামান, মৌঃ রুহুল আমীন প্রভৃতি লেখকগণ সৃষ্ট হয়েছেন। তবু আমরা বলব আধুনিক জ্ঞান-বিবর্জিত ধর্ম্ম শিক্ষায় কেবল কাটমোল্লারই সৃষ্টি হ'বে এবং তাতে দেশের দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য আরও বাড়বে। এই জন্য পুরাতন নিয়মের মাদ্রাসার সঙ্গে সরকারের কোন সম্বন্ধ না থাকলেও যখন সেগুলি একেবারে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভবপর নয়, সেগুলির সংস্কার দেশবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য।

এখানে এক বিষয়ে সাবধান করতে চাই। যাঁরা ইসলামের ইতিহাসে অজ্ঞ তাঁরা মনে করতে পারেন যে ইসলামীয় শিক্ষা চিরকালই এইরূপ দর্শন-বিজ্ঞান বর্জিত হ'য়ে আছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলাম গ্রীক, পারসী ও হিন্দু তিনটী প্রাচীন কালচার থেকে কম বেশী তার মাল মসলা আহরণ ক'রে এক বিরাট ইসলামীয় কালচার গ'ড়ে তুলেছিল। কাব্য, জ্যোতিষ, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, ইতিহাস, ভূগোল কোন বিষয়েই ইস্‌লামের দান কম নয়। এক সময়ে সেবিল, কর্দ্দোভা ও গ্রানাডার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য খ্রীষ্টান ইউরোপের দূর প্রান্ত থেকে ছাত্রেরা আসত এবং কৃতবিদ্য হ'য়ে নিজ নিজ দেশে জ্ঞান বিস্তার কর্‌তে চ'লে যেত।

www.pathagar.com

বাঙ্গালার মুস্‌লিম সাহিত্য গড়তে গেলে মুসলমান ধর্ম্ম ও কালচারের সঙ্গে গাঢ় পরিচয় থাকা চাই, কিন্তু সাধারণ প্রণালীর শিক্ষায় তা ঘ'টে উঠে না। ঘ'টে উঠা ত দূরের কথা, অনবরত ইসলামের বিপক্ষে লোকদের রচনা প'ড়ে তাদের মাথা এমন বিগ্‌ড়ে যায় যে ইসলামের প্রতি একটা স্পষ্ট বিদ্রোহের গন্ধ তাদের লেখায় পাওয়া যায়। তাই ব'লে সাধারণ শিক্ষা বর্জ্জন করলেও চলবে না। বিজ্ঞান শিক্ষা এই সাধারণ শিক্ষা ছাড়া অন্য প্রণালীতে হতে পারে না। এই জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে কে বিজ্ঞানকে অবহেলা করতে পারে? তবে চাই আমাদের এই শিক্ষার অভাব পূর্ণ করতে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম শিক্ষার বন্দোবস্ত করা। সুখের বিষয় তার জন্য ঢাকার এডুকেশন ট্রাষ্ট প্রস্তুত হয়েছে। এই ট্রাষ্ট সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও অর্থকরী শিক্ষার বন্দোবস্ত ক'রে দেশের এক অভাব দূর করতে অগ্রসর হয়েছে।

সাহিত্যিক বন্ধুগণ, আমাদিগকে শিক্ষা দীক্ষায় পরিপক্ক হ'য়ে এক বিরাট সাহিত্য রচনা করতে হ'বে। সে সাহিত্য হবে জাতীয় গৌরবদীপ্ত অথচ বিশ্বমানবতার ভাবে অনুপ্রাণিত, ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ অথচ জ্ঞান কর্ম্মে মহীয়ান্। আমাদের সাহিত্য হ'বে বিশ্বজনমনোমোহন অথচ আমাদের যা কিছু সত্য, মঙ্গল, সুন্দর আছে, তার নিদর্শন। বন্ধুগণ! একাজ তোমরা না ক'রলে আর কে করবে? কবি বলেছেন—

"বিরচিব মধুচক্র গৌড়জন যাহে,
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

তোমরা বল—

"বিরচিব মধুচক্র বিশ্বজন যাহে,
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা

সাহিত্য কি? আমি মনে করি, যেখানে আনন্দহারা আনন্দ পায়, ব্যথিতের ব্যথা জুড়ায়, হতাশের ভরসা জাগে, তাপিত আরাম পায়, দুখী সুখের খবর শোনে, প্রেমিক স্বর্গের সৌরভ শোঁকে, সে-ই সাহিত্য।

সাহিত্যিক বিশ্বমানবের স্বজাতি। কাজেই তিনি অসাম্প্রদায়িক। শেক্‌সপীয়ার ভেনিসের ইহুদি সওদাগর শাইলক ও মুসলমান ওসমান আলীর (Othello) প্রতি কম সহানুভূতি দেখান নি। শরৎচন্দ্র বেচারা গফুর ও লাঠিয়াল আকবর সর্দারের চিত্র কি দরদের সঙ্গে এঁকেছেন। রমণীহৃদয়ের সমস্ত প্রীতি শেখ আব্দুর জন্য উথলে পড়েছে। এই সহ-অনুভূতিই সাহিত্যের প্রাণ।

যেখানে রাজনীতি ছোট বড় তাঁবু গেড়ে তার দোরে সঙ্গীনধারী সান্ত্রী খাড়া ক'রে লিখে দিয়েছে— সাধারণের প্রবেশ নিষেধ, সেখানে সাহিত্য তার আনন্দমেলা খুলে বসেছে। তার গেটে বড় বড় হরফে লেখা আছে—স্বাগত। সেখানে বড় ছোট, আমীর গরীব, বামন চাঁড়াল, হিন্দু-মুসলমান সকলের জন্য অবাধ প্রবেশ। ঝগড়া, বিবাদ সঙ্কীর্ণতা, ঘৃণা বিদ্বেষের ঠাঁই সেখানে নেই।

www.pathagar.com

আমার ভাষাতাত্ত্বিক বন্ধু ডক্টর সুনীতি কুমার তাঁর কুমিল্লার অভিভাষণে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত। কিন্তু যেখানে তিনি সাম্প্রদায়িকতা আবিষ্কার ক'রেছেন, সেখানে আমি সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে পাই না। সুনীতি বাবু বলেন, এক শ্রেণীর মুসলমান লেখক হিন্দু-বিদ্বেষের বশে বাংলা ভাষায় দেদার আরবী পারসী শব্দ আমদানী করছে। আরবী পারসী শব্দের আমদানি যদি সাম্প্রদায়িকতা হয়, তবে সাধারণের দুর্বোধ্য অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারকে আমরা কি বলব না মুসলমান-বিদ্বেষের বশে হিন্দুর সাম্প্রদায়িকতা?

প্রথমে দেখুন কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের প্রতি কাজীর উক্তিতে লিখেছেন—

"গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধে হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।" (চৈতন্য-চরিতামৃত)

কেউ কি বল্‌বেন যে হিন্দু-বিদ্বেষের বশে কবিরাজ মহাশয় মুসলমানি চাচা, নানা শব্দ ব্যবহার করেছেন? আরবী পারসী শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার অনেক হিন্দু লেখকই করেছেন। মধ্যযুগের দু'জন প্রসিদ্ধ কবির লেখা থেকে নমুনা দেখাচ্ছি। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে লিখেছেন—

"আইসে চড়িয়া তাজি সৈয়দ মোগল কাজী
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ী।
পুরের পশ্চিম পটী বোলায় হাসন হাটী
এক সমুদয় গৃহবাড়ী ॥
ফজর সময় উঠি বিছায়্যা লোহিত পাটী
পাচ বেরি করয়ে নামাজ।
ছিলি মিলি মালা ধরে, জপে পীর পেগাম্বরে,
পীরের মোকামে দেই সাঁজ ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার ক'রে
অনুদিন কিতাব ও কোরান ॥
সাঁজে ডালা দেই হাটে, পীরের শিরণী বাঁটে,
সাঁজে বাজে দগড় নিশান ॥
বড়ই দানেশ বন্দ কাহাকে না করে ছন্দ,
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বুজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ,
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি ॥
* * *

www.pathagar.com

বসিল অনেক মিয়া আপন তরফ লৈয়া
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়্যা নিকা দান পায় সিকা সিকা,
দোয়া করে কলমা পড়িয়া ৷৷
করে ধরি খর ছুরি কুক্‌ড়া জবাই করি,
দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা মোল্লারে দেই মাথা,
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি ৷৷
যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তবখান,
মখদুম পড়ায় পঠনা।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ
গুজরাট পুরের বর্ণনা॥"

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁর যুবজনমনোহারী অন্নদামঙ্গলে বাদ্‌শা ও মানসিংহের কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায়।
গজব করিলা তুমি আজব কথায় ৷৷
লস্করে দু'তিন লাখ আদমী তোমার।
হাতী ঘোড়া উট গাধা খচর যে আর ৷৷
এ সকলে ঝড় বৃষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া।
বামন খোরাক দিল অন্নদা পুজিয়া ৷৷
সয়তান দলি দাগা ভূতের পূজায় ৷৷
আলো চাউল বেড়ে কলা ভুলাইয়া খায় ৷৷
আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।
কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম ৷৷
সয়তানে বাজি দিল না পেয়ে কোরান।
ঝুটমুট পড়ি মরে আগম পুরাণ ৷৷
গোঁসাই মর্দ্দের মুখে হাত বুলাইয়া।
আপনার নূর দিলা দাড়ী গোঁপ দিয়া ৷৷
হেন দাড়ী বামন মুড়ায় কি বিচারে ।
কি বুঝিয়া দাড়ী গোঁপ সাঁই দিল তারে ৷৷
আর দেখ পাঁঠা পাঁঠী না করি জবাই।
উভ চোটে কাটে বলে খাইল গোঁসাই ৷৷
হালাল না করি করে নাহক হালাক।

www.pathagar.com

যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক ॥
ভাতের কি কব পান পানির আয়েব।
কাজী নাহি মানে পেগাম্বরের নায়েব ॥

*   *   *

বন্দেগী করিবে বন্দা জমিনে ঝুকিয়া।
করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া।
মিছা ফান্দে পড়ে হিন্দু তাহা না বুঝিয়া।
যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া ॥
যতেক বামন মিছা পুথি বানাইয়া।
কাফের করিল লোকে কোফর পড়িয়া ॥
দেবী ব'লে দেয় মিছে ঘড়ায় সিন্দুর।
হায় হায় আখের কি হইবে হিন্দুর ॥
বাঙ্গালীরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে।
পান পানি খানা পিনা আয়েব না করে ॥
দাড়ী রাখে বাঁদী রাখে আর জবে খায়।
কান ফোঁড়ে টিকি রাখে এই মাত্র দায় ॥"

আরবী পারসী শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে দুইজন সাহিত্য-মহারথীর মত উদ্ধৃত করছি। রবীন্দ্রনাথ বলেন "পার্সি আরবি শব্দ চলতি ভাষা বহুল পরিমাণে অসংকোচে হজম করে নিয়েছে। তারা এমন আতিথ্য পেয়েছে যে তারা যে ঘরের নয় সে কথা ভুলেই গেছি। 'বিদায়' কথাটা সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও মেলে না। সেটা আরবি ভাষা থেকে এসে দিব্যি সংস্কৃত পোষাক পরে বসেছে। 'হয়রান ক'রে দিয়েছে' বললে ক্লান্তি ও অসহ্যতা মিশিয়ে যে ভাবটা মনে আসে, কোনো সংস্কৃতের আমদানি শব্দে তা হয় না। অমুকের কণ্ঠে গানে 'দরদ' লাগে না, বললে ঠিক কথাটা বলা হয়, ও ছাড়া আর কোন কথাই নেই। গুরু-চণ্ডালির শাসন কর্ত্তা যদি দরদের বদলে সংবেদনা চালাবার হুকুম করেন, তবে সে হুকুম অমান্য করলে অপরাধ হবে না।" (বাংলা ভাষা পরিচয় ৫২, ৫৩ পৃঃ)

দীনেশ বাবু বলেন, "বর্ত্তমান কালে গোঁড়া হিন্দুরা দিবা রাত্র যে সকল উর্দু কি ফারসী শব্দ জিহবাগ্রে ব্যবহার করিয়া থাকেন, লেখনী মুখে তাহা বদলাইয়া তৎস্থলে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করেন, এইরূপে 'হজম' স্থলে 'পরিপাক' বা 'জীর্ণ', 'খাজনা' স্থলে 'রাজস্ব', 'ইজ্জৎ' স্থলে 'সম্মান', 'কবর' স্থলে 'সমাধি', 'কবুল' স্থলে 'স্বীকার', 'আমদানি' স্থলে 'আনয়ন', বা 'সংগ্রহ করিয়া আনা', 'খেসারৎ', স্থলে 'ক্ষতিপূরণ', 'জমিন' স্থলে 'ভূমি', 'খানদান, স্থলে 'পদ-প্রতিষ্ঠা' ইত্যাদি কথার প্রয়োগ করেন। একটু কাগজ লইয়া টুকিয়া

www.pathagar.com

দেখিবেন, বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ বিদেশী শব্দ কত প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমাদের ভাষার জাতি যায় নাই। পরের জিনিষ আত্মসাৎ করিবার শক্তি সতেজ জীবনের লক্ষণ। শব্দগুলি বাদ সাদ দিয়া ভাষা শুদ্ধ করিয়া ইহাকে তুলসীতলা করিয়া রাখিলে হিন্দু-মুসলমানের উভয়ের মাতৃভাষাকে আমরা খণ্ডিত ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিব।" (প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান, ৯৮ পৃঃ)

মোট কথা বাংলা ভাষায় জবরদস্তি ক'রে যেমন অপ্রচলিত অনাবশ্যক আরবী পারসী শব্দের ব্যবহা অসঙ্গত, তেমনি অপ্রচলিত অনাবশ্যক সংস্কৃত ব্যবহার করাও অসঙ্গত। বে-দরকারে ইংরেজীর মিকচার করাও তেমনি আমার অসহ্য। আমি এসব নিন্দা করি; কিন্তু যা বাংলায় এসে গেছে, যা বাংলার হাড়ে মাসে ঢুকে গেছে, তা আরবী, পারসী, তুর্কী, পর্তুগীজ, ডচ, ফরাসী, ইংরেজী, আর্য্য, বা অনার্য্য যা হোক, তাতে আমি আপত্তি করি না। আমি বাংলা ভাষাকেই চাই, তাকে শুদ্ধি বা খতনা করবার পক্ষপাতী নই।

সে যাই হোক সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমি বুঝি সাহিত্যের ভিতর দিয়া অন্য সম্প্রদায় বা ধর্ম্ম বিশেষের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালান, কোনও জাতির ঐতিহাসিক চরিত্রকে বা কোনও ধর্ম্মাবলম্বীর সম্মানিত পুরুষদের হীন বা বিকৃত করা। দেশের সাম্প্রদায়িক বিবাদের মূলে এই সাম্প্রদায়িক সাহিত্য। দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য যে বাংলার হিন্দু লেখকেরা এর সূত্রপাত করেন। তারপর মুসলমান লেখকেরা গালির বদলে গালি শুরু করেন। এর জন্য অবশ্য ব্রিটিশের ভেদনীতি ছিল অনেকটা দায়ী। আমরা পূর্ব্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতা বিষবর্জিত 'পাক সাফ' সাহিত্য চাই— দেশের মঙ্গলের জন্য, দশের মঙ্গলের জন্য। সাহিত্য যদি সত্য ও শিব হয়, তবে তা সুন্দর হবেই। নয়ত সে সাহিত্যই হবে না, হবে একটা অপসাহিত্য। আমরা যদি বাংলা ভাষা থেকে এই অপসাহিত্য দূর করতে পারি, তবে প্রকৃত সাহিত্যের সেবা হবে, সত্য-শিব-সুন্দরের অর্চ্চনা হবে, পাকিস্তানের মঙ্গল হবে।

www.pathagar.com

মোসলেম বঙ্গ-সাহিত্য

শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী

লেখক-পরিচিতি ঃ শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৫) শিবপুর, হাওড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক ও সম্পাদক।

লেখা-পরিচিতি ঃ 'সাহিত্য' (সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী ও গোলাম মোস্তফা) আষাঢ় ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত।

বঙ্গীয় মোসলেম-সাহিত্য কিভাবে গড়ে উঠা দরকার, তার আলোচনায় আজকাল বহু শিক্ষিত লোক নিয়োজিত হয়েছেন। জাতীয়-জীবনের এ যে একটি শুভ লক্ষণ, তাতে সন্দেহ নাই। কারণ সাহিত্য হচ্ছে জাতির মুক্তি-সেতু বা কল্যাণের স্বর্ণ-সৌধ। অতএব সেটি যাতে সুদৃঢ় ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, তার জন্য যত্ন চেষ্টা করা প্রত্যেক সমাজ-প্রাণ সাহিত্যিকেরই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। আজ সে কর্ত্তব্য সম্পাদনে বহু মনীষী লেখককে নিয়োজিত দেখে সত্যই আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে যাঁরা নেমেছেন; তাঁদের অধিকাংশেরই আলোচনার বিষয় হচ্ছে সাহিত্যের বাইরের পথ নিয়ে। বাংলা ভাষা থেকে সংস্কৃত শব্দের উচ্ছেদ সাধন করে তার স্থলে আরবী, ফার্সী ও উর্দ্দূ শব্দ-যোজনায় ভাষাতে ইসলামী রূপ ফুটিয়ে তোলা বা আরবী অক্ষরে বাংলা রচনা প্রচলন করা যায় কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে কিছু কিছু উপদেশ প্রদান করেই তাঁরা নীরব হচ্ছেন। কিন্তু সাহিত্যের ভিতরের বস্তু-ভাব ও চিন্তাধারার স্বরূপ কি রকম হওয়া দরকার সে বিষয়ে কাউকে বেশী কিছু বলতে শুনি নাই। ফুলের সৌন্দর্য্যের চেয়ে সৌরভের মূল্য যে বেশী- বাইরের রূপ অপেক্ষা ভিতরের রসের মূল্য যে অধিক, তা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। আরবী ফার্সী ও উর্দ্দূ শব্দের বহুল সমাবেশে বাংলা ভাষার গায়ে মুসলিম জাতির বিশেষত্বের একটা ছাপ পড়তে পারে বা শব্দ-সম্পদে হয়ত বঙ্গ-ভারতীয় লাবণ্য-শ্রী অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু তার ভেতরের বস্তু যদি তেমন উপাদেয় না হয়, তবে কেবল পোষাকের পারিপাট্য সাধনের সার্থকতা কি? বরং সে বৃথা আর্তস্বরে জাতীয় অগৌরবকেই টেনে আনা হবে। শুধু শব্দ সম্পদে সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হতে পারে না। তার মধ্যে চিন্তার গভীরতা ও ভাবের মৌলিকত্ব থাকা চাই। যে সাহিত্যের মধ্যে এই দুটী জিনিসের অভাব ঘটে, সে সাহিত্যকে কেবল মৃত সাহিত্য বললেই হবে না, তাকে সাহিত্যের আবর্জ্জনাও বলা যেতে পারে। তার ভাগ্যে লোকের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পরিবর্ত্তে চিরদিন অবজ্ঞা ও অনাদরই লাভ হয়ে থাকে। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমাদের পুঁথি-সাহিত্য। পুঁথি-সাহিত্যের মধ্যে আরবী-ফার্সী শব্দের অভাব নাই। কিন্তু তার ভাব ও চিন্তাধারার তেমন উৎকর্ষ সাধিত না হওয়ায় উহা কোন দিন দুনিয়ার বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নাই এবং উহা সমগ্র

www.pathagar.com

বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য না হয়ে সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি হয়ে কোণঠাসা হয়ে রয়েছে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ঐ দুর্দ্দশার জন্যেই আমাদের সামাজিক জীবনের কোন অভিব্যক্তির কোন দিক দিয়ে বিকাশ হতে পারে নাই। আর সাদী, হাফেজ, ফের্দ্দৌসী ও ওমর খাইয়াম প্রভৃতি পারস্য কবিদিগের রচনা–সম্ভার আজ যে জগতের সুধী সমাজের প্রাণের বস্তুরূপে সর্ব্বত্র ভক্তি–শ্রদ্ধা লাভ করেছে, সে শুধু ঐ অমর কবিবৃন্দের শব্দ-প্রয়োগ-চাতুর্য্যের ফলে নহে, উহা তাঁদের মৌলিক চিন্তার গভীরতা ও অসাধারণ ভাব প্রকাশের ফল বলতে হবে।

আমাদের বর্ত্তমান লেখকগণ যে সাহিত্য সৃষ্টি কচ্ছেন, তাতে প্রাণের তারে তারে একটা পুলকের সুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠে সত্য, কিন্তু তাতে আমরা কেবল ক্ষণিক প্রীতি লাভ ভিন্ন অন্য কিছুরই স্বাদ পাই না। মানুষ যাতে প্রকৃত মানুষ হতে পারে, এমন ইঙ্গিত তাতে বড় বেশী থাকে না। জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যদি কিছু ইঙ্গিত কোথাও থাকে, সে এত অস্পষ্ট যে, তা লোকের হৃদয়ে কোন স্থায়ী চিহ্ন আঁকতে পারে না। আমাদের সাহিত্যের ভিতরের বস্তু এমন সরস, সতেজ ও প্রাণবন্ত হওয়া দরকার যে, তা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসাড় সমাজ-দেহ কর্ম্মচঞ্চল হয়ে উঠে, হৃদয়ের কেন্দ্রে কেন্দ্রে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়—এক অভূতপূর্ব প্রেরণার স্পন্দনে প্রাণ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে, আলাদীনের প্রদীপ ঘর্ষণে দৈত্যের আবির্ভাবের ন্যায় হাজার হাজার সমাজ সংস্কারক কর্ম্মীর সৃষ্টি হয়ে সমাজকে চঞ্চল করে তোলে। যে সাহিত্য জাতির প্রাণে যত বেশী বিদ্যুৎ-জ্বালা সৃষ্টি করতে পারে, সেই সাহিত্যই আদর্শ সাহিত্য, আর জাতীয় দুঃখ–দুর্দ্দশা মোচন করতে একমাত্র সেই সাহিত্যই সক্ষম। আমাদের সাহিত্যিকগণ যে দিন সেই জীবন্ত সাহিত্য গড়ে তুলতে পারবেন—দৈত্যপুরীর রাজ কন্যার চেতনা সম্পাদনের জন্য সোনার কাঠির সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন, সে দিন আমরা আমাদের এই অবনতির অন্ধকূপ হতে উদ্ধার লাভ করতে পারব—আমাদের সকল অবসাদ ও হীনতা আপনা হতেই টুটে যাবে, আমরা আবার আমাদের হারান সৌভাগ্য ফিরে পাব।

সাহিত্যের কাজ নট–নটীর কাজের ন্যায় কেবল লোকচিত্ত বিনোদন নয়, ভাঁড়ের ভাড়ামীর মত হাস্য–রহস্য বা রস-রঙ্গ সৃষ্টি করাও নয়, অথবা চিত্রকরের সচিত্র অঙ্কনের ন্যায় মানব-মনকে সৌন্দর্য্য-রসে ডুবিয়ে রাখাও নয়। সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলা—তার অন্তর জ্ঞানের আগুন জ্বালিয়ে তার ভীরুতা, জড়তা ও মূর্খতার আবর্জ্জনা পুড়িয়ে দেওয়া এবং তৎপরিবর্ত্তে সৎসাহস, কর্ম্মস্পৃহা ও দেশাত্মবোধ উদ্দীপ্ত করা। মানুষ যাতে খাঁটি মানুষ হয়— জ্ঞানে উন্নত, চরিত্রে আদর্শ, কর্ম্মে সুপটু, পর-হিতৈষণায় সুদক্ষ ও স্বজাতি-কল্যাণে অকুণ্ঠিতচিত্ত হয়, তারই চেষ্টা করা প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। মানুষের মনে আবিলতা, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও প্রাণের দুর্ব্বলতা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে পারে যে সাহিত্য, সেই সাহিত্যের খেদমতে নিয়োজিত হওয়া আমাদের সাহিত্যিকগণের একান্ত দরকার। আশাকরি আমাদের সাহিত্যিক বন্ধুগণ সেই সাহিত্য গড়ে তুলতে চেষ্টা পাবেন।

www.pathagar.com

সাহিত্যের আর একটা দিক আছে—কলা বা সৌন্দর্য্যের দিক, সেটা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেটি আনুসঙ্গিক বা উপলক্ষ্য মাত্র। সেই উপলক্ষ্য যেখানে লক্ষ্যে পরিণত হয়, সেখানে অতিরিক্ত সৌন্দর্য্য-দোষে দুষ্ট হয়ে অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্যও অস্পৃশ্য হয়ে পড়ে। যে বৃক্ষের পাতার বাহার বেশী, সে বৃক্ষে ফুল বা ফল জন্মিবার আশা কম। বিশেষ দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, আমাদের অনেক শক্তিশালী সাহিত্যিক বন্ধু সেই অসার পাতার বাহারের দিকে বেজায় রকম দৃষ্টি রেখে চলেছেন। তাঁরা ভাষার প্রসারতা, চিন্তার গভীরতা ও বিষয়ের মৌলিকত্বের প্রতি লক্ষ্য না করে, কেবল ভাষার ঝঙ্কার, ছন্দের নৃত্যভঙ্গি ও অলঙ্কারের পারিপাট্যকেই সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করেছেন।

তাঁদের মনে রাখা দরকার, কেবল কথার জাল বুনলে, ছন্দের নাগরদোলা তৈরী করলে অথবা অলঙ্কারের দোকান বসালে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না, সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে নব নব চিন্তা ও নব নব ভাবধারার দ্বারা।

ভাষা ভাবের দূতী মাত্র। ছন্দ ও অলঙ্কার তার বিশ্রম্ভালাপের সখী স্বরূপ। যথার্থ ভাবুকের ভাবরাশির যখন স্ফূরণ হয়, সে কি তখন ব্যাকরণ, পদ-বিন্যাস ও অলঙ্কারের অপেক্ষা করে? না, পণ্ডিতদিগের কষ্ট-রচনার অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যদ্গম ও গলিত ধাতুরাশি যেমন কোন হিসাব-পত্র না করে, নিয়ম শৃঙ্খলা না মেনে আপনার বেগে বাহির হয়, তেমনি ভাব-বিভোর লেখক কোন বাধা নিয়মের অনুসরণ করতে পারেন না। তিনি হাতের কাছে যে ভাষা পান, যাতে তাঁর মনোভাব কিছু পরিমাণেও ব্যক্ত হতে পারে, তাকেই তিনি অবলম্বন করেন। তবুও তাতে তাঁর সাহিত্যের কোনরূপ অঙ্গহানি ঘটে না। মানুষের সুনিয়ন্ত্রিত কাটা খাল অপেক্ষা স্বভাবজাত নদ-নদীর গতিপথ আঁকা-বাঁকা হলেও তার উপকারিতা ও শোভারাশি যে অনেক বেশী, তা সকলকেই স্বীকার করতে হবে।

সকল দিক দেখে শুনে, সকল দোষ ত্রুটির হাত এড়িয়ে, সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস সকল জাতি, সকল সমাজ ও সকল সম্প্রদায়ই করে থাকে। এ বিজ্ঞতা আবহমান কাল থেকে জগতে চলে আসছে এবং তার প্রচার না করলেও চিরকাল থাকবে। সুতরাং তার আর বেশী প্রচারের আবশ্যকতা নাই। আমরা এখন দেখতে চাই সেই উদ্দীপনাময়ী সাহিত্য, যে সাহিত্য কোন নিয়ম-কানুনের ধার ধারে না। পর্ব্বতদুহিতা স্রোতস্বিনী যেমন সকল বাধা অতিক্রম করে ময়দান, বন, জঙ্গল দিয়ে বয়ে গিয়ে দেশকে উর্ব্বর করে তুলে, তেমনি ভাবের প্লাবনে লোকের অন্তর থেকে ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র চিন্তা ভাসিয়ে দিয়ে গোটা জাতিকে যে সাহিত্য উদারচেতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, অধ্যবসায়শীল, অনন্যকর্ম্মা স্বজাতি-বৎসল এবং ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্যের সেবক করে গড়ে তুলতে পারে, তাহাই প্রাণবন্ত জ্বলন্ত সাহিত্য। সে আদর্শ সাহিত্য কি আমরা গড়ে তুলতে পারব না?

www.pathagar.com

বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলমান

কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ২৪ মে, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ ; চুরুলিয়া, বর্ধমান, পশ্চিম বঙ্গ। মৃত্যু ঃ ২৯ আগস্ট, ১২ ভাদ্র ১৩৮৩। পি. জি. হাসপাতাল, ঢাকা । সর্বাধিক খ্যাতিমান, জাতীয় জাগরণের কবি-কাজী নজরুল ইসলাম।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কবিতাঃ অগ্নিবীণা (১৯২২), বিষের বাঁশী (১৯২৪), ভাঙার গান, প্রলয়-শিখা, সঞ্চিতা, সিন্ধু-হিন্দোল প্রভৃতি। গান ঃ বুলবুল, চক্রবাক, চোখের চাতক, নজরুল গীতিকা, চন্দ্রবিন্দু, সুর-সাকী, গুল-বাগিচা প্রভৃতি। উপন্যাস ঃ বাঁধন হারা, কুহেলিকা। গল্প ঃ ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলি-মালা প্রভৃতি। প্রবন্ধ ঃ যুগ-বাণী, রাজবন্দীর জবানবন্দী প্রভৃতি।

লেখা-পরিচিত ঃ 'নজরুল রচনাবলী', ১ম খণ্ড। প্রকাশক ঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা। নতুন সংস্করণ ১৯৯৩।

আমাদের বাঙলার মুসলমান সমাজ যে বাঙ্‌লা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যে আশাতীতভাবে উন্নতি দেখাইয়াছেন, ইহা সকলেই বলিবেন, এবং আমাদের পক্ষে ইহা কম শ্লাঘার বিষয় নহে। সাধারণ অসাধারণ প্রায় সকল বাঙালী মুসলমানই এখন বাঙ্‌লা পড়িতেছেন, বাঙ্‌লা শিখিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা বড়ই আশা ও আনন্দের কথা। বাঙ্‌লা সাহিত্যে পাকা আসন দখল করিবার জন্য সকলেরই মনে যে একটা তীব্র বাসনা জাগিয়াছে, এবং ইহার জন্য আমাদের এই নতুন পথের পথিকগণ যে বেশ তোড়জোড় করিয়া লাগিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই সাহিত্যে আমাদের জীবনের লক্ষণ। ইহারই মধ্যে আমাদের কয়েকজন তরুণ লেখকের লেখা দেখিয়া আমাদের খুবই আশা হইতেছে যে, ইহারা সাহিত্যে বহু উচ্চ আসন পাইবেন।

এখন আমাদের বাঙ্‌লা সাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে সর্বপ্রথম আমাদের লেখার জড়তা দূর করিয়া তাহাতে ঝর্ণার মত ঢেউভরা চপলতা ও সহজ মুক্তি আনিতে হইবে। যে সাহিত্য জড়, যাহার প্রাণ নাই, সে নির্জীব-সাহিত্য দিয়া আমাদের কোন উপকার হইবে না, আর তাহা স্থায়ী সাহিত্যও হইতে পারে না। বাঙ্‌লা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খুব কম লেখকেরই লেখায় মুক্তির জন্য উদ্দাম আকঙ্ক্ষা ফুটিতে দেখা যায়। হইবে কোথা হইতে? সাহিত্য হইতেছে প্রাণের অভিব্যক্তি, যাহার নিজের প্রাণ নাই, যে নিজে জড় হইয়া গিয়াছে, সে লেখার প্রাণ দিবে কোথা হইতে? যাহার নিজের বুকে রঙ-এর আলিপনা ফুটে না, সে চিত্তে রঙ ফুটাইবে কেমন করিয়া? আমাদের অধিকাংশই হইয়া গিয়াছি জড়, কেননা আমাদের জীবন ভয়ানক একঘেয়ে; তাহাতে না আছে কোন বৈচিত্র্য, না আছে কোন সৌন্দর্য। তা ছাড়া, 'বোঝার উপর শাকে আঁটির' মত আমরা নাকি আবার জন্ম হইতেই দার্শনিক, কাজেই বয়স কুড়ি পার না হইতেই আমরা গম্ভীর হইয়া পড়ি

www.pathagar.com

অস্বাভাবিক রকমের। আর, গম্ভীর হইলেই অমনি নির্জীব অচেতন প্রাণীর মত হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। এই যে চলার আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া জড়-ভরতের মত বসিয়া থাকা, ইহাই আমাদের প্রাণশক্তিকে টুটি টিপিয়া মারিতছে। সাহিত্যের মুক্তধারায় থাকিবে চলার আনন্দ, স্রোতের বেগ এবং ঢেউ-এর কল-গান ও চঞ্চলতা।

আমাদিগকে, বিশেষ করিয়া আমাদের তরুণ সম্প্রদায়কে এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অনেক যুবকের লেখা দেখিয়া মনে হয়, ইহা যেন এক জরাগ্রস্ত বুড়োর লেখা; তাহাতে না আছে প্রাণ, না আছে চিন্তাশক্তি, না আছে ভাব,- শুধু আবর্জনা, কঙ্কাল আর জড়তা। ইহা বড়ই দুঃখের কথা। সাহিত্যকে এই প্রাণের সোনার কাঠি দিয়া জাগাইবার যে যাদু শক্তি, ইহা লাভ করিতে হইলে আমাদের তরুণ সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে সর্বপ্রথম শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শরীর নীরোগ হইলে মনে আপনি একটা বিমল আনন্দ উছলিয়া পড়িতে থাকে। দেখিবেন, যে-সাহিত্যিকের স্বাস্থ্য যত ভাল, যিনি যত বেশি প্রফুল্লচিত্ত, তাঁর লেখা তত বেশি স্বাস্থ্য-সম্পন্ন, তত বেশি কলমুখর। নবীন সাহিত্যিকগণ সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকিবার জন্য যদি এক-আধটু করিয়া সঙ্গীতের আলোচনা করেন, তাহা হইলে দেখিবেন তাহাদের লেখার মধ্যে এই সঙ্গীত, সুরের এই ঝঙ্কার উন্মুক্ত প্রফুল্লচিত্তের এই মোহন-বিকাশ ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাদের লেখার মধ্যে এক নূতন মাদকতা, অভিনব শক্তি দান করিতেছে। অধিকাংশ "পুঁয়ে মারা" পিলে রোগাক্রান্ত সাহিত্যিকের লেখাই দেখিবেন অসুস্থ (morbid); ইহাই সাহিত্যের স্বচ্ছ ধারায় আবিলতা আনে। যাঁহার চিত্ত যত নিরাবিল, নির্মল, উন্মুক্ত, হাস্য-মুখর, তাঁহার লেখাও তত নূতন নূতন সম্পদে ভরা (rich)। ইউরোপের লোকেরা যেমন স্বাস্থ্য-সম্পন্ন, খেলাধুলা, দৌড়-ঝাঁপ, মারামারি, হাসি-খুশি যেমন তাহাদের নিত্যকার সঙ্গী, তাহাদের লেখার মধ্যেও ঠিক তাহাদের জীবনের ঐসব গুণ সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে।

অপর পক্ষে, ইহারই বিপরীত সমস্ত দোষসম্পন্ন বলিয়া আমাদের লেখা, আমাদের সাহিত্য সৃষ্টি আবার তেমন সঙ্কীর্ণ, ভণ্ডামি, অসত্য, রোগের বীজাণু প্রভৃতিতে ভরা। লেখকের লেখা হইতেছে তাঁহার প্রাণের সত্য অভিব্যক্তি। যেখানে লেখক সত্য, তাঁহার লেখাতেও সে সত্য সত্যভাবেই ফুটিয়া উঠিবে; যেখানে লেখক মিথ্যা, সেখানে সেই মিথ্যাকে তিনি হাজার চেষ্টা করিলেও লুকাইতে পারিবেন না। সাধারণের চক্ষে যদি না পড়ে তবে জহুরির চক্ষে তাহা পড়িবেই পড়িবে। সাহিত্যে এই প্রাণ, এই উদ্দাম-চঞ্চলতা, এই উদার মুক্তি আনয়নের চেষ্টা আপাতত আমাদের মাত্র দুই একজন তরুণ সাহিত্যিক ভিন্ন অন্য কারুর লেখায় দেখিতে পাইতেছি না। সেই গড্ডালিকা প্রবাহ। সাহিত্যে যে একটা নূতন ধারা চলিয়াছে, সে-সম্বন্ধে আমাদের অনেক নূতন লেখক এখনও অন্ধ। এই সব কারণে সাহিত্যিকের, কবির, লেখকের প্রাণ হইবে আকাশের মত উন্মুক্ত উদার, তাহাতে কোন ধর্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, বড়-ছোট জ্ঞান

www.pathagar.com

থাকিবে না। বাঁধ-দেওয়া ডোবার জলের মত যদি সাহিত্যিকের জীবন পঙ্কিল, সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার সাহিত্যসাধনা সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হইবে। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য আঁতুড়-ঘরেই মারা যাইবে। যাঁহার প্রাণ যত উদার, যত উন্মুক্ত, তিনি তত বড় সাহিত্যিক। কারণ, সাহিত্য হইতেছে বিশ্বের, ইহা একজনের হইতে পারে না। সাহিত্যিক নিজের কথা, নিজের ব্যথা দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন, বিশ্বের ব্যথায় ছোঁওয়া দিবেন। সাহিত্যিক যতই কেন সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করুন না, তাহা দেখিয়াই যেন বিশ্বের যে কোন লোক বলিতে পারে, ইহা তাঁহারই অন্তরের অন্তরতম কথা; ইহা তাঁহারই বুকে গুমরিয়া মরিতেছিল, প্রকাশের পথ পাইতে ছিল না। এই রূপেই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি হয়, ইহাকে বলে সাহিত্যে সার্বজনীনতা।

এই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আজ রবীন্দ্রনাথ এমন জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা বিশ্ব-সাহিত্যে স্থাপন পায় না, তাহা স্থায়ী সাহিত্য নয়, খুব জোর দুদিন আদর লাভের পর তাহার মৃত্যু হয়। আমাদিগকেও তাই এখন করিতে হইবে সাহিত্যে সার্বজনীনতা সৃষ্টি। অবশ্য, নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়াইয়া, না হারাইয়া। যিনি যে দেশেরই হউন, সকলেরই অন্তরের কতকগুলি সত্য আছে, সূক্ষ্মতম ভাব আছে, যাহা সকল দেশের লোকের পক্ষেই সমান; সাহিত্য-সৃষ্টির সময় ভিতরের এইসব সূক্ষ্মদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের গূঢ় রহস্যকে বিশ্লেষণ করিয়া সত্যের সৌন্দর্য ও মঙ্গল ফুটাইয়া তুলিতে হইবে,— এই মহাশক্তি আমাদের তরুণ লেখক সম্প্রদায়কে অর্জন করিতে হইবে। সত্য যদি লক্ষ্য হয়, সুন্দর ও মঙ্গলের সৃষ্টি সাধনা ব্রত হয়, তবে তাঁহার লেখা সম্মান লাভ করিবেই করিবে। অন্যের ঠিক প্রাণে গিয়া আঘাত করিবার মত শক্তি পাইতে নিজের প্রাণ থাকা চাই। এসব কথা আমরা শুধু কোন বিশেষ লেখক-সম্প্রদায়কে উল্লেখ করিয়া বলিতেছি না; ইহা ঔপন্যাসিক, কবি, ছোট গল্পলেখক সকলেরই প্রতি প্রযোজ্য। এই তিন রকমের লেখকের মধ্যে কেহই ছোট নন, কারণ প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য-সৃষ্টি। তিনিই আর্টিষ্ট, যিনি আর্ট ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। আর্ট-এর অর্থ সত্যের প্রকাশ (execution of truth), এবং সত্য মাত্রেই সুন্দর, সত্য চিরমঙ্গলময়। আর্টকে সৃষ্টি, আনন্দ, বা মানুষ এবং প্রকৃতি (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা যাইতে পারে; তবে সত্যের প্রকাশই হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। আমাদের নবীন তরুণ আর্টিষ্ট সাহিত্যিক ও কবিগণ এই কয়েকটি কথা মনে রাখিয়া স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টির দিকে চেষ্টা ও প্রাণ প্রয়োগ করিবেন, ইহাই আমাদের বাসনা। আমাদের এ আশা পূর্ণ হউক।

www.pathagar.com

সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য কেন?

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ২৮ ভাদ্র, ১৩০৩, বাঁশদহ, সাতক্ষীরা, খুলনা। মৃত্যু ঃ ৮ নভেম্বর, ১৯৫৪। পেশা: সাপ্তাহিক ও মাসিক সওগাতের সম্পাদনা বিভাগে কাজ; বুলবুল পত্রিকার সম্পাদনা সহযোগী।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জীবনী ঃ মরুভাস্কর, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ আলী, ছোটদের হজরত মোহাম্মদ, ছোটদের কায়েদে আজম জিন্নাহ। কাহিনী ঃ ছোটদের শাহনামা।

লেখা-পরিচিতিঃ লেখটি 'সওগাত' ১৩৩৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

অল্পদিন হইল মুসলমান শিক্ষিতদের দৃষ্টি বাঙলা সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছে, বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা এবং এই মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সেবা ব্যতীত আমাদের সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি একেবারে অসম্ভব। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের সেবা ক্ষেত্রে বর্তমান সময় নূতন করিয়া পদার্পণ করিয়াই মুসলমানেরা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য-সমিতি গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হইয়াছেন।

হিন্দুরা প্রশ্ন করেন, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের ন্যায় সাহিত্য-সেবা ক্ষেত্রে মুসলমানদের এই স্বাতন্ত্র্য কেন? হিন্দু ভ্রাতাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমরা এ বিষয়ে দুই চারটি কথা বলিতেছি।

প্রথমেই বলা উচিত যে, রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রের ন্যায় মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সেবার ব্যাপারেও যদি মুসলমানদিগকে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে না হইত, যদি হিন্দুদের সাহিত্য পরিষদের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া গিয়া সাহিত্য সেবার পথে অগ্রসর হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত ও সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের অপেক্ষা কেহ অধিক সুখী হইতেন না।

মুসলমানেরা সাহিত্য ক্ষেত্রে কতকটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পক্ষপাতী কেন—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে কিঞ্চিত 'গোড়ার কথা' বলিয়া লইতে হইবে।

সাহিত্য-সেবার উদ্দেশ্য কি? 'নির্জলা আর্ট' ভক্তদের মতামত যাহাই হোক না কেন, যাঁহারা আর্টের উদ্দেশ্যহীনতা মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক ও অসমর্থ, তাঁহারা বলিবেন যে, সমাজকে বর্তমান অপেক্ষা একটা বিরাটতর, উচ্চতর, মহত্তর, সুন্দরতর ভবিষ্যতের দিকে গতিশীল করিয়া দেওয়াই প্রকৃত সাহিত্য সাধনার লক্ষ্য। কিন্তু সে ভবিষ্যতের স্বরূপ কি? সাহিত্যশিল্পীদের নির্মিতব্য সে ভবিষ্যৎ সৌধের ভিত্তি কি? এক কথায় তাহার ভিত্তি হইতেছে জাতীয় বিশিষ্ট সভ্যতার সার্বজনীন উপকরণগুলি। ফলকথা, যে সমাজের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি হইবে, তাহার জ্ঞান, ধর্ম, শিক্ষা ও কর্মসাধনার বিশ্বরূপকে সাহিত্যিক তাঁহার নিপুণ তুলিকার সাহায্যে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়া একটা মোহন সুন্দর আদর্শরূপে তাহার সম্মুখে ধরিবেন, ইহাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। যুগধর্মের প্ররোচনায় এবং অন্য

www.pathagar.com

সমাজ ও সভ্যতার সংস্পর্শে ও সংঘাতের ফলে কোন বিশিষ্ট সমাজের পক্ষে নব-নব রূপ ও রস গ্রহণ করা যতই বাঞ্ছনীয় হোক না কেন, তাহার বৈশিষ্ট্যকে সে কোন মতেই বিসর্জন দিতে পারে না, দিলে তাহাকে আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইতে হইবে, যিনি যাহাই বলুন, কার্যতঃ কোন সমাজ অন্যের দ্বারা পরাজিত ও পরিপ্লাবিত হওয়ার পূর্বে স্বেচ্ছায় এ পাপে কখনও লিপ্ত হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। সুতরাং মুসলমান সমাজও যে অনুরূপ মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

বর্তমানে বাঙলার মুসলমান সমাজকে দুইটি বিরাট বিসদৃশ সভ্যতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ ইউরোপীয় সভ্যতা, দ্বিতীয়তঃ ভারতের হিন্দু সভ্যতা। ইউরোপীয় সভ্যতার কয়েকটি বহিরঙ্গের সহিত ইসলামী সভ্যতার বিরোধ থাকিলেও অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাস পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, যে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ফলে ইউরোপ আজ বিশ্বজয়ী হইয়াছে, আরব বা ইসলামী সভ্যতাই সে বিষয়ে তাহার শিক্ষাগুরু। এ কথা ছাড়িয়া দিলেও বাঙলা সাহিত্যের সেবা ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত ইসলামী সভ্যতার বিন্দুমাত্রও মিল বা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দু সভ্যতার ভিত্তি হইতেছে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ, বহুযুগ পূর্ব হইতে এই বিশিষ্ট রূপেই হিন্দু সভ্যতা আমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছে। ইসলামী সভ্যতার স্বরূপ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধনপূর্বক এক অদ্বিতীয়, নিরাকার, সর্বগুণকর, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপাসনা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেই ইসলামের উদ্ভব। ইসলাম জাতিভেদ স্বীকার করে না। প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভ্রাতা এবং সকল মানুষই এক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত—ইহাই কোরআনের ঘোষণা। এমন দুইটি পরস্পরবিরোধী সভ্যতার মধ্যে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সাংসারিক জীবন কর্মের সংঘর্ষ হইতেছে। সাহিত্য-সেবা ক্ষেত্রেও এই সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, এ জন্য মুসলমানকে আত্মরক্ষার জন্য পূর্ব হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

ইহা কাহারো অবিদিত নহে যে, হিন্দু সেবিত বাঙলা সাহিত্য হিন্দু সভ্যতাকে ভিত্তি করিয়াই দণ্ডায়মান। পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, পুনর্জন্মবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি তাহার রক্তে-মাংসে, অস্থি-মজ্জায় রহিয়াছে। মুসলমানকে নিজের সঙ্গী, সহচর ও দোসররূপে পাইবার আশায় হিন্দু কখনও বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গ হইতে তাঁহার নিজস্ব সভ্যতার এই ছাপগুলি তুলিয়া লইতে রাজী হইবেন না। পক্ষান্তরে মুসলমানও নিজের সার্বজনীন বিশিষ্টতাগুলি বিসর্জন দিয়া হিন্দু-সেবিত বাঙলা সাহিত্যকে নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিংবা হিন্দুর অন্ধ অনুকরণ দ্বারা নিজের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতে সম্মত হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দুরা শ্রদ্ধা করেন, কারণ তিনি স্বদেশ মন্ত্রের পুরোহিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে কি দিয়া গিয়াছেন? তিনি যে স্বাদেশিকতার আদর্শ দান করিয়া গিয়াছেন, মোসলেম বিদ্বেষকেই তাহার ভিত্তি করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীত-'বন্দে মাতরম্' গান পৌত্তলিকতার ভাবে পরিপূর্ণ, তাহা কোন অপৌত্তলিক-একেশ্বরবাদী নিজের ধর্ম বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। তথাপি হিন্দুরা এই সঙ্গীতটিকেই

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জাতীয় সঙ্গীতরূপে চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যাঁহারা অগ্নিমন্ত্রের সাধনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ঘোর পৌত্তলিকাতর মধ্য দিয়ে মোসলেমহীন বাঙ্গালা বা ভারতের কল্পনা করিয়া নিজেদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। হিন্দু-সেবিত সাহিত্যের প্রভাব এইভাবে জাতীয় মনের উপর কার্য করিয়াছে। ইহাকে মুসলমানরা যুগপৎ ভয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত অসামান্য প্রতিভা হিন্দু সমাজ ও সভ্যতার অঙ্গ মাত্র। যেভাবে তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইয়াছে এবং সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা ভিন্ন অন্যভাবে তাঁহার বিকাশ বা প্রকাশের উপায় ছিল না। কারণ, বঙ্কিমের প্রতিভা অসামান্য হইলেও তাহা সার্বজনীনতার সুউচ্চ গ্রামে আরোহণ করিতে পারে নাই।

কিন্তু শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করিয়া লাভ নাই। প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু-সেবিত বঙ্গ-সাহিত্য হিন্দু সভ্যতা হইতে রূপ-রস সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। পৌত্তলিক হিন্দু সভ্যতাকে ভিত্তি করিয়া, পৌত্তলিক সংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্য হইতে জীবনীশক্তি সংগ্রহ করিয়া, পৌত্তলিক হিন্দু মনের ছাপ সর্বাঙ্গে ভিতরে-বাহিরে ধারণ করিয়া এই সাহিত্য বিরাজমান। মোসলেম সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও পবিত্রতা রক্ষার পক্ষে ইহা মারাত্মক। মুসলমান ইহা বুঝিতে না পারিয়া একবার সর্বনাশের পথে উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব কবিদের কোমল মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের সুললিত পদাবলীর রূপ-রসে মজিয়া মুসলমান একবার নিজেকে হারাইতে বসিয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বৈষ্ণব কবিতার সহজ সৌন্দর্যে কিছুকাল সম্মোহিত থাকিবার পর মুসলমান ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন প্রাচীন বাঙ্গলা বর্জনপূর্বক তাহার স্থানে দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃত আমদানী করিলেন তখন মুসলমানদের চৈতন্য আরও অধিক পরিমাণে ফিরিয়া আসিল। হিন্দু রাজকন্যা সংস্কৃতার চেহারা দেখিয়া তাঁহারা একেবারে থতমত খাইয়া গেলেন। এই অবস্থা মোসলেম চিত্তে অতি শুভ প্রতিক্রিয়া করিল। তাঁহারা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর জাগ্রতভাবে নিজের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যের বিষক্রিয়া হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা পূর্ব হইতেই বাঙ্গলার মুসলমানদের ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দ বহুলভাবে ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃতপ্রিয়তার ফলে তাঁহাদের এই চেষ্টা দ্রুততর হইয়া উঠিল।

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয় কুমার প্রভৃতি প্রতিভাশালী সাহিত্যিক ও কবিগণ আবির্ভূত হইয়া যে সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন, তাহাও স্বাভাবিকভাবে হিন্দু-সভ্যতার দ্বারা অন্তরে-বাহিরে অনুরঞ্জিত হইল। মুসলমানেরা কিছুদিন ইহা হইতে দূরে রহিলেন। কিন্তু সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শিক্ষিতরা ক্রমশঃ এই সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। পুরাতন "মুসলমানী" বাঙ্গলা লিখিত কেতাব পুঁথি আর তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলাই শিক্ষণীয় বাঙ্গলা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। একদল মুসলমান

www.pathagar.com

লেখক এই অবস্থা সমাজের বৈশিষ্ট্য রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহারা পুরাতন বাঙ্গলা ছাড়িয়া দিয়া তথাকথিত 'সাধু' বাঙ্গলায় সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও কয়েকজনের মধ্যে হিন্দু সাহিত্যের প্রভাব কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, শুধু 'বিষাদ সিন্ধু' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির ভাষা ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা সহজে উপলব্ধি হইতে পারিবে।

তারপর এই বর্তমান যুগের বাঙ্গলা সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদিগের চেষ্টায় বাঙ্গলা ভাষা পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সরল হইয়া আসিয়াছে। এজন্য এবং অন্যান্য কারণে শিক্ষিত মুসলমানেরা এখন বাঙ্গলার দিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সাহিত্যের চর্চা করিতে আসিয়া তাঁহারা একটা অনাত্মীয় সঙ্কীর্ণ সভ্যতার বিষবাষ্পে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন। তাই পূর্বযুগের সদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহারা আবার আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-সাধনা, ভাব-প্রেরণা আনয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গলার মুসলমানদের নিজস্ব সভ্যতা ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ইহা ব্যতীত তাঁহাদের গত্যন্তর নাই।

পুরাতনপন্থী পণ্ডিতেরা এখনও মাঝে মাঝে হাঁকিয়া বলিতেছেন, যবন ম্লেচ্ছের সংস্পর্শ হইতে বাঙ্গলার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চল। বাঙ্গলা সাহিত্যের আদি যুগ হইতে মুসলমানদের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার ফলে তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইসলামের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সভ্যতার উত্তরাধিকারী পৌত্তলিক হিন্দুর অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সাহিত্য সেবা করিতে গেলেই তাঁহাকে বাগদেবী বীনাপানির রাতুল চরণে ভক্তি কুসুমাঞ্জলী উপহার দিতে হইবে। হিন্দু-সভ্যতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নহে— বর্তমান যুগে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-সাধনা ও তজ্জনিত শক্তি সামর্থ্যে বলীয়ান হওয়ায় হিন্দু-মানসিকতার সংক্রমণ অত্যন্ত ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার আওতায় গেলে মুসলমানের স্বরূপ লুপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে মুসলমানরা বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের বুকে তাঁহাদের নিজস্ব সভ্যতার জন্য স্থায়ী আসন রচনা করিতে চাহেন।

প্রকৃত দেশ কল্যাণের দিক দিয়া চিন্তা করিলে ইহাতে হিন্দুদের অসন্তুষ্টির কোন কারণ থাকিবে না। হিন্দু মুসলমানকে এবং মুসলমান হিন্দুকে বুঝিতে না পারিলে, বুঝিয়া উভয়ের মধ্যে মৈত্রী বিধানের একটা পথ পরিষ্কার করিতে না পারিলে, এ দেশের কোন প্রকার স্থায়ী কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে না। উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত উদার ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিবে, তবেই উভয় সম্প্রদায় দেশের মঙ্গল সাধনে সমব্রতী হইতে পারিবে। সাহিত্যের দিক দিয়াই এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হওয়া সম্ভব।

কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে যদি মুসলমানেরা নিজস্ব ভাবধারা আমদানী করিতে না পারিল, তাহা হইলে হিন্দুরা তাহাদিগকে চিনিবেন, জানিবেন, বুঝিবেন কিরূপে? বর্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের মারফতে হিন্দুকে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে, কেননা মূলতঃ এবং প্রধানতঃ হিন্দুরাই সাহিত্যিক। মুসলমানকেও অতঃপর বাঙ্গলার মারফতে স্বকীয় স্বরূপ লোকচক্ষুর গোচরীভূত করিতে হইবে। যে ভাষা কেবলমাত্র হিন্দুর চিন্তা বাহন, তাহা দ্বারা মুসলমানের

www.pathagar.com

সকল চিন্তা, সকল ভাব প্রকাশিত হইতে পারে না। এ জন্য মুসলমানদের ব্যবহৃত শব্দ অবাধে বাঙ্গলা ভাষায় গৃহীত হওয়া আবশ্যক। হিন্দু পণ্ডিত ইহাতে নিশ্চয়ই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন, ঐ সকল ম্লেচ্ছ ভাষার শব্দ বাঙ্গলায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রধানতঃ এই জন্যই হিন্দুর সহিত মুসলমানদের বনিবনাও হইতেছে না। অবশ্য প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিবেচনা না করিয়া যথেচ্ছভাবে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হইলে ইহাতে আপত্তি করা অন্যায় নহে, কিন্তু যেখানে মুসলমানী পরিভাষার অর্থ ও সঙ্গতি রক্ষার জন্য এইরূপ শব্দ ব্যবহার করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, সেখানে কাহারও আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু হিন্দু ভ্রাতারা এতটুকুও মানতে রাজী নহেন।

দুঃখের বিষয় মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যেও দুই-চারিজন আছেন, যাঁহারা মুসলমানদের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াসকে সংকীর্ণতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নিজের দৃষ্টি এতই সঙ্কীর্ণ অথবা স্বজাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান এতই অল্প যে, পরের কুযুক্তিকে তাহারা সহজেই পরম সুযুক্তি বলিয়া মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন। তাহারা ভুলিয়া যান যে, হিন্দুরা মুখে যত বড় বড় কথা বলুন না কেন, কার্যতঃ তাহারা হিন্দু-সভ্যতাকে আশ্রয় করিয়াই সাহিত্য গঠন করিয়াছেন ও করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া চুনাপুটি সাহিত্যিক পর্যন্ত কেহই বাঙ্গলা সাহিত্যে হিন্দু সভ্যতাকে বর্জন করিতে ইচ্ছুক নহেন। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-সভ্যতার জয়-গৌরব ঘোষণার জন্য বৃহত্তর ভারত আবিষ্কারের কল্পনায় অধীর হইয়া এই বৃদ্ধ বয়সেও সাগর পাড়ি দিতে ত্রুটি করিতেছেন না। ইহাতে যদি তাহাদের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ না পায়, তবে মুসলমান বেচারারা তাঁহাদের সভ্যতার ছাপ বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গে লাগাইয়া দিতে চাহিলে, তাহাকে সঙ্কীর্ণতা বলা হইবে কেন? পরলোগত গিরিশচন্দ্র সেন ভিন্ন অন্য কোন খ্যাতনামা হিন্দু বা ব্রহ্ম সাহিত্যিক এ যাবৎ ইসলামী সভ্যতাকে ভালরূপে জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। কেবল হিন্দু সভ্যতা লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত। ইহাতে যদি তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ না পাইয়া থাকে, তবে নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টি প্রয়াসী মুসলমানদিগকে সঙ্কীর্ণদৃষ্টি বলা হইবে কোন অপরাধে?

যে সুযোগের অভাবে বাঙ্গালী হিন্দুদের সহিত আমাদের প্রকৃত পরিচয় হইতেছে না, আমরা ইচ্ছা করিলেই যখন তাহাদিগকে সে সুযোগ করিয়া দিতে পারি, তখন আমরা তাহা করিব না কেন? হিন্দুরা যেমন বাঙ্গলা সাহিত্যের মারফতে তাঁহাদের সভ্যতার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইতেছেন, আমরা মুসলমান সাহিত্যিকরাও তেমনিই ইসলামী সভ্যতার উপকরণগুলি বাঙ্গলা সাহিত্যের মারফতে হিন্দুদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। তাহা না করিলে আমাদিগকে কর্তব্যভ্রষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় মুসলমানী সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা কোন মতেই নিন্দার পাত্র নহেন; বরং সর্বদা প্রশংসা পাইবার অধিকারী।

আমরা নানা কারণে স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গলা সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইলেও একটি বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। বর্তমান যুগের হিন্দু-সেবিত সাহিত্যের ভাষা ও আমাদের ভাষায় যাহাতে গুরুতর রকমের পার্থক্য না ঘটে, সেদিকে

www.pathagar.com

দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কেননা, ঐ রূপ বৃহৎ পার্থক্য ঘটিলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। আমরা আবশ্যক মত আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করিব কিন্তু এইরূপ শব্দ ব্যবহারে যেন আমাদের অতি লোভ না জন্মে। আমাদের এরূপ সাহিত্য সৃষ্টির নামে একেবারে "আমির হামজা" বা "ছহি বড় সোনাভান" বা "শূর্য্য উজ্জল বিবির কেচ্ছা" রচনা করা কোন মতেই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। অবশ্য আমাদের সমাজে দুই একজন লোক এমন আছেন যাঁহারা কোন ব্যক্তিকে "দয়ার পাত্র" মনে না করিয়া "কাবেলে রহম" মনে করিলে ইসলামী ভাব প্রকাশ পাইল বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা নিজেরাই দয়ার পাত্র এবং বড়ই সুখের বিষয়, ইহাদের সংখ্যা, প্রতিপত্তি ও সাহিত্যিক যোগ্যতা নিতান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য। আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যে ইসলামী ভাব আনয়ন করিতে যতই উৎসুক হই না কেন, এইরূপ উৎকট মনোভাব বর্জন না করিলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। পক্ষান্তরে মুসলমানদের নিত্যব্যবহার্য-নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, কেবলা, জায়নামাজ, আল্লাহ, রাসূল, পীর, ওলি, ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, বেদাৎ প্রভৃতি শত শত ইসলামী পারিভাষিক শব্দ কোন মতেই বর্জন করা যাইতে পারিবে না। কেননা বাঙ্গলা ভাষায় ঐ সকল শব্দের অনুবাদ হওয়া অসম্ভব। এইভাবে উভয় দিক বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি কোরআন। ইহার নিম্নে বিশ্বস্ত হাদিসের স্থান। তারপর ফেকা, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। ইসলামের এই সকল উৎস হইতে ভাবধারা সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে সঞ্চারিত করিতে হইবে। তবেই আমাদের সাহিত্য সাধনা সফল ও সার্থক হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, মুসলমান ও হিন্দু যদি এইভাবে পৃথক সাহিত্য চর্চায় ব্যাপৃত হয়, তবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে উভয়ের মিলন কবে হইবে, কিরূপে হইবে? আমাদের মনে হয়, এ যাবৎ মুসলমানেরা যেমন হিন্দুদের ভাব ও চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়াছেন মুসলমানদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত গতিতে চলিলে অল্পকাল পরেই হিন্দুরা তেমনিই মুসলমানদের নিজস্ব ভাব ও চিন্তার সহিত পরিচয় লাভ করিবেন। এই সময় হইতে উভয় সম্প্রদায় একযোগে সমবেত শক্তি প্রয়োগে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের পরিচর্যা করিতে পারিবেন।

মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে সাহিত্য-সেবকের সংখ্যা-শক্তিশালী সাহিত্য-সেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। হিন্দু ভ্রাতারাও ক্রমে ক্রমে মোসলেম-সেবিত সাহিত্যের প্রতি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইবেন। ইহার ফলে পণ্ডিতদিগের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়া পরিশেষে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইবে। বাংলায় এক শক্তিশালী সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে।

www.pathagar.com

সাহিত্য ও যুগধর্ম

আবুল মনসুর আহমদ

লেখক -পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ১৮৯৮, ধানীখোলা গ্রাম, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ। মৃত্যু ঃ ১৮ মার্চ, ১৯৭৯। শিক্ষাঃ বি.এ, ১৯২১ ; বি.এল. ১৯২৯, কলকাতা। পেশা ঃ সাংবাদিকতা ও ওকালতি। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য ১৯৫৪, ১৯৫৭–৫৮।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ সত্যমিথ্যা (১৯৫০), জীবনক্ষুধা (১৯৫৫), আবে হায়াত (১৯৬৮)। গল্প ঃ আয়না (১৯৩৫), ফুডকনফারেন্স (১৯৫০), আসমানী পর্দা (১৯৫৫), গালিভারের সফরনামা (১৯৪৯)। শিশু সাহিত্য ঃ ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া (১৯৬৬)। স্মৃতিকথা ঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৮), শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৭৩), আত্মকথা (১৯৭৮)। পুরস্কার ঃ ছোটগল্পে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৬০।

লেখা-পরিচিতি ঃ 'সওগাত'– ১৩৩৩ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

"সাহিত্যিক অর্থাৎ চিন্তানায়করা আমাদিগকে সেই সব জিনিষ দিতেছেন, যাহাতে আপাততঃ আমাদের দরকার নাই বরং অনিষ্ট আছে, আর সেই সমস্ত জিনিষ দিতেছেন না, যার অভাবে আমরা মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছি।.... তাঁদের চিন্তারাশি শিক্ষিতদের মস্তিষ্ক ও মনের খোরাক যোগাইলেও হৃদয়ের বল যোগায় না। তাই তাঁদের সেই চিন্তার ফল ভাল হিসাবে আমাদের মাথায় গজ্‌গজ্ করিলেও প্রেরণা–শক্তির অভাবে তাহা আমাদের বাস্তব জীবনে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে না।"

নিম্নে এই প্রবন্ধটির আরো কতক অংশ উদ্ধৃত করা হলঃ

"বাঙালী প্রাণের এই বিস্ফোটনোন্মুখ ভাবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে ব্যাপক ও প্রজ্জলিত অনল রাশিতে পরিণত করিতে হইলে দরকার মাত্র একটা আদর্শের ইন্ধন। এই আদর্শের বারুদের স্তূপকে আশ্রয় করিয়াই বাঙালীর কর্মশক্তির আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বিরুদ্ধ শক্তির সমস্ত আবর্জ্জনারাশিটি মুহূর্তে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে।

কিন্তু এই আদর্শের সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না; কারণ সাহিত্য এ বিষয়ে নীরব। যে সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক নেতা দেশবাসীর সামনে একটা আদর্শ ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তা সাহিত্যের সোনার কাঠির পরশ পায় নাই বলিয়া নিতান্ত প্রাণহীন।..... এই সঙ্গেই বাঙলা সাহিত্য বাঙলার যুগধর্ম্মের সঙ্গে অসহযোগ করিয়াছে। সাহিত্যে যুগধর্ম্মের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতেছে না। সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় বিভিন্ন পক্ষে ধাবমান হইয়াছে।

বাঙলার প্রকৃত সাহিত্য জীবন শুরু হইয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের আমল হইতে। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে একটা আদর্শের আগুন লক্‌লক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। তিনি সে আদর্শকে একটা রূপ দিবার চেষ্টাও করিয়া গিয়াছেন। তাঁর "আনন্দমঠ", "সীতারাম" ও "দেবী চৌধুরাণী" সেই আদর্শেরই অস্পষ্ট ছায়া। কিন্তু তাঁর আদর্শ প্রতিবেশী মুসলমানদের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ রূপ প্রকৃতি–বিরুদ্ধ অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া শতকরা পঞ্চাশ জন বাঙালী সে আদর্শ হইতে প্রেরণা পায় নাই।

www.pathagar.com

তারপর রবীন্দ্রনাথের যুগ। বঙ্কিমের সেই অস্পষ্ট আদর্শ বাঙলায় যে উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিল, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্র লাল ও রজনী সেন তাহারই প্রত্যক্ষ ফল। এইটুকু সত্যের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়াই ইহারা ততটুকু নিষ্ফল হন নাই। ইহাদের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনও চিন্তানায়কের নূতন সৃষ্টির ক্ষমতা না থাকাতে তাঁহাদের দান আর দশ জনের দানের চাইতে খুব বেশী কার্য্যকরী হয় নাই। এক রবীন্দ্রনাথের লেখনী বাঙালীর প্রাণে একটা বিরাট ঘা দিয়াছিল। তাঁহার এই আঘাতে কাজও বোধ হয় কিছু হইয়াছিল। তাঁহার 'স্বদেশ' ও 'সংকল্প', 'নৈবেদ্য' ও 'গোরা' বস্তুতঃই বাঙালীকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু কমলে যেমন কন্টক থাকে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র পিছনে 'নষ্টনীড়' ছিল এবং 'নৈবেদ্য'র ফুলের উপর অনেকখানি আবর্জনা স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙলার দেবতা সে আবর্জনা স্তূপের তল হইতে 'নৈবেদ্য' আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বাঙালী যখন এই বিরুদ্ধ ভাবের দো-টানা স্রোতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল, তখন গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র লাল ও রজনী সেন স্বর্গ গমন করিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ উদ্ধার অসম্পূর্ণ রাখিয়া বিশ্বের চিন্তার পুষ্পক রথে চড়িয়া স্বর্গের দিকে পঞ্চাশ ধাপ উঠিয়া গেলেন; বাঙালী আত্মবিস্মৃতির বালুকাতটে মূর্চ্ছিত হইয়াপড়িয়া রহিল।

তারপর আসিলেন, ভাষার সাপুড়িয়া, ভাবের যাদুকর শরৎচন্দ্র। এই বিরাট শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটা খুব বড় ঘটনা। আমি এই ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলিতে চাই। ইহাতে অনেকেই আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন, অনেকেই আমার মধ্যে প্রকৃত রসজ্ঞানের অভাব দর্শন করিবেন। আমি জানি, বাঙলায় আজ শরৎচন্দ্রের পাঠক সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহার ভক্তের সংখ্যাও যে অনুদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, বাজারে তাঁর অক্ষম অনুকরণের বিরাট রাবিশ স্তূপের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝা যায়। সুতরাং শরৎ সাহিত্যের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা আজ কারও পক্ষে নিরাপদ নহে। কিন্তু নিরাপদ না হইলেও নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, শরৎচন্দ্রের এমনই একটি ম্যাগনেটিক প্রতিভা যে, ইহার প্রভাব মুক্ত হইয়া চলা অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিসম্পন্ন লেখকদের পক্ষে বাস্তবিকই অসম্ভব।... কিন্তু শক্তি ও ন্যায় এক কথা নহে। তাই শরৎচন্দ্রের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াও আমরা পূর্ণ বিশ্বাসেই তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করিতেছি।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুই রকম মতবাদ পোষিত হইতে দেখা গিয়াছে। এক শ্রেণীর মত এই যে, শরৎচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যে মৌলিক দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের তিনি অনুকরী নন; কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্যে ও শরৎ-সাহিত্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, উহা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বিশেষত্বের ফলে নহে; উভয়ের পথই স্বতন্ত্র। আর এক শ্রেণীর মত এই যে, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথেরই শক্তিশালী শিষ্য; বিপুল সৃজন ক্ষমতা বলে তাঁহার এই অনুকরণকে তিনি বৈচিত্র্য করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যে এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে সার্থক পার্থক্য দেখা যায়, তা বাহ্যিক যতটা, আভ্যন্তরীণ ততটা নহে; রূপে যতটা, রসে ততটা নহে; কায়িক যতটা, আন্তরিক ততটা নহে।"

ব্যক্তিগতভাবে আমি এই শেষোক্ত মতের পরিপোষক। আমারও বিশ্বাস, রবীন্দ্র-সাহিত্যে ও শরৎ-সাহিত্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই, যে টুকু আছে, তাহা শরৎচন্দ্রের কারিগরী মাত্র। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ যত বড় আদর্শবাদীই হউন না কেন,

www.pathagar.com

সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ পুরাদস্তুর আর্টবাদী ছিলেন, তিনি যে অন্তরে অন্তরে আর্টবাদী ছিলেন তাহার প্রমাণ আমরা তাঁহার 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে'তে পাইয়াছিলাম।

'শ্রীকান্ত' 'পল্লী সমাজ' প্রভৃতি পুস্তকে শরৎচন্দ্র হিন্দু সমাজের কতকগুলি বিধিনিষেধের অন্ধকার দিকটা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই দিক দিয়া শরৎচন্দ্র অসংখ্য শিষ্য পাইয়াছেন।

শরৎচন্দ্র ছদ্মবেশী আর্টবাদী। তিনি তাঁর কতক গ্রন্থে একটা আদর্শকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া হিন্দুর সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে গোঁজামিল দিয়া চালাইয়া দিলেও অধিকাংশ পুস্তকেই তাঁহার অস্থিমজ্জাগত আর্টবাদিত্ব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। তাঁহার 'দত্তা', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'বড় দিদি' প্রভৃতি পুস্তক এই শ্রেণীর। এই শ্রেণীর বহি পড়িয়া উপসংহারে 'চমৎকার' বলা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। 'বড় দিদি'র সুরেন্দ্র, 'বৈকুণ্ঠের উইলে'র গোকুল খুব ভাল মানুষ হইতে পারে। 'দত্তা'র বিজয়ার তেজ ও রাসবিহারীর ভণ্ডামী খুব উপভোগ্য হইতে পারে এবং এ সমস্তই শরৎচন্দ্রের শক্তির পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু তাহাতে আমার কি? আমি যে উহাতে অতটা শক্তি ও সময় নষ্ট করিলাম, তার প্রতিদানে কি পাইলাম? উত্তর—আনন্দ। আকাশের তারার দিকে, বাগানের ফুলের দিকে হা করিয়া চাহিয়া থাকিলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সেই আনন্দ।

ইহার ফল যাহা হইয়াছে, তাহা দেশের পক্ষে নিতান্তই লজ্জার কথা। আর্টের নামে সাহিত্যসেবীরা মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা সৌন্দর্যের মোহে পারিপার্শ্বিকতাকে উপেক্ষা করিতেছেন; বাঁচিয়া থাকিবার আবশ্যকতাকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা গৃহকোণে বসিয়া কবি প্রিয়ার ধ্যানস্থ হইয়াছেন। তাই দেশের উপর দিয়া জীবন-যুদ্ধের যে তুমুল ঝটিকা বহিয়া গেল, সাহিত্যিকদের প্রাণে তার আঁচড়ও লাগিল না! তাই যখন ষোল বৎসরের অসাহিত্যিক পুত্র স্বরাজের সন্ধানে আত্মহারা হইয়া হাসিতে হাসিতে কারাগারে প্রবেশ করিল, তখনও সাহিত্যিক প্রৌঢ় পিতা নির্জ্জন গৃহকোণে নায়ক-নায়িকার অভিসারের নিখুঁত বিন্যাসে ব্যস্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন। তাই স্বাধীনতার জন্য বাঙলার জননী-সহধর্ম্মিনীরা যখন মুখে স্বামী পুত্রকে পুলিশের সঙ্গীনের মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন তখনও সাহিত্যিকের লেখনী-মুখে বাঙলার রমণী পিয়ানোর সামনে বসিয়া বিলোল কটাক্ষে ভ্রাতৃ-বন্ধুর মনোহরণে ব্যস্ত ছিল। শরীরী বাঙলা যখন তার বাঁচিয়া থাকার অধিকার লইয়া বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে ক্লান্ত, যখন বাঙলার আকাশ-বাতাস দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশবাসীর করুণ আর্তস্বরে মুখরিত তখন সাহিত্যিকের সৃষ্ট অশরীরী বাঙলা চায়ের পেয়ালা ও গল্প-গুজব লইয়া ব্যস্ত। এ দুই-এ ইহাই পার্থক্য; বাস্তব বাঙলা ও ভাবের বাঙলার সামঞ্জস্যের স্বরূপ ইহাই।

মানুষের মনে পাপী-তাপী ও পতিতাদের প্রতি এন্‌সাফের ভাব সৃষ্টি করা এবং পতিতাদিগকে সতীত্ব ও মহত্ত্বের মহিমায় অনুপ্রাণিত করা খুবই বড় কাজ। কিন্তু যে প্রণালীতে শরৎচন্দ্র এই কাজে হাত দিয়াছেন, তাহাতেই দু'একজন বেশ্যা 'রাজলক্ষ্মী' ও 'চন্দ্রমুখী'তে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ বাঙালী যুবকও ত দেবদাস ও শ্রীকান্তে পরিণত হইতে পারে। রাজলক্ষ্মী বাইজীদের আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু শ্রীকান্তের মত নিষ্কর্ম্মা, ভবঘুরে স্থূল বুদ্ধি, বেশ্যানুগ্রহজীবী হতভাগা বাঙালী যুবকের আদর্শ হইতে পারে না। সেইরূপ, চন্দ্রমুখী বেশ্যাদের আদর্শ হইলে দেশের তাতে কল্যাণ হইবে সত্য, কিন্তু দেবদাস যদি বাঙালী যুবকের আদর্শ হইয়া বসে, তবে বাঙলার ভবিষ্যৎ তাতে

www.pathagar.com

উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে না। অথচ শরৎচন্দ্রের সরস লিপি চাতুর্যে রাজলক্ষ্মী ও চন্দ্রমুখী এতই জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাতে যতজন বেশ্যার মনে রাজলক্ষ্মী ও চন্দ্রমুখী হইবার বাসনা জাগিবার সম্ভাবনা আছে, ঐ কয়টি রাজলক্ষ্মী ও চন্দ্রমুখীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য লক্ষগুণ বাঙালী যুবকের উন্মাদ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনাও আছে। সুতরাং সাবিত্রীকে পাইবার লোভে নিজ নিজ মেসের যুবতী ঝিদিগকে 'এক্সপেরিমেন্ট' করিবার খেয়াল যদি কলিকাতার মেসের যুবকদের মাথায় চাপিয়া বসে, তবে বাঙালী যুবক কেবল সতীশের মত নিষ্কর্মা ও অনাবশ্যক জীবেই পরিণত হইবে না, সত্যিকার কোনও সাবিত্রীর সন্ধান না পাইয়া ব্যর্থ-জীবন এই সমস্ত হতভাগা সমাজ অঙ্গের কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিণত হইবে। ঠিক সেইরূপ, শরৎ-সাহিত্য পাঠক উন্মত্ত বাঙালী যুবকরা যদি চন্দ্রমুখীর অনুসন্ধানে বেশ্যাপল্লীতে হাঁটাহাঁটি শুরু করিয়া দেয়, তবে কি শত শত তরুণ বাঙালী চন্দ্রমুখীহীন দেবদাসে পরিণত হইবে না? শক্তিশালী লেখকরা তাঁদের বই-এ গণিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া গণিকালয়ে গমনটাকে কি একটা নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে পরিণত করেন নাই? জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে চন্দ্রমুখীর সংখ্যা বাড়িতেছে, না দেবদাসের?

... শরৎচন্দ্রকে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, দু'দশটি বেশ্যার জন্য লক্ষ লক্ষ বাঙালী যুবককে বলি দিবার সময় এ নহে। পরাধীন বাঙালী আজ সাম্রাজ্যবাদীর স্বেচ্ছাচারের অশ্বপদতলে পিষ্ট। তারা আজ অন্নহীন, গৃহহীন; তারা আজ স্বার্থপর ও বিচ্ছিন্ন; প্রভুশক্তির উচ্ছিষ্ট হাড্ডি লইয়া আজ হিন্দু-মুসলমানে কামড়া-কামড়ি চলিতেছে। কোটি কোটি হিন্দু আজ তাদের স্বধর্মীদের দ্বারা অস্পৃশ্য লইয়া পশুর অধম জীবন যাপন করিতেছে; আর এই সমস্ত অভিশাপে তেত্রিশকোটী ভারতবাসীকে আজ কতিপয় বিদেশী সঙ্গীনের আগায় তাড়া করিয়া বেড়াইতেছে। মুষ্টিমেয় বেশ্যার মধ্যে সতীত্বের আকাঙ্খা সৃষ্টি অপেক্ষা কোটী কোটী কাপুরুষের প্রাণে মনুষ্যত্ব, বীরত্বস্বাধীনতার আকাঙ্খা সৃষ্টি করাই কি বড় কাজ নহে? কোটী কোটী বাঙালী যখন আত্মিক খোরাকীর জন্য, জীবন্ত আদর্শের আশায় সাহিত্যিকদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে, তখন বাঙলার সাহিত্য-রথী শরৎচন্দ্র তাঁহাদিগকে বেশ্যা বাড়ীর পথ দেখাইয়া দিয়াছেন; কারণ উহাতে বাঙালীর ভাল না হোক, বেশ্যার তাতে ভাল হইবার সম্ভাবনা আছে!

মোসলমান বাঙালীর দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, তারা বাঙলা সাহিত্যের এমন দুঃসময়ে, সাহিত্যিক আবহাওয়ার এমনি ঝটিকাবর্তের মধ্যে বাঙলা ভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে, যে হিন্দু-বাঙলা সাহিত্যকে ভিত্তি করিয়া মোসলমান তার সাহিত্য সাধনার সৌধ রচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছে, তার অবস্থা ত এই। এই অবস্থা যে শক্তিশালী জাতীয় সাহিত্য গঠনের পক্ষে অনুকূল নহে, এ কথা আমি আমার বিদ্যা-বুদ্ধির অনুরূপ বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই অবস্থা যে ভাবের বহিপ্রকাশ, তাহা শক্তিশালী জাতি গঠনের পক্ষে যতই প্রতিকূল হোক, ইহা যে অ-হিন্দু ভাব এ কথা বলিবার দুঃসাহস বা অধিকার আমার নাই। তথাপি আমার মনে হয় হিন্দুর পক্ষ হইতে এই ভাবের বিরুদ্ধে খুব জোরের সঙ্গে কোনও কথা বলিবার নাই। কারণ, বেশ্যা ও পরকীয়া প্রেমকে হিন্দুরা কি চক্ষে দেখিয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করা সম্ভব নহে।.... পরকীয়া প্রেমের কথা লইয়া উপন্যাস রচনা না করিলেই যে নয়, তার প্রাথমিক কারণ যাই হোক, রাধার প্রেম যে হিন্দু সাহিত্যিককে ঐ দিকে অনেকখানি আগাইয়া দিয়াছে এই

www.pathagar.com

সত্যটাই আমার মনে পড়ে। রাধা হিন্দুর দেবতা। সুতরাং হিন্দুমনের উপর তার প্রভাব অন্যান্য দেবদেবীর চাইতে কোনও অংশেই বেশী হইত না, যদি না চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সরস তুলিকা তাঁকে অমন জীবন্ত মানুষ করিয়া তুলিত। বৈষ্ণব সাহিত্যই রাধাকে দেবীর আসন হইতে টানিয়া নামাইয়া আর দশ জন প্রণয়িনীর সঙ্গিনী করিয়া হিন্দু মনের উপর তাঁর চরিত্রকে এতটা প্রভাবশালী করিয়াছে। পরকীয়া প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সাহিত্যকে হিন্দু বাঙালীরা শুধু ঘৃণা করে নাই তাহা নহে, এই উৎসমুখ হইতেই বাঙলার কবীন্দ্রের কবিত্ব রসধারা উৎসারিত হইয়াছে। কাজেই রাধাকৃষ্ণ চরিত্রে দোষারোপ না করিয়া আমরা চারু, মায়া ও পার্ব্বতীর উপর দোষারোপ করিতে পারি না। এ জন্যই হিন্দু বাঙালীর পক্ষ হইতে রবীন্দ্র ও শরৎ সাহিত্যের প্রতিবাদ খুব জোরে সোরেই হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমার আশা হইতেছে, এ ভার মুসলমানকেই লইতে হইবে। শরৎ-সাহিত্যের মত মাদকতাময় সাহিত্যকে ধাক্কা মারিয়া সরাইয়া দিয়া বাঙালীমনের উপর স্থান লাভ করিতে হইলে যে শক্তিশালী সাহিত্যের দরকার, সে সাহিত্য কেবল তওহীদবাদী মুসলমানই দিতে পারিবে। এ বিশ্বাস অনেকের কাছে পাগলামী মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার এ বিশ্বাসের কারণ আছে। পৃথিবীতে যতপ্রকার ধর্ম্ম ও জাতি আছে, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ইহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর জাতি আছে, তাহারা ভাবুক যতটা, কর্ম্মী ততটা নহে; তাহারা কবিত্বের ধার যতটা ধারে, আইনের ধার ততটা ধারে না। প্রাচীন কালের গ্রীক, মিসরী, ইরাণী ও হিন্দু জাতি এবং বর্তমান যুগে ফরাসী, স্পেনীশ এই শ্রেণীভুক্ত। আর এক শ্রেণীর জাতি আছে ঠিক ইহার বিপরীত। প্রাচীনকালের রোম, বেবোলনীয়, মুসলমান ও বর্তমান যুগের রুশ ও ইংরাজী এই শ্রেণীভুক্ত। প্রথমোক্ত শ্রেণী সৌন্দর্য সৃষ্টি ও সৌন্দর্য পূজায় যে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে, সাম্রাজ্য স্থাপনে সে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতিসমূহ রাজ্য শাসনে যে শক্তির পরিচয় দিয়াছে, শিল্পী হিসাবে সে প্রকার ভোগের পরিচয় দিতে পারে নাই। বর্তমান যুগের হিন্দু মুসলমান প্রাচীন কালের সে বৈশিষ্ট হারায় নাই। হিন্দুরা বাঙালী সাহিত্যকে কবিত্ব দিয়াছে, আইন দিতে পারে নাই, সৌন্দর্য দিয়াছে, পৌরুষ দিতে পারে নাই। কারণ, হিন্দু কবির জাতি। কিন্তু নিভাঁজ কবিত্ব দিয়া জাতির উদ্ধার হয় না। সুতরাং সাহিত্যকে পৌরুষ দান করিতে হইবে। তওহীদবাদী মুসলমানই সাহিত্যে এই পৌরুষের প্রবর্তন করিতে পারে।

মুসলমান অধিকদিন বাঙলা সাহিত্যে নামে নাই। কিন্তু এই অল্প দিনেই নজরুল ইসলাম দেখা দিয়াছে। বাঙলার গীতিকাব্য যখন সুরা, সুন্দরী ও স্বর্গ লইয়া মাতোয়ারা হইতে হইতে অবসাদে মৃতকল্প হইয়া গিয়াছিল, যখন ওদিকে অগ্রসর হইবার আর কোনও পথই ছিল না, যখন কবি-প্রিয়ার ধ্যানে নিতান্ত অকবিরাও অবসন্ন নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেই সময় নজরুল ইসলাম তাঁর কাড়া-নাকাড়া বাজাইতে বাজাইতে বাঙালীর হৃদয় দুয়ারে উপস্থিত হইয়া তাকে এমন সবল ঝাঁকুনী দিয়াছে যে, তার প্রেমের নেশা ছুটিয়া গিয়াছে। বাঙলা গীতি-কাব্যের নূতন তোরণদ্বার খুলিয়াছে। আমার মনে হয়, এমনি করিয়া কথা-সাহিত্যের দিক দিয়াও মুসলমান এমন এক নূতন দিক খুলিয়া দিবে, যাহাতে করিয়া বাঙালী অতি সহজেই শরৎ-সাহিত্যের তীব্র মদিরার প্রভাব কাটাইয়া উঠিবে।

www.pathagar.com

বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সেবা

কাজী আবদুল ওদুদ

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্মঃ ১৮৯৪, ৮ এপ্রিল, বাগমারা, পাংশা, ফরিদপুর। মৃত্যু ঃ ১৯ মে, ১৯৭০, কলকাতা। শিক্ষা ঃ এম, এ ১৯১৯ (ইকনমিক্স), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পেশা ঃ অধ্যাপনা, বাংলা বিভাগ ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গল্প ঃ মীর পরিবার, উপন্যাস ঃ নদীবক্ষে, প্রবন্ধ ঃ নবপর্যায় ১ম খণ্ড (১৯৩৩), নব পর্যায়-২য় খণ্ড (১৯৩৬), সমাজ ও সাহিত্য (১৩৪১), আজকার কথা (১৩৪৮), কবিগুরু গ্যেটে-২ খণ্ড (১৯৫৩), শাশ্বত বঙ্গ (১৩৫৮), হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম (১৯৭৩)।

লেখা-পরিচিতি ঃ 'সওগাত', ১৩৩৯ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

সেকালের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকের দান নগণ্য নয়, বরং এক হিসাবে গৌরবের, অথচ একালের মুসলমান সমাজ যেন বহুদিন পর্যন্ত ভাবতেই ভরসা পান নাই যে, তাঁদের কোন সাহিত্যিক এমন কিছু রচনা করতে পারেন যা দেশের সর্ব্বত এতটুকু সমাদর লাভ করতে পারে; আর কতকটা এই দুঃখে তাঁদের কেউ কেউ ব্যবস্থা দিয়েছেন— বাংলা বাদ দিয়ে উর্দুকেই বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা রূপে ব্যবহার করা উচিত।

বাঙালী মুসলমানের সেকালের সাহিত্য-চর্চ্চা প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে— অনুবাদ সাহিত্য, গাথা সাহিত্য ও মারফতী সাহিত্য।

'পুঁথি সাহিত্য' নামে যে বিরাট 'মুসলমানী' সাহিত্য আছে তা অনুবাদ সাহিত্যের অন্তর্গত করে আমরা দেখতে চাচ্ছি। বলা বাহুল্য, এই পুঁথি সাহিত্যের খুব কম গ্রন্থই অনুবাদ, অধিকাংশই পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের অনুসরণ মাত্র, কতকগুলো তাও নয়, প্রাচীন কাহিনী, কিম্বদন্তী প্রকৃতির বর্ণনা। এই পুঁথি সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আজও হয় নাই।

অনুবাদ সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান কবি আলাওলের। অন্ততঃ এই-ই অনেকের মত। তিনি প্রকৃতই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এতখানি পাণ্ডিত্য নিয়ে আর কোন মুসলমান বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে লেখনী ধারন করেন নাই। সৌন্দর্যবোধও তাঁর ছিল। তাঁর 'পদ্মাবতী' পড়তে গিয়ে অনেক সময়েই মনে হয় বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্রের কথা।

মুসলমান রচিত গাথা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ বোধ হয় মৈমনসিংহ গীতিকার 'দেওয়ানা মাদিনা।' গ্রাম্য ভাষায় এই গাথা রচিত, কিন্তু রচয়িতা সত্যকার কবি বলে তাঁর সৃষ্টি তাতে ম্লান হয় নাই। স্বামী কর্ত্তৃক অকারণে পরিত্যক্ত প্রেমময়ী কৃষককন্যা মদিনার শোকের এক মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকা হয়েছে এতে; আর মদিনার মৃত্যুতে তার এই অপরাধী স্বামীর যে বুকফাটা ক্রন্দনের ছবি কবি এঁকেছেন সাহিত্য-রসিকদের চোখে তা অমূল্য— সীতার বিরহে কৃত্তিবাসের রামের চাইতে চাষী কবি মনসুর বয়াতির অঙ্কিত এই শোক গভীরতর সুন্দরতর।

www.pathagar.com

মারফতী সাহিত্য এক সুবিস্তীর্ণ সাহিত্য। মুর্শীদী গান, দেহতত্ত্ব গান, বাউল গান এর অন্তর্গত। এই মারফতী সাহিত্যের অনেকখানিই তাত্ত্বিকতাপূর্ণ। কিন্তু এর অন্তর্গত কবিত্বময় বাউল গানের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ রচয়িতা— যেমন হাসন রাজা, মদন, লালন শাহ, শেখ ভানু মুসলমান সমাজ উদ্ভুত।

এই মুসলমান বাউলদের সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাদের সাহিত্যিকদের ভাবতে হবে। এই বাউলরা কোন্ সাধনার উত্তরাধিকারী, সুফী সাধনা ও বৈষ্ণব সাধনা অথবা সুফী কবিতা বৈষ্ণব কবিতা এবং কোন্‌টীর প্রভাব এদের উপরে বেশী, এদের নিজস্বতাই বা কি, ইত্যাদি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে তাঁরা হিন্দু মুসলমানের দীর্ঘদিনের পরিচয়ের অনেক গোপন তথ্য উদ্ধার করতে পারবেন। এদের রচনা পড়ে আমার কিন্তু মনে হয়েছে এদের ভাষায় বাংলার বৈষ্ণব কবিতার কোমলতা ও মৃদুতার চাইতে বাএজীদ বোস্তামি, হাফেজ প্রমুখ সুফীদের বাণীর বিদ্যুৎ ভঙ্গি ও দাহই বেশী ফুটেছে। সুফী সাধনা ভারতে এসে এখানকার নানা ভাব-সাধনার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছিল, চট্টগ্রামের দরবেশ আলী রাজা ওরফে কালু ফকিরের "জ্ঞান সাগর" গ্রন্থে তার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

এই পর্যন্ত যে সমস্ত বাউল কবি আবিষ্কৃত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মদন বাউল এক ক্ষণজন্মা কবি। "নিঠুর গরজি তুই মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে" ও "হৃদয় কমল চল্‌তেছে ফুটে কত যুগ ধরে" শীর্ষক তাঁর দুইটি গান ভারতীয় দার্শনিক সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণে উদ্ধৃত করেছিলেন। সমস্ত বাংলা সাহিত্যে মদনের এই গান পরমাশ্চর্য্য সামগ্রী।

এই যে কয়েক শ্রেণীর সাহিত্যের উল্লেখ করা হলো, এ ভিন্ন নানা রকমের পল্লী গান মুসলমান চাষীর কণ্ঠে গীত হয়ে থাকে। সেই সব গানের রচয়িতার নাম প্রায় পাওয়া যায় না। না যাক্, কবিতা বা গান যে রচনা করে শুধু তারই নয় যে মনপ্রাণ দিয়ে পাঠ করে বা গায় তারও বটে। এইভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে বাংলার মুসলমান ভাব-চর্চ্চার আস্বাদ লাভ করে আস্‌চে তার মাতৃভাষার সাহায্যেই।

কিন্তু এই সহজ ধারা একালে এমন বিকৃত হলো কেন? বিকৃত যে হয়েছে কেউই তা অস্বীকার করে না। সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমান ত নানাভাবেই দ্বিধান্বিত, এমন কি মুসলমান চাষীর সেই গানের সাধনার ধারাও অনেকখানি বদলে গেছে।

এ ব্যাপারটী বাস্তবিকই বড় জটিল। বাংলার মুসলিম জীবনের এই বিপর্য্যয়ের প্রথম কারণ রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন বাংলার মুসলমানের সাহিত্যিক জীবনে বিপর্য্যয় আন্‌ল তার সমাজ-গঠন ও কৃষ্টীর দুর্ব্বলতার জন্যই। এই পরিবর্ত্তনে উত্তর-ভারতের মুসলমানের জীবন এমন কৃষ্টীধারা বিচ্যুত হয় নাই। বৌদ্ধ হিন্দু পাঠান আরব. প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণে বাংলার মুমলমানের সমাজ গঠিত। এই বৈচিত্র্য বা বিচ্ছিন্নতা অখণ্ডত্বে রূপান্তরিত হবার সময় ও সুযোগ পায় নাই; মোগল ভারতে আভিজাত্যবোধের লালিত হবার অবকাশ কম ছিল না। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত "সিয়ার মোতাখেরিন"-এর ইংরজী অনুবাদে অনুবাদক স্থানে স্থানে যে মন্তব্য করেছেন তাতে

www.pathagar.com

নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যায়, বাংলাদেশে সাধারণ মুসলমান ও ভদ্র মুসলমানের ভিতরে (একালের মুসলমানের ভাষায় "আশরাফ' ও 'আত্‌রাফের ভিতরে) একটি সুবিস্তীর্ণ ব্যবধান ছিল। এই ভদ্র মুসলমানদের কৃষ্টীর ভাষা ফারসী ও উর্দু ছিল। আর এরূপ ঘটনা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বাংলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বহুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃতকে ব্যবহার করে আসছিলেন তাঁদের কৃষ্টীর ভাষারূপে। রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনে রাজাশ্রয়হীন এই ভদ্র মুসলমান দল অচিরেই শক্তিহীন হয়ে পড়লেন, আর দেশের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য তাদের কৃষ্টী ধ্বংস হয়ে গেল। মুসলমান সমাজের এক অংশে বিপর্য্যয় ঘটবার পরে অন্যান্য অংশ যে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে এ সম্ভবপর নয়।

এর উপর সমস্ত দেশের ভিতরে একটি বড় ব্যাপার ঘটল। বাংলাদেশই নূতন সভ্যতার নিকেতন হয়ে উঠল। বাংলার হিন্দু সমাজে এমন মনীষীর জন্ম হলো যারা এই নূতন বিদ্যা ও কৃষ্টী মনঃপ্রাণে গ্রহণ করবার পথ আবিষ্কার করলেন। এই নব ঐশ্বর্য্য-লব্ধ হিন্দুর সঙ্গে তুলনায় মুসলমান হয়ে চললো দিন দিন অধিকতর শ্রীহীন।

এর কারণ– মনীষীর অভাব। মনীষীর জন্ম কোন কোন সমাজের ভিতরে কখন কখন হয় তা বলা শক্ত। তবে তাঁদের আবির্ভাব না হলে কোনো জাতির বা কোন দেশের জীবনে নূতন উদ্যম যেন অসম্ভব হয়েই থাকে। সমাজ যখন অপেক্ষাকৃত নিম্নতর অবস্থায় থাকে, অথবা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয় তখন তার জন্য মনীষীর প্রয়োজন হয় সব চাইতে বেশী। কিন্তু বাংলার মুসলমান সমাজে প্রয়োজন যত বড়ই হোক, তার সমাজে কোনো মনীষীর আবির্ভাব ঘটে নাই। উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদের আবির্ভাব সেখানকার মুসলমানদের জন্য কল্যাণপ্রসূ হয়েছিল। মনীষী সাধারণতঃ তাঁকেই বলা হয় যাঁর কাছ থেকে তাঁর চারপাশের লোক জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটা নূতন অথচ চিরসত্য দৃষ্টি লাভ করে। সবল-কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্ন এক শক্তিশালী কর্ম্মী তিনি ছিলেন নিশ্চয়ই, তাই সিপাহি-বিদ্রোহের ফলে পশ্চিমী মুসলমানের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আশু প্রতিকারের চেষ্টা তিনি নিপুণভাবেই করেছিলেন। বাংলার হিন্দু সমাজে যে কয়েকজন মনীষীর জন্ম হয়েছে তাঁদের প্রভাব মুসলমানের উপর তেমন কিছুই হয় নাই, তার কারণ তাঁদের বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্র ছিল হিন্দুসমাজ, আর নানা প্রভাবের তাড়না ভোগের ফলে মুসলমানের এমন মনোভাবও ছিল না যে এই সব মনীষীর বাণী ও কর্ম্মের পূর্ণ অর্থ তাঁদের হৃদঙ্গম হবে।

বাউল গানকে আমি সেকালের সাহিত্য বলছি, অথচ যে সব মুসলমান বাউলের নাম উল্লেযোগ্য, তাঁরা সবাই উনবিংশ শতাব্দীর লোক, হয়ত ওহাবী প্রভাবের সমবয়সী অথবা পরবর্ত্তী। মুসলমান বাউল সাহিত্য একালে জন্মেছে বটে কিন্তু তাঁর নাড়ীর যোগ রয়েছে সেকালের অর্থাৎ মধ্যযুগের মরম সাধনার সঙ্গেই, একালের বহির্মুখী জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য তার কিছুমাত্র দরদ আছে তা বোঝা যায় না। মুসলমান সমাজের লৌকিক ধর্ম্মের প্রতিবাদ এ সাহিত্যে আছে বটে, কিন্তু সেই প্রতিবাদ এর ভিতরকার প্রধান কথা নয়, প্রধান কথা হলো বাউল সাহিত্য একালের সাহিত্যেই হতো, এর প্রধান কথা হচ্ছে অন্তর্লোকের এক অপরূপ পরিচয় লাভ করা— যে পরিচয় লাভের ফলে অনুভাবকের জীবন হয়ে ওঠে মধুময়, জগৎ হয় আনন্দনিকেতন।

www.pathagar.com

বাংলার মুসলিম জীবনে ওহাবী প্রভাব ও মনীষীর অভাব সম্বন্ধে বহু কথা বলবার আছে। আপাতঃ শুধু এই কথাটি বলতে চাই যে, বাংলার মুসলমান এক সম্পূর্ণ নূতন পরিবেষ্টনে এখন উপস্থিত, সেই পরিবেষ্টনে আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের জন্য নূতন আয়োজন তার চাই-ই, কিন্তু সেই আয়োজনের উপকরণ সে যে তার চারদিকে সন্ধিগ্ধ ও অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পাবে না, পাবে শান্ত ও সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই, এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাটি সে বুঝছে না এই নব সৃষ্টধর্ম্মী মনীষীর অভাবের জন্যই।

কিন্তু বাঙালী মুসলানের একালের জীবনে এই সব বিপত্তির জন্য সে যে ক্রমাগত অধঃপাতের দিকেই যাচ্ছে তা সত্য নয়। তার কৃষ্টিধারার বিপর্য্যয়, আর্থিক অসচ্ছলতা, রাজনৈতিক দৃষ্টির অভাব, এসব বিড়ম্বনায় তার জীবন বিড়ম্বিত হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এত বিড়ম্বনাভোগের ভিতরেও তার প্রাণপুরুষ যে মুহ্যমানই হয় নাই তার পরিচয় ফুটতে চেয়েছে তার একালের সাহিত্যে। মীর মোশার্‌রফ হোসেনের ও কায়কোবাদের সাহিত্য অলোকসামান্য কিছু নয় বটে, কিন্তু নৈরাশ্য ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পরিবেষ্টনে তাঁরা যে সহজভাবে জীবনকে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, এর হর্ষ বেদনা ও প্রেমের মাধুর্য্য উপভোগ করতে পেরেছিলেন, জগতের অনাত্মীয় কখনো তাঁরা হন নাই— এরও মাহাত্ম্য ত কম নয়। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের প্রথম যৌবনের রচনাও এমনিভাবে হৃদয়গ্রাহী। আর এই সময়ের চিন্তাশীল লেখক হচ্ছেন পণ্ডিত রেয়াজউদ্দিন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলিম জামালুদ্দিন-আল্‌-আফগানীর জীবন-কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর স্বসম্প্রদায়ের নব জীবনারম্ভের কথাও তিনি ভেবেছিলেন।

একালের বাঙালী মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের দৃষ্টি তেমন আকর্ষণ করতে পারে নাই, তার কারণ মনে হয় এর অপ্রাচুর্য্য ও অনবদ্যতার অভাব। কিন্তু যাঁদের জন্য এই সাহিত্য বিশেষভাবে রচিত হয়েছিল তাঁরা যে এর পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে পারেন নাই, এইটি-ই এর গৌরবহীনতার প্রধান কারণ বলে মনে হয়।

তবে এঁদের চাইতে ভাগ্যবান সাহিত্যিকও এ যুগে মুসলমান সমাজে জন্মেছেন— বৃহত্তর দেশে তাঁরা সমাদর লাভ করতে পেরেছেন। আমি নজরুল ইসলাম ও জসীমউদ্দীনের কথা বলছি। মুসলমান সমাজের এই দুই তরুণ শিল্পীর সম্বন্ধে মত প্রকাশ করবার সময় এখনো বহুদূরে থাকুক, কিন্তু এঁরা ধন্য হয়েছেন এই জন্য যে একালের মুসলমান সমাজের অন্তরে তার সাহিত্যিক সার্থকতা সম্বন্ধে এক নব আশার সঞ্চার এঁরাই করতে পেরেছেন।

কিন্তু তবু বলতে হবে বাংলার মুসলমান সমাজে সাহিত্যচর্চ্চার যে অবস্থা, অর্থাৎ লেখক ও পাঠকের যে সম্বন্ধ, তা শুধু অসন্তোষজনক নয়, অনেকখানি আপত্তিকর। পাঠকসমাজের বিচারশক্তি এখনো অত্যন্ত দুর্ব্বল, সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ পুরোপুরি নেবার উদ্দেশ্যে আমাদের অনেক লেখককে অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর রচনায় হাত দিতে। পাঠক-সমাজের অজ্ঞতা এইভাবে দাঁড়াচ্ছে লেখক সমাজের উৎকর্ষলাভের পরিপন্থী হয়ে। এর আর এক ফলও ফলেছে। সেইটী বেশী

www.pathagar.com

মারাত্মক। এমন পাঠককে অবহেলা করবার প্রবৃত্তি একটুখানি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাহিত্যিকের মনে সহজেই আসে। ফলে সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন চরমপন্থী চিন্তাশীল ও পরিবর্ত্তন-ভীত পাঠক-সমাজ এই দুয়ের প্রাদুর্ভাব এই সমাজে হচ্ছে। এই বিরোধের পরিণতি কোথায় জানি না, কিন্তু মুসলিম সভ্যতার এক গৌরব যুগে এমনি ধরনের বিরোধ সমাজে জেগেছিল, আর তার ফল সমগ্র মুসলমান সভ্যতার জন্য অবাঞ্ছিতই হয়েছিল, এ কথাটি সহজেই মনে পড়ে।

তবে এ বিরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী নাও হতে পারে। কিন্তু সে জন্য চেষ্টাও যেন কম না হয়। দেশের সর্ব্বত্র শিক্ষা বিস্তারের প্রেরণা দান, উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র পরিচালনা এসব সাহিত্যিকদের দ্বারা সম্ভবপর হতে পারে, কিন্তু তারও চাইতে বড় কথা এই যে, উদ্দেশ্য-আদর্শের যে বিরোধ একালে মুসলমান সমাজে প্রবল হতে চাচ্ছে তার একটা যোগ্য-মীমাংসার চেষ্টায় যদি সমাজের সব শ্রেণীর চিন্তাশীল অগ্রসর হন তবে কোনো মীমাংসায় উপনীত হতে না পারলেও সমস্ত সমাজের মানস উৎকর্ষের এক অভিনব ভিত্তিপত্তন তাঁরা করতে পারবেন। অবশ্য তার জন্য প্রথম প্রয়োজন এই যে, সব শ্রেণীর চিন্তাশীলই হবেন সত্য ও কল্যাণকামী।. . . .

বাংলার মুসলমানদের দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে যে পরিচয়টুকু আমাদের হলো তা থেকে একথাটি পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, সেকালের বাঙালী মুসলমান সহজভাবেই মাতৃভাষায় সাহিত্যের চর্চ্চা করেছিলেন, আর একালে সে সহজ ধারা কিছুদিনের জন্য বিপর্য্যস্ত হলেও আবার তাতে প্রতিষ্ঠিত হবার পথেই তাঁরা চলেছে। শুধু তাই নয়, পরিবেষ্টনের সঙ্গে প্রেমের যোগ ও অকুণ্ঠিত সত্যানুসন্ধান এ নহিলে যে জীবনে শ্রেয়োলাভ হয় না— এ সত্যে প্রমাণও রয়েছে মুসলমানের সেকাল ও একালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সাধনায়। তবে সাদৃশ্য এমনি ধরনের থাকলেও দুয়ের ভিতরে পার্থক্যও আছে। মধ্যযুগের অন্যান্য চিন্তাশীলের মতো সেকালের মুসলমানও প্রধানত ছিলেন গুরুবাদী ও জীবনের অনিত্যতাবাদী, কিন্তু একালের মুসলমান মুগ্ধ হতে চাচ্ছেন বৈজ্ঞানিকতায় ও জীবনের ঐতিহাসিক বিকাশের দীপ্তিতে।. . .

বাংলার মুসলিম সাহিত্যের বিশেষ পরিবেষ্টন সম্বন্ধেই এতক্ষণ কয়েকটি কথা বলতে চেষ্টা করেছি। এইবার সাধারণভাবে সাহিত্যের আকৃতি প্রকৃতি উদ্দেশ্য আদর্শ সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বললে বক্তব্য নিত্যান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে মনে হয়। আমি সাহিত্যে রস ও সমস্যা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি একথাটীর সঙ্গে আমরা সবাই অত্যন্ত পরিচিত। কিন্তু এর প্রতিবাদ বা সমর্থন কিছুই না করে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি অন্য একটি কথার দিকে— সাহিত্যের উদ্দেশ্য জীবনের সমস্যার সমাধানের প্রয়াস। এই প্রয়াস জ্ঞাতসারেও হতে পারে, অজ্ঞতাসারেও হতে পারে, কিন্তু সমস্যার সোনার কাঠির স্পর্শ না পেলে সাহিত্যিকচিত্তের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না, সাহিত্য সক্রিয় হয় না, এ এত সত্য কথা যে এর প্রমাণ দেবার দরকার করে না। রস অনেক সময়ে এই সমস্যার আনুষঙ্গিক

www.pathagar.com

যেমন ফুলের রং পাপড়ির বিন্যাস তার বীজ কোষের আনুষঙ্গিক। এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করলে সাহিত্য সাংবাদিকতায়ও পর্যবসিত হতে পারে, তবু তা হবে অর্থপূর্ণ– সুপাঠ্য, কিন্তু শুধু রস বা সৌন্দর্য্য সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করলে তা কি বিষম পাগলামির ব্যাপার হয়, বিশেষতঃ এই স্বল্প অবসরের যুগ, বাংলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রস-স্রষ্টাদের রচনায় রয়েছে তার দৃষ্টান্ত। যীশুখৃষ্ট বলেছেন Take not the name of God in vain, সাহিত্য রস ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সেই কথা খাটে,– ও এমনি দুর্লভ ব্যাপারেও যে ও সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে নিপুণভাবে জীবনের সমস্যার আলোচনা ভিন্ন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর কিছু যে করতে পারেন তা মনে হয় না।

এই সমস্যা সাহিত্যের কথা আপনাদের কাছে উত্থাপন করছি কতকগুলো কথা ভেবে। বাংলার মুসলমান এক নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব শুরু করেছে! সেই নূতন জীবনের সূচনায় নানা সমস্যা সহজেই তাকে আঘাত দিচ্ছে। সেই সব সমস্যা যদি গানে, কবিতায়, গল্পে উপন্যাসে, নাটকে, রূপকে কিম্বা নিবন্ধে সে রূপ দিতে চেষ্টা করে তবে বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সম্পদ সে দান করতে পারবে আশা করা যায়। অনেক সময় দেখা যায়, বড় বড় উত্তেজনার মুখে উৎক্ষিপ্ত হয় বড় বড় সাহিত্য।

আমাদের দীর্ঘদিনের অজ্ঞানতার ও অপ্রেমের বেদনা সাহিত্যে সার্থকতা লাভ করুক, এই প্রার্থনা করি।

www.pathagar.com

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

লেখক -পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ১৮৯৭, ধানীখোলা, ত্রিশাল,ময়মনসিংহ। মৃত্যু ঃ ৪ মার্চ ১৯৭৮। শিক্ষা ঃ ঢাকা কলেজ ও রিপন কলেজ, কলকাতা। পেশা ঃ সাংবাদিকতা। সম্পাদক, তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ খরতরঙ্গ (১৯৫৭)। গল্প ঃ ত্রিস্রোতা (১৯৪৪)। প্রবন্ধ ঃ দৃষ্টিকোণ (১৯৬০)। শিশু সাহিত্য ঃ কচিপাতা (১৯৩৫)। ভ্রমণকাহিনী ঃ নতুন চীন নতুন দেশ (১৯৬৫)। স্মৃতি কথা ঃ অতীত দিনের স্মৃতি (১৯৬৮)। ইতিহাস ঃ পলাশী থেকে পাকিস্তান (১৯৬৮)। অনুবাদ ঃ অনাবাদী জমি (টুর্গেনিভের উপন্যাস, ১৯৪৩), ইলিয়াড (হোমারের গদ্যানুবাদ), (১৯৬৭) তৈমুরলঙ্গ। পুরস্কার ঃ অনুবাদে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭০)।

লেখা-পরিচিতি ঃ বার্ষিক 'সওগাত' ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত।

সাহিত্য চিরন্তনের সাধনা-ক্ষেত্র। বিশ্বমানবের সার্ব্বভৌব মনোভাব, অনুভূতি ও জীবন প্রবাহের বিকাশক্ষেত্র সাহিত্য। ইহাতে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। ব্যক্তি, সমাজ, সম্প্রদায়, জাতি প্রভৃতি বিশ্বমানবের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহাদের সমগ্র স্বরূপই সাহিত্যের বিষয়ীর্ভুত নহে। ইহাদের মধ্যে যাহা-কিছু বিশ্বজনীন, যাহা-কিছু মানবতার অনুকূল, যাহা সমগ্র মানব-অনুভূতিতে একটা সাড়া দিতে পারে, তাহাই চিরন্তন, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্য তাই দেশ-কাল-পাত্রে আবদ্ধ নহে; সাহিত্য তাই সর্ব্বদৈশিক, সর্ব্বকালিক এবং সার্ব্বজনীন। একদেশের সাহিত্যকে যখন অন্যদেশের সাহিত্য-রসিকগণ আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারে, এক যুগের সাহিত্য হইতে যখন তাহার বহু পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যও রস সংগ্রহ করিতে পারে এবং সাহিতোক্ত ব্যক্তির বাণীতে যখন বিশ্বের সাহিত্যরসিক ব্যক্তিগণ অন্তরের বাণী শুনিতে পান, তখন সেই সাহিত্য হয় চিরন্তন—সেই সাহিত্যই প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্য হয়। তাই হাফেজ-ওমর খাইয়াম, হোমার-দান্তে, মিল্টন-সেকস্‌পিয়ার, কালীদাস-চণ্ডীদাস, প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন যুগের সাহিত্য সাধকগণের বাণী দেশ, কাল ও পাত্রের ব্যবধান এড়াইয়া আজিও মানবজাতির হৃদয়ে অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে।

মানব দেশ, কাল ও পাত্রের অধীন। কিন্তু মানবের মন দেশ-কাল-পাত্রের দাস নহে।— দেশ, কাল, পাত্রের নিয়ামক সে। সুতরাং তাহার বিকাশ দেশ-কাল-পাত্রের ছাপ লইয়াও দেশাতীত, কালাতীত ও পাত্রাতীত। সুতরাং মানব-মনের বিকাশস্থল সাহিত্যে দেশ-কাল-পাত্রের সংকীর্ণ ঝড়-ঝঞ্ঝা-কোলাহলের পারিপার্শ্বিকতা ইহার প্রকাশভঙ্গিতে বাহিরের রূপ হিসাবে স্থান পাইলেও উহাই তাহার অন্তরের বাণী হইতে পারে না। দেশ-কাল-পাত্রের মধ্যে যাহা চিরন্তন, যাহা সর্ব্বকালজয়ী, তাহাই সাহিত্যের জিনিস।

www.pathagar.com

দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গে সর্ব্বদেশিকতা, সর্ব্বকালিতা ও সার্ব্বজনীনতার সম্পর্ক এই। চিরন্তন দেশ-কাল-পাত্রেই প্রকাশ বটে, কিন্তু ইহাদের দ্বারা সে আবদ্ধ নয়। সে মুক্তচারী, গতি তার সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে এবং পাত্রে। তাই সাহিত্যে জাতির, সাম্প্রদায়িকত্বের গণ্ডি নাই। তাই সেক্‌স্‌পিয়ার-রচিত সাহিত্য পাঠে আমাদের জাতি যাওয়ার আশঙ্কা নাই, আবার আমাদের সাহিত্য পড়িয়াও ইউরোপীয়দের খৃষ্টানধর্ম্ম রসাতলে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু সাহিত্যের অন্তরভাগ চিরন্তনের সাধনা-ক্ষেত্র হইলেও তাহার বহির্ভাগ দেশ-কাল-পাত্রেরই লীলাভূমি। কারণ মানব-মনের চিরন্তন মনোভাবগুলি বিভিন্ন দেশে, বিভিন্নকালে এবং বিভিন্ন পাত্রে ঠিকভাবে প্রকাশ পায় না। উদাহরণস্বরূপ 'প্রেমে'র কথা ধরা যাউক। 'প্রেম' মানব-মনের চিরন্তন অনুভূতি। কিন্তু ইহার প্রকাশ বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন পাত্রে ঠিক একভাবে হয়না। ইউরোপীয়দের প্রেম-প্রকাশ-প্রণালী যেরূপ, আমাদের দেশে তাহা সেরূপ নহে, কিংবা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে-ভাবে প্রেমের বিকাশ হইত, এখন সেরূপ নহে, কিংবা যদু তাহার স্ত্রীর সহিত যে প্রকারে প্রেমচর্চ্চা করে, রহিমের প্রেমচর্চ্চা হয়ত ঃ তাহা হইতে অন্য রকমের। সুতরাং সাহিত্যের বহিরঙ্গ অর্থাৎ প্রকাশভঙ্গী দেশ কাল-পাত্রের অধীন। এমন কি, এই প্রকাশভঙ্গী দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী করিতে না পারিলে সাহিত্যসৃষ্টি সার্থক হয় না, সুন্দর হয় না— অস্বাভাবিক হইয়া উঠে।

আমার এত কথা বলিবার কারণ,—সম্প্রতি বাঙ্গলা সাহিত্যে চিরন্তনের দোহাই দিয়া এই দেশ-কাল-পাত্রানুসারী প্রকাশভঙ্গিকে অভিশপ্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের সাহিত্য। কিন্তু এ-যাবত এই বাঙ্গলা সাহিত্যের যা-কিছু গৌরব হইয়াছে. তা প্রায় বাঙ্গালী হিন্দুগণের দ্বারাই হইয়াছে। শিক্ষাদীক্ষায় অনুন্নত মুসলমান এ-যাবত বাঙ্গলা সাহিত্য-সেবায় এক রকম উদাসীন ছিলেন বলিলেই চলে। আর মুসলমানদের মধ্যে যাহারা ইতিপূর্ব্বে ইহার সেবার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারা সাধারণতঃ প্রতিভাশালী হিন্দু সাহিত্যিকগণেরই সাহিত্যাদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন। ইহাই স্বাভাবিক, কারণ সাহিত্য সেবায় নূতন ব্রতিগণের পক্ষে অগ্রগামিগণের অনুসরণ অপরিহার্য্য। কিন্তু সম্প্রতি বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানদের মধ্যে প্রতিভাশালী লেখকগণ দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের হস্তে বাঙ্গলা সাহিত্যে অত্যন্ত স্বাভাবিকরূপেই মুসলমানী রূপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতেই গণ্ডগোল পাকিয়া উঠিয়াছে। হিন্দু সাহিত্যিকগণ ইহাকে চিরন্তনের পরিপন্থী বলিয়া হুঙ্কার দিতে শুরু করিয়াছেন। কোথায় তাঁহারা ইহাকে সাহিত্যের নূতন বৈচিত্র্য বলিয়া অভিনন্দন করিবেন,—তা না করিয়া তাঁহারা ইহাতে বাঙ্গলা সাহিত্যের জাতিনাশের কাল্পনিক বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা তাঁহারা যে রূপ-সজ্জায় বাঙ্গলা সাহিত্যকে সাজাইয়াছেন, তাহাই তাহার একমাত্র রূপকেই চিরদিন অনুসরণ করিয়া চলিবেন। কিন্তু এ-ধারণা ত সত্য হইতে পারে না। উভয়ের ধর্ম্মই পৃথক এবং ধর্ম্মের প্রভাব মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীর উপর অনেকখানি। সুতরাং বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান

www.pathagar.com

উভয়েই এক দেশের ও এক পারিপার্শ্বিকতার বাশিন্দা হইলেও ধর্ম্মের প্রভাবের জন্য উভয়েরই জীবনযাত্রা প্রণালী অনেকখানি পৃথক। কাজেই তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি অনেকখানি পৃথক হওয়াই ত স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় মুসলমান-সৃষ্ট সাহিত্যে মুসলমানী প্রকাশভঙ্গি দেখিয়া হিন্দু সাহিত্যিকগণের আতঙ্কিত হইবার কি আছে, বুঝি না। ইহা ত সাহিত্যের একটা বৈচিত্র্য। হিন্দুধর্ম্ম আদর্শবাদের দিকে যত দৃষ্টি দিয়াছে, বাস্তবের দিকে তত নজর দেয় নাই; তাই তার মধ্যে জ্ঞানের সাধনা যতটা আছে, কর্ম্মের সাধনা ততটা নাই,-ভাবতান্ত্রিকতা যতটা আছে, বস্তুতান্ত্রিকতা ততটা নাই। কিন্তু ইস্‌লাম আদর্শ ও বাস্তবের সামঞ্জস্যসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে; তাই তার মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম্ম হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে—ভাব ও বস্তু, দীন ও দুনিয়া কেহ কাহাকে ছাড়িয়া চলিতে পারে না। তাই হিন্দুধর্ম্মে চরম আদর্শবাদ অহিংসাকে যতটা উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে, হিংসাকে ততটা দেওয়া হয় নাই; কিন্তু মুসলিম ধর্ম্মে অহিংসা ও হিংসার সমান আসন,— প্রয়োজনানুসারে উভয়ের ব্যবহারই অপরিহার্য্যরূপে ধার্য্য করা হইয়াছে। কাজেই ধর্ম্মাদর্শের পার্থক্য হিন্দু-মুসলমানের জীবন-যাত্রা-প্রণালীতেও যে একটা পার্থক্য ঘটিবে, ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। তাই হিন্দুসাহিত্যে বৈষ্ণবভাবের বাহুল্য ঘটিয়াছে—ইহার রূপে মেয়েলী কোমলতাই বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মুসলমান-সৃষ্ট সাহিত্যে ইহার হুবহু অনুকরণ আশা করা যায় না। কারণ মুসলমান বাস্তব এবং রুদ্রেরও সাধক বটে। কাজেই তার সৃষ্ট সাহিত্যে শুধু মেয়েলী কোমলতাই থাকিবে না, পুরুষালী বলশালীতাও থাকিবে বৈকি! এই পুরুষালী বলশালীতাকে 'পালোয়ানের মাতামাতি' বলিয়া বিদ্রুপ করা সহজ বটে, কিন্তু এই বিদ্রুপ কি চিরন্তনের সাধনাকেই বিদ্রুপ করিতেছে না?

এই ত গেল ভাবের দিক দিয়া মুসলমানী রূপের কথা। কিন্তু ভাষায় মুসলমানী রূপ লইয়াও কথা উঠিয়াছে। মুসলমানরা সাহিত্যে দৈনন্দিন কথাবার্ত্তার ভাষায় ব্যবহার্য্য দু'চারটা আরবী-পারসী-উর্দ্দু শব্দ ব্যবহার করেন বলিয়া হিন্দু সাহিত্যিকরা ভাষায় জাতিনাশের আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা 'ফতোয়া' জারী করিয়াছেন, যেহেতু এ ভাষা বাঙ্গালীর (অর্থাৎ হিন্দুর) অবোধ্য, কাজেই ইহা অচল! এখানে হিন্দু সাহিত্যিকগণের সেই সঙ্কীর্ণ মনোভাবই ক্রিয়া করিতেছে। বাঙ্গালী হিন্দুদের কথাবার্ত্তার ভাষার স্থান যদি বাঙ্গলা সাহিত্যে থাকিয়া থাকে, তবে বাঙ্গালী মুসলমানদের দৈনন্দিন কথোপকথনের ভাষার স্থান কেন থাকিবে না? এতদিন প্রতিভাশালী মুসলমান সাহিত্যক্ষেত্রে আগমন করেন নাই,— তাই নূতন-ব্রতী মুসলমান সাহিত্যিকগণ হিন্দু কথোপকথনের ভাষাই সাহিত্যে চালাইয়াছেন। কিন্তু তাহাই তাহাদের খাঁটী ভাষা নহে। এখন প্রতিভাশালী মুসলমান লেখকগণ মুসলমানদের স্বাভাবিক ভাষা সাহিত্যে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে এত আপত্তি কেন? নূতন শব্দগ্রহণের পক্ষে কি বাঙ্গলা ভাষার দ্বার রুদ্ধ? বাঙ্গলা ভাষা কি বিভিন্ন ভাষার শব্দগ্রহণ করিয়াই সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই?

তবে কথা উঠিতে পারে যে, আরবী-পারশী-উর্দ্দু শব্দগ্রহণে বাঙ্গলা ভাষার আপত্তি থাকিতে পারে না, তার আপত্তি অপ্রচলিত শব্দ লইয়া। কিন্তু প্রচলিত ও অপ্রচলিত শব্দ নির্ণয় করিবার মানদণ্ড কি? এই দুই রকম উত্তর হইতে পারে। এক উত্তর,—বাঙ্গলা ভাষায়

www.pathagar.com

পূর্ব্বে যাহা চলিয়া গিয়াছে–তাহা কথোপকথনের ভাষা হউক বা না হউক—তাহাই প্রচলিত শব্দ; আর এক উত্তর,—বাঙ্গালী কথোপকথনের ভাষায় যাহা ব্যবহার করে, তাহাই প্রচলিত শব্দ। প্রথম উত্তর সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য, পূর্ব্বে যাহা চলিয়া গিয়াছে, এ কথার অর্থ কি? বাঙ্গলা ভাষায় যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহা হয় ত এক সময়ে অপ্রচলিত ছিল, এখন তাহা ব্যবহারে প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাষার সৌষ্ঠবের জন্য বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতেও ত এমন অনেক শব্দ প্রচলিত হওয়া আবশ্যক, যাহা বর্ত্তমানে অপ্রচলিত। কেবল প্রাচীনত্বের দোহাই দিলে ত চলিবে না। পূর্ব্বে যে প্রথা চলিয়াছে তাহা বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতেও চলিবে— সে অধিকার কেবল পূর্ব্বকালের জন্যই রিজার্ভ করা থাকিতে পারে না। অনেক সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহা মুসলমানদের নিকট গ্রীক। এই দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শব্দের প্রচলন যদি আপত্তি না উঠে, তবে মুসলমানী tradition, allusion প্রভৃতির প্রকাশের জন্য দু'চারটা আরবী–পারশী–উর্দ্দু শব্দ প্রচলনে হিন্দু সাহিত্যিকদের আপত্তির কারণ কি? দ্বিতীয় উত্তর সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য,—কথোপ-কথনের ব্যবহৃত ভাষাই যদি প্রচলিত হয়, তবে কথোপকথনের ভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বাঙ্গলা সাহিত্যে দেখি কেন? অনেক সংস্কৃত শব্দের অর্থ খুঁজিতে যে কেবল মুসলমানদিগকেই অভিধান হাতড়াইতে হয় তা নয়, হিন্দুগণও সে-কার্য করিয়া থাকেন। এর অর্থ কি? কাজেই বুঝিতে হইতেছে যে, শুধু কথোপকথনের ভাষাই সাহিত্যের ভাষা নয়,— বিষয়ের তারতম্যানুসারেই সাহিত্যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তবে আমরা মনে করি, গদ্য রচনায় সাধারণতঃ কথোপকথনের ভাষাই ব্যবহৃত হওয়া উচিত, কিংবা তার কাছাকাছি সরল সোজা ভাষার ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু গদ্যরচনা সম্বন্ধে একথা খাটিলেও কবিতা রচনার বেলায় একথা খাটিতে পারে না। অলঙ্কার, ছন্দ, মিল ইত্যাদির সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য কবিতায় অনেক সময় ভাষা নির্ব্বাচনে স্বাধীনতা শুধু আবশ্যক নয়–অপরিহার্য্য। তাই আধুনিক হিন্দু কবিদের রচনায়—বিশেষতঃ গম্ভীর ও রুদ্ররসাশ্রিত কবিতায়ও আমরা অনেক সময় অপ্রচলিত, সর্ব্বসাধারণের দুর্ব্বোধ্য, দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই— যা শুধু মুসলমান কেন অনেক হিন্দুর নিকটও গ্রীক। বাস্তবিক কবিত্ব–সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া এরূপ প্রয়োগ অনেক সময় অত্যাবশ্যক। সেইরূপ মুসলমানী রূপবিশিষ্ট রুদ্ররসাশ্রিত কবিতায়ও মুসলমানী tradition allusion-এর সম্যক প্রকাশের জন্য অনেক সময় এমন অনেক আরবী–পারশী–উর্দ্দু শব্দের প্রয়োগ অপরিহার্য হইয়া পড়ে— যা হিন্দু, এমন কি অনেক সাধারণ মুসলমানের নিকটও হয়ত আপাতঃ দুর্ব্বোধ্য। কবিদের এই licence সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। এর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা শুধু পণ্ডশ্রম নয়,—অন্যায়ও। তারপর ব্যাকরণ, ভাষা–বিজ্ঞানের নিয়মকানুন সব সময় মানিয়া চলা প্রতিভাশালীর কাজ নয়।

বাঙ্গলা সাহিত্যে ভাবের এবং ভাষার মুসলমানী রূপ বিদ্রুপের জিনিস নহে, ইহাতে সাহিত্যের সম্পদই অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যে রুদ্ররস খুব বেশী ছিল না। মুসলমান প্রতিভা এই রুদ্ররস সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিয়াছেন। এই

www.pathagar.com

পরাধীন জাতির পক্ষে ইহা কম লাভজনক হয় নাই। কোমলতা যতই উপভোগ্য ও সুন্দর হউক না কেন, পরাধীন জাতির পক্ষে তা খুব স্বাস্থ্যকর নয়। এই মেরুদণ্ডহীন জাতির পক্ষে বৈষ্ণবী প্রেম অপেক্ষা রুদ্রের আহ্বানই অধিক দরকারী। কাজেই এই জাতীয় প্রয়োজন হিসাবেও সাহিত্যে মুসলমানী রূপ সর্ব্বতোভাবে বরণীয়। ইহাতে বাঙ্গলা সাহিত্যে নবযুগ সূচিত হইয়াছে। মানুষের দরবারে এ-জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইলে শুধু বৈষ্ণবী প্রেম দ্বারাই কিছু হইবে না, পুরুষোচিত সবলতা এবং দৃঢ়তাও অত্যাবশ্যক। সাহিত্যের এই নবযুগ সেই পৌরুষই আনিয়া দিয়াছে। সুতরাং ইহাকে বরণ করিয়া লইলে এ জাতির পরম লাভই হইবে।

এই ত গেল সাহিত্য সম্বন্ধে হিন্দু মনোভাবের কথা। মুসলমান সমাজেও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়াছে। একশ্রেণীর মুসলমান সাহিত্যিকের মতে সাহিত্যকে শুধু মুসলমানী রূপ দিলেই চলিবে না,—ইহাকে একেবারে আস্ত 'মুসলমান সাহিত্য' করিয়া তুলিতে হইবে। ভাষা অনুসারে সাহিত্যের নামকরণ হয় বলিয়া আমরা জানি,—যেমন ইংরেজী সাহিত্য, পারসী সাহিত্য, আরবী সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্য ইত্যাদি। ধর্ম্মানুসারে সাহিত্যের নামকরণের কথা আমরা এ যাবত শুনি নাই। সুতরাং 'মুসলমান সাহিত্য' কথাটা বুঝিতে পারা গেল না। তবে কথাটার অর্থ যদি হয় 'মুসলমানী রূপযুক্ত বাঙ্গলা সাহিত্য' তাহা হইলে আমরা তাহা বুঝিতে পারি। বাঙ্গলা সাহিত্যের যে একটা মুসলমানী রূপ আছে, তাহা আমরা জানি এবং মানি। উপরে তাহাই আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।......

জাতির যখন অধঃপতন হয়, বর্ত্তমানের সহিত তাল রাখিয়া চলা যখন আর তার সামর্থ্যে কুলায় না, তখনই তার অতীত-প্রীতি জাগিয়া উঠে। অতীতের স্মরণ মনন খুব ভাল কথা, কারণ অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ত্তমানের চলার পথ অনেকখানি আলোকিত হইতে পারে। কিন্তু এই স্মরণ, মনন ছাড়িয়া যখন অতীতের প্রতি অহেতুক প্রেম জাগিয়া উঠে— যখন অতীতকেই আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিবার উৎকট বাসনা মনে জাগিয়া উঠে, তখন বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমানের চলার পথ সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। এ-ভাব অত্যন্ত মারাত্মক; ইহা মৃত্যুরই অরিষ্ট লক্ষণ— যেমন বৃদ্ধকালে মানুষের মনে শৈশবের মোহ জাগিয়া উঠে। এই অতীত মোহের কবলে পড়িয়া এই শ্রেণীর সাহিত্যিকগণ পুরাতন Semitic Culture ফিরাইয়া আনিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখেন না, সেই Semitic Culture-এর পরিণতিই বর্ত্তমানের এই European Culture,-ইহা Semitic Culture-এরই forward step. সুতরাং Semitic Culture ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায়-যদিও তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব-আমাদের কোনই লাভের আশা নাই; তাহাতে জগতের সাথে তাল রাখিতে না পারিয়া আমরা পিছাইয়া পড়িব মাত্র। অতীত কখনো ফিরিয়া আসিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন দৃষ্টান্ত নাই। Greek Culture, Roman Culture ফিরিয়া আসে নাই, আসিবার কোন সম্ভাবনাও নাই। Semitic Culture ও European Culture কে ডিঙ্গাইয়া ফিরিয়া আসিবে, এমন কল্পনাও সুস্থ মস্তিষ্কে সম্ভব না,—ফিরাইয়া আনিবার কোন আবশ্যিকতাও

www.pathagar.com

নাই। কারণ Semitic Cultuer-এর সার অংশ বর্ত্তমান European Culture এই মিশিয়া আছে। Greek Culture এর পরিণতি Roman Culture, Roman Culture এর পরিণতি Semitic Culture এবং Semitic Culture এর পরিণতিই এই European Culture, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত Culture এর সংমিশ্রণ ফলেই বর্ত্তমান Culture এর জন্ম হইয়াছে। আর একটা নূতন Culture এবং সভ্যতার জন্ম দিতে হইলে বর্ত্তমান Culture এর ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে, অতীতের মোহ নিয়া থাকিলে চলিবে না।.... ইউরোপীয় Culture- এ অনেক দোষ ত্রুটি ঢুকিয়া পড়িয়াছে সত্য, বর্ত্তমানের অনেক সাময়িক জঞ্জাল ইহাতে স্থান পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা একান্তই স্বাভাবিক। কোন Culture-ই এই সাময়িক আবর্জ্জনার হাত এড়াইতে পারে নাই। ভবিষ্যৎ সভ্যতা ও নূতন কালচারের জন্ম দিতে হইলে দোষ-ত্রুটি সমন্বিত বর্ত্তমান Culture-এর ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে এবং নূতনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ Culture বর্ত্তমান Culture এর forward step হইবে- backward step নহে।

অতীতের ভূত যে পর্য্যন্ত না আমাদের ঘাড় হইতে নামিয়া যাইতেছে, ততদিন আমাদের এই অভিশপ্ত জীবনের ভার বহন করিয়া চলিতেই হইবে। তবে আশার আলোক যে একেবারে দেখা যাইতেছে না, এমন কথা বলিতে পারি না। কারণ এই অভিশপ্ত দেশেও মুক্তির আকাঙ্খা জাগিয়াছে এবং এই অভিশপ্ত মুসলমান সমাজেও স্বাধীনচিন্তার স্ফূরণ দেখা যাইতেছে। মুসলমান সৃষ্ট সাহিত্যেও আসিয়া এই স্বাধীন চিন্তার আলোক স্পর্শ করিয়াছে। অধিকাংশ বাঙ্গালী মুসলমান এখনও আলোক অপেক্ষা অন্ধকারেই থাকিতে ভালবাসেন। কাজেই এই আলোক–স্পর্শ তাহাদের অন্ধকারের নির্জ্জন সুপ্তি-সুখে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে; ফলে তাঁহারা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতেছেন। ইহাও মন্দের ভাল। কারণ সুপ্তির জীবন্মৃত অবস্থা হইতে বিরক্তি প্রকাশের সচল পরিচয় অনেক প্রার্থনীয়। বিরক্তি প্রকাশ করিতে করিতে শেষে হয়ত ঃ তাঁহাদের সুপ্তির ঘোর কাটিয়া যাইতে পারে। আমরা সেই আশায়ই রহিলাম। খোদা তেমন শুভদিন নিকটবর্ত্তী করুণ!

অতীতে ইসলামের নামে যে বিশ্বসভ্যতা সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতেই এখন আমাদিগকে রসদ সংগ্রহ করিয়া যুগের সহিত পা রাখিয়া চলিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের চলা সার্থক হইবে— আমরা আবার গৌরবের উচ্চ শিখরে উঠিতে সমর্থ হইব। যিনি সাহিত্যে এই যুগোপযোগী চলার মন্ত্র দিতে পারিবেন, তিনিই জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার করিবেন— তাঁহারই সাহিত্য–সাধনার সঞ্জীবনী মন্ত্রে এ–জাতি আবার জাগিয়া উঠিবে।

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান

লেখক-পরিচিতি ঃ 'বাংলা ভাষায় মুসলিম অবদান' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

লেখা-পরিচিতি ঃ এটি লেখকের কোনো শিরোনামভুক্ত পৃথক প্রবন্ধ নয়। তাঁর রচিত 'বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস' (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯; তৃতীয় প্রকাশ ঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা ১৯৯২) থেকে গৃহীত।

বার শত খৃষ্টাব্দে মুসলমান বিজেতা হিসাবে বাঙ্গালাদেশে প্রবেশ করেন। এই সময়ের কিছু পূর্ব হইতেই সমগ্র ভারতবর্ষে এক নূতন সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন হইতে থাকে। দেশ বিজয় এই সংস্কৃতি স্থাপনে সাহায্য করিয়াছে সত্য কিন্তু মুসলিম সংস্কৃতির বিস্তার শুধু দেশ বিজয়ের ফলে ঘটে নাই। বাঙ্গালাদেশ বিজিত হইবার বহু পূর্বেই ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিম অঞ্চল মুসলমান অধিকারে আসিয়াছিল। কিন্তু তবু দেখা যায় বাঙ্গালাদেশেই মুসলিম জনসংখ্যা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বেশী। অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গালাদেশই অধিককাল মুসলিম আক্রমণ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। অথচ এই বাঙ্গালাদেশে এত মুসলিম জনসংখ্যা বাড়িয়া যাইবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

রাজ্য জয়ের সহিত ইসলামিক সংস্কৃতি বিস্তারের সম্পর্ক থাকিলেও তাহাই একমাত্র কারণ নয় এবং হয়ত প্রধান প্রধান কারণও নয়; প্রধান কারণ মুসলিম সমাজে সকল মানুষের সমান অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া। মানুষের অধিকার যেখানে সবচেয়ে ক্ষুণ্ন হইয়াছিল সেইখানেই ইসলাম সবচেয়ে বেশী বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই কারণেই দ্রাবিড় অঞ্চলগুলিতে যেখানে ব্রাহ্মণ্য শাসনের প্রভাবে মানুষের চরম অধঃপতন ঘটিয়াছিল সেই সব অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী নূতন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

"But it is not the ancient centres of the Muhammadan government that the Musalmans of Bengal are found in large numbers, but in the country districts, in districts where there are no traces of settlers from the west, and in places where low-caste Hindus and out castes were abound". "In Bengal the Muslim missionaries were welcomed with open arms by the aborigines and the low castes on the very outskirts of Hinduism, dispised and condemned by their proud Aryan rulers. To these poor people fishermen, hunters, pirates and low-caste tillers of the soil, Islam came as a revelation from on high....

www.pathagar.com

Its missionaries were men of zeal who brought the Gospel of the Unity of God and the equality of men in its sight to a desspised and neglected population. The initiatory rite rendered relapse impossible, and made the proselyte and his posterity true believers for ever. In this way Islam settled down on the richer alluvial province of India. It offered to the teeming low castes of Bengal, who had sat for ages abject on the outermost pale of the Hindu community, a free entrance into a new social organisation.

চট্টগ্রাম ও ভারত-মহাসাগরের বাণিজ্য প্রধান দ্বীপগুলিতে বহু পূর্ব হইতে ধর্ম্ম প্রচারক আরব বণিকদের প্রতিষ্ঠা ঘটিলেও ভারতের অভ্যন্তরে এরূপ প্রচারক অধিক সংখ্যায় বার শত খৃষ্টাব্দ অথবা তাহার কিছু পূর্ব হইতেই তাঁহাদের প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। ভারতের বিভিন্ন অংশে এই সময় হইতে মুসলমান বণিক, ফকির, দরবেশ ও মৌলবী সকলে মিলিয়া যে ইসলাম প্রচারের স্রোত বহাইয়া দেন তাহার ফলে অল্পদিনের ভিতরেই নানা স্থানে সামাজিক বিপ্লবের সূচনা হয়। প্রচারকদের মধ্যে দক্ষিণাত্য ও বাঙ্গালাদেশের প্রচারকরাই সবচেয়ে বেশী সফলকাম হন। বাঙ্গালাদেশের মত দাক্ষিণাত্যেও দ্রাবিড়রা বহুদিন পর্য্যন্ত আর্য্য শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অবশেষে তাহাদের দাস হইয়া পড়েন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া পড়ে যে, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের ছায়া স্পর্শ করিলেও দেহ অপবিত্র হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেন। সেইজন্য তাঁহাদের ঘন্টা বাজাইয়া পথ চলিতে হইত।

"In the western coast districts the tyrany of caste intolerance is peculiarly oppressive; to give but one instance, in Travancore certain of the lower castes may not come nearer than seventy four paces to a Brahman, and have to make a grunting noise as they pass along the road, in order to give warning of their apprroach. Similar instances might be abundantly multiplied. What, wonder, then that the Musalman population is fast increasing through conversion from these lower castes, who thereby free themselves from such degrading oppression, and raise themselves and their descendants in the social scale?

In fact the Mappilas on the west coast are said to be increasing so considerbly through accessions from the lower classes of Hindus, as to render it possible that in a few years the whole of the lower races of the west coast may become Muhammadans."

www.pathagar.com

পশ্চিম উপকূলের শহরগুলিতে দশ শত খৃষ্টাব্দ হইতে মুসলমান আরব বণিকরা বসতি স্থাপন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার ও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে থাকেন। পশ্চিম উপকূল হইতেই ইসলাম, ধর্ম্মপ্রচারক সাহায্যে ক্রমে ক্রমে লাক্ষা দ্বীপ ও মালদ্বীপে ছড়াইয়া পড়ে। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে মালদ্বীপের শাসনকর্ত্তা ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মালদ্বীপের এই প্রথম মুসলমান সুলতানের নাম আহমদ শানুরাজা। চতুর্দ্দশশত খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ইবনে বতুতা কিছুকাল মালদ্বীপে বাস করিয়া এই সুলতানের দৌহিত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

দ্বাদশশত খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত দরবেশ খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তী আজমীরে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। আজমীরে প্রবেশ কালে তাঁহাকে নানাস্থানে নানা রূপ বাধা পাইতে হয়। আজমীরে থাকিবার সময়েও সেখানকার রাজা ও দেশবাসী নানাভাবে তাঁহাকে উৎপীড়ন করে। কথিত আছে অলৌকিক শক্তির মহিমায় সে সমস্ত অত্যাচারকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তী শুধু আজমীরের সাধারণ নাগরিক নয়—রাজার অনেক বিশ্বস্ত অনুচরকেও ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হন। এমন কি রাজগুরু বিখ্যাত যোগী ও ঐন্দ্রজালিক অজয় পালও এই অসীম ক্ষমতাশালী দরবেশের প্রভাবে নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। দিল্লী হইতে মাত্র ৪০ জন বিশ্বস্ত সঙ্গীসহ তিনি আজমীর যাত্রা করেন। এই সময়ে দিল্লী ও আজমীরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন-রাজা পৃথ্বিরায়। তিনি আজমীরে থাকিয়াই রাজকার্য্য চালাইতেন। তাঁহার ছোট ভাই খাঁড়া রায় তাঁহার অধীনে দিল্লী শাসন করিতেন।

পৃথ্বি রায়ের পিতা সুমিষ রায় নাকি মৃত্যুকালে পুত্রকে বলিয়াছিলেন— পৃথ্বি রায়ের রাজ্যের কোন হিন্দু কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তবে একজন মুসলমান ফকির তাঁহার রাজত্বকালে ইসলাম প্রচার করিতে আসিবেন। তিনি ঐশী শক্তির সাহায্যে নানা অসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। তাঁহার নিকট কাহারো কোন প্রকার বলই কার্য্যকরী হইবে না। সুমিষ রায় এসব তথ্য জ্যোতিষবিদ্যার সাহায্যে জানিতে পারিয়া পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন এই মহাপুরুষের আগমণ ঘটিলে তাঁহার যেন কিছুতেই অবমাননা না হয়।

পৃথ্বি রায় পিতার এসব উপদেশে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। সামান্য ফকিরকে ভয় করিয়া রাজত্ব চালানো তাঁহার অত্যন্ত হেয় মনে হইয়াছে। তাই ফকিরের দিল্লী আগমনের সংবাদ পাইয়া একজন গুপ্ত ঘাতককে দিল্লীতে ফকিরকে হত্যা করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। কথিত আছে, ঘাতক দিল্লীতে খাজা সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে খাজা সাহেব যোগবলে তাঁহার গুপ্ত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে তাহার পাপ অভিসন্ধির জন্য তিরস্কার করেন। ফকিরের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া ঘাতক তৎক্ষণাত তাহার কার্য্য সিদ্ধির কথা ভুলিয়া গিয়া ফকিরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। খাজা সাহেব তাহাকে ক্ষমা করেন। ঘাতক খাজা সাহেবের প্রভাবে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।

শারেলি আউলিয়া গ্রন্থে এরূপ বহু অলৌকিক ঘটনা খাজা সাহেব সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনাগুলির সত্যাসত্য প্রমাণ করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া শুধু এইটুকু বলা যায় Thought reading ও Mesmerism প্রভাবে এরূপ ঘটনা অসম্ভব নয়।

www.pathagar.com

ঘাতকের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কথা অল্পকালের মধ্যেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং দলে দলে লোক আসিয়া দিল্লীতে ও আজমীরের পথে খাজা মঈন উদ্দীনের করুণা প্রার্থনা করে। তাহাদের অনেকেই মুসলমান হইয়া নূতনভাবে জীবন যাপন করিতে থাকে।

পৃথ্বি রায় সামান্য ফকিরের কাছে এই পরাজয় সহজে ভুলিতে পারেন নাই। তাই ফকির আজমীরে প্রবেশ করিলে নানাভাবে তাঁহাকে উৎপীড়ন করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার অথবা তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে সমস্তকেই ব্যর্থ করিয়া দিয়া খাজা মঈন উদ্দীনের অনুচর ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে থাকে।

খাজা মঈন উদ্দীনের মত অতটা শক্তিশালী না হইলেও এদেশে ইসলাম বিস্তারের কাজে সৈয়দ জালাল উদ্দীনও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ইসলাম প্রচারের ইতিহাস বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবেই সম্পর্কিত। ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বোখারা হইতে পাঞ্জাবে আসিয়া বাহাওয়ালপুরের অন্তর্গত উখ নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার নিরলস অধ্যাবসায়ের ফলেই বাহাওয়ালপুর অঞ্চলে ইসলামের বহু বিস্তৃতি সম্ভব হয়। বাহাওয়ালপুরের জনসাধারণের ভিতর তিনি যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তেমন প্রতিষ্ঠা ধর্ম্ম প্রচারকের ভাগ্যে খুব বেশী ঘটে না।

তাঁহার পৌত্র সৈয়দ আহমদ কবিরও একজন প্রসিদ্ধ প্রচারক ছিলেন। পাঞ্জাবের অনেকগুলি সম্প্রদায় তাঁহারই অনুপ্রেরণায় একে একে ইসলামের অনুরক্ত হইয়া অবশেষে ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পরবর্ত্তী কালে আহমদ কবির মখদুম-ই-জাহানিয়া নামে বিখ্যাত হন।

বাঙ্গালাদেশে চট্টগ্রামে আরব প্রচারকদের কথা ও পুণ্ড্রবর্দ্ধনে পালরাজদের সময়ে শাহ্ সুলতান বলখী মাহীসওয়ারের কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহারা ছাড়া ১২০০ খৃষ্টাব্দে শেখ জালাল উদ্দীন তাবরেজি এদেশে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। তিনিও অনেকগুলি সম্প্রদায়কে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হন। বাঙ্গালায় থাকিবার কালে তিনি যেখানে বাস করিয়াছিলেন সেখানে বহু অর্থ ব্যয়ে একটি দরগাহ তৈরী করানো হয়। এই দরগাহ ঠিক কোথায় ছিল তা আর জানিতে পারা যায় না; কোন কোন মতে পাণ্ডুয়া।

জালাল উদ্দীন তাবরেজি সম্বন্ধে বহু অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এই সব ঘটনার উল্লেখ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতার প্রভাবে তিনি সেকালের বাঙ্গালীদের বহুলাংশে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অনেকেরই ধারণা বাঙ্গালাদেশে মুসলিম সংস্কৃতির বিস্তার মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই ঘটে। সেইজন্য তুর্কী আক্রমণের সময় হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন যুগ অনুমান করা হয়। সময়ের দিক হইতে এই অনুমান কতকটা ঠিক হইলেও ভাবের রাজ্যে সমগ্র দেশে যে পরিবর্ত্তন আসে তাহা শাসন পরিবর্ত্তনের ফল নয়। তুর্কী আক্রমণের পূর্ব্বে বহুবার বাঙ্গালাদেশ বিদেশীর পদানত হইয়াছে—কিন্তু তুর্কী আক্রমণের পর হইতে ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যায় সে পরিবর্ত্তন কখনই

www.pathagar.com

ঘটে নাই। এ পরিবর্ত্তন নূতন শাসন প্রতিষ্ঠার ফল নয়। নূতন শাসনতন্ত্র এ পরিবর্ত্তনকে হয়ত কিছুটা সাহায্য করিয়াছে এ কথা স্বীকার করিলেও শাসন পরিবর্ত্তনই যে দেশের ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ ইহা মানিয়া লওয়া যায় না।

ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের যে ক্ষুদ্র অংশ উপরে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, যে কয়জন বিখ্যাত প্রচারকের নাম করা হইয়াছে তাঁহারা ১২০০ খৃষ্টাব্দে বা তাহার একটু পূর্ব্বে কিংবা পরে হইতেই প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। অবশ্য দশশত খৃষ্টাব্দে ও তাহার বহু পূর্ব্বেও প্রচারকেরা এদেশে আসিয়াছেন। কিন্তু শক্তিশালী প্রচারক অধিক সংখ্যায় ১২০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রচারকরাই নূতন সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করেন।

প্রচারকদের কোন সংঘ ছিলনা এবং কোন বিশেষ সংঘ কর্ত্তৃক তাঁহারা অর্থ, লোক-লস্কর ও প্রচার কার্য্যের উপযুক্ত পুঁথিপত্র সঙ্গে লইয়াও প্রচার করিতে আসেন নাই। তাঁহারা অধিকাংশই আসিয়াছেন একা ফকিরের বেশে, কাহারো কাহারো দুই দশজন শিষ্য ছিল সে সব শিষ্যও সংগৃহীত হইয়াছে পথেই। এই ফকিররা ছিলেন সকলেই নিরস্ত্র। দেশ মুসলমান অধিকারে আসিবার পর তাঁহারা সেখানে প্রচার করিতে যান নাই। বরং এমন স্থানেই তাঁহারা প্রচার করিতে গিয়াছেন যেখানে কেহ কখনো মুসলমানের নামও শুনিতে পায় নাই। বহুস্থানে অত্যাচারিত হইয়া নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। পয়গম্বরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা এই সব ক্লেশ ও অত্যাচার সহ্য করিয়াও নিজেদের বিশ্বাস হইতে বিচলিত হন নাই। কখনো কখনো অত্যাচার নির্ম্মম ও অমানুষিক হইয়া উঠিলে অত্যাচার দমনের জন্য দূর দেশ হইতে কোন মুসলমান সুলতানের কাছে সাহায্য যে কেহ কেহ লইয়াছেন তাহাও সত্য। রিয়াজ-উস-সালাতীনে রাজা গণেশের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়—রাজা গণেশ ও দনুজমর্দ্দন উভয়ে মুসলমান রাজত্ব ধ্বংস করিয়া হিন্দু শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা মুসলমানের উপর নানা অত্যাচার করিতেও দ্বিধা করেন নাই। রাজা গণেশ বহু শিক্ষিত মুসলমান নিহত করিয়াছিলেন। শেখ মুঈন উদ্দীন আব্বাসের পুত্র শেখ বদর উল্ ইসলাম রাজা গণেশকে অভিবাদন না করায় তাঁহার আদেশে নিহত হইয়াছিলেন। সেই দিনই অপর অনেক শিক্ষিত মুসলমানকে নৌকায় চড়াইয়া নৌকা নদীর মাঝখানে লইয়া গিয়া ডুবাইয়া দেওয়া হয়। মুসলমানের প্রতি এই রকম জুলুম দেখিয়া ধর্ম্মীয় নেতা শেখ নূর-কুতব-উল আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহ্ শার্কীকে গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। ইব্রাহিম শাহ্ এই অনুরোধ রক্ষা করিতে গৌড় আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন।

এইরূপ দু'একটা ঘটনা ঘটিলেও ভারতে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্তহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একথা সত্য যে, ব্রাহ্মণ্য শোষণে নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষের অধিকার হইতে বঞ্চিত, নীতি ও শিক্ষা বিবর্জ্জিত বিরাট মানবগোষ্ঠি এই নূতন সংস্কৃতির ভিতর যে মুক্তি ও আত্মোন্নতির সম্ভাবনা দেখিয়াছিল— সে সম্ভাবনা তাহারা

www.pathagar.com

পুরাতন সমাজ ব্যবস্থায় পায় নাই। নিপীড়িত দ্রাবিড় ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছেই এই নূতন সংস্কৃতি অধিক সমাদর পাইয়াছে।

ইসলাম শুধু ধর্ম্ম নয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধানও বটে। কোন সামাজিক বিধান রাজানুমোদিত না হইলে তাহাকে কার্য্যকরী করিবার উপায় নাই। সামাজিক বিধান অবশ্যকরণীয় করিতে হইলেই রাজার আদেশ প্রয়োজন হয়। এজন্য শরিয়তের অর্থাৎ ইসলামিক বিধান মত যেখানে শাসন না হয় সেখানে মুসলমানের না থাকিবার কথা। 'দারুলহরব' হইতে মুসলমানেরা হিজরত করিয়া ইসলামিক রাজ্যে চলিয়া যাইবে এরূপ বিধান আছে। শরিয়তের এই নীতির একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে।

শরীয়তের বিধান যদি মুসলমানেরা মানিয়া চলে তবে সমাজে সাম্য বজায় থাকিবে এরূপ আশা করা যায়। ইসলামিক উত্তরাধিকার আইন অনুসারে পিতার বিরাট সম্পত্তিও পুত্র-কন্যার ভিতর বিভক্ত হইয়া তাহাদিগকে সামান্য অবস্থার লোকে পরিণত করে। সুদ হারাম হওয়ায় বিনা পরিশ্রমে সঞ্চিত অর্থ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িতে পারে না। জাকাত দিবার নিয়ম থাকায় ধনীর কিছুটা উদ্বৃত্ত অর্থ দরিদ্রের ভিতরে বিতরিত হইয়া যায়। ফলে ধনীর ধন কিছু কমে আর দরিদ্রের কিছু বাড়ে। মুসলমান হইলেই তাহার সঙ্গে বিবাহ, খানা-পিনার আর কোন বাধা থাকে না। বাদশাহের দাসকে বিবাহ করিতে শরিয়তের নিষেধ নাই, আবার ক্রীতদাসের বাদশাহ হইতেও বাধা নাই। প্রতিষ্ঠা সকলেরই সমান। মসজিদে নামাজ পড়িবার সময়ে অর্থ বা প্রতিপত্তি অনুসারে কাহারো বিশেষ স্থান পাইবার অধিকার নাই। এই সমস্ত নিয়মই গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই সমস্ত সামাজিক বিধান যদি দেশের সরকারের অনুমোদিত না হয় তবে ইহাদিগকে কার্য্যকরী করিবার কোন উপায় থাকে না। যদি কাহারো পরকালের ভয় না থাকে তবে সে ইচ্ছা করিলেই সুদ খাইতে পারে এবং নিজের সম্পত্তি এক পুত্র বা এক কন্যাকে দান করিয়া বিপুল সম্পত্তির বিপুলই রাখিতে পারে। ইহাতে সামাজিক সাম্য নষ্ট হইয়া যায়। সামাজিক বিধানকে কার্য্যকরী করিবার জন্য তাই রাজদণ্ডের প্রয়োজন। সুতরাং ইসলাম বলিতে শুধু ধর্ম্ম বুঝায় না, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থাও বুঝায়। ইহা একটি ইহ পরকাল ব্যবস্থা। গণতন্ত্রের ভিত্তিতে ইহা প্রথম সামাজিক বিপ্লব।

প্রপীড়িত বঞ্চিত মানবগোষ্ঠিই এই ইসলামের বিজয় পতাকা বহন করিয়াছে এবং সেই পতাকা অক্ষুণ্ন রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। এক সময় ছিল যখন মুসলমান সেনা অপরাজেয় আখ্যা পাইয়াছিল। তাহাদের এই অপরাজেয় হইবার কারণ এই যে তাহারা জানিত যুদ্ধে পরাস্ত হইলে যে সমানাধিকার তাহারা ইসলামীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শাসনের অধীনে ভোগ করিতেছিল সে অধিকার চলিয়া যাইবে। শাসন পরিবর্ত্তনের অর্থ শুধু রাজার পরিবর্ত্তন নয় প্রত্যেক মানুষের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়াও। কারণ নূতন রাজা নিজের নিয়মে রাজ্য শাসন করিবেন তাহাতে সমানাধিকার ক্ষুণ্ন হইতে পারিবে। ইসলামিক রাষ্ট্রের স্বার্থের সহিত সমাজের প্রত্যেকে তাহার স্বার্থের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাইত। রাষ্ট্র রক্ষা পাইলে নিজেদের স্বার্থও বজায় থাকিবে ইহা তাহারা মনে করিত। তাই সর্ব্বস্ব

www.pathagar.com

পণ করিয়া তাহারা রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধ করিত। এই কারণেই সেকালে মুসলমান অজেয় হইতে পারিয়াছিল।

ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার অর্থ শুধু পরকালের পথ প্রশস্ত করা নয়। ইহকালেও ইসলামিক সমাজের বিধান মত সকলের সহিত সমান অধিকার ভোগ করিতে পারা। আজিকার দিনে কম্যুনিজম বা সোশ্যালিজম যে ভাবে বঞ্চিত মানবকে প্রেরণা যোগায়, সেকালে ইসলামও তেমনিভাবে শোষিত ও বঞ্চিত মুক্তির বাণী ছিল। এই কারণেই ভারতের দ্রাবিড় ও বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চলে এত সহজে অগণিত ইসলামের ভক্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

১২০০ খৃষ্টাব্দে তুর্কী আক্রমণের ফলে বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচারিত ও অনেক স্থলে গৃহীত ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থার সহিত রাজশক্তির যোগ ঘটিল। যাহা এতদিন ব্যক্তির শুভ ধর্ম্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিত সেই বিধানকে কার্যকরী করিবার জন্য এবার রাজশক্তির আগমনে সাহায্য পাইবার সুবিধা হইল।

শোষিতেরা মুসলমানের আগমনে খুশী হইয়া যে নূতন কবিতা লিখিয়াছিল তাহাও সত্য।

"ধর্ম্ম হৈলা জবনরূপি — মাথা এত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরুচ কামান
চাপিয়া উত্তম হয় — ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার — হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেত দম্বদার ॥
যতেক দেবতা গণ — সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার ॥
ব্রহ্মা হৈল মহাম্মদ — বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বার
আদম হৈল সুলপানি
গণেশ হইআ গাজী — কার্ত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইল্যা জত মুনি ॥
তেজিয়া আপন ভেক — নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে — পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলি বাজায় বাজানা ॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবি — তিহুঁ হৈলা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হল্যা বিবি নূর
জাতেক দেবতা গণ — হয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥"

www.pathagar.com

১২০০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ছাড়া বাংলা সাহিত্যের আরো নানারকম উন্নতির সূচনা হয়। এই সময়ের পূর্ব্বে এবং অনেককাল পরেও কোন মৌলিক বিষয় লইয়া সাহিত্য রচনার কথা কেহ কখনো কল্পনা করিতেন না। একই বিষয়বস্তু লইয়া রচনা লিখিবার রীতিই তখনকার দিনে প্রচলিত ছিল। তাই দেখিতে পাওয়া যায় সেকালের লেখকদের প্রায় অনেকেরই আখ্যান বস্তু এক। কিন্তু রচনাকার পার্থক্যে বাক্যবিন্যাস ও বর্ণনাভঙ্গি হয়ত কিছু পৃথক। রচনায় নূতন বিষয়বস্তুর অবতারণা করা তখন লেখকরা উচিত বিবেচনা করিতেন না। কারণ প্রচলিত কোন একটি আখ্যান বস্তুর চেয়ে নিজেদের সৃষ্ট আখ্যান বস্তু উন্নততর হইতে পারে এ বিশ্বাস তখন কাহারো ছিল না। তাই প্রচলিত আখ্যান বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই নূতন পুস্তক রচিত হইত। ভাব ও কল্পনার অনুন্নত অবস্থাই এই অভ্যাসের কারণ। নূতন সাহিত্য রচনার অর্থ, নূতন ভাষা ও ভঙ্গিতে পুরানো আখ্যান বস্তুকে উপস্থিত করা নয়—নূতন ভাবেরও পরিকল্পনা। নূতন ভাব হইতেই নূতন দৃষ্টিকোণ আসে। তাহারই ফলে নূতন সৃষ্টি বিশিষ্ট হইয়া উঠে। নূতন ভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রাচীন যুগের সাহিত্যিক রচনা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোন বিশিষ্ট রূপ পায় নাই। তবে দু-একজন ক্ষমতাশালী রচনাকার পুরাতন আখ্যান বস্তুকে কল্পনার নূতন রঙে রাঙাইয়া বহুদিনের পরিচিত আখ্যান বস্তুকেও যে কোন ক্ষেত্রে নূতন রসে ও রূপে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন একথাও ঠিক। কিন্তু এরকম শিল্পকৌশল পুরাতনের পুনারাবৃত্তিতে খুব দেখা যায় নাই।

১২০০ শত খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাপের দেবতা, বাঘের দেবতা, ওলাউঠা ও বসন্তের দেবতাকে লইয়াই বাংলা সাহিত্যের কারবার চলিতেছিল। কিন্তু এই সময় হইতে ভাবের রাজ্যে এক বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেল। দেশের সর্ব্বত্র ফকির ও দরবেশের ইসলাম প্রচারের ফলে জনসাধারণের চিন্তা স্রোতের গতি কিছুটা দিক পরিবর্ত্তন করিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাবে যে সমস্ত আচার জনসাধারণের ভিতরে চলিতেছিল তাহা যে সকলেই গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নয়। বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থী সরোরুহ, জাতিভেদ প্রথাকে আক্রমণ করিয়া লিখিয়াছিলেন— "ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা মুখ হইতে হইয়াছিল; যখন হইয়াছিল তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্যেও যেরূপে হয়, ব্রাহ্মণও সেইরূপ হয়, তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রহিল কি করিয়া! যদি বল, সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দাও, সে ব্রাহ্মণ হোক; যদি বল, বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক। আর তারা পড়েও ত, ব্যাকরণের মধ্যে ত বেদের শব্দ আছে। আর আগুনে ঘি দিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে অন্য লোকে দিক্ না। হোম করিলে মুক্তি যত হোক, না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয় এই মাত্র।"

ক্ষপণকদের সম্বন্ধে সরোরুহ বলিয়াছেন—"ক্ষপণকেরা কপট মায়াজাল বিস্তার করিয়া লোক ঠকাইতেছে, তাহারা তত্ত্ব জানে না, মলিন বেশ ধারণ করিয়া থাকে এবং আপনার শরীরকে কষ্ট দেয়। নগ্ন হইয়া থাকে এবং আপনার কেশোৎপাটন করে। যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃগাল কুকুরের মুক্তি আগে হইবে। ময়ূরপুচ্ছ গ্রহণ করিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে হাতী ঘোড়াকে ত ময়ূরপুচ্ছ দিয়া সাজায় তাদের আগে মুক্তি হইবে।"

www.pathagar.com

এই ধরনের চিন্তাধারায় ইন্ধন যোগাইল ফকির ও দরবেশ প্রচারিত ইসলাম। তাই চিরাচরিত প্রথা পরিত্যাগ করিয়া রামাই পণ্ডিত নূতন ধরণের কবিতা লিখিলেন। জাজনগরের পতনে "কল্‌মা" নামক কবিতাটি সেকালে বেশ অদ্ভুত মনে হইয়াছে। ফিরোজ শাহের অভিযানের ফলে জাজনগর তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়া কর দিতে স্বীকৃত হয়। সম্ভবতঃ সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই রামাই পণ্ডিতের কবিতা রচিত হয়। দীনেশচন্দ্রের মতে রামাই পণ্ডিত একাদশ খৃষ্টাব্দের লোক। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে।

রামাই পণ্ডিতের কবিতা বা ছড়ায় প্রচলিত কোন আখ্যান বস্তু স্থান পায় নাই। তাঁহার কল্পনা নিজ পরিবেশ হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহাতে হাস্যোদ্দীপক কাব্যরস যোজনা করিয়া এক নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। ভাবে ও ভাষায় ইহা সেকালে অভিনব ছিল। রামাই পণ্ডিতের প্রতিভা তাই স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

রামাই পণ্ডিতের কালে লোকে মনে করিত সত্যযুগে শেতাই পণ্ডিত, দ্বাপরে কংসাই পণ্ডিত এবং কলিতে রামাই পণ্ডিতের মত অতবড় পণ্ডিত আর জন্মায় নাই। রামাই পণ্ডিতের রচিত গ্রন্থ শূন্যপুরাণ। এই পুস্তকে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতি লেখা আছে দেখিয়া কেহ কেহ রামাই পণ্ডিতকেই ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তক অনুমান করেন। ইহারা ইহাও অনুমান করেন যে ধর্ম্ম-পূজা বৌদ্ধদিগের পূজা।

"হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই প্রথমে এই মত প্রচার করেন কিন্তু ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা সম্বন্ধে তাঁহার মতের পর অনেক আলোচনা হইয়াছে এবং যারা সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তাঁরা মনে করেন যে, এই পূজা পদ্ধতির উদ্ভব বৌদ্ধধর্ম্ম থেকে নয়। উড়িষ্যার উচ্চ্যুতানন্দ প্রভৃতি পঞ্চ সখাদের ধর্ম্মমতের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাছাড়া মহিমা ধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের যে কোন যোগ নাই সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।"

রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তক হইলে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা না করিয়া শূন্যপুরাণ লিখিতে যাইবেন কেন বুঝিতে পারা যায় না। শূন্যপুরাণে যে বহু প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। কারণ তাহার সর্ব্বত্র ভাষা এক নয়। শূন্যপুরাণে সবসুদ্ধ একান্নটি অধ্যায় আছে। এসব যে একই লোকের লেখা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সৃষ্টি পত্তন সম্বন্ধে রামাই পণ্ডিতের মত অনেকটা বৌদ্ধ মতের মত। কিন্তু ইহার পরের অধ্যায়গুলিতে যে ধর্ম্ম-পূজার পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের যে কি সম্পর্ক বুঝা কঠিন। ধর্ম্ম-পূজার মন্দিরগুলিতে প্রায়ই শীতলা দেবীর প্রতিমূর্তি দেখা যায়। রামাই পণ্ডিত যিনি "ধর্ম্ম-রাজ যজ্ঞ নিন্দা করে" বলিয়াছেন তিনিই যে আবার শীতলা দেবীর পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন একথা বিশ্বাস করা সহজ নয়। তাছাড়া "কল্‌মা" ছড়াতে সমস্ত অবতার ও পূজা পদ্ধতির উপর যে বিদ্রুপের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই ভাবের সহিত ধর্ম্মপূজার পদ্ধতির বিশেষ সামঞ্জস্য আছে বলিয়াও মনে হয় না। যাহারা ধর্ম্মপূজা করে তাহারা ব্রাহ্মণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। "কল্‌মার" ভাবের সহিত এই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করার কোন মিল নাই; বৌদ্ধধর্ম্মে ত জাতিভেদ প্রথাই নাই।

www.pathagar.com

ধর্ম্ম-হৈলা জবনরূপি মাথা এত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরুচ কামান
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম।
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলেত দম্বদার ॥
যতেক দেবতা গণ সভে হয়্যা এক মন
আনন্দেত পরিল ইজার ।
আপনি চণ্ডিকা দেবী তিহ্ হৈল্যা হায়াবিবি
পদ্মাবতী হল্যা বিবি নূর।
জতেক দেবতা গণ হয়্যা সভে এক মন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥

এইসব শুনিয়া ধর্ম্ম পূজারীদের ধর্ম্মের উপর ভক্তি বাড়িবার কথা নয়। ধর্ম্ম পদ্ধতি যিনি লিখিবেন তাঁহার পক্ষে এরূপ ধর্ম্মকে ব্যঙ্গ পরিহাস করা সম্ভব নয়।

প্রকৃত কথা এই-পরিচ্ছন্ন বৃদ্ধি ও উন্নত সংস্কৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়া অন্ধকার যুগে দেশের জনসাধারণ এমন সব উৎকট ও হাস্যজনক পূজা পার্ব্বণের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, সুরুচিসম্পন্ন কাহারো সেগুলিকে বর্ত্তমান যুগে নিজের বলিতে লজ্জা হয়, সঙ্কোচ আসে। তাই সমস্ত অপরাধ বৌদ্ধধর্ম্মের উপর চাপাইয়া দিয়া জনসাধারণের পঙ্কিল মানসতার দায়িত্ব এড়াইবার জন্য ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার পতাকাধারীরা নিজেদেরকে নিরপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিতে চান। তবুও একথা সত্য যে-বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দেবতা কিংবা উপদেবতার স্থান নাই। হীনযান পন্থাতে ত নাই, এমনকি বুদ্ধের ধর্ম্মের পরবর্ত্তী সংজ্ঞা যাহাতে বুদ্ধকে মানুষের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করা হয়, সেই মহাযান পন্থাতেও শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা যে তিনটি ভাবে আধ্যাত্মিক সাধনাকে বিভক্ত করা হইয়াছে তাহার ভিতরে কোথাও ধর্ম্মপূজার স্থান নাই। যদি ইহা মানিয়াও লওয়া যায় ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধরাই করিতেন তবু প্রশ্ন উঠে বৌদ্ধ ধর্ম্মে ইহা আসিল কোথা হইতে; জনসাধারণের অজ্ঞতা ও মূঢ় অভ্যাস হইতেই নহে কি? ব্রাহ্মণ্য শাসনই কি এই অজ্ঞতা ও মূঢ় অভ্যাসের জন্য দায়ী নহে?

বৌদ্ধ যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে সব রচনা বাংলা বলিয়া জানা যায় সেগুলির বিষয়বস্তু সবেরই ধর্ম্ম তা সে ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্মই হোক অথবা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই হোক। এ পর্যন্ত সাহিত্য যে ধর্ম্ম ছাড়া আর কোন বিষয়বস্তু লইয়া রচিত হইতে পারে তাহা কেহ মনে করিতেন না। কিন্তু ত্রয়োদশ শত খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে বাংলা সাহিত্যে এক নব যুগের সূচনা দেখা গেল। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট গিয়াস উদ্দীন বলবনের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দীন মাহমুদ ওরফে বগড়া শাহ বাঙ্গালা দেশের স্বাধীন নরপতি ছিলেন। ইহার আদেশে মহা ভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ সঙ্কলিত হয়। মহাভারতখানি নাকি খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। কেন পাওয়া যায় নাই তাহার কারণ জানা যায় নাই। তবে দেখা যাইতেছে

www.pathagar.com

ক্রমে ক্রমে ইহার উল্লেখ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে উঠিয়া যাইতেছে। অবশ্য দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "গৌড়েশ্বর নাসির খাঁ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; এই মহাত্মা মহাভারতের একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন।" কিন্তু সুনীতিকুমার ও সুকুমার সেন উভয়ের মতে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে শুধু মারামারি কাটাকাটি হইয়াছে। উভয়ের মতেই কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ কাব্যটিই মুসলমান আমলের প্রথম ও প্রধান অনুবাদ গ্রন্থ। কিন্তু কৃত্তিবাস যে কোন মুসলমান সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহাও সুকুমার সেন স্বীকার করেন নাই। কারণ তিনি লিখিয়াছেন ঃ "গৌড়েশ্বরের আদেশ পাইয়া কৃত্তিবাস সাতকাণ্ড রামায়ণ পাঁচালী রচনা করেন। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু রাজ সভায় যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে এবং সভাসদ্গণের নাম হইতে বোঝা যায় যে, গৌড়ের সিংহাসনে তখন হিন্দু রাজা উপবিষ্ট ছিলেন। সুতরাং কৃত্তিবাস রাজা গণেশের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে।"

কিন্তু দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভা বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ রূপে মুসলমান প্রভাব চিহ্নিত ছিল।"

কৃত্তিবাসের প্রসঙ্গ আপাততঃ মূলতবী থাকুক। নাসির উদ্দীন মাহমুদের সময় হইতে আরো প্রায় দুই শতাব্দী পরে কৃত্তিবাসের জন্ম। তাঁহার প্রসঙ্গ যথা সময়ে আলোচিত হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে প্রশ্ন এই যে, যে মহাভারত পাওয়া যায় নাই তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় কি করিয়া।

পঞ্চদশ শত খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে (১৪৯৩) আলাউদ্দীন হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গৌড়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি তাঁহার সেনাপতি পরাগল খাঁকে চট্টগ্রামের অন্তর্গত পরাগলপুর দান করেন। পরাগল খাঁ সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করিয়া হোসেন শাহের অধীনে শাসন কার্য্য চালাইতে থাকেন। হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগলের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের আদি পর্ব্ব হইতে স্ত্রী পর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই মহাভারতে পরমেশ্বর লিখিয়াছেন ঃ

নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর।
লস্কর পরাগল খাঁন মাহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ু গতি ॥
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটি গ্রামে চলিয়া গেল হরষিত হৈয়া ॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খাঁন মহামতি ॥
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি ॥

পরমেশ্বরের এই মহাভারতে তাঁহার পূর্ব্বে অনূদিত আর একটি মহাভারতের উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

"শ্রীযুক্ত নায়ক সে যে নসরত খান
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান"

পাঞ্চালী রচনা করাইয়াছিলেন সে কোন নসরত খান? হোসেন শাহের পুত্রের নাম নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহ—তিনিও হোসেন শাহের মত বাংলা সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেন। সেই কারণে কবীন্দ্র পরমেশ্বর যে নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহের কথাই বলিয়াছেন ইহাই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন নাসির খাঁ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; কিন্তু নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহ ষোড়শ শতকের লোক। অন্যদিকে ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে নসরৎ খান বলিয়া কেহ ছিলেন না। সুতরাং কবীন্দ্র যে হোসেন শাহের পুত্র নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহের কথাই বলিয়াছেন ইহাই ধরিয়া লইয়া সুনীতি কুমার লিখিয়াছেন ঃ "১২০০ হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালাদেশে সাহিত্য বা বিদ্যা চর্চ্চার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না।" সুকুমার সেনও ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্যের প্রধানগণ তাহার পুত্র নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করেন। পরমেশ্বর যখন মহাভারত লেখেন তখন হোসেন শাহ জীবিত। তাহা তাঁহার "নৃপতি হোসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর" এই কথাতেই প্রকাশ। এই নৃপতির লস্কর পরাগল খানের আদেশেই পরমেশ্বর মহাভারতের অনুবাদ করেন। সে সময় নসরৎ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আসীন হন নাই। সুলতান হইবার পূর্ব্বেই 'শ্রীযুক্ত নায়ক সে যে নসরত খান' একথা বলিবার কোন অর্থ হয় না। তাছাড়া পরমেশ্বরে অনুবাদের প্রায় ১৮/১৯ বৎসর পর নসরৎ শাহ সুলতান হন। তাঁহারই আদেশে অনূদিত মহাভারতের কথা, ১৮/১৯ বৎসরের পূর্ব্বের রচনায় উল্লিখিত হওয়া শুধু যে সম্ভব নয় তাহা নয়, হাস্যকর। পূর্ব্ববর্ত্তীর কাছে ঋণ স্বীকার করিবার জন্য কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার পূর্ব্বে রচিত মহাভারতে উল্লেখ করিয়াছেন। কবীন্দ্রের লেখার পরে যাহা লেখা হইয়াছে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অলৌকিক ক্ষমতা না থাকিলে কবীন্দ্রের জানিবার কথা নয়। কবীন্দ্রের লিখিবার সময় কাল পর্য্যন্ত যাহা লেখা হয় নাই তাহা তিনি উল্লেখ করিবেন কি প্রকারে এ প্রশ্ন সুনীতি কুমার বা সুকুমার সেন কাহাকেও বিশেষ ভাবিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

শুধু কবীন্দ্র পরমেশ্বর নহেন বিদ্যাপতিও তাঁহার ভণিতায় নাসিরা শাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

সে যে নাসিরা সাহ জানে যারে হানিল মদন বাণে ॥
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

এই পঞ্চ গৌড়েশ্বর কে—ষোল শত খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগের হোসেন শাহের পুত্র নাসির উদ্দীন নসরৎ শাহ কি? সুনীতি কুমার লিখিয়াছেন, "মিথিলার এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কবি ছিলেন বিদ্যাপতি ঠাকুর (আনুমানিক ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ এর মধ্যে ইহার জীবৎকাল)।" মিথিলার রাজা দেব সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শিব সিংহ ১৪১৩

www.pathagar.com

খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারই আদেশে বিদ্যাপতি পদাবলী রচনা করেন। শিব সিংহের প্রথম স্ত্রীর নাম লখিমা বা লছিমা দেবী। লখিমা দেবী ছাড়াও শিব সিংহের আরো ছয়জন পত্নী। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে— সুখমা দেবী, মধুমতী দেবী, সুরমা দেবী, রূপিনী দেবী, মেধা দেবী এবং মোদবতী দেবী। বিদ্যাপতির পদাবলীর ভণিতায় ইহাদের সকলেরই নাম আছে। তাছাড়া মহেশ্বরদেব ও রতিদেব নামক শিব সিংহের দুইজন মন্ত্রী ও শঙ্কর নামক একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীর নামও পদাবলীতে পাওয়া যায়। সুতরাং বিদ্যাপতি যে শিব সিংহের সমসাময়িক ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সুনীতিকুমার অনুমিত ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ এর মধ্যেই শিব সিংহের রাজত্বকাল। সুতরাং বিদ্যাপতি যে চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক ইহা মানিয়া লইতে বাধা নাই। কিন্তু এই বিদ্যাপতি ষোড়শ শতাব্দীর নাসির উদ্দীন নসরৎ শাহের কথা লিখিবেন কি করিয়া!

পনের শত খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি গৌড়ের ইতিহাস অনেকটা গোলমেলে। এই সময় একাধিক নাসির গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়াছেন। এই সময় শম্‌স উদ্দীন আহমদ শাহের দুই ক্রীতদাস শাদী খাঁ ও নাসির খাঁ, শম্‌স উদ্দীন আহমদকে হত্যা করে। পরে নাসির খাঁ শাদী খাঁকে হত্যা করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করে। ওমরাহগণ ক্রীতদাসের অধীনতা স্বীকার না করায় নাসির খাঁও নিহত হয়। তখন ইলিয়াস শাহের বংশধর নাসির উদ্দীন গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিবার অধিকার পান। তিনি ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে সুলতান বলিয়া গৃহীত হন।

নগেন্দ্রনাথ তাঁহার বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলীতে লিখিয়াছেন, "বিদ্যাপতি শিব সিংহের অপেক্ষা কিছু বড় ছিলেন। মিথিলায় প্রবাদ আছে তিনি দুই বৎসরের বড় ছিলেন।" শিব সিংহ যে সময় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন "প্রবাদ আছে শিব সিংহের বয়ঃক্রম তখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর।" সুতরাং বিদ্যাপতির বয়স তখন ৫২ বৎসর। শিব সিংহ ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

বিদ্যাপতির রচিত "কীর্ত্তিলতা" অনুসারে শিব সিংহের জ্যেষ্ঠতাত রাজা গণেশের আর্সলান কর্ত্তৃক নিহত হন। বিদ্যাপতি সে সময় বালক। গণেশ ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে নিহত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় শিব সিংহের রাজ্যাভিষেকের সময় বিদ্যাপতি হয়ত ৫০ বৎসর ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ আরো বলেন-"একটি স্থূল মত এই যে, তিনি (বিদ্যাপতি) প্রথম বয়সে মিথিলা ভাষায় পদাবলী রচনা করেন ও পরিণত বয়সে সংস্কৃত গ্রন্থাদি রচনা করেন। যে সকল পদে শিব সিংহের নাম আছে সেগুলি তাঁহার রাজ্যকালে রচিত। শিব সিংহের রাজ্যকাল দীর্ঘ না হইলেও যে বিদ্যাপতির প্রতিভা সেই সময়ে পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তাঁহার রচনাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।"

ইলিয়াস শাহের বংশধর নাসির শাহ ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে তখন বিদ্যাপতির বয়স ৯৮ বৎসর হওয়া উচিত। যদি ইহা মানিয়াও লওয়া হয় যে, বিদ্যাপতি তখনও জীবিত ছিলেন তবু একথা

www.pathagar.com

স্বীকার করা যায় না যে, ৯৮ বৎসর বয়সেও পদাবলীতে নাসির শাহের "মদন বাণে" বিদ্ধ হইবার অথবা "অপরূপ রূপ দেখি রায় নসরদ শাহ ভুলিল কমল মুখি" লিখিবার অবস্থা ছিল। এ বয়সে তাঁহার লিখিবার মত অবস্থা থাকিবার কথা নয়, থাকিলেও নগেন্দ্রনাথের কথামত সংস্কৃত লিখিবার কথা। সুতরাং ইলিয়াস শাহের বংশধর নাসির উদ্দীন যে বিদ্যাপতির উল্লিখিত নাসির উদ্দীন নহে তা নিশ্চিত।

Stewart এর list of independent kings of Bengal-এ দেখিতে পাওয়া যায় এই বিদ্যাপতির উল্লিখিত নাসির উদ্দিন বলবনের পুত্র নাসির উদ্দীন মাহমুদ ওরফে বগড়া শাহ। Stewart ইহাকে নাসির শাহ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহা Stewart এর কথামত লিখিয়াছেন— The first Bengali rendering of the Mahabarata was ordered by Nasir Shah of Bengal (1282-1325 A.D) who was a great patron of the Vernacular of the province and whom the great poet Vidyapati has immortalized by dedicating to him one of his songs. Vidyapati also makes a respectful reference to sultan Gheyasuddin most probably Sultan Ghiyasuddin II of Bengal. (1367-73 A.D)

মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ বাঙ্গালা সাহিত্যে এক বিপ্লবাত্মক ব্যাপার। যে সময়কে সুনীতি কুমার ও সুকুমার সেন উভয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের বন্ধ্যা কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন প্রায় সেই সময়েই সাহিত্যের এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

মহাভারতের অনুবাদ যে একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনা তাহা এইটুকু হইতেই বুঝিতে পারা যায়, যে অনুবাদ করিবার পর যাঁহারা অনুবাদ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে "সর্ব্বনেশে" বলিয়া ব্রাহ্মণ সমাজে অভিহিত করা হইয়াছিল। সংস্কৃত হইতে বাংলায় অনূদিত হইয়া গ্রন্থের পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই যে শুধু এই আন্দোলন হইয়াছিল তাহা নহে; যাহা শুধু ব্রাহ্মণেরই পড়িবার অধিকার তাহাকে জাত-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের সহজ পাঠ্য করিয়া তোলা হইয়াছে ইহাই প্রকৃত অনর্থ। এমন অনর্থ যে কোন ব্রাহ্মণধর্ম্মে বিশ্বাসী রাজার সাহায্যে ঘটিতে পারে না তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং বহুকাল পরে কৃত্তিবাস ওঝা যে রাজা গণেশের আনুকূল্যে রামায়ণ অনুবাদ করেন নাই তাহা সত্য। এ রকম কাজ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ শাসনের বিরোধী কোন রাজশক্তিরই প্রয়োজন ছিল।

যে বাংলা ভাষা সমগ্র আর্য্য শাসনকালে অনার্য্য নীচ জাতির ভাষা বলিয়া পরিগণিত ছিল সেই ভাষার রাজদরবারে সম্মান লাভ করা, কিন্তু দেবভাষা সংস্কৃতের সেইরূপ আদর না পাওয়া—এও একটি বিপ্লবাত্মক ব্যাপার। ইহা নিশ্চয়ই ডোম চণ্ডালের ভাষাকে সম্মানিত করিয়া দেবভাষাকে অপমান করা। সংস্কৃত ভাষার অনাদরের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ইহা অপমানের কথাই বটে। কাজেই যিনি বা যাঁহারা এই অনুবাদ করিয়াছিলেন তাঁহারা যে "সর্ব্বনেশে" তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাহিত্যের দিক হইতেও ইহা একটি বিপ্লব। কারণ এতদিন ধর্ম্মবিষয়ে ছোট ছোট পদ রচনা করা ছাড়া কেহ বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন নাই; বাংলায় মহাভারত সেই

www.pathagar.com

মহাকাব্য রচনার সূত্রপাত করিল। মহাভারতের উল্লিখিত পাত্রপাত্রীরা সব দেবতা বা দেবী নহেন। অনেকেই পৃথিবীর মানুষ, কেহ কেহ হয়ত দেবানুগ্রহে আধা মানুষ আধা দেবতা। সম্পূর্ণ দেবতাও অবশ্য এই কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। বাংলা কাব্যের বিষয়বস্তুর দিক হইতেও ইহা বিপ্লবাত্মক। কারণ ইহার পূর্ব্বে যাহা কিছু রচনা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া মানব চরিত্রের বিকাশ নাই। কিন্তু মহাভারতে তাহা আছে। ইহার যুধিষ্ঠির কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, দ্রৌপদী, অর্জ্জুন প্রভৃতি চরিত্রগুলির ভিতর মানুষের চিরন্তন সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, কর্ম্মনিষ্ঠা, জাগ্রতবুদ্ধি ও কূটনীতি সবেরই সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং অনুবাদ হইলেও বাংলা ভাষায় মহাভারতের প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের অনেকটা যুগ পরিবর্ত্তন।

মহাভারত ধর্ম্ম-গ্রন্থও বটে। তাই ভক্ত-প্রাণ দীনেশ চন্দ্র, যিনি এই মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন সেই নাসিরউদ্দীনকে "মহাত্মা" বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যিনি ইহার অনুবাদ করাইয়াছিলেন তিনি ইহার ধর্ম্ম-তত্ত্বের জন্য ইহার অনুবাদ করাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হন নাই; মহাভারত অনুবাদ করাইবার কারণ সম্পূর্ণ অন্য রকম। সেই কারণটি বুঝিতে পারিলে নাসির উদ্দীনই যে ইহা অনুবাদ করাইবার সবচেয়ে উপযুক্ত লোক তাহা বুঝিতে আর বেশী বেগ পাইতে হয় না।

পারস্যের সিংহাসনে যখন সাসনিদ বংশের রাজারা অধিষ্ঠিত সেই সময় ২৬০ হিজরীতে দানিশওয়ার তাঁহার "খোদাইনামা" গ্রন্থে পারস্যের রাজাদের কাহিনী প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ সমস্ত রাজার কাহিনী লইয়া রচিত হইবার সুযোগ হয় নাই; মাত্র কয়েকজন রাজার কাহিনী ইহাতে লিপিবদ্ধ হয়। তবু গ্রন্থখানি প্রকাশ হইবার সাথে সাথে পারস্য ও ইরাকের সর্ব্বত্র ইহা বিশেষ সমাদর লাভ করে। ইহাতে সাসনিদ বংশের রাজারা উৎসাহিত হইয়া আরো অনেক কাহিনী সংগ্রহ করিতে থাকেন। কিন্তু সে সমস্ত প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই পারস্যের শাসন ভার সাসনিদ বংশের হাত হইতে গজনীর সুলতানের হাতে চলিয়া যায়। সবুক্তগীনের পুত্র সুলতান মাহমুদ তখন গজনীর সিংহাসনে আসীন। ৯৯৮ হইতে ১০৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার চেষ্টায় পারস্যের রাজন্যবর্গ সম্বন্ধে আরো অনেক নূতন তথ্য সংগৃহীত হয়। এইসব তথ্য সন্নিবেশিত গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি কিছুকাল উপযুক্ত লোকের সন্ধান করিতে থাকেন। অবশেষে তুস নগরের উপকণ্ঠ শাদাবের অধিবাসী আবুল কাসিম মনসুরের দেখা পাইয়া তাহাকেই এই বিরাট কাজের ভার দেন। আবুল কাসিম পরে ফেরদৌসী নামে পরিচিত হন। সুলতান তাঁহার কোষাধ্যক্ষ খাজা হোসেন মৈমন্দিকে প্রত্যেক ১০০০ কবিতা রচনা করিবার জন্য কবি ফেরদৌসীকে ১০০০ স্বর্ণ-মুদ্রা দান করিবার আদেশ দেন।

ফেরদৌসী যে অঞ্চলে বাস করিতেন সেখানে লোকে জলের অভাবে প্রতি বৎসরেই কষ্ট পাইত। তাই ফেরদৌসী ছেলেবেলা হইতেই ঠিক করিয়াছিলেন যেমন করিয়াই হোক ঐ অঞ্চলে একটি খাল খনন করাইবেন। এইবার বহু অর্থাগমের সুযোগ দেখিয়া ফেরদৌসী প্রত্যেক এক হাজার কবিতার জন্য স্বর্ণ মুদ্রা না লইয়া সমস্ত অর্থ এক সঙ্গে লইয়া জলাশয় খনন করাইবেন মনে করিয়া টাকা সুলতানের রাজকোষেই জমা রাখিলেন।

www.pathagar.com

কবি এবার একাগ্র চিত্তে কবিতা রচনা করিয়া যাইতে লাগিলেন। একটি একটি করিয়া দীর্ঘ ৩৫ বৎসর ব্যাপী ৬০,০০০ কবিতায় সমগ্র পারস্য দেশের ইতিহাস তিনি কবিতায় সংকলন করিলেন। জগতে এরূপ অধ্যবসায় খুব বেশী দেখা যায় না। এই বিরাট গ্রন্থ "শাহনামা" বা রাজ কাহিনী নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে এমন অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহা পরবর্ত্তী যুগে বহু ভাষায় বহু সাহিত্যের খোরাক যোগাইয়াছে। লায়লি-মজনু, শিরি-ফরহাদ, সোহ্‌রাব-রুস্তম প্রভৃতি বহু কাহিনী পরবর্ত্তী যুগে অনেকটা আন্তর্জাতিক আখ্যান বস্তুর স্থান অধিকার করিয়াছে।

দশ শত খৃষ্টাব্দ হইতে উনিশ শত খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাহনামা হস্ত লিখিত পুঁথি হিসাবেই ছিল। ১৮৩১-৬৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই বিরাট পুস্তকের একটি সুন্দর মুদ্রিত সংস্করণ জুলিয়াস ফন মোহন কর্ত্তৃক ফরাসী সরকারের খরচে প্রকাশিত হয়। পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ও তাহা প্রকাশ করিবার খরচ এত বেশী হয় যে, এই সংস্করণ কিনিবার মত বহু ক্রেতা পাওয়া যায় নাই। ফ্রাউ ফনমোহন ১৮৭৬-৭৮ খৃষ্টাব্দে ইহার একটি সস্তা ফরাসী অনুবাদ বাহির করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে টার্ণার ম্যাকান, জার্ম্মাণী হইতে ১৮৭৭-৮৩ খৃষ্টাব্দে ভুলার ও লণ্ডাওয়ার, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে অ্যাটকিনসন, ১৮৮৬-১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারনার কবিতায় লণ্ডন হইতে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে রজার এবং ১৮৮৬-৮৮ খৃষ্টাব্দে ইটালী হইতে আই, পীৎসি এই পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইটালীয়ান ও অন্যান্য অনেক অনুবাদই মাত্র অংশ বিশেষের অনুবাদ। একটি মানুষের চেষ্টায় এতবড় কাব্যগ্রন্থ পৃথিবীর ইতিহাসে আর নাই। ইহার অনেকগুলি কাহিনীই বর্ত্তমানে সর্ব্বমানবের রস-সম্পদ।

বৃটিশ আমলে ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা যেমন তাঁহাদের সকল কাজের অনুপ্রেরণা খুঁজিতেন "হোম"—এ বা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে, বাংলাদেশের পাঠান শাসকও তেমনি তাঁহাদের কালে আদর্শের জন্য তাকাইয়া থাকিতেন গজনী বা সমরকন্দের দিকে। পাঠান শাসক সম্প্রদায়ের পক্ষে গজনীর দিকে তাকানো কিছুই অস্বাভাবিক নয়— অনুচিতও যে নয় তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যখন গজনীতে 'শাহনামা' সৃষ্টির ইতিহাস পড়া যায়।

নাসিরউদ্দীন মাহমুদ বহুকাল বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। তাঁহার পিতা গিয়াস উদ্দীন বলবন বৃদ্ধাবস্থায় দুর্ব্বল হইয়া নাসিরউদ্দীনকে কিছুদিন দিল্লীতে থাকিতে বলিয়াছেন। নাসির তিন মাস কাল দিল্লীতে থাকিয়া পিতার আদেশ না লইয়াই গোপনে বাঙ্গালায় চলিয়া আসেন। দিল্লীর সিংহাসনের চেয়েও বাঙ্গালাদেশ তাঁহার অধিক প্রিয় ছিল, এই ঘটনাই তাহা বলিয়া দেয়। বাংলা সাহিত্য যে এমন একজন শাসকের হাতে নূতন জীবন লাভ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। পিতার মৃত্যুর পর নাসিরউদ্দীন বাঙ্গালাদেশে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র কায়কোবাদ দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

বাঙ্গালাদেশে অবস্থান করিলেও শাহনামা, সুলতান মাহমুদ ও গজনী নাসির উদ্দীনের অন্তর হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই। সুলতান মাহমুদের আদর্শেই তিনি এ দেশের শাহনামা

www.pathagar.com

রচনা করাইতে চাহিয়াছিলেন। সেই শাহনামার প্রথম অধ্যায় মহাভারত তাঁহার রাজত্ব কালেই বাঙ্গালায় অনূদিত হয়। মহাভারত ধর্ম্মগ্রন্থ হইলেও তাহাই এদেশের প্রাচীনতম কাহিনী। সেই রাজকাহিনী তিনি বাংলায় অনুবাদ করাইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ বাড়াইয়া গিয়াছেন। রাজ দরবারে লাঞ্ছিত বাংলা ভাষা এই অনুপ্রেরণা পাইয়া এই সময় হইতে নূতন গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

এই কালের ইহাই যে একমাত্র রচনা তাহা নহে। নাসির উদ্দীনেরও পূর্ব্বে ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে যখন বীরভূমের পশ্চিম অঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহ দেখা দেয় সেই সময় রামচন্দ্র কবি ভারতীর আবির্ভাব ঘটে। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অনুদারতায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বরেন্দ্র মণ্ডলের বীরাবতী নগরে কাত্যায়নী গোত্রে তাঁহার জন্ম হয়। কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মে আস্থা হারাইয়া তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও সমাজের অপর সকলে তাঁহার উপর নানা প্রকার উৎপীড়ন-অত্যাচার করিতে থাকে। রামচন্দ্র উত্ত্যক্ত হইয়া দেশত্যাগী হন। ইহার পর তিনি সিংহলে গিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। সে সময় পরাক্রমবাহু সিংহলে রাজত্ব করিতেছিলেন।

রামচন্দ্র ফারসী "পন্দে নামার অনুকরণে" "ভক্তিশতক", "বৃত্তমালা" ও "বৃত্তরত্নাকর" গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। কিন্তু বোধ হয় লেখক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করায় তাঁহার রচনা আর উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তা বিবেচিত না হোক— কিন্তু এ রচনা ঠিক সেই সময়ের যে সময় সম্বন্ধে সুকুমার সেন বলিয়াছেন— "প্রায় আড়াই শত বৎসরের মত দেশ সকল দিকেই পিছাইয়া পড়িল। দেশে শান্তি নাই, সুতরাং সাহিত্য চর্চা তো হইতেই পারে না।" রামচন্দ্রের রচনা যে উঁচুদরের সাহিত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে তাহা কেহই বলিবে না, কিন্তু ত্রয়োদশ শত খৃষ্টাব্দে বা তাহার পূর্ব্বে খুব উঁচুদরের লেখা যে বিশেষ কিছু ছিল তাহার প্রমাণ আজো পাওয়া যায় নাই। সেই দিক হইতে বিচার করিলে রামচন্দ্রের আবির্ভাব উল্লেখযোগ্য বই কি।

কিন্তু ত্রয়োদশ শত খৃষ্টাব্দের প্রকৃত দান পুস্তকাকারে নয়—সাহিত্য সৃষ্টি হইবার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টিতে। এই খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষা যে মর্যাদা পাইল তাহা ইহার পূর্ব্বে প্রায় এক হাজার বৎসর পায় নাই। এই এক হাজার বৎসর বাংলা ভাষা ছিল সমাজের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর ভাষা—কোনপ্রকার সংস্কৃতির বাহক নয়—শুধু দৈনন্দিন কাজ চালাইবার ভাষা। ত্রয়োদশ শত খৃষ্টাব্দেই সর্ব্ব প্রথমে এই ভাষা শুধু রাজদরবারে সম্মান পাইল না—ক্রমে পবিত্র ধর্ম্মের কাহিনী বিবৃত করিবারও উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল।

ইহার চেয়েও বড় লাভ যাহা ঘটিল তাহা এই যে, মনে যাঁহাদের চিন্তা ছিল অথচ সংস্কৃত জানা ছিল না বলিয়া তাহা সুধী সমাজে প্রকাশ করিবার সুবিধা হয় নাই—বাংলা ভাষার মর্য্যাদা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মনের দুয়ারের অর্গল ভাঙ্গিয়া গেল। এই অর্গল ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়াই আর কিছু দিনের ভিতরেই দেশী ভাষায় বাঙ্গালার দুইজন শ্রেষ্ঠ কবির জন্ম সম্ভব হইয়াছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই এই সময়ের কবি। যে সময়

www.pathagar.com

সুকুমার সেনের মতে বন্ধ্যা কাল সেই সময় এই দুইজন শ্রেষ্ঠ কবি জীবনদর্শনের পরিপ্রেক্ষিত রচনা করিয়াছেন। কাব্য একটি অহেতুক বস্তু নিরপেক্ষ ভাষায় কল্লোল নয়—জীবন ও পরিপার্শ্বের আঘাত-সংঘাতে গড়িয়া ওঠা বিশিষ্ট অনুভূতির মনোহর অভিব্যক্তি। জীবনের পরিপ্রেক্ষিত যেখানে নাই—কাব্য সেখানে অসার কথার মিল ছাড়া আর কিছুই নয়। জীবন ও পরিপার্শ্বিক নিরপেক্ষ যে কাব্য তাহা সাধারণ অভিজ্ঞতার বাহিরের বস্তু। সেই সর্ব্বনিরপেক্ষ অনভিজ্ঞ ভাব মনকে ঠিক তেমন করিয়া নাড়া দেয় না—যেমন করিয়া দেয় অভিজ্ঞতার ভিতরের কোন বস্তু বা ভাব।

আমীর জইন উদ্দীন খান—ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম জীবনী রচনার কাল স্থির নিশ্চয় হইয়া বলিবার উপায় নাই। তবে জীবনী রচনা যে প্রথম আর্য্য লেখকগণ করেন নাই তাহা স্থির নিশ্চয় হইয়াই বলা চলে। বুদ্ধের জীবনী রচিত হইবার পূর্ব্বে সংস্কৃতে কোন জীবনী লিখিত হয় নাই। বৌদ্ধদের ভিতর অশ্বঘোষ, বুদ্ধঘোষ, কল্‌হন জীবনী রচনা করিয়াছেন। ইহাদের অভ্যাস যে অনার্য্য অভ্যাস তাহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু বেদের সময় হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত, আর্য্য লেখকদের রচিত কোন প্রকৃত জীবনী আজো পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বাংলায় জীবনী কাব্য বা জীবনী লিখিবার অভ্যাস তাই-আর্য সভ্যতার কাছে প্রেরণা পাইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। আর্য্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার বহু পূর্ব্বেই বাংলাদেশ অনার্য্য, বৌদ্ধ ও জৈন সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছিল। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ যুগে বাংলা ভাষায় রচিত কোন জীবনী পাওয়া যায় নাই। ১২০০ খৃষ্টব্দের পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় যে কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহাই স্থির নিশ্চয় হইয়া বলিবার মত কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। সংস্কৃতে অবশ্য সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিত" লিখিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী পুণ্ড্রবর্দ্ধনের বৌদ্ধ অধিবাসী পুণ্ডরীক। রামচরিত বৌদ্ধ পাল বংশের রামপালের কাহিনী সম্ভবতঃ কল্‌হনের অনুপ্রেরণায় লিখিত। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই সময়ের মধ্যে বা আরো দুই শতাব্দী পর পর্য্যন্ত কোন প্রকার জীবনী বা কাব্য রচিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

আরবীতে ইতিপূর্বেই সপ্তম শতাব্দী হইতে বহু জীবনী লিখিত হইয়াছিল। এমনকি খল্লীকানের বৃহৎ জীবনীকোষ যাহাতে সমস্ত মুসলিম জগতের বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী, আক্ষরিক পরম্পরা অনুসারে সাজাইয়া লিখিত হইয়াছিল তাহাও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা সেকালের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। আরবী জীবনী রচনার অনুপ্রেরণায় পরবর্ত্তী যুগে ফারসীতে বহু জীবনীগ্রন্থ ও কাব্য রচিত হয়। এইসব আরবী ও ফারসী জীবনী মুসলিম যুগে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। অনেকগুলি বিখ্যাত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি-যে সবের রচয়িতা অনেকেই ভারতীয়-আজো বাঁকিপুর ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। লণ্ডনের ভারতীয় আপীস লাইব্রেরী ও বার্লিনেও অনেকগুলি পুঁথি আছে। সবগুলি পুঁথির আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। মাত্র কয়েকটি অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম করিলেই-মুসলিম যুগে জীবনী রচনার উৎসাহ ও কৃতিত্ব স্পষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বাঁকিপুর লাইব্রেরীতে যে সব জীবনী আছে-তাহা বিভিন্ন জাতীয়। প্রত্যেক জাতীয় জীবনীর শুধু

www.pathagar.com

নামের তালিকা কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী। যেমন বিভিন্ন হাদীস সংগ্রাহকদের জীবনী গ্রন্থের তালিকা ৪৩ পৃষ্ঠাব্যাপী।

বিভিন্ন–সূফী ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির জীবনীগ্রন্থের তালিকা ১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী। কোরানের যাঁহারা ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন তাঁহাদের জীবনীগ্রন্থের তালিকা ২৮ পৃষ্ঠাব্যাপী।

বৈজ্ঞানিক ও হাকিমদের জীবনীগ্রন্থের তালিকা–এক পৃষ্ঠাব্যাপী।

ইহা হইতে সেকালে ভারতে প্রচলিত কত বিভিন্ন প্রকারের জীবনী কত সংখ্যায় লিখিত হইয়াছিল তাহার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। বাঁকিপুর লাইব্রেরী ছাড়া কলিকাতার বুহার লাইব্রেরী, হায়দরাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়–দেওবন্দ মাদ্রাসা ও অন্যান্য বহু ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে যে অসংখ্য জীবনীগ্রন্থ আছে তাহার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়।

দশম শতাব্দীতে 'রচিত কিতাবুল আঘানী'–২১ খণ্ডে বিভক্ত একটি বিশাল গ্রন্থ। রচয়িতা আবুল ফারাজ আলী বিন আল হুসাইন। এই গ্রন্থে গায়ক ও কবিদের জীবনী প্রাচীন কাল হইতে লেখকের কাল পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

'তবকাত আশ্–শুআরা'তে ইসলাম-পূর্ব্ব যুগ হইতে হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত বিখ্যাত কবিদের জীবনী লিখিত হইয়াছে। রচয়িতার নাম— আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মুসলিম।

শুধু যে আক্ষরিক পরম্পরা অনুসারে বিভিন্ন যুগের বিখ্যাত জীবনী আলোচিত হইয়াছে তাহা নহে—এক এক দেশের বিখ্যাত জীবনীও এক এক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। আবুবকর আহমদ–বিন আলী বিন–খাবিদ একাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত জীবনীকার। তাঁহার রচিত 'মুখতসর তারিখ বাগদাদ' একটি জীবনী অভিধান। ইহাতে তাঁহার কাল পর্য্যন্ত বাগদাদের বিভিন্ন বিভাগের বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী দেওয়া হইয়াছে। আবুবকরের জন্ম বুখারায় কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তিনি তাঁহার বাবার সঙ্গে বাগদাদে যাইয়া বাস করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল ১০৯৮ খৃঃ

'তারিখ দামস্ক'–তারিখ বাগদাদের মতই একটি জীবনী অভিধান। ইহাতে দামেস্কের বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী আছে। রচয়িতা সিকাতাদ্দিন আবুল কাসেম।—লেখকের মৃত্যুকাল ১১৭৬ খৃঃ। গ্রন্থখানি ৩২ খণ্ডে বিভক্ত। তারিখ দামস্ক লিখিত হইবার ৩০/৪০ বৎসর পূর্ব্বে আবু নাসর আল ফাতেহ বিন মোহাম্মদ বিন উবায়দুল্লাহ স্পেইনের বিখ্যাত লেখক ও কবিদের রচনা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের একটি সুন্দর জীবনী রচনা করেন। আবু-নাসরের মৃত্যুকাল ১১৪০ খৃষ্টাব্দ। তাঁহার গ্রন্থ ইহার অনেক পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছিল।

ইয়ামনের বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী লেখেন বদরউদ্দিন আবু আবদাল্লা আল হুসেইন। তাঁহার কাল– ১৩৭৮ (জন্ম)–১৪৫১ (মৃত্যু)। ইহাতে শুধু যে ইয়ামনের বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে; ইয়ামনের বাহির হইতে যদি কোন বিখ্যাত ব্যক্তি ইয়ামনে আসিয়া থাকেন তবে তাঁহারও জীবনী এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তৃতীয়

www.pathagar.com

হিজরী পর্য্যন্ত ইয়ামনের গবর্ণর, পণ্ডিত ব্যক্তি, সূফী ও ধার্ম্মিক যাঁহারা বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন তাঁহাদের সকলেরই জীবনকাহিনী এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

তুরস্কের বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনকাহিনী লিখিত হইয়াছে– "আল ইকদল মনজম ফি দিকর আফদিল আর রুম" গ্রন্থে। ইহার রচয়িতার নাম জানিতে পারা যায় নাই। গ্রন্থে তুরস্কের অটোমান সুলতানদের রাজত্বে যে সব জ্ঞানী ব্যক্তি ১৫২০ হইতে ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের ভিতর বাস করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনকাহিনী দেওয়া হইয়াছে। হাধরামাউতের জীবনী গ্রন্থে চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর বংশধর যাঁহারা ঐ প্রদেশে বাস করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনী–জামাল উদ্দিন আবু আল ওয়াই মোহাম্মদ বিন–আবি বকর লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আবি বকরের মৃত্যুকাল ১৬৮২ খৃষ্টাব্দ।

সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে শিহাবদ্দিন আহমদ বিন মোহাম্মদ বিন উমর আল আফাজি অল মিসরি "রায়হানত অল আলিব্বা ওয়া জহরতল হায়াত" রচনা করেন। এই গ্রন্থ চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে সিরিয়ার যে সব কবি লেখকের কালে বর্ত্তমান ছিলেন তাঁহাদের জীবনী আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে পশ্চিম দেশীয় কবিদের জীবনী লিখিত হইয়াছে।—মৃত্যু ১৬৯১ খৃষ্টাব্দ।

একই শতাব্দীতে সদরউদ্দীন আলা বিন আহম্মদ বিন মোহাম্মদ মাসুম "সুলাফত অল আশরফি মহসিন আয়ান অল আসর" নামক পুস্তকে একাদশ শতাব্দীর কবিদের জীবনী সন্নিবেশিত করেন। সদরউদ্দীনের জন্ম মদিনায়–১৬৪২ খৃষ্টাব্দে। সদরউদ্দীন পারস্যের সফাবিদ রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার বাবা গোলকণ্ডার আবদাল্লাহ কুতুব শাহের মেয়ে বিবাহ করিয়া গোলকণ্ডায় বাস করেন। সদর উদ্দীন মক্কায় শিক্ষা লাভ করিয়া গোলকণ্ডায় তাঁহার বাবার নিকট আসেন। কিন্তু সেখানে দুর্ব্যবহারের জন্য পরে সম্রাট আলমগীরের দরবারে পলায়ন করেন। আলমগীর তাহাকে খান উপাধী ও ১৫০০০ ঘোড় সোওয়ারের অধিনায়ক করিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি ইস্পাহান যান। কিন্তু সেখানে সুলতান তাঁহাকে বিশেষ সম্মান না করায় নিজ জন্মস্থান শিরাজ নগরে মদরেস হিসাবে জীবন অতিবাহিত করেন। মৃত্যু ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ভারতেও মীর গোলাম আলী–আলী আল হুসেইনী অল ওয়াস্তি অল বিল গারামী–"সুবহাত আল মরজন ফি আসরার হিন্দুস্তান" রচনা করেন। ইহাতে বিখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিত ব্যক্তির জীবনী দেওয়া আছে। তাছাড়া–সংস্কৃত ও আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রেরও বিস্তৃত আলোচনা আছে। ভারতীয় ও আরবী দৃষ্টিকোণ হইতে "প্রেমের" আলোচনাও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানি ৪ খণ্ডে বিভক্ত।

বাংলা ভাষায় জীবনীগ্রন্থ ইহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। যিনি এই জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন তিনি বাঙালী নহেন, আফগানী। কিন্তু বাংলাদেশেই স্থায়ীভাবে বাস করেন এবং ফার্সী ও বাংলা দুই ভাষাতেই কাব্য রচনা করেন। তাঁহার নাম আমীর জইন উদ্দীন খান। তাঁহার রচিত কাব্যের নাম "রসূল বিজয় কাব্য"। ইহাই বাংলা ভাষার প্রথম জীবনীকাব্য। পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের জীবনী অবলম্বনে লিখিত।

www.pathagar.com

নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রুকন উদ্দীন বারবাক শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাসির উদ্দীনের জীবিত কালে রুকন উদ্দীন দক্ষিণ বঙ্গে সপ্ত গ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রুকন উদ্দীনের রাজত্বকালে কামরূপ ও উড়িষ্যা তাঁহার সেনাপতি ইসমাইল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, কামরূপ বিজিত হইয়াছিল এবং উড়িষ্যার অন্তর্গত মান্দারণের রাজা বিদ্রোহী হইলে তাঁহাকেও পরাজিত ও নিহত করিয়া ইসমাইল, গাজী উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। বারবক শাহের রাজত্বকালেই দক্ষিণ বঙ্গের হিন্দু রাজাদের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছিল। চট্টগ্রামও বারবকের অধিকারভুক্ত ছিল। বারবক শাহ ১৪৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তাঁহার রাজত্বকালেই কবি জইন উদ্দীনের আবির্ভাব।

বাংলা ভাষায় প্রথম জীবনকাব্য জইন উদ্দীনের জীবন কথা বিস্তৃত জানিতে পারা যায় নাই। বিজয় কাব্যের প্রথম স্রষ্টা এ পর্য্যন্ত মালাধর বসুকেই মনে করা হইয়াছে। মালাধরের কালজ্ঞাপক যে দুইটি চরণ সচরাচর উদ্ধৃত হইয়া থাকে—সেই চরণ,

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন"।

মালাধর রচিত কোন হাতে লেখা পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই—পাওয়া গিয়াছে মুদ্রিত পুঁথিতে। এই কবিতা অবলম্বন করিয়া এবং মালাধরের নিজের কথা "গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান" এর সূত্র ধরিয়া একাল যাবৎ অনেকেই মনে করিয়া আসিতেছেন মালাধর বসু শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহের (১৪৭৩-৮২) নিকটেই 'গুণরাজ খান' উপাধি পাইয়াছিলেন। অপর মতে মালাধর হোসেন শাহের দরবার হইতে উপাধি পাইয়াছিলেন। কেহ কেহ আবার উত্তর বঙ্গের বণিক কুলধর ও মালাধরকে এক মনে করিতে চাহেন। এই কুলধর প্রথমে গৌড়েশ্বরের কাছে 'সত্যখান" এবং পরে "শুভরাজ খান" উপাধি পাইয়াছিলেন। 'শুভরাজ' খানই ছাপার ভুলে 'গুণরাজখান' হওয়া বিচিত্র নয়।

'সত্যখান', 'শুভরাজ খান' অথবা 'গুণরাজ খান' যে সুলতানের দেওয়া উপাধি তাহার কোন প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ইতিহাসে এই ধরনের উপাধির কোন উল্লেখ নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার রচিত "চৈতন্য চরিতামৃতে' 'গুণরাজের' উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে লিখিয়াছেন চৈতন্য নীলাচলে গুণরাজ খানের পুত্র সত্যরাজ খানকে সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। গুণরাজ খান উপাধি হইলে সত্যরাজ খানও উপাধি হওয়া উচিত। কিন্তু কৃষ্ণদাস এই দুইটির একটিও উপাধি হিসাবে উল্লেখ করেন নাই। গুণরাজ খানের পৌত্র রামানন্দবসুকে রামানন্দই লিখিয়াছেন। কিন্তু গুণরাজ অথবা সত্যরাজের অপর কোন নাম নাই। দেখিয়া-শুনিয়া অবশেষে সুকুমার সেনকেও লিখিতে হইয়াছে ঃ

"শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কবে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা জানিতে পারি নাই, তবে রাধিকানাথ দত্তের সংস্করণ (চৈতন্যন্দ ৪০১, ১৮৮৬-৮৭ খৃঃ) যে প্রথম মুদ্রণ নয় তাহা নিঃসন্দেহ। প্রকাশকের "উপক্রমণিকায় প্রকাশ" আমরা হস্তলিপি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত

www.pathagar.com

করিলাম তাহাতে পাওয়া যায় যে শ্রী শ্রী মহা-প্রভুর আবির্ভাবের দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৩০৫ শকাব্দে শ্রীবেদানন্দ বসু কর্তৃক ঐ গ্রন্থ লিখিত হয়। কৃত্তিবাসের ১৪২৩ শকাব্দের পুঁথির মত এই পুঁথিখানিও হারাধন দত্তের সংগ্রহ। ১৪০৫ শকাব্দের ভাষার চিহ্নমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থে নাই। পুঁথির তারিখে যদি কারচুপি না থাকে তবে বুঝিব যে উহা আদর্শ পুঁথির লিপিকাল।"

লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়মে একটি 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' আছে। তাহার মুদ্রণকাল ১৮৮৭। এটি লিখিত হইয়াছিল দেবানন্দ বসু কর্তৃক ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে। তখন ইউসুফ শাহের কাল শেষ হইয়াছে। সুতরাং সুকুমার সেনের সন্দেহ নিতান্ত অমূলক মনে হইতেছে না। মুদ্রিত পুঁথির মত এই পুঁথির কবিতাগুলিতে নম্বর নাই এবং পরিচ্ছেদ ভাগ করাও নয়।

জইন উদ্দীনের 'রসূল বিজয় কাব্য' বিজয় কাব্যগুলিরই একটি। বিজয় কাব্যের আদি মালাধর বসুকে স্থির করা হইলেও তাঁহার কাল সম্বন্ধে যে নানা সন্দেহের অবকাশ আছে তাহা উপরের আলোচনা হইতে বেশ ভালভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। মালাধর বসু যে শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের কালে তাঁহার আদেশেই 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনা করিয়াছিলেন তাহার নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নাই। সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, "গুণরাজ খানের ভণিতায় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত শ্রীরাম পাঁচালী পুঁথি অনেকগুলি মিলিয়াছে। সবচেয়ে পুরানো পুঁথির লিপিকাল ১৬৭৯-৮০ খৃঃ।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে রচিত 'লক্ষ্মী মঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা শিবানন্দ কর ও গুণরাজ খান। রাজা রামমোহনের কালেও যে পাঠান সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের উপাধি বিতরিত হইত একথা সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে গুণরাজ খান বলিয়া কোন উপাধি পাঠান বা মোগল শাসকেরা যে কেহ বিতরণ করিয়াছেন তাহা আজো সঠিকভাবে জানা যায় নাই। শুধু পুঁথির উপরে নির্ভর করিয়া ইহার সত্যাসত্য মানিয়া লওয়া যায় না।

'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের' বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে প্রধানত ভাগবতেরই গল্পাংশের অনুসরণ হইয়াছে। স্থানে স্থানে বিষ্ণু পুরাণ ও হরিবংশের অনুসরণও দেখা যায়।"

ভবানন্দের রচিত হরিবংশ সপ্তদশ শত খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। বিষ্ণুপুরাণ আরো পরের রচনা। কিন্তু শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের কাল ১৪৭৩-৮২। মালাধর বসু শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের আদেশে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় রচনা করিয়া থাকিলে প্রায় দুই শতাব্দী পরে রচিত হরিবংশের অনুসরণ করিলেন কিরূপে। মালাধরের পূর্ব্ববর্ত্তী যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ মহাত্ম্য লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের অন্যতম জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস। জয়দেবের কাব্যের নাম 'গীতগোবিন্দ'; বিদ্যাপতির কাব্য 'পদাবলী' নামেই প্রচারিত। চণ্ডীদাসের পুঁথির নামও 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন'। কিন্তু মালাধরের রচনা সেই একই বিষয় লইয়া হওয়া সত্ত্বেও উহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'। শুধু তাহাই নহে, গোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন রচনার কোন মওসুম দেখা যায় নাই; পদাবলী যদিও অনেকেই রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বিজয় কাব্যের একটা ধারাবাহিক মওসুম চলিয়াছে। মঙ্গল কাব্যের মতই তাহা বহুকাল বহু কবির আকর্ষণীয় বস্তু রূপে দেখা দিয়াছে। তবে মঙ্গল কাব্যগুলির আখ্যান বস্তু যেমন

www.pathagar.com

এক এক শ্রেণীর মোটামুটি একই, বিজয় কাব্যের তাহা নহে। বিজয় কাব্যে হিন্দু ও মুসলিম কবির রচনার বিষয়বস্তু পৃথক।

গোবিন্দের গীত বা কৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন হঠাৎ 'বিজয়' রূপে প্রকাশ পাইল কিরূপে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। এমনকি মনসা মঙ্গলও মনসা বিজয়ে পরিণত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। নিছক প্রেমলীলা তাহাও 'গোপালবিজয়' রূপে দেখা দিয়াছে। এ পরিবর্ত্তন কি অহেতুক!

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত বিজয় কাব্য পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে জইন উদ্দীনের 'রসূল বিজয়', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', বিপ্রদাসের 'মনসা বিজয়', পরমেশ্বরের 'পাণ্ডব বিজয়', শেখ ফয়জুল্লাহের 'গোর্খ বিজয়', 'গাজী বিজয়', 'সত্যপীর বিজয়' এবং কবি শেখরের 'গোপাল বিজয়' কাব্যই প্রধান। মালাধর বসু ও বিপ্রদাস কেহই জীবিতকালে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের কাল সম্বন্ধেও সঠিক কিছু জানা নাই। তবে তাঁহারা যে প্রাচীন অন্ততঃ ষোড়শ শত খৃষ্টাব্দের পরের কেহ নহেন তাহা ঠিক। কিন্তু জইন উদ্দীন নিশ্চিতরূপে ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী।

জইন উদ্দীন সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন কৌতূহল দেখা যায় নাই। একমাত্র আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ তাঁহার প্রাচীন পুঁথির বিবরণীতে জইন উদ্দীনের কথা বলিতে গিয়া তিনি যে কোন ইউসুফ খানের আদেশে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই ইউসুফ খান কে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আজও সংগৃহীত হয় নাই। সুকুমার সেন ইউসুফ খানকে চট্টগ্রামের জমিদার বিবেচনা করিয়া জইন উদ্দীনকে আধুনিক কালের কবি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ ইউসুফ খানকে শাম্‌সুদ্দীন ইউসুফ শাহ মনে করিয়াছেন। ইউসুফ খান চট্টগ্রামের জমিদার হওয়া যেমন সম্ভব, আবার গৌড়ের সুলতান হওয়াও তেমনি সম্ভব। সেকালে গৌড়ের সুলতানকে শাহ না বলিয়া শুধু ইউসুফ খান বলা, পুঁথিকারের পক্ষে সম্ভব হইত বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং যে ইউসুফ খান 'রসূল বিজয়' কাব্য লিখিতে আদেশ দিয়াছিলেন, তিনি যে সুলতান ছিলেন না তাহা নিশ্চিত। অপরপক্ষে ইউসুফ খান যদি একজন সাধারণ জমিদার হইতেন তবে তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশের এমন কিছু মূল্য হইত না যাহা পুঁথিতে উল্লেখ করিয়া পুঁথিকার যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিতেন। সুলতানের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া কোন কিছু রচনা করার অর্থ শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করা।

জইন উদ্দীন প্রকৃত পক্ষে চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন না এবং সামান্য জমিদার কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াও কাব্য রচনা করেন নাই। তাঁহাকে যিনি আদেশ করিয়াছিলেন তিনি ইউসুফ খানই বটে তবে হয়ত যে সময়ে আদেশ করিয়াছিলেন সে সময় পর্য্যন্ত সুলতান হন নাই। ইউসুফ শাহ যে নাসির উদ্দীন মাহমুদ কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন সেই 'নাসির শাহের' পৌত্র। নাসির শাহের পর গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র রুকন উদ্দীন বারবক শাহ। তারিখ-ই-ফেরেশ্‌তা অনুসারে বারবক শাহ সুপণ্ডিত ও সুবিচারক ছিলেন। 'বারবাক শাহের' ই সেনাপতি ইসমাইল গাজী। তাঁহার

www.pathagar.com

কীর্ত্তি কাহিনী শেখ ফয়জুল্লাহ 'গাজী বিজয়ে' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বারবক শাহের দরবারে বহু আরব, পারসিক ও আফগানী গুণী ব্যক্তির দ্বারা অলঙ্কৃত থাকিত। এই গুণী ব্যক্তিদেরই একজন আমীর জইন উদ্দীন। জইন উদ্দীন ছিলেন বারবক শাহের সভাকবি। জইন উদ্দীনের প্রকৃত নাম জইন উদ্দীন খান, জাতিতে পাঠান। তিনি ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও বাংলা ভাষাতেও কাব্য রচনা করিয়াছেন। ফরাসী ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ফারসী অভিধান 'শউফ নামা' সৃষ্টির ইতিহাস হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

জইন উদ্দীনের "রাসূল বিজয়ের" যে কয়টি পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে তাহা যে অবিকৃত অবস্থায় আছে তাহা মনে হয় না। এই 'রসূল বিজয়' রচয়িতা মোহাম্মদ খানের পরবর্ত্তী। সুতরাং ইউসুফ খান কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইতে পারে না। 'রসূল বিজয়' কাব্যে মোহাম্মদ খানের "শান্ত দান্ত গুণবন্তু" প্রভৃতি কথা এবং জইন উদ্দীন মোহাম্মদ খানের শিষ্য, এ সংবাদ প্রকাশক পদ– আদি জইনুদ্দীনের হইতে পারে না। দেখিয়া মনে হয় এ জইনুদ্দীন আসল নয়—নকল, হয়ত কোন পুঁথি প্রকাশক।

মওলানা ইব্‌রাহিম ফারুকী ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে শৌফনামা অভিধান সঙ্কলন করেন। অভিধান প্রণয়নে মওলানা ইব্‌রাহিম যাঁহাদের সাহায্য পাইয়াছিলেন তাঁহাদের ভিতরে সুলতানের সভাকবি আমীর জইন উদ্দীন অন্যতম। জইন উদ্দীনের জন্মস্থান হীরাট। তাঁহার আর একটি নাম ছিল ফতেহ্ খান। ফারসী কবিতায় নাকি তিনি ফতেহ খান বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। এই কারণেই 'রসূল বিজয়ের' যে আমীর জইন উদ্দীন তাহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সেকালে ফরাসীতে সুপণ্ডিত অনেক মুসলমান পাঠান কবিই বাংলা কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ভিতরে আলাউল খান ও মোহাম্মদ খান বিশেষ পরিচিত।

বারবক শাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেই যুবরাজ ইউসুফ খান আমলী জইন উদ্দীনকে রসূলের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিতে বলেন। ইহারই ফলে 'রসূল বিজয়' কাব্য সৃষ্টি হয়। বারবক শাহের মৃত্যু হয় ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার মৃত্যুর পর ইউসুফ খান শাম্‌সউদ্দীন ইউসুফ শাহ রূপে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং 'রসূল বিজয়' কাব্য ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। বিজয় কাব্যগুলির মধ্যে 'রসূল বিজয়' প্রাচীনতম বটেই—এমনকি চণ্ডীদাস হইতেও জইন উদ্দীনের প্রাচীনতর হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

বিজয় কাব্য রচয়িতাদের অধিকাংশ মুসলমান। জইন উদ্দীন, শেখ ফয়জুল্লাহ, সাবিরিদ খান, শেখচাঁদ প্রভৃতি সকলেই বিজয় কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাদের কাব্য রসূল বিজয় বা গাজী অথবা সত্যপীর বিজয় সব ক্ষেত্রেই বিজয় কথার অর্থ সঙ্গতি আছে। বিজয়ের সাধারণ অর্থেই নামগুলি বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ বিজয় অথবা কবি শেখরের গোপাল বিজয় বুঝিতে হইলে বিজয়ের অর্থকে টানিয়া মোচড়াইয়া নূতন রূপ দিতে হয়। নহিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা অথবা গোষ্ঠবিহারী গোপালের গোচারণকে বিজয় বলিয়া বুঝিতে পারা শক্ত। মনে হয় মুসলিম শাসন যুগে রসূল বিজয়ের হিন্দুর প্রতি আদর্শ

www.pathagar.com

সৃষ্টির জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বিজয় অথবা গোপাল বিজয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। রসূলের জীবনে বিজয় একটি বিশিষ্ট অংশ– ইসমাইল গাজীর জীবনেও বিজয় তাঁহার জীবনের অংশ। ভাগবতের, গীত গোবিন্দের অথবা শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের শ্রীকৃষ্ণেও তেমন কোন বিজয় নাই; তবে অর্জ্জুনের সারথি কৃষ্ণের বিজয় আছে। তাহা মহাভারতের আখ্যান বস্তু নয়। তবুও এক কালে এই বিজয় পুঁথির নামের সহিত যোগ করা হইত—হয়ত এই কারণেই যে রাজ–দরবারের আমীর জইন উদ্দীন যে নাম রসূল সম্বন্ধে অবলম্বন করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ্য সমাজেও অনুরূপ নাম না রাখিলে হয়ত শ্রীকৃষ্ণের মহিমাকে রসূলের মহিমার মত উন্নত করিয়া তোলা সম্ভব হইত না। রুকন উদ্দীন বারবক শাহের দরবারের কবি জইন উদ্দীন যে প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহা সেকালের হিন্দু–মুসলমান সকল কবিই গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তন ও পদাবলী ছাড়িয়া বিজয় কাব্য রচনায় মনোযোগ দিয়াছিলেন। রাজ–দরবার হইতে প্রচলিত না হইলে বিজয় কাব্য একটি প্রথায় পরিণত হইত না। মঙ্গল কাব্য ও পদাবলীর প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল ধর্ম্মের কারণে। সেই প্রথা পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ একটি নূতন প্রথা গ্রহণ করা প্রচণ্ড শক্তির প্রভাব ছাড়া ঘটিতে পারে না। মুসলিমপূর্ব্ব যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম প্রতিক্রিয়া বিজয় কাব্য। এই প্রতিক্রিয়ার হিন্দু প্রতিক্রিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, মনসা বিজয় ও গোপাল বিজয়। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ও গোপাল বিজয়ে শুধু হিন্দু আদর্শকে বড় করিয়া তুলিবার চেষ্টা আছে; কিন্তু বিপ্রদাসের মনসা বিজয়ে রসূল বিজয়ের মতই মনসার বিজয় ঘোষিত হইয়াছে। এমনকি দেশের সুলতানও যে মনসা দেবীর কাছে কত তুচ্ছ তাহা দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে নীচের কয়েকটি চরণে। দেশের রাজা হাসনের সঙ্গে মনসার বিবাদ বাধিলে চাঁপা বিবি হাসনকে উপদেশ দিল ঃ

সাপের দেবতা বটে সেইত মনসা
হিন্দুর গোসাঞি যবনের হাওয়াসা।
তার সঙ্গে রাজা তুমি না করিহ বাদ
নাগেতে বেড়িয়া রাজ্য হবেক প্রমাদ।

হাসন উপদেশ শুনিলেন না, হুকুম দিলেন ঃ

হেড়া খাওয়াইব তারে দেহ পাকড়িয়া
দরবেশ নিকা দিব কলেমা পড়াইয়া।

ইহাতে মনসা রাগে হাসনহাটির সমস্ত প্রজা ধ্বংস করিলেন। তারপর হাসনকেও দুর্দ্দশায় ফেলিলেন। তখন আর উপায় না দেখিয়া হাসন বিধিমমে মনসার পূজা দিলেন। মনসা খুশী হইয়া তাঁহার পূর্ব্ব অবস্থা ফিরাইয়া দিলেন।

ইহা যে মনসা বিজয় তাহাতে সন্দেহ কি।

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক

লেখক-পরিচিতি ঃ 'বাংলা ভাষায় মুসলিম অবদান' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

লেখা-পরিচিতি ঃ লেখাটি 'মাহে নও' ৮ম বর্ষ, ৩২ সংখ্যায়, চৈত্র ১৩৬৩ (মার্চ ১৯৫৭) সালে প্রকাশিত।

বাংলা-সাহিত্যের মধ্যযুগে মুসলিম প্রভাবের কথা বলিতে গেলে, খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সাড়ে পাঁচশত বৎসরের কথাই প্রধানতঃ চিন্তা করিতে হয়। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন যেই ধারা অবলম্বন করিয়া আজিকার বিশ্ববিমোহন রূপ লাভ করিয়াছে, সর্বাগ্রে তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। বলিতে কি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের এই ধারা যেমন বিচিত্র, ইহাতে মুসলিম প্রভাবও তেমন সুস্পষ্ট।

খ্রীস্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে 'গৌড়ীয় প্রাকৃত' নামে অভিহিত 'মাগধী প্রাকৃতের' পূর্বাঞ্চলিকরূপ হইতে বাংলা-ভাষা ধীরে ধীরে আপন স্বাতন্ত্র্য লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। বাংলা-ভাষার এই 'সৃজ্যমান যুগের' সহিত্য মুসলমানদের কোন সংস্রব ছিল না।

খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিক হইতে বঙ্গে তর্কী আক্রমণ শুরু হয়। এই সময় হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত—প্রায় দেড় শতাধিক বৎসর বঙ্গে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। তখনও বাংলা-ভাষা প্রকৃত পক্ষে সূতিকাগৃহেই অবস্থান করিতেছে। এই সময় কিভাবে বাংলা-ভাষায় সর্বপ্রথম মুসলিম প্রভাব সূচিত হয়, বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসই তাহার প্রধান সাক্ষী।

পালদের সময় বৌদ্ধযুগে বঙ্গে বাংলা-ভাষার সুস্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত প্রাকৃত অপভ্রংশে 'চর্যাপদ' রচিত হইয়াছিল। সেনদের সময় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হওয়ায়, 'চর্যার' বাংলা লক্ষণক্রান্ত ভাষা যেমন ছিল, তেমনই থাকিয়া গেল,—আর বেশী দূর আগাইল না। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ফলে, সৃজ্যমান বাংলা ভাষার কি দুর্দশা ঘটিয়াছিল, লক্ষণ সেনের সভা-কবি কেন্দুবিল্বের বাঙালী কবি জয়দেবই তাহার প্রমাণ। মনে ও প্রাণে, ভাবে ও ছন্দে বারআনী বাঙালীয়ানা রক্ষা করিয়া তাঁহাকেও সংস্কৃতে "রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে" প্রভৃতি পদ রচনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছিল।

সেন রাজত্বের অবসানে তুর্কী আমল প্রতিষ্ঠার সহিত বাংলায় ব্রাহ্মণদের জারিজুরি শেষ হইয়া যায়। যেইভাবে এই দেশ হইতে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের অবসান হয়, সেইভাবেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সূচনা হয়। বাংলাদেশে তুর্কী আমলেই ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হইয়া একটি "ইসলামী পরিবেশ" সৃষ্টির পথ খোলসা হয়। কয়েক প্রকারেই

www.pathagar.com

এই পরিবেশ-সৃষ্টি সুসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার কথা না বলিলেও চলে। তুর্কী আমল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা স্বাভাবিকভাবে খসিয়া পড়িল। ফলে, এই সংস্কৃতির মূল উৎস সংস্কৃত-চর্চা ক্রমেই শুকাইয়া আসিতেছিল; আর তৎস্থলে দেশে আরবী-ফারসী ভাষাভাষী মুসলিম সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হইতেছিল। তুর্কী আমলের পূর্ব হইতে দেশে নানা আউলিয়া-দরবেশের আগমন হইতে থাকিলেও, এই আমলেই তাহাদের ব্যাপক আবির্ভাব ঘটে এবং ইহার সহিত বহু মৌলানা-মৌলবীর ধর্ম প্রচারও মিশিয়া যায়। বহিরাগত মুসলমানেরাও কেহ রাজপুরুষ, কেহ ব্যবসায়ী, কেহ ভাগ্যান্বেষী, কেহ মুহাজির, আবার কেহ তাহাদের সহচররূপে, দেশে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেশে একটি বলিষ্ঠ "ইসলামী পরিবেশ" সক্রিয় এবং ক্ষীয়মাণ "ব্রাহ্মণ পরিবেশ" নিষ্ক্রীয় হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময়ে ক্রম-বিলীয়মান ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ও ক্রম-বর্ধমান মুসলিম প্রভাবের সুযোগ গ্রহণ করিয়া, বাংলা-ভাষা ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে লাগিল। ফলে অচিরেই সেন রাজত্বের কোণঠাসা বাংলা-ভাষা তুর্কী আমলে আসিয়া সূতিকাগৃহ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইল। মুসলিম ধাত্রীরাই ইহার লালন পালনের ভার গ্রহণ করিলেন; ধাত্রীর মাতৃসুলভ যত্নে শিশু দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বাংলা-ভাষার এই শৈশবকালে রচিত রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণের' অন্তর্গত "নিরঞ্জনের রুষ্মা" শীর্ষক অধ্যায়ে যেই কৌতুকাবহ চিত্রটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ ঃ উড়িষ্যা বা জাজপুরের ষোলশত বৈদিক ব্রাহ্মণ কানে পৈতা তুলিয়া দক্ষিণা মাগিতে বাহির হয়, এবং যাহারা দক্ষিণা দেয় না, তাহাদিগকে তাহারা অভিশাপ দিয়া জ্বালাইয়া দেয়। তাহাদের কারসাজিতে মালদহে কর বসে এবং তাহাদের জাল জুয়াচুরির শেষ নাই। দল বাঁধিয়া শক্তিশালী হইয়া তাহারা বৌদ্ধ সদ্ধর্মীদের সর্বনাশ করে। ইহা দেখিয়া সদ্ধর্মীদিগের বাঁচাইবার জন্য তাহারা ধর্ম-ঠাকুরকে ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে আহ্বান করিল। ধর্মদেবতা বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া মায়ারূপ ধারণ করিলেন এবং অবশেষে —

"হইলা যবনরূপী, মাথায়ত কালটুপী,
হাতে শোভে, ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হএ, ত্রিভুবনে লাগে ভএ,
খোদা এ বলিয়া এক নাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈলা ভেস্ত অবতার,
মুখেতে বলএ দম্বদার।
যথেক দেবতাগণ, সভে হয়্যা একমন,
আনন্দেত পরিলা ইজার ॥
ব্রাহ্মা হৈল্যা মহামদ, বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর,
আদম্ফ হৈল্যা শূল পানি।
গণেশ হৈল্যা গাজি, কার্তিক হৈল্যা কাজি,
ফকির হইল্যা জথমুনি ॥

www.pathagar.com

তেজিয়া আপন ভেক, নারদ হইল্যা শেক,
পুরন্দর হইল্যা মলনা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে, পদাতি হইআ সেবে,
সভে মিলে বাজাএ বাজনা ॥
আপনি চণ্ডীকাদেবী, তিঁহ হৈল্যা হায়া বিবি,
পদ্মাবতী হৈল্যা বিবি নূর।
জথেক দেবতাগণ, সভে হইয়া একমন,
প্রবেশ করিলা জাজপুর ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে, কাড়্যা ফিড়্যা খাএ রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিআ ধর্মের পাত্র, রামাঞি পণ্ডিত গাএ,
ই বড় বিসম গণ্ডগোল" ॥

ইহাতে যে 'ইসলামী পরিবেশ' ও মুসলিম প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে মুসলিম তুর্কীর ধর্ম, সমরনীতি ও অস্ত্রশস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া একটু একটু আচার ব্যবহারের আভাসও পাওয়া যায়। সদ্ধর্মী ও নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণদের অত্যাচার সহ্য করিত বলিয়া নিশ্চয় উত্যক্ত হইত ও বিব্রত বোধ করিত। ফলে, তাহারা বঙ্গে মুসলিম শাসনকে অভিনন্দিত করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-শাসনের আশু নিপাত কামনা করিয়াছে; মুসলমানেরাও দেশের ভাষায় দেশীয় লোকের সহিত পরিচিত হইতে ও ভাব বিনিময় করিতে উৎসুক হইয়া থাকিবেন। এই উদ্দেশ্যে তাহারা সংস্কৃত শিখিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই।

এমন এক ইসলামী পরিবেশ পুষ্ট মুসলিম প্রভাব বাংলা ভাষাকে সূতিকাগৃহ ত্যাগ করিতে সাহায্য করিয়া শৈশবে লালন-পালন করিয়াছে। বঙ্গে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত না হইলে, বাঙলা-ভাষা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের চাপে যে আঁতুর ঘরেই মরিয়া যাইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার পর দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে যেই নূতন যুগের সূচনা হয়, তাহাতেই বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের নবীন সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। এই নবীন বাংলা-সাহিত্য-সম্ভাবনার সর্বশেষ ফলরূপে কেবল একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহা চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন। খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইহা রচিত হইয়াছিল। তখন বাংলাদেশ ঔলিয়া দরবেশে, মৌলানা-মৌলবীতে ও মুসলিম আগমনে একরূপ ভরিয়া উঠিয়াছে এবং এদেশে একটি বলিষ্ঠ ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির কাজ অনেকদূর আগাইয়া গিয়াছে। এই 'ইসলামী পরিবেশে' যেই 'কৃষ্ণকীর্তন' রচিত হইল, তাহাতে কোন মুসলিম প্রভাব নাই, এমন ধারণা ঠিক নহে। ইহাতে 'মজুর', 'মজরিয়া', 'কামান' (ধনুক অর্থে) প্রভৃতি গোটা আটেক ফারসী শব্দের ব্যবহারই যে একমাত্র মুসলিম প্রভাবের ফল, এমন মনে করাও

www.pathagar.com

সমীচীন নহে। কেন-না ভাষার শব্দ-সম্পৎ বৃদ্ধি যেমন মুসলিম প্রভাবে স্বাভাবিক, ভাষার বা জাতির ভাব-সম্পৎ-বৃদ্ধিও তেমনি স্বাভাবিক। এই দিক হইতে কৃষ্ণকীর্তনের বিচার করিতে হইলে, নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন 'কৃষ্ণকীর্তনের' চণ্ডীদাস ও 'পদাবলীর' চণ্ডীদাসকে এক কবি বলিয়া প্রমাণ করিলেও, শুধু অনুমান-নির্ভর কূটতর্কের ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হইয়া আজ চণ্ডীদাস একাধিক বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে। আমরা দেখিতেছি, একাধিকবার একাধিক বেশে চণ্ডীদাস আবিষ্কৃত হইয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, তিনি একাধিক হইয়াও একাধিক নহেন—মাত্র একটি। তাই, গান শুনিবার জন্য কান পাতিয়া দিলে কালপ্রবাহ অতিক্রম করিয়া আজও বাউলধর্মী মন-উদাসী সুর বাজিয়া উঠে :

"শুন হে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।"

এই মধুময় চিরন্তন সত্যের ঝঙ্কার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেই উতলা মন বলিয়া উঠে—কে এই কালজয়ী কবি, যিনি আজও বাংলা-ভাষীর কানে এমন বিশ্বজনীন বাণীর সুধাধারা ঢালিতেছেন? ইনি যদি সেই চণ্ডীদাস হন, তবে স্বীকার করিতে হইবে, পারস্যের অমর কবি শেখ সাদী (জন্ম ১১৭৫ খ্রীঃ) তাঁহার—

طریقت بجز خدمت خلق نیست
بتسبیح وسجاده ودلق نیست

মানুষের সেবা বিনা তরীকৎ নয়-
আলখাল্লা, তসবি আর জা'-নমাজে নয়॥

এই বিশ্ববিখ্যাত মানবকল্যাণময়ী বাণী লইয়া বাংলার চণ্ডীদাসে নবজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নতুবা আর যাহাই হউক, এমনটি হইত না।

এই যে আমাদের চির পরিচিত চণ্ডীদাস, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' লইয়াই তিনি যেন অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্বার্জিত সংস্কার বলে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনকে তলাইয়া দেখিবার অভাব ঘটার ফলেই ব্যাপারটা এতদূর গড়াইতেছে। রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের একমাত্র উপজীব্য। পদাবলীর উজীব্যও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। এই লীলা-বর্ণনা 'কৃষ্ণকীর্তনে' কাহিনী-ভিত্তিক হইলেও পদাবলীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পদসর্বস্ব। এই কাব্যে উল্লেখযোগ্য পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা মাত্র তিনটি; তাঁহারা হইতেছেন রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই। প্রেমাস্পদের ভূমিকায় কৃষ্ণ, প্রেমিকার ভূমিকায় রাধা এবং উভয়ের মধ্যে প্রেম

www.pathagar.com

ঘটাইয়া দেওয়ার সহায়করূপে বড়াই পরিকল্পিত। রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা হিন্দুদের শাস্ত্রীয় ব্যাপার নহে; এমনকি ইহা তাঁহাদের কোন পৌরাণিক কাহিনীও নহে। ইহা এই বাংলাদেশেরই প্রাচীন সম্পৎ। এই দিক হইতে এই কাহিনীটি মনসা, ধর্ম, শীতলা, চণ্ডী প্রভৃতি বঙ্গের প্রাচীন কাহিনী সগোত্রীয়। অথচ "কৃষ্ণকীর্তনে' বর্ণিত রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার কাহিনী এমন একটা কাহিনী নহে, যাহা 'মনসা-মঙ্গল', 'ধর্ম-মঙ্গল', 'শীতলা-মঙ্গল', কি 'চণ্ডীমঙ্গল' কাহিনীর সহিত আঙ্গিক, চরিত্র-সৃষ্টি, বর্ণনা-পদ্ধতি, প্রাণ-ধর্ম প্রভৃতি কোন দিক হইতে কোন প্রকারে তুলিত হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইহা হৃদয়ধর্মী গীতিকাব্য; প্রেমই ইহার প্রধান উপজীব্য। এই দিক হইতে জয়দেবের সংস্কৃত কাব্য 'গীত-গোবীন্দের' সহিত ইহার স্বাজাত্য আছে বটে, কিন্তু সগোত্রতা নাই। 'গীতগোবিন্দ' কাহিনীপ্রধান গীতি-কবিতা এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার খণ্ডিত সূত্রাবলী গীতিপ্রধান কাব্য। অধিকন্তু, বড়াই চরিত্র পরিকল্পনায় চণ্ডীদাস কবি জয়দেব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

এই কথা কয়টি মনে রাখিয়া, বিশেষতঃ শেখ সাদীর বাণী চণ্ডীদাসে প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিয়া, চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, সূফীদের গজলের মতই 'কৃষ্ণ-কীর্তন' খণ্ড খণ্ড পদের সমষ্টি, এবং তাঁহাদের 'ইশ্‌কতত্ত্ব'ই যেন প্রেমরূপে ইহার মূল প্রেরণা যোগাইয়াছে। ইহার কৃষ্ণ যেমন সূফীদের 'আশিক' রূপে দেখা দিয়াছে, 'রাধিকা'ও তেমন 'মাশুক'-রূপে আবির্ভূতা হইয়াছে, আবার 'বড়াই'ও তেমন সূফীতত্ত্বের 'রাবিতা' বা প্রেমিক ও প্রেমাসুদের মধ্যে মিলন ঘটাইবার যোগসূত্র 'পীর-ই-মর্গা' বা সিদ্ধিলব্ধ গুরুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। সূফীদের ইশ্‌ক-তত্ত্বে অবস্থা ভেদে 'আশিক'-'মাশুক' যেমন আপন ভূমিকা বদল করিতে দেখা যায়, অর্থাৎ 'আশিক' 'মাশুক' হইতে এবং 'মাশুক' 'আশিক' হইতে দেখা যায়, 'কৃষ্ণকীর্তনেও' রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে প্রেমের ক্ষেত্রে ভূমিকা বদল হইতে দেখা যায়ঃ কৃষ্ণ প্রথমে রাধিকাকে পাইতে চাহিয়া প্রত্যাখ্যাত অবস্থায় বহুকাল কাটাইয়াও পরে তাহাকে প্রেম দেন নাই; রাধিকাও কৃষ্ণপ্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া পরে তাহা ঐকান্তিকভাবে চাহিয়াও পান নাই। প্রকৃত পক্ষে 'কৃষ্ণকীর্তনে'ও কৃষ্ণ একবার রাধিকার প্রেমিক ও রাধিকা একবার কৃষ্ণের প্রেমিকা। এই ভূমিকা বদলের মধ্যেই 'কৃষ্ণকীর্তনের' শেষ দুই খণ্ড অর্থাৎ 'বংশী' ও 'বিরহ' খণ্ড পরিকল্পিত বলিয়া সূফীদের 'দিল-আজারী'ও 'জুদায়ী'-পরিকল্পনার একটি সুস্পষ্ট ছবি মানস মুকুরে ভাসিয়া উঠে। তাই বংশীখণ্ডে চণ্ডীদাসের কণ্ঠে যখন শুনিতে পাই ঃ

"কে না বাঁশী বাএ বাড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বাড়ায়ি এ গোঠ গোকূলে ॥
কে না বাঁশী বাএ বাড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হঞাঁ তার পায়ে নিশিবোঁ আপনা" ॥

তখন আপনা হইতেই সুফী কবি মৌলানা জালালু-দ-দীন রূমীর (১২০৭-১২৭৩) সুবিখ্যাত 'বাঁশরী বেদন' কবিতার কথা মনে পড়ে এবং চণ্ডীদাসের ভাব, সুর ও ঢঙে কণ্ঠ ছাড়িয়া ফারসী-ভাষায় গাহিতে ইচ্ছা করেঃ

www.pathagar.com

بشنواز نئے چون حکایت می کند
وزجد ائیها شکایت می کند
کزنیستان تامراببریده اند
ازنفیرم مردوزن نالیده اند

শুন লো সজনি! একি সে কাহিনী শুনায় বাঁশের বাঁশরী,
ফরিয়াদে তার ফাটিয়া পড়িছে বিরহ-বেদনা-রাশি।
কাঁদিয়া বেড়াই ঝাড় হ'তে মোর যেদিন আনিল কাড়ি,
আমার বিধুর সুর-মুরছনে মুরঝায় নরনারী।

ফারসী কবির ভাব, ভাষা ও সুর-প্রবাহ 'ছায়া-ঢাকা-পাখি ডাকা' বাংলার শস্যশ্যামল সমতল ক্ষেত্রে যেই প্লাবন তুলিয়াছিল, ইহা তাহার ক্ষীণ আভাস মাত্র। ইহার সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে আরও গভীর ইহতে গভীরতর সাধানায় নিমগ্ন হইতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে কেহ কেহ আদি রসাত্মক কাব্য বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; এই অজুহাতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র চণ্ডীদাস ও 'পদাবলীর' চণ্ডীদাস এক নহে বলিয়াও অনুমান করা হয়। আমাদের বিবেচনায়, যেখানে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' শেষ, সেখানেই পদাবলীর আরম্ভ। তাই, 'পদাবলী' এই কাব্যের শেষ পরিণতি। 'কৃষ্ণকীর্তন' যদি আদি রসাত্মক বলিয়া পরিত্যাজ্য হয়, তবে হাফিজের "আগর আঁ তুর্কে শিরাজী" জাতীয় সূফী-কবিতা বা গজলগুলি লইয়া কি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে ভাবিয়া রাখিতে হইবে। শিরাজের প্রিয়ার গালের এক তিলের জন্য সূফী কবির সমরকন্দ ও বোখারা বিলাইয়া দিবার উদগ্র বাসনার চিত্র বুকে লইয়াও যদি ফারসী 'গজলিয়াৎ' আধ্যাত্মিক সাহিত্য বলিয়া নিঃসংশয়ে গৃহীত হইতে পারে, তবে চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'—

"কতনা রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
নিদয়া হৃদয় কাহ্ন ন গেলা বোলাইআঁ" ॥

শ্রেণীর 'পদাবলী' লইয়া আধ্যাত্মিকতাহীন হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কতিপয় নীতিবাগীশের উন্নাসিকতার ফলে এই কাব্যকে এমন বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই দিক হইতে চিন্তা করিলে মনে হয়, সূফী কবিদের 'য়ূসুফ-জলিখা',

www.pathagar.com

'লাইলী-মজনু', 'শিরী-ফরহাদ' ও 'পদ্মাবতীর' ন্যায় 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'-ও একটি রূপক কাব্য। রূপক ব্যবহারের দিক হইতে 'কৃষ্ণকীর্তন' সূফীদের এই কাব্যগুলির অনুরূপ হইলেও, আঙ্গিকের দিক হইতে এক নহে। এই সূফী কাব্যগুলি কাহিনী-আশ্রিত বর্ণনাত্মক রূপক এবং 'কৃষ্ণকীর্তন' ক্ষীণ ঘটনা-সূত্র অবলম্বনে রচিত গীতিপ্রধান খণ্ড কবিতার সমষ্টি।

বাংলার রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার প্রাচীন মৌলিক কাহিনী কি করিয়া এমন একটি রূপ ধারণ করিল, তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। আমার বক্ষ্যমাণ আলোচনায় যদি কোন সত্য নিহিত থাকে, তবে বলিতে হইবে সঙ্গে প্রায় দেড় শতাধিক বৎসর ধরিয়া মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতা স্থায়ী ও বিস্তৃত হওয়ার ফলে চণ্ডীদাসের হাতে বাংলার প্রাচীন রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলা লৌকিক কাহিনী এমনভাবে মুসলিম প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। এই কাহিনী লৌকিক ধারা পরবর্তীযুগে 'কৃষ্ণ-মঙ্গল' কাব্যে প্রাণধর্ম বিরল বর্ণনাত্মক পদ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং মুসলিম সূফীতত্ত্ব প্রভাবিত প্রাণধর্মী 'গজলিয়াৎ'-জাতীয় গীতিধারা বৈষ্ণবদের 'পদাবলী সাহিত্যে' স্ফূর্ত ও মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একটু পরেই এই বিষয়ে আরও বিশদভাবে বলা হইবে।

খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত প্রায় আড়াই শত বৎসর মুসলিম শাসনাধীন বঙ্গে স্বাধীনতার যুগ। সাংস্কৃতিক দিক হইতে বাংলাদেশে ইহা এক বিশেষ যুগ। এই যুগের নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের অনন্যসাধারণ বিকাশ অন্যতম। এই সময়ে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য যে মুসলিম বাদশাহ ও আমীর ওমরাহদের আন্তরিক উৎসাহ ও সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে, এখন এই কথা আর কাহারও অবিদিত নাই। এই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি এই স্থলে নিষ্প্রয়োজন। গৌড়ীয় সুলতানদের বাংলা-সাহিত্য-প্রীতি ও পৃষ্ঠপোষকতাকে এই সাহিত্যে মুসলিম প্রভাবের গৌণ নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। এই যুগ হইতেই বাংলার মুসলমান প্রত্যক্ষভাবে বাংলা-ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪০৯) শাহ মোহাম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ জুলেখা' কাব্য; এই সুলতানের সহপাঠী পাণ্ডুয়ার ভারত বিখ্যাত সাধক নুরুদ্-দীন কুৎব্-ই-আলমের (মৃত্যু-১৪১৬) 'রেখতা' জাতীয় বাংলা গজল; শামসুদ্দীন ইউসুফশাহের (১৪৭৪-১৪৮১) অনুগ্রহ প্রাপ্ত কবি জৈনুদ্দীনের 'রসূল বিজয়'; সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) কর্মচারী চাঁদ কাজীর বাংলা পদ; সুলতান নসরৎ শাহের (১৫১৯-১৫৩১) রাজত্বকালে আবির্ভূত শেখ কবীরের পদাবলী প্রভৃতিই এই যুগের মুসলিম সৃষ্ট বাংলা-সাহিত্য। মুসলমানদের এই নবীন সৃষ্টিতে মুসলিম প্রভাবের কথা বোধ হয় না বলিলেও চলে। স্বাধীনতার যুগে বাংলার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইরান-তুরানের মধ্যস্থতায় ইসলামের সহিত বাংলার যেই মিলন ঘটিয়াছিল, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই ইহা মুসলিম বাংলা সাহিত্যে অধিক দেখা যায়।

বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যই এই যুগের সর্বাপেক্ষা অভিনব ও শক্তিশালী সৃষ্ট। ইহা জীবনী ও পদাবলী এই দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত। চৈতন্য-দেবের আবির্ভাবে (১৪৮৫-১৫৩৩)

www.pathagar.com

বাংলাদেশে যে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মত' প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, বৈষ্ণব-সাহিত্য তাহারই অভিব্যক্তি। বাংলাদেশে এই সাহিত্যের প্রভাবই অতি ব্যাপক ও গভীর। ইহার ফলে দেশে "রাধা ছাড়া সাধা" এবং "কানু ছাড়া গীত" রহিল না। 'পদাবলী সাহিত্য' এক আধ্যাত্মিক ভাব-মহিমায় ঐশ্বর্যশালী হইয়া মানুষের প্রেমময় হৃদয়ে শান্তিসুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। চৈতন্যদেব প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনদের সত্য ও কাল্পনিক জীবন-কাহিনী অবলম্বন করিয়া চরিতকাব্য লিখিত হইতে লাগিল। বাংলার ভাটিয়ালী ও মুর্শিদার পাশে বাউল, কীর্তন, মনোহর- সাঁই, রেনেটি সঙ্গীতের সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

আমরা অন্যত্র প্রমাণ করিয়াছি যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতবাদ মুসলিম প্রভাবে ভরপুর। এই মতবাদসঞ্জাত বাংলা-সাহিত্যে কোন মুসলিম প্রভাব আছে কিনা, এখন সেই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

প্রথমে বৈষ্ণব সাহিত্যের পদাবলী শাখার কথা ধরা যাইতে পারে। সূফীদের 'গজলিয়াৎ' এবং বৈষ্ণবদের 'পদাবলী' শুধু সমার্থক নহে, আধ্যাত্মিকতা, ভাবৈশ্বর্য ও আঙ্গিকের দিক হইতে অনেকখানি এক। সূফী সাহিত্যের 'ইশক' যেমন 'মৈয়্' ও 'শরাবের' প্রতীক গ্রহণ করিয়া 'শাকীর' মারফতে সরাইখানার কক্ষে কক্ষে পরিবেশিত হইয়াছে, বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমও তেমন পিরীতির বেশে 'মান'-অভিমানের রূপ ধরিয়া গোপিনীদের মধ্যস্থতায় বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সূফী সাহিত্যের 'আশিক' ও 'মাশুক', 'বুৎ' ও 'বুৎগর' অথবা 'শমা' ও 'পরওয়ানা' বৈষ্ণব-পদাবলীতে 'রাধা' ও কৃষ্ণের প্রতীক লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখানে মনে রাখিতে হইবে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'রাধাকৃষ্ণ' হিন্দুর পৌরাণিক দেবতা নহে; তাহারা 'যুগল-প্রেমের' প্রতীক। বলা বাহুল্য, ভক্ত বৈষ্ণবদের মতে এই 'রাধা' জীবাত্মার এবং এই 'কৃষ্ণ' পরমাত্মার প্রতীক; কৃষ্ণের 'বাঁশরী' জীবাত্মার প্রতি পরমাত্মার ডাক; এই দুইয়ের মিলনের অন্তরায় স্বরূপ ঐহিক-জীবনের 'সংসার-ধর্ম' মধ্যখানে 'যমুনা-নদী'রূপে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। জীবনের পরপার হইতে 'কৃষ্ণ'রূপী পরমাত্মার বংশী-ধ্বনি ভাসিয়া আসিয়া 'রাধা'-রূপী জীবাত্মার জীবনের ঘাটে পৌছিয়াছে; আর মানবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলনের জন্য উতলা করিয়া তুলিয়াছে। তাই মুসলিম কবিও গাহিতে পারেন,—

"এপার হৈতে বাজাও বাঁশী ওপার হইতে শুনি।
অভাগিয়া নারী আমি সাঁতার নাহি জানি ॥"

এই যে 'রাধা', এই যে 'কৃষ্ণ', এই যে 'যমুনা', এই যে 'বাঁশী',— ইহাদের সহিত পৌরাণিক রাধা-কৃষ্ণের সম্বন্ধ কোথায়? আরবের 'আল্লাহ্' পারস্যের 'খোদায়' পরিণত হইয়াও সূফী কবিদিগকে খুশী করিতে পারেন নাই। তিনি তাহাদের হাতে 'মাশুক', 'শমা', 'ইয়ার' অর্থাৎ প্রেমাস্পদে পরিণত হইয়া 'ইশক্' বা প্রেমের সম্বন্ধ পাতিয়াছেন। আর ভারতীয় হিন্দুর শাস্ত্রীয় 'অবতার'-রূপী 'কৃষ্ণ' বাংলার বৈষ্ণব কবির হাতে 'বধুঁয়া' বনিয়া প্রেমাস্পদ সাজিয়াছে, আর সে বৈষ্ণব কবিদের হাতে 'মানুষ' 'পরওয়ানা' বা 'আশিক' সাজিয়াছে, আর সে বৈষ্ণব-কবিদের হাতে 'রাধিকা' বা 'প্রেমিকা' বনিয়াছে।

www.pathagar.com

সূফী-কবিদের 'সুজ-ও-সাজ' বা প্রেমের আকুতি, 'হিজরান'-নামে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেমন পাঠকের নয়ন-কোণে 'আঁসু'-র আবির্ভাব ঘটাইয়াছে, বৈষ্ণব-কবিদের 'বিরহ-বেদনা' বা পিরীতি-আরতি', 'মাথুর'-আখ্যায় চিহ্নিত হইয়া তেমনিই সকল বাঙালীকে কাঁদাইয়াছেন। সূফী-কবিদের 'বিলাস'বা মিলনের 'গজলিয়াৎ' যেমন ভাবের বন্যায় পারস্য ও তৎসূত্রে ভারতবর্ষকে ভাবাইয়া দিয়াছে, বৈষ্ণব-কবিদের 'ভাব সম্মিলনের' পদাবলীও তেমনই বাংলাদেশ, ও তৎসূত্রে আসাম ও উড়িষ্যাকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। অধিকন্তু যমুনা বা কালিন্দী নদীর অপর পাড়ে অবস্থিত কৃষ্ণের বাঁশরী-লীলা দেখাইবার জন্য বংশী-ধ্বনি অবলম্বনে বৈষ্ণব-কবির যেই বিরাট বিরাট পদাবলী-সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহার মর্মার্থ ও প্রতীক, মৌলানা জালালু-দ্-দীন রূমীর (১২০৭-১২৭৩) সুবিখ্যাত 'বাঁশরী-বেদন' কবিতার মর্মার্থ ও প্রতীক অবিকল এক, দেশভেদে কেবল ভাষাভেদ ও রূপভেদ ঘটাইয়াছে,—এইটুকুই পার্থক্য।

অতঃপর, বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রধান শাখার অন্যতম 'চরিতকাব্য'গুলির দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-মঙ্গল, অদ্বৈত-প্রকাশ প্রভৃতি এই শ্রেণীর গ্রন্থ। এইগুলিকে বৈষ্ণবেরা মহাজন-চরিত বলিয়া চিহ্নিত করিয়া থাকেন। মুসলামন সূফীদের শিষ্য-প্রশিষ্যরা যেমন পারস্যে 'তজকিরা-ই-আউলিয়া' এবং ভারতবর্ষে 'সুওয়ানহ্-ই-উম্রী' বা সাধক-জীবনের কাহিনী লিখিয়াছেন, বাংলার বৈষ্ণবরাও তেমনি চৈতন্য প্রমুখ বৈষ্ণব-সাধকদের জীবন-কাহিনী লিখিয়া 'মহাজন-চরিত' নাম দিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মতের সহিত যেমন প্রাচীন বিষ্ণুমতবাদী বৈষ্ণব-মতের মিলের চেয়ে গরমিল অধিক, প্রাচীন 'হর্ষ-চরিত', 'রঘু-বংশ' প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যের সহিতও তেমনই বৈষ্ণব-'মহাজন-চরিতের' মিলের চেয়ে গরমিলই অধিক। বৈষ্ণবদের এই 'মহাজন-চরিত-গুলি 'তজকিরা-ই-আউলিয়া' বা 'সুওয়ানহ্-ই-উম্রী প্রভৃতি জীবন-আখ্যায়িকার ন্যায় সাধকজীবনের লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনী-সম্বলিত গ্রন্থ মাত্র। এই জীবনগুলিতে ব্যবহৃত 'মহাজন' ও 'আউলিয়া' শব্দ একেবারে সমার্থবোধক এবং 'মহাজনেরা' যেই সমস্ত 'ঐশ্বর্য' প্রদর্শন করিয়াছেন বা লৌকিক ক্রিয়া-কলাপ দেখাইয়াছেন, তাহাই 'আউলিয়া'র বেলায় 'কিয়ামৎ' রূপে চিত্রিত হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে, 'ঐশ্বর্য' এবং 'কিয়ামৎ' শব্দ দুইটি শুধু সমার্থবোধক নহে; একটি যেন আর একটির অনুবাদ। অধিকন্তু, ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, বঙ্গে পীর-মহাত্ম্যজ্ঞাপক পুস্তক রচনার রেওয়াজ বৈষ্ণবদের বহু পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। রাজা লক্ষণ সেনের সভা-পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র রচিত সংস্কৃত 'শেকশুভদয়া'-গ্রন্থ ইহার প্রাচীনতম উদাহরণ।

স্বাধীনতার অবসানে বঙ্গে মুঘল-আমলের সূত্রপাত হয় এবং ইহা বাংলায় প্রায় দুই শতাব্দী (১৫৭৬-১৭৫৭) স্থায়ী হয়। এই মুঘল আমলের বাংলা-সাহিত্যে নূতন কিছু হয় নাই বলিলেও চলে। এই সময় বেশী করিয়া স্বাধীনতার যুগের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার পুনরাবৃত্তি ও সম্প্রসারণ সাধিত হইয়াছে মাত্র। ফলে, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সাহিত্য-সাধনা বিশেষ নূতনত্ব সৃষ্টি করিতে না পারিলেও বিশালাকায় ও ব্যাপকতর হইয়া উঠিয়াছে। এই সময় দেশে ফারাসী ভাষার চর্চা অধিকতর বাড়িয়া যাওয়ায়, বাংলা-

www.pathagar.com

সাহিত্যের সর্বাঙ্গে এই ভাষার প্রভাব ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল। দেশে যেরূপ মোগলাই-মার্কা মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, দেশের সাহিত্যেও তেমন ইরানীমার্কা মুসলিম প্রভাব স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছিল। শব্দ-সম্পদ-বৃদ্ধি ভাব-আমদানী, অনুবাদ ও হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতিসমন্বয়, এই চারি দিক হইতে বাংলা–সাহিত্য ফারসী সাহিত্যের দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হয়। এই যুগের সর্বশেষ খ্যাতনামা কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রে (১৭০৭–১৭৬১) সেই প্রভাবের অধিকাংশের নিদর্শন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই সময়ের কোন হিন্দু–মুসলমান কবি বাংলা-ভাষায় তাঁহার চেয়ে অধিক ফার্সীশব্দ ব্যবহার করেন নাই, অনুবাদ ছাড়া কাব্যে ফারাসী–সাহিত্যের ভাব আমদানীতে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই, কিংবা 'সত্যপীর' রচনা ব্যতীত অন্য কোন রচনার মধ্যদিয়া হিন্দু–মুসলিম সংস্কৃতি–সমন্বয়ের বৃহত্তর নজীর স্থাপন করিতে পারেন নাই। তবে হিন্দু কবির কাব্যে ফার্সী সাহিত্যের ছায়া যে কত আপন ও গভীর হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে, তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দর'–কাব্যে মুসলিম প্রভাবের কথা উল্লেখ করিতে যাইয়া ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন যে মন্তব্য করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহাও স্মর্তব্য। তিনি লিখিয়াছেন,–"এই সময় নায়ক–নায়িকার বিলাসকলাপূর্ণ প্রেমের গল্প ও ফারাসী বহুবিধ পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছিল, এই সব পুস্তকে প্রায়ই দেখা যায় নায়কগণ নায়িকাদের পটে লিখিত মূর্তি দেখিয়াই পাগল হইয়া অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছেন; তাজী ঘোড়া সমারূঢ় সুন্দরকে নায়িকার খোঁজে যাইতে দেখিয়া আমাদের সেই সব (নায়ক) নায়িকার কথাই মনে পড়িয়াছে"। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩১৯)

মুঘল–আমলের পরেই ইংরেজ–আমল আসিল। এই আমলের বাংলা–সাহিত্যে মুস্লিম প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয় বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নহে।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের সূচনাপর্ব

মুহম্মদ আবদুল হাই

লেখক-পরিচিতি : জন্ম : ২৬ নভেম্বর, ১৯১৯, মরিচা গ্রাম, মুর্শিদাবাদ। মৃত্যু : ৩ মে, ১৯৬৯। শিক্ষা : বি.এ অনার্স (বাংলা) ১৯৪১, এম.এ (বাংলা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২; এম. এ (ধ্বনি বিজ্ঞান, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫২) পেশা : বিভিন্ন সরকারী কলেজে অধ্যাপনা। প্রফেসর ও অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ : সাহিত্য ও সংস্কৃতি (১৯৫৪), বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে ১৯৫৬), তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা (১৯৫৯), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৬০), A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalisation in Bengali (1960), The Sound Structures of English and Bengali (1961) ধ্বনি বিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৬৪), Traditional Culture in East Pakistan (1966), Bengali Language Hand.

লেখা-পরিচিতি : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (আধুনিক যুগ)। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে। প্রকাশকাল ১৯৬৮। উক্ত গ্রন্থের 'পঞ্চম পরিচ্ছেদ,' মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত 'ইসলামী সাহিত্য'-ভূমিকাংশটি এখানে মুদ্রিত হলো।

বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত হিন্দু সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে যে বিষ সংক্রমিত হয়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমানের মধ্যেও তা অনুপ্রবিষ্ট হ'তে থাকে। এ সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কিছু মুসলমান খৃষ্টান হয়ে যেতে থাকে। অশিক্ষা, নিজধর্মের প্রতি শিথিল বিশ্বাস এবং আর্থিক ও সাংসারিক মোহই স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে তদানীন্তন রাজধর্ম গ্রহণে সেদিন মুসলমানদেরও প্রেরণা যুগিয়েছিল।

হিন্দু সমাজকে শতাব্দীর শুরুতে এ ধরনের খৃষ্টানধর্ম-মুখিতা থেকে বাঁচিয়েছিলেন রামমোহন। শতাব্দী শেষে মুসলমানদের মধ্যে আন্দোলন আরম্ভ করেন যশোর নিবাসী বাগ্মী প্রবর মুন্সী মেহেরুল্লাহ এবং তাঁরই হাতে দীক্ষিত ধর্মান্তর গ্রহণকারী মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন। এঁদের প্রধান অবলম্বন ছিল ওয়াজ। গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় বক্তৃতা ক'রে মুন্সী মেহেরুল্লাহ আশাতীত ফল লাভ করেছিলেন।

বাঙালী মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার ব্যাপারে মুন্সী জমিরুদ্দীন সংঘবদ্ধভাবে মুসলিম সমাজের মধ্যে চেতনার সৃষ্টি সেদিন করতে পারেন নি। এঁদেরই আরব্ধ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এ যুগের বাঙালী মুসলমানকে ইসলামমুখী ক'রে তুলেছিল একটি বিশেষ দল। সে দলটিকে 'সুধাকর দল' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন খুলনা জেলার সাতক্ষীরার অন্তর্গত বাঁশদহের অধিবাসী এবং কল্‌কাতা ডভ্‌টন ও সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের আরবী ও ফারসীর অধ্যাপক মৌলবী মেয়রাজউদ্দীন আহম্মদ, ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলের অন্তর্গত চাড়ানের অধিবাসী এবং

www.pathagar.com

কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশ্‌হাদী, বসিরহাটের মোহাম্মদপুর নিবাসী মুন্সী শেখ আবদুর রহিম এবং ত্রিপুরা জেলার রূপসার অধিবাসী মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ।

আর্থিক ও সাংসারিক প্রলোভনে পড়ে কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানেরা যে সেদিন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করছিল, তা থেকে তাহাদের বাঁচানোর একমাত্র পথ ছিল তাদেরকে ইসলামী ঐতিহ্য এবং মুসলমানের জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলা। এতে সিদ্ধি লাভ করার জন্যে মাতৃভাষায় জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করা এবং সংবাদপত্রাদির মাধ্যমে ধর্ম ও কৃষ্টিমূলক বিষয়বস্তুর আলোচনা ক'রে মুসলিম জনসাধারণের দৃষ্টি ফুটিয়ে তোলাই ছিল প্রশস্ত পথ। উল্লিখিত মনিষীবৃন্দ এ সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে কলকাতায় একটা দল বাঁধলেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রথমত মুসলিম কৃষ্টি এবং ইসলামের তত্ত্বকথা সংক্রান্ত কতকগুলো বইএর অনুবাদ ক'রে খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশ করতে লাগলেন। ইসলামধর্ম সম্বন্ধে সুপণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ মনীষী জামালুদ্দীন আফগানী কর্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত 'নেচার এবং নেচারিয়া' নামক গ্রন্থের অনুবাদ ক'রে 'এসলাম তত্ত্ব' নাম দিয়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করলেন। এর অল্পদিন পরেই মওলানা আবদুল হক হাক্কানীকৃত 'তফসিরে হাক্কানী'র উপক্রমণিকাভাগ থেকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক বিষয়সমূহ অনুবাদ ক'রে এঁরাই 'এসলাম তত্ত্ব' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করলেন। 'এসলাম তত্ত্ব' (বা মুসলমান ধর্মের সার সংগ্রহ) এর প্রথম খণ্ড ১২৯৪ সাল, আশ্বিন মাসে অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১২৯৫ সাল-১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে-প্রকাশিত হয়।

'এসলাম তত্ত্ব' খণ্ডাকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতো ব'লে অনেকেই একে মাসিক পত্রিকা মনে করতেন। এসলাম তত্ত্ব খুব বেশীদিন চলে নি। তবু এর বিক্রয়লব্ধ অর্থে এবং ময়মনসিংহ করটিয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান এবং বর্ধমানের কুসুমগ্রামের জমিদার মোহাম্মদ মুন্সী মোহাম্মদ এবরাহিমের অর্থানুকূল্যে শেখ আবদুর রহিম এবং মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ 'সুধাকর' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। ১২৯৬ সালের (১৮৮৯ খৃঃ) আশ্বিন মাসে প্রথম সংখ্যা 'সুধাকর' প্রকাশিত হলো।

'সুধাকর' পত্রিকা নানা বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে বেশ কিছুদিন চলেছিল। এ পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলা ভাষায় বাঙালী মুসলমানেরা তাদের ধর্মের মহিমা, তত্ত্ব, তথ্য, জাতীয় ঐতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়েছিল। সেকালে বঙ্কিম প্রমুখ মুসলিম-বিরোধী লেখক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সব লেখা লিখতেন, 'সুধাকরে' তার প্রতিবাদ বের হতো।

সুধাকর দল সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পূর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পথে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে কেউ যে অগ্রসর হননি, তা নয়। এ দলের বহু আগে থেকে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মীর মোশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর আগে শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীকে দেখা যায়। তাঁর

www.pathagar.com

'ভাবলাব' এবং 'উচিত শ্রবণ' ১৮৬৫ সালের আগেই রচিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাংলায় মুসলিম জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির নেশায় এঁরা যেমন ক'রে মেতেছিলেন এবং প্রাণঢালা সাধনা করেছিলেন, এঁদের আগে তেমন আর কাউকে দেখা যায় না। তাছাড়া এমন সচেতন স্বজাতীয়তাবোধও তাঁদের আগের কোনও মুসলমান-রচিত সাহিত্যে এমনভাবে ফুটে ওঠেনি। এঁরা আরবী ফারসী সাহিত্য থেকে অনুবাদ করেছেন, হয্রত মোহাম্মদের এবং অন্যান্য পীরপয়গম্বরের, খলিফাদের এবং তাঁর সাহাবিয়া এবং ওলি আল্লাদের জীবনী লিখেছেন, ইসলাম ধর্মের গৌরবগাথা রচনা করেছেন, তার মহিমা ব্যাখ্যা করেছেন। একটি জাতীয় আশা–আকাঙ্খা তার মনোজীবনের স্পন্দন এবং অন্তর ও বহির্জীবনের প্রকাশ যে তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক এঁদের এ-বোধ ছিল প্রখর। বাঙালী মুসলমান জাতির ঘোর দুর্দিনে এঁরাই সে জাতিকে ঘরমুখো করেছিলেন এবং নিজেদের চিনতে সহায়তা করেছিলেন। এক কথায় এ সুধাকর দলই যেভাবে মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেছিলেন সে পথেই অর্ধ শতাব্দীব্যাপী সাধনায় বাঙালী মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য বিকশিত হয়েছে। অন্যকথায় পাকিস্তানী জাতি এবং এ জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা এঁদেরই হাতে লালিত ও বর্ধিত হয়েছে। মুসলিম বাংলা সাহিত্যে সুধাকর দলের ভূমিকা এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিচার করতে হবে। পরবর্তী মুসলিম সাহিত্যিকদের জন্যে এঁরা পথ তৈরী ক'রে দিয়ে গেছেন এবং সেকারণেই আমাদের জাতীয় জীবনেও নবীন অধ্যায়ের সংযোজন করেছেন এবং বাঙালী মুসলমানের মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত ক'রে নব গৌরবের সূচনা করেছেন। এঁদের রচিত সাহিত্যের মূল্য যেমনই হোক না কেন, স্থান কাল পাত্র বিচারে বাংলা সাহিত্যে এঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম।

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব

আবদুস সাত্তার

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ২০ জানুয়ারী, ১৯২৭, গোলরা, কালোহা, টাঙ্গাইল। **শিক্ষা ঃ** বি.এ ১৯৫১, সাদত কলেজ, করটিয়া, ময়মনসিংহ। **পেশা ঃ** সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ। বর্তমানে অবসর।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কবিতা ঃ বৃষ্টিমুখর (১৯৫৯), অন্তরঙ্গ ধ্বনি (১৯৫৯), আমার ঘর নিজের বাড়ী (১৯৬৯), নামের মৌমাছি (১৯৭২) প্রভৃতি। গবেষণা, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, অনুবাদ সহ তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। আবদুস সাত্তারের শ্রেষ্ঠকীর্তি তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'আরণ্য জনপদ' (১৯৬৬)। পুরস্কার ঃ দাউদ পুরস্কার, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, আবুল মনসুর সাহিত্য পুরস্কারসহ বহু পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হয়েছেন।

লেখা-পরিচিতি : 'কলম' ১৯৮৯ সালের নভেম্বর সংখ্যায় 'বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব' এবং 'কলম' ১৯৯১ সালের জুলাই সংখ্যায় 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব' শিরোনামে দুটি লেখা প্রকাশিত হয়। দুটি লেখাকে একটি শিরোনামে এখানে প্রকাশ করা হলো।

এক.

বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব অষ্টম শতাব্দীতে ঘটলেও বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব শুরু আরও কয়েক শতাব্দী পরে। প্রত্যেক সাহিত্যের সূচনা যেমন কবিতা দিয়ে বাংলাসাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। অষ্টম শতকের কবি সরহপা-কেই বাংলাদেশের তথা বাংলাসাহিত্যের প্রথম কবি বলে ধরা হয়। তিনি বাংলা ভাষার আদিরূপ চর্যাগীতিতে দোহা রচনা করেন। তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল মানবতাবাদ। মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই এই মতবাদেই সোচ্চার ছিল তাঁর প্রতিটি দোহা- কাব্যে।

তিনিই একমাত্র কবি যিনি বৌদ্ধধর্মাশ্রিত পাল রাজন্যবর্গ এবং হিন্দুধর্মাশ্রিত ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হন। শুধু রচনার মাধ্যমে নয় নিজের ব্যক্তিগত জীবন দিয়েও তিনি প্রমাণ করেছেন যে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য'।

নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি শ্রমণের ভূমিকা পালন করেছেন, ডোমনী মেয়েকে বিয়ে করে চণ্ডাল-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ইত্যাদি অর্জন করে এমনকি ডোমনীকে নিয়ে দোহা রচনা করেছেন এভাবে ঃ 'ডোম্বী তু বিনা ক্ষণ হ ন জীবমী। তু মুহ চুম্বী কমল রস পীবমী।' হে ডোমনী? তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচবো না। তোমার মুখে চুমো খেয়ে কমল-রস পান করবো।

উল্লেখ্য, চর্যাগীতির এই ধারা বিভিন্ন পদকর্তাদের দ্বারা কয়েক শতাব্দী বাংলাসাহিত্যের বিশেষ করে কাব্যসাহিত্যে বহমান ছিল। বাংলাকাব্যের সূচনাপর্বের এই প্রয়াস আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত। এগুলো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

ইসলামের আবির্ভাবের ফলে বৌদ্ধ শাসন ও হিন্দু শাসন আমলে অর্থাৎ পাল ও সেন রাজত্বের সময় জাতিভেদ কিম্বা আচার-অনুষ্ঠানের যাঁতাকলে যেসব সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত হচ্ছিল তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। কারণ ইসলাম বয়ে এনেছিল প্রশান্তির

www.pathagar.com

অমিতধারা। একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে বলে আশা করি। যেমন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (১২০১) ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজীর আগমনে এদেশের সাধারণ মানুষ উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল। হোসেন শাহের বেলায়ও একই কথা। তবে এটা স্বীকার্য যে, বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার এবং প্রসারের প্রশাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ মুসলমান রাজন্যবর্গের যতটা না ভূমিকা ছিল তার চেয়ে বেশী ভূমিকা ছিল বিভিন্ন সময়ে আগত সূফী দরবেশ এবং ওলিয়ে কামেল-খ্যাত মহান ব্যক্তিবর্গের। এদেশের জনগণের মধ্যে ইসলাম-প্রচার তাঁদেরই অবদান বলে স্বীকৃত। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত ইসলামের আলোকেই কেবল তাঁদের হৃদয় উদ্ভাসিত ছিল না, তাঁদের হৃদয়ে কাব্যগুণও সংগুপ্ত ছিল এবং কখনো কখনো তার বহিঃপ্রকাশও তাঁরা ঘটিয়েছেন।

অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে প্রায় ছয় সাত শত বছর পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যে হিন্দুয়ানী ভাবধারাই প্রচলিত ছিল। কাজেই বাংলাসাহিত্যের আদিপর্বে যেসব সাহিত্য পদবাচ্য কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল সেসবের মধ্যে 'শূন্য পুরাণ', 'ধর্মমঙ্গল', 'মনসামঙ্গল', 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'চণ্ডিমঙ্গল', 'গোরক্ষ বিজয়', ইত্যাদি প্রধান। এসব গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের সার-তত্ত্ব, হিন্দু দেবদেবী ইত্যাদির গুণকীর্তনই মুখ্য ছিল এবং বাংলাদেশের মুসলমানরা এসবই শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন। মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতানই (১৫৫০-১৬৪৮) সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য-সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারার প্রবর্তন করে মুসলমানদের মধ্যে এক নবচেতনার সঞ্চার করেন। তাঁর সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ 'নবীবংশ' এর উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। হিন্দু দেবদেবীর গুণকীর্তণ শুনতে শুনতে তিনি যে কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন তা তাঁর 'নবীবংশ'-এর বর্ণনাতেই উপলব্ধি করা যায়। যেমন :

কত দেশ কত ভাষে কোরানের কথা।
দ্বিন মহাম্মদী বুঝি দেয়ন্থ ব্যবস্থা ॥
কর্মদোষে বঙ্গেতে বাঙ্গালী উৎপন্ন।
না বোঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন ॥
আপন দ্বীনের বোল এক না বুঝিল।
পশুর চরিত্র হই সেসব রহিল ॥
সদয় পড়য় রাম কৃষ্ণের যে কথা।
শুনিয়া আমার মনে লাগে অতি ব্যথা।
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার।
আদ্যে যে আছিল তাহা করিমু প্রচার।
যেরূপে আদম ছাফি হইল উৎপন।
কহিলাম সেসব কিঞ্চিত বিবরণ ॥
দ্বিতীএ প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
নূর মহাম্মদের কহিমু বিবরণ ॥

www.pathagar.com

সৈয়দ সুলতানের আগে জৈনুদ্দীন , সাবিরিদ খান প্রমুখ অবশ্যি 'রসূল বিজয়' কাব্য রচনা করেন তবে তাঁদের রচনা সৈয়দ সুলতানের মতো সার্থক হয়নি। পরবর্তীকালে শেখ চান্দ, শাহ্ মোহাম্মদ সগীর, আলাওল, মোহাম্মদ খান, দৌলত কাজী, সৈয়দ মূর্তজা, হায়াৎ মামুদ, সৈয়দ হামজা, মুনশী জান মোহাম্মদ, শাহ্ গরীবুল্লাহ, মোহাম্মদ দানেশ, খাতের মোহাম্মদ, মালে মোহাম্মদ প্রমুখ মুসলিম কবিরা তাঁদের রচনায় পবিত্র কোরান ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামের প্রভাব ঘটিয়েছেন। এমনকি আল্লাহ রাসূলের 'হামদ-নাত'ধর্মী কাব্যের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে আলোক— উজ্জ্বল করেছেন। এরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলিম রূপকার বলে চিহ্নিত এবং এঁদের সময়সীমা ছিল পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত। এঁদের মধ্যে শাহ মোহাম্মদ সগীর, আলাওল, দৌলতকাজী, সৈয়দ মূর্তজা, হায়াৎ মামুদ প্রমুখ শুধু কবি-সাহিত্যিক মাত্র ছিলেন না, তাঁরা আরবী-ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে যেমন ছিলেন পণ্ডিত তেমনি সূফী-তত্ত্বজ্ঞানে পরিপক্ক অলিয়ে-কামেল সদৃশ। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানতো তাঁদের ছিলই তদুপরি আরবী ও ফারসী সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি যেমন লবীদ বিন রাবিআহ্, হাসান বিন সাবিত, কা্‌ব, হযরত আলী, ইমাম বুসিরী আবুল কাসেম ফেরদৌসী, মওলানা রুমী, নিজামী, জামী, হাফিজ, সাদী, আত্তার, আনওয়ারী, আমির খসরু প্রমুখ এমনকি তুর্কী কবি সুলেমান পালাবীসহ অন্যান্য ইসলামী আদর্শ ভাবাপন্ন মুসলিম কবিদের রচনা আদর্শে প্রভাবান্বিত হয়ে বাংলাসাহিত্যে ইসলামের প্রভাব বিস্তার করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে আরবী-ফারসী-তুর্কী সাহিত্যের প্রভাব থাকলেও তাঁদের রচনায় ছিল মুসলিম জাগরণের লিপ্সা, নিজস্ব ঐতিহ্যপ্রীতি এবং ইসলামের আদর্শ। আস্তে আস্তে তারা স্বকীয়তায় প্রত্যাবর্তন করেন৭ বাংলা সাহিত্যে তাদের অবদান অসামান্য এবং অতুলনীয়। তাঁরা ইসলামের ব্যাখ্যায় যতই তৎপর হোন না কেন তাঁদের রচনায় আল্লাহ, রাসূল, চার খলিফা, বেহেশত, দোজখ ইত্যাদি ছিল অপরিহার্য। এমনকি নামাজ-রোজা, কলেমা, হজ-জাকাত ইত্যাদি সম্পর্কেও বিশদ বিবরণ আছে। তাঁদের রচনায় 'হামদ ও নাত' কিভাবে এসেছে তার কিছুটা নমুনা ঃ

পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।
ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার ॥
নিজ সখা মহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা।
সেই জ্যোতিমূলে ত্রিভুবন নিরামিলা ॥
[সৈয়দ আলাওল ঃ পদ্মাবতী]

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার।
তারপাছে প্রণামি এ রাছুল আল্লার ॥
মুখ্য চারি ফিরিস্তারে করি এ প্রণাম।
সহস্র সহস্র তান পদেতে সালাম ॥
[সৈয়দ মূর্তজাঃ যোগ কলন্দর]

www.pathagar.com

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য পুঁথি–সাহিত্য পদবাচ্য বলে চিহ্নিত এবং একই ধারায় আবর্তিত। এমনকি এই ধারা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত চলে আসছিল। এই সময় কালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাংলাসাহিত্যের মুসলিম রূপকারের মধ্যে রয়েছেন খাতের মোহাম্মদ, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী, মুনসী মালে মোহাম্মদ, শেখ ফজলল করীম, মীর মোশাররফ হোসেন, মুনশী মেহেরুল্লাহ, পাগলা কানাই, লালনশাহ, হাসন রাজা, দুদ্দু শাহ, শীতলাং শাহ ফকীর, খান বাহাদুর সলিমুদ্দীন আহমদ, এয়াকুব আলী চৌধুরী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কায়কোবাদ, শাহাদাৎ হোসেন, আকরম খাঁ প্রমুখ। এই অসংখ্য কবি–সাহিত্যিক যে অবদান সংযোগ করেন তার অধিকাংশই ইসলামীসাহিত্য বলে চিহ্নিত। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক গবেষণাগ্রন্থ ছাড়াও এই সময়কালে পুঁথিসাহিত্য পদবাচ্য কবিতা ও গল্প উপন্যাসও রচিত হয়। বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ 'মোস্তফা চরিত', ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বিষাদ-সিন্ধু' এবং সামাজিক উপন্যাস 'আবদুল্লাহ', 'বঙ্কিম দুহিতা' ইত্যাদি এই সময়কারই রচনা।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে কাব্য–সাহিত্যে এক নব উন্মাদনার সৃষ্টি করেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি নিজে যেমন আত্মপরিচয় দিয়েছেন, 'কোরান আমার বর্ম/ইসলাম আমার ধর্ম/মুসলিম আমার পরিচয়' তেমনি বাংলা সাহিত্যকে ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। কি কবিতা কি নাটক, কি উপন্যাস, কি ছোটগল্প এমনকি ফারসী কবিতার অনুবাদের মাধ্যমেও ইসলামের আদর্শ পরিস্ফুট করেছেন তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে। নজরুল যেমন এক অনন্য প্রতিভা তেমনি সেই বহুমুখী প্রতিভার ছাপ তাঁর সাহিত্যের সর্বত্র বিরাজমান। নজরুল সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এই স্বল্পপরিসর নিবন্ধে সম্ভব নয়। তবে এইটুকুই বলবো, ইসলামের প্রশান্তিময় সমুজ্জ্বল জ্যোতি বাংলাসাহিত্যকে আলোকিত করে রেখেছে নজরুলের অবদান।

নজরুলের সমসাময়িক এবং নজরুল পরবর্তী ফররুখ আহমদ পর্যন্ত অনেক মরহুম কবি-সাহিত্যিক আছেন যাঁরা তাঁদের ইসলামী দর্শনের গবেষণা, প্রবন্ধ,কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস ইত্যাদির সমাহারে বাংলাসাহিত্যকে ইসলাম-সঞ্জাত করে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁরা সংখ্যায় অনেক। কয়জনের নাম উল্লেখ করবো? তবে এদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজী আবদুল ওয়াদুদ, কবি মঈনুদ্দীন, কবি মোজাম্মেল হক, আবুল ফজল, মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, ইবরাহীম খাঁ, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি জসিমউদ্দীন, কবি আজিজুর রহমান এবং আরও অনেকে। মানবতাবাদ যদি ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয় তবে তাঁদের রচনায় মানবতাও সুস্পষ্ট এবং এই মানবতার জয়গানেও তাঁরা সোচ্চার হয়েছেন।

বাংলাসাহিত্যে নজরুল যেমন এক যুগান্তকারী এবং অনন্য প্রতিভা তেমনি এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিভা কবি ফররুখ আহমদ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন ছিলেন সত্য নিষ্ঠ এবং বিশ্বাসী, সেই ব্যক্তিস্বভাব তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর সমগ্র সাহিত্যে। তাঁর 'সাত

www.pathagar.com

সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনিরা' ইত্যাদি প্রত্যেকটি মুসলিম জনগণকে 'হেরার রাজ তোরণের' দিকেই আহবান করে।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশক থেকে শুরু করে আশির দশক পর্যন্ত বহু কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে এবং যাঁরা এখনও জীবিত-তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করবো? লম্বা নামের ফিরিস্তি না দিয়ে অথবা ভুলক্রমে নাম বাদ পড়ার দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার শিকার না হয়ে, বলা যায়, তাঁদের উদ্যম প্রশংসনীয়। তবুও কিছু কথা থেকে যায়। কাজী নজরুল ইসলাম এবং ফররুখ আহমদ যে উদ্যমে বাংলা সাহিত্যকে ইসলামের প্রভাবে প্রভাবান্বিত করেছেন তেমনটি কিন্তু অনেকের মধ্যেই স্তিমিত। ফারসী সাহিত্যের রুমী, হাফিজ, সাদী,জামী প্রমুখের মতো কালজয়ী প্রতিভার অভাব কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এখনও অনুভূত হয়। এমনকি অনুভূত হয় উর্দু সাহিত্যের মীর, হালী, গালিব এবং ইকবালের মত কবির অভাব। ইকবাল উপদেশ দিয়াছেন সত্যিকার মুসলমান হতে এবং সত্যিকার মুসলমান হয়ে 'মর্দে মুমিন' হতে পারলে তার গুরুত্ব কতটুকু ইকবালের ভাষায়ই বলা যায়ঃ 'তুম সায়্যেদ ভি হো, মিরজা ভি হো, পাঠান ভি হো/ বাতাও তুম মুসলমান ভি হো?' তুমি সৈয়দ, মিরজা, পাঠান যাই হওনা কেন, বলো তুমি সত্যিকার মুসলমান কিনা? অথবা 'হাথ হায় আল্লাহ কে বান্দায়ে মুমিন কা হাথ। পালিব ওকার আফরী কার কুশা কার সায'। -আল্লাহর হাত হয়ে যায় বিশ্বাসী মানুষের হাত।

সেই হাত শক্তিশালী, কর্মক্ষম, কর্মপ্রসারী এবং কর্মে উদ্দীপ্ত। অর্থাৎ সত্যিকার মানুষের হাত আল্লাহর গুণাবলী অর্জিত হাত।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে অনেক কিছুই সহজতর হয়েছে। কম্পিউটার পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন নিয়েও গবেষণা চলছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের অনুবাদ এবং এসব সম্পর্কে গবেষণাধর্মী গ্রন্থ কি বাংলা ভাষায় কম প্রকাশিত হয়েছে? গাজ্জালীর দর্শন সংক্রান্ত গ্রন্থ, ইবনে খলদুনের সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ ইত্যাদির নির্ভরযোগ্য অনুবাদ অনেক পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত ইসলাম সংক্রান্ত বইগুলো দেখলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। এগুলোর কি কোনো সদব্যবহার হবে না? এগুলো সঠিকভাবে আত্মস্থ করে সাহিত্যে প্রয়োগ করলে ইসলামের প্রভাব পড়তে বাধ্য।

আমাদের প্রত্যেককে হতে হবে খাঁটি মুসলমান। কবি ইকবালের 'মর্দে মুমিন' কিম্বা 'বাতাও তুম ভি মুসলমান হো', অথবা নজরুলের 'এক আল্লাহ জিন্দাবাদ', 'আমার কিসের শঙ্কা, কোরান আমার ডঙ্কা' 'গোড়ামী ধর্ম নয়' ইত্যাদির স্মরণে এনে আমাদেরকে হতে হবে সাহিত্যের অগ্রপথিক। পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ, ইসলামী আদর্শ ও দর্শন আত্মস্থ করে তার একটা পূর্ণরূপ বিম্বিত করতে হবে বাংলাসাহিত্যে এবং তবেই হবে বাংলা সাহিত্যে সত্যিকারের ইসলামের প্রভাব।

আরো কিছু কথা আছে। আগেই বলেছি, আমাদের সাহিত্য হতে হবে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত। মিথ্যাচার, অশ্লীলতা এবং আজগুবী রচনার মাধ্যমে আমরা যেন লোকদের বিভ্রান্ত না করি। এ সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে সাবধানবাণী রয়েছে। আবার

www.pathagar.com

পরক্ষণেই বলা হয়েছে "ইন্নাল লাজিনা আমানু ওয়া আমেলুস সালেহাত"– অর্থাৎ সেইসব কবি-সাহিত্যিকরা ব্যতিক্রম যারা বিশ্বাস এবং সৎ কাজ করে অর্থাৎ সৎ সাহিত্য রচনা করে। সৎ কবি বা সাহিত্যিকদের জন্য পুরস্কার অবশ্যি রয়েছে।

অসৎ সাহিত্য তথা অশ্লীল কবিতা সম্পর্কে রাসূল করীম (সা) এর একটি সুন্দর বক্তব্য আছেঃ 'লে আন্না ইয়ামতালিআ আ জুফু আহাদাকুম কায়হান হাত্তা ইয়ারিহু খায়রানলাহু মিন ইয়ামতালিআ' শে'রান"— অর্থাৎ কারও পেট পঁচে যদি পুঁজ জমে যায় তবে সেই পুঁজ-জমা পঁচা পেট অশ্লীল কবিতার চেয়ে উত্তম।

অতএব, এসব বিবেচনা করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। তবেই বাংলা সাহিত্যে পড়বে ইসলামের সত্যিকার প্রভাব।

দুই.

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান সম্পর্কে পর্যালোচনার আগে বাংলা সাহিত্যের আদি পর্ব সম্পর্কে সামান্য ইংগিত দেয়ার অপেক্ষা রাখে। বাংলাদেশের ইসলামের আবির্ভাব ঘটে অষ্টম শতাব্দীতে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের সূত্রপাত হয় আরও কয়েকশ বছর পর।

অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে প্রায় ছয় সাত শত বছর পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে হিন্দুয়ানী ভাবধারা প্রচলিত ছিল। তবে ইসলামের আবির্ভাবের ফলে এদেশের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। কারণ ইসলাম বয়ে এনেছিল প্রশান্তির ধারা। এর ফলে বৌদ্ধ শাসন ও হিন্দু শাসন আমলে অর্থাৎ পাল ও সেন রাজত্বের সময় সাধারণ মানুষের জাতিগত ভেদাভেদ এবং আচার–অনুষ্ঠানের যাঁতাকলে পড়ে যে নিষ্পেষিত হচ্ছিল তার অবসান ঘটাল ইসলামের শিক্ষা এবং অমিয় বাণী।

মধ্যযুগের কবি সাহিত্যিকদের অনেকেই আরবী–ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যে যেমন ছিলেন পণ্ডিত তেমনি সুফী–তত্ত্ব জ্ঞানে পরিপক্ক অলিয়ে কামেল সদৃশ। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান তো তাঁদের ছিলই, তদুপরি আরবী ও ফার্সী সাহিত্যের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ যেমন 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা', সাবআ মু'আল্লাকা', 'মাকামাতে হারিরী', 'মাকামাতে হামদানী', 'বানাতে সুআদ', 'কাসিদাতুল বোরদা', 'শাহনামা', 'বোঁস্তা–গুলিস্তাঁ', 'মসনবী শরীফ', 'দীওয়ান-ই-হাফিজ', 'পান্দনামা', 'মানাকিতুত তায়ের', 'আশেক নামা' ইত্যাদি বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করে ইসলামী চেতনা ও আদর্শে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করেন। শুধু অনুবাদ নয়, তাঁদের রচনাআদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েও বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব বিস্তার করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁদের রচনায় আরবী–ফার্সী–তুর্কী ইত্যাদি সাহিত্যের প্রভাব থাকলেও আস্তে আস্তে তাঁরা স্বকীয় ভাবধারা সম্বলিত সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনায় সমর্থ হন। বাংলা সাহিত্যে তাঁদের অবদান অসামান্য এবং অতুলনীয়।

পুঁথি সাহিত্যের গবেষক ও অনুসন্ধান বিশারদ ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের মতে মধ্যযুগের মুসলিম সাহিত্য রূপকারদের রচিত

www.pathagar.com

পুঁথির সংখ্যা ছিল ৮৩২৫টি। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের ক্ষেত্রে এই মুসলিম কাব্য সাহিত্য, বটতলার পুঁথি কিম্বা দোভাষী পুঁথি যাই বলি না কেন, এসবের অবদান অসামান্য।

উল্লেখ্য, ফার্সী সাহিত্যের সমৃদ্ধি প্রচার এবং প্রসারে রাজা বাদশাহ সুলতানদের আনুকূল্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা যেমন প্রবল ছিল তেমনটি কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ছিল না। তাছাড়া এ দেশের মুসলিম শাসন আমলে শাসকরা ছিলেন হয় মুগল অথবা তুর্কী এবং দীর্ঘদিন রাষ্ট্রভাষায় মর্যাদায় আসীন ছিল ফার্সী ভাষা। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ছিল ফার্সীর প্রতি অনুরক্ত। তবে ইংরেজ শাসন আমলে যে সব জাগরণের সূচনা হয়, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের প্রভাবে, তাতে হিন্দু সমাজই লাভবান হয়েছিলেন বেশী।

এখানে রাজনৈতিক এবং সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণের অবকাশ নেই। তবে এইটুকু বলা যায়, বিভিন্ন সময়ে ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য এবং স্বজাত্য বোধ প্রতিষ্ঠায় যেসব ধর্মীয় আন্দোলন হয়েছে যেমন তরীকা-ই মুহাম্মদী, ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের সংগ্রাম ইত্যাদি এসব মূলতঃ ধর্মীয় এবং স্বাজাত্যবোধের আন্দোলন হলেও শিল্প সাহিত্য সৃষ্টিতেও মুসলমানদের প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিল এবং প্রেরণা যুগিয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর দুই দশক পর্যন্ত, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের স্বর্ণযুগ বলা চলে। এই সুদীর্ঘ সময়কালের লেখকদের অনেকের মধ্যে মধ্য যুগীয় ভাবধারা বর্তমান থাকলেও তারা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনায় বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলেন। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাঁরা রচনা শুরু করলেন ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটক ইত্যাদি। তাছাড়া হামদ-নাত ও ইসলামী গান সমন্বয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে শুরু করলেন। ......এঁদের সামগ্রিক সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে এখানে বলার অবকাশ নেই তবে এঁদের মধ্যে মীর মোশাররফ হোসেনকে সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলে অভিহিত করা হয়। এসব লেখকদের মধ্যে মীর মোশাররফ হোসেনের 'গাজী মিয়ার বস্তানী', 'বিষাদ সিন্ধু' 'এসলামের জয়', 'অশ্রুমালা', নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণীর 'রূপজালাল'; মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'মানব মুকুট'; 'শান্তি ধারা', মোহাম্মদ নজীবর রহমানের 'আনোয়ারা'; 'গরীবের মেয়ে'; মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদীর 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা'; মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের 'উন্নত জীবন', 'মানব জীবন'; শেখ ফজলল করিমের 'পথ ও পাথেয়'; ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ', 'রায় নন্দিনী'; আবদুল হামিদ খান ইউসুফজায়ীর 'উদাসী'; ইত্যাদি খুবই উল্লেখযোগ্য এবং বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানে সমৃদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের প্রেক্ষিতে পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও উল্লেখের দাবী রাখে। যে সব সাময়িক পত্র পত্রিকা মুসলিম চিন্তাধারা বিকাশে এবং ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত ছিল সে সবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'আল এসলাম', 'ইসলাম প্রচার', কোহীনূর', মিহির, মিহির ও সুধাকর, হাফেজ, এসলাম সুহৃদ এবং পরবর্তী কালের সওগাত, মোহাম্মদী, আল ইসলাহ, নওরোজ, ইমরোজ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলাসাহিত্যে মুসলিম অবদানের এক যুগান্তকারী প্রতিভা কবি নজরুল ইসলাম। তিনি ইসলামী অবদানে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন। গজল, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ইত্যাদিতে নজরুল প্রতিভা ভাস্বর। সংক্ষেপে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের সব শাখাই নজরুলের অবদানে সমুজ্জ্বল।

নজরুলের সমসাময়িক এবং নজরুল পরবর্তী ফররুখ আহমদ পর্যন্ত অনেক কবি-সাহিত্যিক, পণ্ডিত-গবেষক নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর গবেষণায়, ইসলাম আদর্শ, ঐতিহ্য ও স্বাজাত্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে রচনা করেছেন নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষাসঞ্জাত ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কবিতা, নাটক, গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি। এমনকি বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ করেও বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন। এই দলভুক্ত লেখকদের সংখ্যা অনেক। ......

চল্লিশ দশক থেকে নব্বই দশকের শুরু পর্যন্ত আমাদের লেখকরা প্রত্যক্ষ করেছেন ১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগ অর্থাৎ পাকিস্তান অংশের পূর্ব-পাকিস্তান, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। আর সেই মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিবেশ সাহিত্যের উপরও ক্রিয়া করে বহুল পরিমাণে। পাকিস্তান সৃষ্টিলগ্নে আমাদের অনেকেই আগেকার মুসলিম সাহিত্যিকদের অবদানের মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন, অন্তত নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য এটারও প্রয়োজন ছিল।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে সুদৃঢ় ও সংহত করার প্রেরণা দিয়েছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন আমাদেরকে আরও উৎসাহব্যঞ্জক করে তুলেছে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করার।

আগেই বলেছি, এই সুদীর্ঘ সময়ের লেখকদের তালিকা প্রস্তুত করতে কয়েকশ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকবে। এঁরা সবাই সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনায় ব্রতী এবং তাঁদের উদ্যম প্রসংশনীয়।

তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়, আমাদের এই অসংখ্য লেখকদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লেখকদের রচনায় আছে ইসলামী আদর্শ, বিশ্বাস, ঐতিহ্য এবং স্বাজাত্যবোধ-প্রীতি।

www.pathagar.com

আমাদের সাহিত্য
আল মাহমুদ

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ১১ জুলাই ১৯৩৬, মৌড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পেশা : সাংবাদিকতা ও লেখালেখি। সম্পাদক, দৈনিক কর্ণফুলী। আল মাহমুদ বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবি।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কবিতা ঃ লোক লোকান্তর (১৩৭০), কালের কলস (১৩৭৩), সোনালী কাবিন (১৯৭৩), মায়াবী পর্দা দুলে উঠো (১৯৭৬), অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না (১৯৮০), বখতিয়ারের ঘোড়া (১৯৮৪), আরব্য রজনীর রাজহাঁস (১৯৮৬), প্রহরান্তের পাশফেরা (১৯৮৭), একচক্ষু হরিণ (১৯৮৯), মিথ্যাবাদী রাখাল, আমি দূর দূরগামী, দোয়েল ও দয়িতা প্রভৃতি। গল্প: পানকৌড়ির রক্ত, সৌরভের কাছে পরাজিত, গন্ধবণিক, ময়ূরীর মুখ প্রভৃতি। উপন্যাসঃ কাবিলের বোন, ডাহুকী, উপমহাদেশ প্রভৃতি। প্রবন্ধ ঃ কবির আত্মবিশ্বাস, দিন যাপন, কবিতার জন্য বহু দূর, নারী নিগ্রহ। পুরস্কার ঃ বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদকসহ বহু পদক ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

লেখা-পরিচিতি ঃ 'নতুন কলম' এপ্রিল ১৯৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত।

সাহিত্য এমন একটা মাধ্যম যাতে কেউ কাউকে শেষ করতে পারে না। ফররুখ আহমদ এমন অনেক রহস্য উদঘাটন করে গেছেন যা আমাদের স্মরণ করতে হচ্ছে। আমাদের অনেক প্রতিভাবান তরুণ লেখক আছেন যাদের পাশে দাঁড়ানোর শক্তি বিপক্ষের অনেকের নেই। যেমনঃ মতিউর রহমান মল্লিক, মোশাররফ হোসেন খান, তমিজউদ্দীন লোদী, মুকুল চৌধুরী প্রমুখ। আমিতো মনে করি ডান-বাম মিলিয়ে এরাই এখনকার শক্তিশালী কবি।

লেখক হতে হলে নিজের উপর জোর দিতে হবে। সাহিত্য হলো ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, যেহেতু আমরা একটি আদর্শে বিশ্বাস করি সেহেতু আমাদের একটা জায়গায় মিলতে হবে। বামপন্থীরা ক্ষয়িষ্ণু কিন্তু খুব পাওয়ারফুল। এখন আর তাদের সৃষ্টি ক্ষমতা নেই। বামদের আদর্শ পরাজিত হয়েছে। লড়াইয়ে পরাজিত হয়নি— এমনিই। কমিউনিস্ট অর্থনীতির চাকা ভেঙ্গে গেছে। আমি আমার পড়াশুনার আলোকে আর কমিউনিস্টদের ফিরে আসার কারণ দেখি না।

এখন যেটা পৃথিবীর সামনে আদর্শ, সেটা হলো ইসলাম। তর্কের দিক থেকে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হচ্ছে। মুসলমানরা এক সময় সাহিত্য রচনা করেছে কিন্তু তার সবটা ইসলামী সাহিত্য নয়, বিপক্ষেরও নয়। তবে ইসলামের পক্ষেও লেখা হয়েছে। যেমন ইকবাল। এগুলো পড়তে হবে। উদ্ভাবনার শক্তি অর্জন করতে হবে। উদ্ভাবনার শক্তি আল্লাহর তরফ থেকে আসে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হয় যে, আল্লাহ আমাকে উদ্ভাবনা শক্তি দান করুন, যেন আমি মুসলমানদের পক্ষে লিখতে পারি।

তুরস্কের পাওয়ারফুল কবিরা সবাই ইসলামী। জগত সম্পর্কে জানতে চায়না আজকের তরুণ কবিরা। এখন পর্যন্ত জীবনভিত্তিক কোনো উপন্যাস বাংলা ভাষায় লেখা হয়নি।

কবিদের শব্দ সম্পর্কে খুব সচেতন থাকতে হবে। এই সচেতনতা পড়তে পড়তে এবং লিখতে লিখতে আসে।

www.pathagar.com

আমি নানা পরিবেশ থেকে শিক্ষিত হয়েছি, এবং আমার মধ্যে এই প্রার্থনা ছিল যে, হে আল্লাহ! আমাকে উদ্ভাবনার প্রাণশক্তি দান করুন, যেন আমি ইসলামের পক্ষে লিখতে পারি। ইসলামের পক্ষে কিভাবে লিখব? কি রকম লেখা হওয়া উচিত? যে ধরনের লেখা সমাজে, সামাজিক জীবনে আর্ট হিসাবে স্বীকৃতি পায়। যেমন আমি একটা গল্প লিখলাম, তাতে মুসলমানদের সমাজ জীবনের চরিত্র ও রীতি নীতি আছে— সেটাকে আমি ইসলামের পক্ষে বা আধুনিক গল্প বলি না। আমি বলি— আমার লেখার কাহিনীটা, আমার চরিত্রটায় যেন ধর্মের গন্ধ, তার সুফল-কুফল ধরা পড়ে এবং তাতে কেউ যদি আমাকে মৌলবাদী বলে, বলুক। আপত্তি নেই।

আমি বিভিন্ন দেশে ঘুরেছি— অনেক শিখেছি, অনেক দেখেছি। আমি জানি, বর্তমান তুরস্কের সবচেয়ে পাওয়ারফুল কবি বিশ/একুশ বছরের কবি— তাঁরা সব ইসলামের কবি। তাঁদের বলা হয় মৌলবাদের কবি। কিন্তু আপনারা শুনে অবাক হবেন, এরাই তুরস্কের শীর্ষস্থানীয় কবি। তাঁদের একটা গল্প বা কবিতার বই বের হলে মুহূর্তেই বিক্রি হয়ে যায় হাজার হাজার কপি। ঠেকাতে পারছেনা। তুরস্কের মানুষ লাইন ধরে কেনে তাদের কবিতার বই। এই হলো আধুনিক কবি, কবিতা—মৌলবাদের কবি। যাতে ধর্মের গন্ধ, সুফল-কুফল পাওয়া যায়।

ইসলামের আন্দোলন যেখানেই থাকুক আমাদের সেখানেই থাকতে হবে। ইসলামের আন্দোলনকে আমরা সমর্থন করি, করব। কারণ ইসলামী আন্দোলন একটা চমৎকার সুন্দর স্বপ্ন দেখায়, বাস্তবতার স্বপ্ন। আমিও ইসলামের মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখি। কবিতায় সৃষ্টি করি Dream. আমি আমার কবিতা, উপন্যাসে ইসলামের মধ্যে মানুষের জন্য মমতাবোধ সৃষ্টি করি। আমি একটা গল্প লিখে সমস্ত মুসলমানকে স্বপ্ন দেখিয়ে দিতে পারি, যে ইসলাম একটা সত্য সুন্দর পূর্ণাঙ্গ ধর্ম।

আমাদের দেশে তরুণদের মধ্যে একটা সমস্যা আছে। তারা মনে করে কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় লেখা আসলেই বুঝি বড় কবি হওয়া যায়। চরম আধুনিক সাহিত্যিক হওয়া যায়। এবং তারা এর জন্য সব সময় ব্যগ্র থাকে। কিন্তু না, কলকাতায় লিখলেই বড় হওয়া যায় না। বড় হতে হলে আপনাকে সারা বিশ্বের সাহিত্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। বিশ্বের কে কোথায় কি লিখছে, কতোভাবে লেখা হচ্ছে, তা আপনাকে জানতে হবে। ল্যাটিন আমেরিকায় কতোভাবে সংস্কারমূলক লেখা হচ্ছে। নতুন নতুন Dream. কতো আন্দোলনের পতন হয়েছে। কিছুদিন আগে যাদু বাস্তবতা নামক একটা আন্দোলন ছিল ল্যাটিন আমেরিকায়। কবিতাতে পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়েছিল— নেই! তারা আর তা নিয়ে লিখছে না। এখন তারা উপন্যাস লিখতে চায়। বড় বড় উপন্যাস। এতোদিন টেড হিউজ মাছ, গাছ, পাখি, পাথর নিয়ে কবিতা লিখেছেন। সম্প্রতি তিনি আবার তাঁর প্রথমা স্ত্রী সিলভিয়া প্লাথকে নিয়ে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখে ফেললেন। কেন টেড হিউজ লিখছেন কৈফিয়ৎমূলক কবিতা? তাঁকে এতোদিন সিলভিয়া প্লাথের জন্য দায়ী করা হয়েছে। তিনি নীরব ছিলেন, মুখ খোলেননি। আর কেন হঠাৎ তিনি সিলভিয়া প্লাথের উপর একটা বই লিখে ফেললেন? জবাবে তিনি বলেন— অনেক দিনের জমে থাকা নীরব প্রশ্নের জবাব

www.pathagar.com

আপনারা এতে পাবেন। এখন আপনারা ভেবে দেখুন, একজন কবি সত্য বলার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছেন। এতোদিন তাঁকে নানা প্রশ্ন করা হয়েছে, কিন্তু তিনি সিলভিয়ার পক্ষে একটা কথাও বলেননি। বিপক্ষেও না। আর হঠাৎ করে তিনি বই লিখে ফেললেন! আমি তো মনে করি এই বইটা তাকে সেফ করবে। অতএব, এটা একটা দেখার বিষয়, জানার বিষয়। আপনাকে জানতে হবে, পড়তে হবে।

টেড হিউজ কিছুদিন আগে কড মাছ নিয়ে একটি চমৎকার কবিতা লিখে ফেললেন। কিভাবে কড মাছ ডিম দেয়, কোথায় থাকে, কি খায় ইত্যাদি। আমরা তাঁকে নিয়ে এসেছিলাম বাংলাদেশে; তিনি সুন্দরবন নিয়ে এক নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখে ফেললেন। তারপর হঠাৎ তিনি চলে গেলেন সিলভিয়া প্লাথের উপর কবিতা লেখার কাজে। এই যে সত্য, এই যে সুন্দর— এ আমাদের দেখতে হবে, বুঝতে হবে এবং তা ইসলামের খেদমতে পেশ করতে হবে। আমাদের ঐ 'দেশ' পত্রিকার পিছনে ঘুরলে চলবেনা। একজন কবিকে প্রথমত হতে হবে প্রচণ্ড সৎ তারপর অন্য যা খুশি। আপনি হয়তো ভালো কোনো গল্প, কবিতা লিখতে পারেননি, ক্ষতি কি? আপনি একজন মুসলিমের জীবনী লিখে ফেলুন। অথবা কোনো এক অঞ্চলের মুসলিম জীবনীগ্রন্থ। যেমন চীনের ঘটনা নিয়ে ফ্লারেন্স ল্যা লিখেছিলেন 'বুডার্ট'। তখন আমি এইট/নাইনে পড়ি— ভালো ইংরেজীও জানতাম না। তবুও আমি অনেক কষ্টে চেষ্টা করে করে ইংরেজীতেই সেটা পড়েছি। অসাধারণ বই! আপনি এই রকম একটা বই লিখে ফেলুন।

জসীমউদ্দীন প্রেমের কবি, রোমান্টিক কবি। তাঁর কবিতায় রাধা কৃষ্ণও এসেছে, কালো ছেলেও এসেছে। কিন্তু তা কয়দিন? কবি রাধাকৃষ্ণ পড়তে পড়তে কাজিয়ার চর দখলে চলে গেছেন। লিখলেন—'রাত থমথম নিস্তব্ধ নিঝুম ক্ষণ'। আর এই কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মোহনলালকে এক চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে—হ্যা, এই হলো মৌলিক কবি। মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন বেরিয়ে এসেছেন। এটা সহজ নয়; সহজের মধ্যে এ এক কঠিন কাজ। বাংলার যে গ্রামীণ জীবন, মারামারি, চর দখল এ কাজ কোনো হিন্দুও কবিতায় আনতে পারেনি।

আমি মনে করিনা জসীমউদ্দীন এ কাজ সচেতনভাবে করেছেন, তিনি করেছেন পড়তে পড়তে, লিখতে লিখতে অর্থাৎ তাঁর অজ্ঞাতে তিনি এ কাজ করে ফেলেছেন। মুসলমানদের জীবনী লিখে ফেলেছেন। জসীমউদ্দীন সম্পর্কে আমার আরো একটি ধারণা— তিনি রোমান্টিক প্রেমের কবি। কিন্তু তিনি চাষী পরিবার থেকে উঠে আসার ফলে তাঁর সেই রোমান্টিসিজম কাজে লাগেনি। তবে তিনি বাস্তবভিত্তিক কিছু অসাধারণ কবিতা লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে 'নক্‌শী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ইত্যাদি। সে এক অসাধারণ কাজ। আমি একবার ইটালী গিয়েছিলাম, সেখানে আমার এক বন্ধু আছে— সে রবীন্দ্রনাথের পর জসীমউদ্দীনকে অনুবাদ করলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম— তোমরা আমাদেরকে অনুবাদ করতে পারো না? আমরা তো মরমী কবি। জবাবে বন্ধু বললেন— জসীমউদ্দীনের লেখায় কাঁচা মাটির গন্ধ পাওয়া যায়, আমাদের দেশের লোক এটাই পড়বে বেশী। ইটালীতে জসীমউদ্দীনের বই লাইন দিয়ে বিক্রি

www.pathagar.com

হয়েছে। তবে আপনি কেন মুসলমানদের জীবনী লিখতে ভয় পান? আপনি কেন মৌলের দিকে ফিরে যাচ্ছেন না?

কবিদের এক ধরনের আত্মঅহংকার থাকা ভালো। জসীমউদ্দীন কি ধরনের মানুষ ছিলেন? স্বাধীনতার পরের ঘটনা— কলকাতা থেকে একদল লোক এসেছেন আমাদের দাওয়াত করতে। দুই বাংলার প্রধান কবিদের নিয়ে সাহিত্য সম্মেলন হবে। আমাকে শামসুর রাহমানকে ও আমাদের প্রধান কবি জসীমউদ্দীনকে দাওয়াত করতে এসেছেন। আমি ও শামসুর রাহমান কিভাবে যাবো? বাসে। আমরা তাতেই খুশি। দাওয়াত করেছে এতেই আমরা ধন্য। তারা এসে আমাকে বললেন—জসীমউদ্দীনের বাসায় যাবো। বললাম, চলুন। তখন তিনি কমলাপুরের বাসায় থাকতেন। আমরা বাসায় গেলাম। কবিকে খবর দেয়া হলো—কলকাতা থেকে মনোজ বসু দু'জন লোক পাঠিয়েছেন। কবি এসে আমাদের বসতে বলে আবার ভিতরে গেলেন। কিন্তু আর এলেন না। আমরা তো অবাক! প্রায় আধঘন্টা পরে তিনি এলেন সাদা সিল্কের পাঞ্জাবী-পাজামা পরে। কাঁধে চাদর। কলকাতার দুই ভদ্রলোক হাত জোড় ও মাথা নিচু করে পায়ে ধরে তো সালাম করলেনই তারপরও সারাক্ষণ এইভাবে বসে ছিলেন। তখন জসীমউদ্দীন তাদের বললেন— মনোজ কি বলেছে?

– আজ্ঞে দুই বাংলার প্রধান কবিদের নিয়ে সাহিত্য সম্মেলন; আপনাকে আমরা নিতে এসেছি।

– তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমাকে নিলে তো তোমাদের খরচ বাড়বে।

– জ্বি আজ্ঞে, তবুও আমরা আপনাকে নিব।

– আমার সাথে আমার মেয়ে যাবে।

– জ্বি আজ্ঞে।

– আমি যে যাবো, এয়ারপোর্টে আমাকে রিসিভ করতে কে আসবে? হয় প্রেমেনকে আসতে হবে; নয় মনোজকে।

– জ্বি আজ্ঞে, ওঁনারা আসবেন।

এখন এখানে ভাববার বিষয় আছে, বুঝবার বিষয় আছে। আমাকে ও শামসুর রাহমানকে বাসে নেবে আমরা তাতেই রাজি। মহাখুশি। আর জসীমউদ্দীন? দেখুন তাঁর কতো সম্মান; নিজের কতো আত্মঅহংকার। এয়ারপোর্ট-এ প্রেমেন্দ্র মিত্র অথবা মনোজ বসুকে আসতে বললেন। তাহলে আমরা কি বুঝলাম, বুঝলাম মুসলমানদের জীবনী লিখলেও কারো সম্মান হানি হয়না। বরঞ্চ উত্তরোত্তর সম্মান, মান-মর্যাদা বাড়তেই থাকে। অনুবাদ হতে থাকে দেশে-বিদেশে। তাহলে আপনারা কেন মুসলিম জীবনীগাথা লিখতে ভয় পান? আরবী, ফার্সী, উর্দু শব্দ আপনাদের লেখায় নেই কেন? রোজা, সেহরী লিখতে আপনারা ভয় পান কেন? কলকাতার একজন লেখকতো দেদারছে পুঁজো, পুঁজোমণ্ডব নিয়ে লিখে যাচ্ছে— কই, তাতে তো সে মৌলবাদী হয়ে যাচ্ছে না? তবে আপনি কেন আপনার ধর্ম নিয়ে লিখতে এতো ভয় পাচ্ছেন? পৃথিবীতে যারা বড় তারা সবাই মৌলবাদী; সবাই তার ধর্মের মূল নিয়ে বড় হয়েছে। আপনিও হবেন। আপনাকেও হতে হবে।

www.pathagar.com

এই হলো জসীমউদ্দীন, যাকে আপনারা বলেন গ্রাম্য! 'মুচোলমান' কবি!..... আর আমি আপনাদেরকে এ ঘটনাটা কেন বললাম? আপনাদের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করার জন্য এবং যাতে আপনারা লিখতে ভয় না পান। লিখতে কার্পণ্য না করেন। নজরুলতো বহু আগেই বলে গেছেন—'বিশ্ব কাব্যলক্ষ্মীতে একটি মুসলমানি ঢং আছে।'

লেখকের জসীম উদ্দীনের মতো একটা আত্মসম্মানবোধ থাকা দরকার। কলকাতা আপনাকে বড় করলে আপনি বড় হবেন, এটা ঠিক না। অথবা কলকাতা আপনাকে স্বীকৃতি দিলে আপনি স্বীকৃতি পাবেন এও ঠিক না। বাংলাদেশ স্বাধীন একটা দেশ, স্বীকৃতি দিলে সে বাংলাদেশই দেবে, বড় করলে সেই আপনাকে বড় করবে। কলকাতার লেখকরা কি লেখে? কিচ্ছু না, কিচ্ছু হয়না। একটা উপন্যাসের তিন/চারটা পৃষ্ঠার বেশি পড়া যায় না। আর সে দেবে আপনাকে স্বীকৃতি ? সাহিত্যে যদি কিছু পড়বার বা বুঝবার না থাকে তবে সেটা আবার কিসের সাহিত্য? দু'কলম লিখলেই সাহিত্য হয়না। লেখক হবে হাজার বছরের। তাঁর মন সংকীর্ণ হলে হয়না। আপনার মুগ্ধতা আপনার লেখায় ধরা পড়বে। সে কাউকে বলে দিতে হবেনা।

যারা কবি তাদের শব্দ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কবিতা শব্দ চায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমার এক বন্ধু। তিনিও কবি। তিনি তার এক কবিতায় লিখেছেন-"পোড়া মাটির জীবন জোড়া পাখির তৃষ্ণা, তাই বলি।" এখন এখানে দেখুন তৃষ্ণা শব্দের অর্থ যে পিপাসা নয়; এ বোঝাবার জন্য কবি হওয়া দরকার। আপনি গদ্যে লেখেন আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে আপনাকে শব্দ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আপনাকে বুঝতে হবে জানতে হবে কোন শব্দের পর কোন শব্দ আসবে। কবিতা কোন শব্দের দাবী করে। আর হ্যা, না জেনে কেউ গদ্য লিখবেন না। গদ্যেরও একটা ছন্দ আছে। সে ছন্দের ব্যালেন্স আপনাকে রাখতে হবে। অবাস্তব কোনো কবিতা-কাহিনী রচনা করবেন না। গল্প, কবিতা, উপন্যাস সবখানেই আপনাকে ছন্দ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। যেমন ধরুন নজিবর রহমান সাহিত্য রত্ন। তিনি লিখেছেন "আনোয়ারা" উপন্যাস। আমি মনে করিনা এখানে উপন্যাসের সবরকম টেকনিক মানা হয়েছে। তবুও দেখুন কি বিস্ময়কর! তখনকার সময়ে সেটার দশটা এডিশন হয়েছিল। বিক্রি হয়েছে মোয়া-মুড়কির মতো। সবাই কিনেছে। সবাই পড়েছে। ধর্মীয়গ্রন্থের মতো পাঠ হয়েছে মুসলমানের ঘরে ঘরে। এটা কেন হয়েছিল? কারণ, উপন্যাসটা ছিল একটা সার্থক সুন্দর উপন্যাস এবং উপন্যাসটি একটা সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। আর এই প্রতিনিধিত্ব কেন করেছিল? কারণ নজিবর রহমান একটা জিনিস রপ্ত করতে পেরেছিলেন, আর সেটি হলো— কিভাবে লিখলে কিভাবে উপস্থাপন করলে মুসলমানরা সেটা গ্রহণ করবেন। আপনাকে তাই করতে হবে। জানতে হবে। জানতে হবে যুগ, যুগের মুসলমানরা কি চায়। কি পেলে তারা তৃপ্ত।
আমাদের একজন শক্তিশালী গল্প লেখক আছেন— শাহেদ আলী। আপনারা জানেন সত্যজিৎ রায় তাঁর গল্প নিয়ে ছবি করতে চেয়েছিলেন। কেননা তখন শাহেদ আলীর লেখার পাশে আর কেউ দাঁড়াতে পারতো না। কোন বাংলাতেই না। আপনাকেও সেই রকম শক্তিশালী হতে হবে। আমাদের সবাইকে শক্তিশালী হতে হবে। যেন মানুষ আমাদের কাছে আসে। আর সেই শক্তির জন্য চাই উজ্জ্বল আলো-উদ্ভাবনাময় প্রাণশক্তি।*

---

* ৮ মার্চ ১৯৯৮, নতুন কলম সাহিত্য সভায় প্রদত্ত সভাপতির ভাষণের ধারণকৃত অংশ

www.pathagar.com

আধুনিক বাংলাসাহিত্যের ধারা

আফজাল চৌধুরী

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ১৯৪২, সিলেট। আফজাল চৌধুরী ষাটের দশকের উল্লেখযোগ্য প্রধান কবি। শিক্ষা ঃ বি.এ (অনার্স), এম.এ ১৯৬৫। পেশা ঃ অধ্যাপনা। বর্তমান হবিগঞ্জ সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কবিতা ঃ কল্যাণ ব্রত (১৯৬৯), সামগীত দুঃসময়ের (১৯৯১) প্রভৃতি। অনুবাদ ঃ বার্ণাবাসের বাইবেল

লেখা-পরিচিতি ঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনের [২৫ নভেম্বর ১৯৮৮] প্রথম অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত এবং প্রথম সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন '৮৮ স্মারকে প্রকাশিত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মাঝে সম্পর্ক সুসম নয়, অত্যন্ত অসম। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য রূপ ও রসবিচারে একান্তই এতদ্দেশীয় চারিত্রসম্বলিত, এবং ইন্দো-মধ্য এশীয়। এশীয় সভ্যতার রসগ্রাহী সকল উপাদান প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে উৎপাদক রূপে বিদ্যমান ছিলো, বরং এমন কি চর্যাগীতিমালাকে ইরানী গযল–জগতের পূর্বসূরী হিসাবেই দেখতে পেয়েছেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ভূখণ্ডগত অবস্থানে এই মাগধী বুলিকীর্ণ বাংলাসাম ও বিহার–উড়িষ্যা ইন্দো–ইরানী–ইউরোপীয় তথা ইউরেশীয় আর্য–ভাষাভাষী–গোষ্ঠীর দক্ষিণ–পূর্বের সর্বশেষ অধিগৃহীত অঞ্চল। তারপরেই কিরাত ও মঙ্গোলীয় ভাষা–জোন যা ভেদ করে ইন্দো–মধ্য এশীয় সভ্যতার প্রবেশ ঘটে থাকলেও ভাষামণ্ডলের বিস্তার সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এর কারণ জাতিগত সংস্কৃতি বিষয়ক নয়। মঙ্গোলীয়, বোদো ও অস্ট্রেলয়েড জাতি ও প্রজাতিগোষ্ঠীর দখলিত এলাকা সূচিত হয়েছে বাংলাসামের পূর্ব-সীমান্ত হতে এবং লীন হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে, পরন্তু ছিটকে পড়েছে উভয় আমেরিকার আদি অধিবাসীদের মাঝে। এঁরা হিন্দু বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের মর্ম গ্রহণ করে থাকলেও ভাষা যেহেতু প্রাকৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক, তাই কেউ কেউ ইন্দো–পশ্চিম এশীয় সভ্যতার বলয়ভুক্ত হলেও ভাষার নিজস্বতার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই আছে যার–যার নিজ–নিজ মেরুদণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে। আর এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। বাংলাসামের মূল ভাষা অর্থাৎ আদি জাতিগোষ্ঠীর ভাষা অনার্য ও অস্ট্রেলয়েড, পরে দ্রাবিড়গোষ্ঠী এ–অঞ্চলে প্রবল আর্যচাপে পেছনে হটে আসাকালে দ্রাবিড় ভাষার একটি বাতাবরণ ছড়িয়ে পড়ে এতে; কিন্তু স্থায়ী হওয়ার আগেই গোলমাথা আলপাইন গোষ্ঠীর আর্যরা গাঙ্গো উপত্যকায় এসে উপনিবেশ স্থাপন করতে থাকে, এখন থেকে খ্রীস্টপূর্ব দেড় হাজার বছরেরও আগে। আর তখন থেকেই জনগোষ্ঠীর আদি শংকর প্রক্রিয়ার সূচনা হয় এবং আর্যবুলি মাগধী প্রাকৃতের রূপ দানা বাঁধতে থাকে। অস্ট্রেলয়েড দ্রাবিড় গোলমাথা আলপাইন নরগোষ্ঠী এবং বোদো বা টিবোটোবর্মনদের কিছু কিছু এবং মঙ্গোলীয় শান

www.pathagar.com

জাতির রক্ত-স্রোতের ছিটেফোঁটা প্রবাহিত হয়ে এ-অঞ্চলে যে সংকর জাতির অভ্যুদয় ঘটায় তাদের ভাষাটিও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সর্বপূর্বী রূপটি বিকাশ সাধনে সক্ষম হয় এবং কালিদাসের কালে একটি সংহত রূপ নিয়ে অন্ত্যজ ছোটলোকদের গণবুলির রূপ ধারণ করে। তাঁর নাটকে বিভিন্ন প্রাকৃত বুলির সংলাপ এই সত্যকে খুবই চিত্তাকর্ষকরূপে প্রকট করে তুলেছে।

মহাভারতের যুগটি পৌত্তলিকতা ও একেশ্বরবাদের টানাপোড়েন ও রক্তক্ষীয় সংঘর্ষের যুগ। অবশ্য আমাদের এই দাবিটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ-সিদ্ধ নয়; কারণ রাজ-রাজড়াদের শৌর্য-বীর্য, ন্যায় ও অন্যায়াচরণের এক মহাকাব্যিক দ্যোতনা ও ঘটনাপ্রবাহে অধ্যাত্ম-সাধনা ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়ের সংলাপের মধ্যে এবং নানা আজগুবি লোক-বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে মনে হলেও অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনে এবং শ্রীমদ্ভগবতগীতার অধ্যাত্মতত্ত্বে বৈদিক সভ্যতার চিন্ময়লোকের শাশ্বতরূপ সত্য আমাদের দাবিকে প্রতিপন্ন করতে সাহায্য করবে এভাবে যে-আদি বৈদিক একেশ্বরবাদ ভাববাদী বা নবীকে অথবা ঋষিমণ্ডলীকে যে দৃষ্টিতে দেখতো তার সঙ্গে হিব্রু বা ইহুদী অর্থাৎ বনি ইসরাইলের দৃষ্টিভঙ্গির অভিন্নতা অতি সামান্য। আর্যরা যে বেদ-সংহিতাগুলো সাথে নিয়ে এসেছিলেন সেগুলো ইব্রাহীম (আ) ও মুসা (আ)-এর সাহিফা ও সংহিতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, একথা দাবি করলে উড়িয়ে দেয়া যাবে না এ-জন্যে যে— যে ইহুদী কাবিলাগুলো পূর্বদিকে হিজরত করে আফগানিস্তান অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন আর্যরা এঁদের এঙ্গে সম্পর্ক বিস্তার করেই ভারতবর্ষের সবুজ উপত্যকায় উপনীত হয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে এনেছিলেন ইহুদীদের তুরীয় ভাববাদ। ফলে ঘোরতর একেশ্বরবাদী ইবরাহীম ব্রহ্মে রূপান্তরিত হলেন, কিন্তু দেবতা বনে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হলো না, কারণ তিনিই তো জগতের আদি বিগ্রহ ধ্বংসকারী; ফলে 'বলং বলং ব্রহ্ম বলং' এই ধ্বনি হিন্দু একেশ্বরবাদীর কণ্ঠে এখনো ধ্বনিত হচ্ছে ব্রহ্মবাদের মূলমন্ত্ররূপে।

আর মুসার ইতিহাস ও কৃষ্ণের জীবনেতিহাসের উপাদানগুলো কি করে নিযাম ডাকাত ও বাল্মিকীর জীবনেতিহাসের মত এত অভিন্ন হলো? তাই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের একটি অভিন্ন মিলনবিন্দু হিব্রু ও বৈদিক সভ্যতার মাঝে আমরা সাদৃশ্যভবন সূত্রে খুঁজে পাই যা থেকে বলা যায়, মহাভারতীয় যুগে গোত্রপ্রীতি ও অন্যান্য আচারের প্রাদুর্ভাব পৌত্তলিকতার গললগ্ন হয়ে যখন তুঙ্গে উত্থিত তখনি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটলো যিনি নিরঙ্কুশ একেশ্বরবাদের প্রবক্তা ছিলেন বটে, কিন্তু মহাভারতকারদের দৃষ্টিতে হলেন অবতার বা ঈশ্বরাংশ যিনি সম্ভবামি যুগে যুগে এবং পুতুলের প্রতি যে পূজার্চনা হয় তারও গ্রাহক তিনি বটে! মূলত এ হলো একটি আপোষরফা বৈদিক একেশ্বরবাদের সঙ্গে আর্যামী ও আচরিত পৌত্তলিতার। আর হিব্রুদের হাতে পড়লে যে কৃষ্ণজীবন হতে পারতো একটি টেস্ট্যামেন্ট তাই ভারতীয় আর্যদের হাতে রূপ নিলো বৃহদাকার মহাকাব্যে।

এই মহাভারতীয় যুগেই আর্য উপনিবেশের বিস্তার ঘটলো গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উর্বর অববাহিকাগুলোয় আর লোকবুলির দ্রাবিড় মুত্তারূপের উপরে চেপে বসলো আর্যবুলির শক্ত

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ, ফলে অব্যবহিত পরে রূপ ধারণ করলো যে অখণ্ড মাগধীমণ্ডল সেই থেকে নির্গত হলো আদি মধ্যযুগীয় লিখিত ও অলিখিত বোলচাল আর ভাষিক ও উপভাষিক রূপের মাঝে বর্তমানে গণ্য হতে পারে বাংলা, অহমীয়া, উড়িয়া ও ব্রজবুলি এবং এদের উপভাষিক রূপ সিলটি, চট্টগ্রামী–নোয়াখালী ইত্যাদি।

মহাভারতীয় রূপ অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রবল যে ধর্মবিপ্লবে সমগ্র উপমহাদেশে আলোড়িত হয়েছিলো, তা হলো কপিলাবস্তুর সাধক গৌতমের অহিংস মতবাদ। গৌতমের গুরুত্ব পবিত্র কুরআনের কোন কোন ভাষ্যকারকে এত মুগ্ধ করেছে যে, নবী জুলকিফল ও কপিলাবস্তুর সাধককে অভিন্ন ব্যক্তি বলে মত প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে তাঁদের। কেননা জুলকিফলের নাম ধৈর্যের প্রতীক ইসমাইল (আ)-এর সঙ্গে একত্রে নেওয়া হয়েছে এবং ইহুদীদের নবী তালিকায় জুলকিফল বলে কারও হদিস কিন্তু মেলে না। তাহলে কি তিনি জেন্টাইল বা ইহুদীয় কোন নবী হতে পারেন না যাঁর নামের সাদামাটা অর্থ হলো কপিলাওয়ালা, অর্থাৎ কপিলার (কপিলাবস্তুর) লোক। এই জুলকিফলের অহিংসবাদ কুরআনেও স্বীকৃত। আমরাও লক্ষ্য করি, বৌদ্ধযুগ অতিক্রান্ত হওয়ার শেষ পর্বে, শংকরচার্য–উত্তর নববলে বলীয়ান ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবল চাপের সূচনলগ্নে চুরাশিজন সিদ্ধাচার্যের অভ্যুদয় ঘটলো বাংলা আসাম ও উড়িষ্যায়। এরা যোগী বা নাথপন্থী, গুরু মীননাথ এদের চৈতন্য বা রামমোহন হলেও এরা মূলত বৌদ্ধধর্মের একটি ফের্কা মাত্র। এদের মতবাদ বিচারে প্রবিষ্ট না হয়ে আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি, এ মার্গীয় সাধকদের অধ্যাত্মসঙ্গীতমালাই হলো আমাদের আদি সাহিত্য–নিদর্শন চর্যাচর্যবিনিকায়। এদের যুগ হলো এখন থেকে কমপক্ষে হাজার বছর আগের এবং সগৌরবে বলা যায়, এ সঙ্গীতমালার একমাত্র পূর্বসূরী (ফর্মের দিক থেকে) বৈদিক গায়ত্রীমন্ত্র।

নৃতাত্ত্বিক, ভাষিক ও সভ্যতার দিক থেকে আমরা পরখ করলাম আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির আদি অবস্থানটিকে। নর্ডিক, সেক্সন, স্লাভ বা ল্যাটিন জাতিগোষ্ঠির প্রতিষ্ঠাতা ও সভ্যতা সূচনার কাল আর আমাদের জাতিগত প্রতিষ্ঠার কালটি অভিন্ন। ওরা কেউ ক্লাসিক নয়, আমরাও ক্লাসিক নই। মিশরীক, সুমেরীয়, হিব্রু, ফিনিশীয়, ক্যালদীয়, হিট্রিয়, মোয়েঞ্জোদাড়ীয়, এ্যাসিরীয়, গাঙেয় (অবশ্য নিদর্শন নেই) আর তারপরে গ্রীক, চৈনিক, পারসিক, বৈদিক, সর্বশেষে রোমকদের আমরা ক্লাসিকরূপে গণনা করবো। এই রোমকদের সাম্রাজ্যসূর্য মধ্যগগনে অবস্থানকালেই ঈসা (আ)-এর অভ্যুদয় ও অন্তর্ধান। খ্রীস্টমতবাদের সাধু পলীয় মতাদর্শে সারা পাশ্চাত্যজগত ও মধ্যপ্রাচ্য সার্ধ হাজার বছরে সংস্থিতি লাভ করলো আর মধ্য–এশিয়ায় ইরানী আর্যদের ম্যাজিয়ান ধর্মের প্রতিযোগিতাসুলভ প্রতিরোধে পূর্বদিগন্ত অধিক প্রসারিত হতে না পারায় এ–উপমহাদেশ বহির্দেশীয় ধর্মাদর্শের প্রভাবমুক্ত এলাকারূপেই বিকশিত হতে থাকলো। কিন্তু সংকট বাধলো এখানেই যে, বৌদ্ধ মতবাদ মহাভারতীয় ঐতিহ্যে পৌত্তলিকতার সঙ্গে আপোষরফা করতে গিয়ে মহাযানী ধারায় অবগাহন করা সত্ত্বেও এই বাংলা মুলুকেই শশাঙ্কের মত মহাবৌদ্ধ নিপীড়নকারী নৃপতির অভ্যুদয় ঘটলো এখন থেকে দেড় হাজার

www.pathagar.com

বছর আগে, যিনি বোধি-বৃক্ষ উৎপাটন করে গঙ্গায় নিক্ষেপ করার দুঃসাহস করেছিলেন, দেখা যায়।

বৌদ্ধধর্ম তথা নাথপন্থার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদের সার্ধ হাজার বছরের উচ্ছেদমূলক সংগ্রাম-সংঘর্ষের রূপ চর্যাপদে বিধৃত আছে।

চর্যাপদের যুগ অতিবাহিত হলো আর কৃষ্ণ ও রাধার প্রেমোপাখ্যান প্রধান প্রসঙ্গ হয়ে আদি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যকে অধিকার করলো প্রবলভাবে। কেননা গৌতমের যুগ অবিসত হয়েছে আর কৃষ্ণের যুগের পুনরুত্থান হয়েছে ঐতিহাসিক উচ্ছেদ-প্রক্রিয়া শেষ করে। তবে আসল গৌতম কিংবা আসল কৃষ্ণ নয়, এদের নামে প্রচলিত তৎকালীন ঘন-ঘোর সাম্প্রদায়িকতায় বৌদ্ধমার্গীয় পৌত্তলিকতাকে উচ্ছেদ করলো ব্রাহ্মণ্য পৌত্তলিকতা আর শুরু হলো-কৃষ্ণলীলার একঘেয়ে সংকীর্তন। বাঙালী সংস্কৃত কবি জয়দেব রচনা করলেন গীতগোবিন্দ আর বড়ুচণ্ডীদাস বাংলায় রচনা করলেন নাটগীতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রায় অভিন্ন সময়ে এবং ব্রজবুলিতে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি সূচনা করলেন বৈষ্ণবগীতি কবিতার আর এসময়েই শুরু হলো মুসলিম সূফী-দরবেশদের শুভাগমন এ অঞ্চলে। শুভাগমন শব্দটি আমি পক্ষপাতিত্ব করে প্রয়োগ করছি তা নয়, বরং সেন রাজাদের একজন সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র হযরত জালালুদ্দীন তাব্রিজীর আগমন উপলক্ষে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; নাম 'শেক শুভোদয়া'; অবশ্য এ তথ্যটি বিতর্কের উর্ধ্বে নয়।

যেভাবেই হোক, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পর্যায়গুলো পরিণতি লাভ করার পর এদেশে প্রবেশ করলো ইসলাম। একান্ত আঞ্চলিকতার দৃষ্টিতে তিনটি ধর্মই বিদেশাগত। ইসলাম পূর্ব দু'টির তুলনায় কিছুটা দূরদেশী ও দূরভাষী! ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে খাস বাঙাল মুলুক থেকেও তিনটি ধর্ম তিন যুগে বহির্বাঙলায় প্রচারিত হয়েছিলো, এই তিনটি ধর্মের তিনজন প্রবর্তক হলেন গুরু মীননাথ, শ্রীচৈতন্য ও রামমোহন। আমরা এগুলোকে ধর্ম না বলে ধর্মান্দোলন বলতে পারি। বাঙলাদেশীয়দের মেধার উৎকর্ষ বিচার করতে গিয়ে বেশী শ্লাঘা প্রকাশের অবকাশ আমাদের নেই। কেননা, ইসলামের বাণীবাহক যে মহাসাধকবৃন্দ এদেশে পদার্পণ করেছিলেন, তাঁরা চাইলে সেন্টপল বা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর চেয়ে অনেক বেশী অনুসারী জোগাড় করে ধর্মান্দোলনকারীরূপে আসন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন, তা তাঁরা করেননি। কারণ সিদ্ধির কষ্ঠিপাথরে তাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ইবনে বতুতার সাক্ষ্য থেকেই জানা যায়, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম প্রচারের নেটওয়ার্ক বাংলা মুলুক থেকে পরিচালিত হচ্ছিলো—হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর নেতৃত্বে। শশাঙ্কের মতই অত্যাচারী রাজা ছিলেন কামরূপ রাজ্যের একাংশের অধীশ্বর রাজা গৌরগোবিন্দ। তাকে সশস্ত্র সংগ্রামে পরাজিত করলেন মুসলমানেরা হযরত শাহজালালের নেতৃত্বে ১৩০৩ সালে সিলেট বিজিত হয় বখতিয়ার খিলজীর হাতে নদীয়ার পতনের একশ' বছর পর। এই শত বছর গিয়েছে চরম উৎকণ্ঠা ও দ্রুত পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। তারপর অবস্থাটা এই দাঁড়িয়েছে যে, ধীরে ধীরে ইসলামী সভ্যতা বাংলাসাম ও আরাকানব্যাপী সমগ্র ভূমণ্ডলে একক অনুকরণীয় চর্যারূপে বিকশিত হয়েছে; যে জন্য

www.pathagar.com

আমরা দেখি, বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের হাতে পরিচালিত হচ্ছে আরাকান ত্রিপুরা ও চাকমা রাজ্য এবং আংশিকভাবে বিহার, কুচবিহার, জৈন্তাপুর ও কাছাড় রাজ্য। রাজকীয় পোশাক ও দরবারি আদব-কায়দা সকলই ইসলামী এবং কোনো বিজাতীয় রাজাদের একটি করে মুসলমানী নামও আছে দেখা গেল। এ দিকে মূল ভূভাগে হিন্দু চিত্তবৃত্তির বিকাশকে উৎসাহিত করছেন মুসলমান সুলতানেরা, যাদের কারো কারো নাম খলিফাতুল মুসলিমীনের নামের সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে জুমার খুৎবায়; কারণ ইতোমধ্যে বাংলা পরিগণিত হয়েছে অখণ্ড মুসলিম জাহানের প্রাচ্যসীমান্তে, যে জন্য বাংলাধিপতিকে বলা হচ্ছে মালিকুশ-শার্ক।

বাংলা সাহিত্যের অন্ত্যমধ্যযুগীয় এই কালটি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সভ্যতার প্রভাবকে ধারণ করে দু'টি পৃথক সাহিত্যের সরেজমিন নির্মাণ করে। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যপাদে একটি আচানক কাণ্ড ঘটে গেল। ভাব, ভাষা ও রূপের দিক থেকে হঠাৎ করে অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে বসলো এ রকম সম্পর্কচ্যুতিকে যদি বিচ্ছিন্নতা বলা যায় তবে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, আর যদি বলা যায় বিপ্লব তবে সে বিলক্ষণ বিপ্লবী হয়ে উঠলো। উনিশ শতকের অন্ত্যপর্বের লেখালেখির সঙ্গে কোন মিল নেই আঠার শতকের অন্ত্যপর্বের। ক্লাসিক নয় এমন অন্যান্য অর্বাচীন জাতিগোষ্ঠীর জীবনে এমনটি ঘটেনি। এখন সাহিত্য স্রষ্টা যারা তারা কেউই ইংরেজীতে অদক্ষ এমন দেখা গেল না। বরং কেউ কেউ বেশ কয়টি ইউরোপীয় ভাষায় সুপণ্ডিত। মাত্র পঞ্চাশ বছরের কোশেশে কোম্পানি সরকার এমন একটি বুদ্ধিজীবি মহল কোলকাতা শহরের বুকে বিচরণক্ষম করে তুললেন যাঁরা বলেন ইংরেজীতে, চলেন ইংরেজীতে, এমনকি স্বপ্নও দেখেন ইংরেজীতে। মজার ব্যাপার, এদের অত্যুৎসাহী তরুণেরা পণ্ডিতের টিকি কেটে দিচ্ছে, ব্রাহ্মণের উঠানে ছুঁড়ে ফেলছে যবনযুক্ত গরুর হাড়গোড়। শরীরে দ্রাবিড়ের রক্ত কিন্তু নীল নয়নার সঙ্গে ঘর বাঁধার সাথে পচা পৈত্রিক ধর্মটাকে বিসর্জন দিয়ে হ্যাট কোট পরে সাহেবও বনে যাচ্ছে কেউ কেউ। আর ইংরেজী ভাষায় 'স্নব' শব্দটি বাংলা তর্জমা হয়নি কিন্তু, যেমন বাংলা 'অভিমান' শব্দের ইংরেজী তর্জমা দুরূহ। কিন্তু এই একদল স্নবের হাতেই একটি পরাজিত জাতির মূঢ়, মূক, ম্লান মুখে ভাষা তুলে দেওয়ার দায়িত্ব অর্পিত হলো এবং বুক ঠুকে তুলে নিলো ওরা এ দায়িত্ব। বলা চলে, যেন ছিনতাই করেই নিয়ে গেল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আবহমানতাকে। আর বিভিন্ন বিদ্যাপিঠ ও নতুন বড়লোকদের অভিনব আনুকূল্য সাব্যস্ত করে দিলো যে এরই নাম হবে আধুনিক বাংলা সাহিত্য। হ্যাঁ, আধুনিক তো বটেই, গীতিকবিতা এখন আর ভক্তিমূলক নয় বরং ব্যক্তিগত, পালাগান ও মঙ্গলকাব্য আর নয়, বরং এখন হবে মহাকাব্য ও কাহিনীকাব্য; এবং কথা-সাহিত্য তথা গল্প-নকশা-উপন্যাস। মোট কথা, ইউরোপ তথা ইংরেজী সাহিত্যের যে -যে আঙ্গিকাবলী তার হুবহু অনুশীলন। বলতে কি মুক্তকচ্ছ অনুকরণই শুরু হলো মৌলিক সৃজনশীলতার নামে। কেবল স্থান-কাল-পাত্রভেদ এবং পাঠককুলের ভিন্নতা এবং সে ভিন্নতা এমনি যে, একই ভাষাভাষী অভিন্ন বেশ-অর্ধেক জনগণ বুঝতেই পারলো না কী হতে যাচ্ছে, কোন বিষবৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে তাদের নাকের ডগায়।

www.pathagar.com

আর শতেক বছর স্বাধীন থাকতে পারলে হয়তো উর্দু ও হিন্দির মত দুটি পৃথক ভাষাই হয়ে উঠতো এই দেশে এবং হিন্দুয়ানি বাংলা গ্রহণ করতো দেবনাগরী লিপি আর কেবল মুসলমানের জবানের বাহনই থাকতো বর্তমান বাংলা লিপিমালা। তাহলে অবশ্য দুঃখের কিছু থাকতো না, হিন্দু সাহিত্যস্রষ্টারা তাদের নিজস্ব ভাষায় কষে যবন-উদ্ধার করলেও তাদের অন্তঃপুরের গালিগালাজের জন্য কেউ কিছু বলতে যেতো না। কিন্তু একই ভাষা, অভিন্ন ও যৌথ সম্পত্তি এটি, অথচ বড় মিঞার হকের কথা ভুলে গিয়ে তাকে উল্টা চড়-চাপড় লাগাতে থাকলে কে স্থির থাকতে পারে! ফলে প্রতিবাদী সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে মুসলমানকে এগিয়ে আসতে হয়েছে, তাও অনুকারকেরও অনুকরণ করে করে—কিন্তু তলোয়ার বাগিয়ে বাগিয়ে। এই ঐতিহাসিক পটভূমি যেমন এ-যুগে অতিবাস্তব সত্য, মধ্যযুগেও ছিলো একই অবস্থায় স্থিত। তখন তলোয়ার বাগিয়ে বাগিয়ে এগিয়ে এসেছে হিন্দুরা, সাহিত্য-জগতের চাপের মোকাবেলায় নয়, ভূখণ্ডগত ও জাতিগত অধিকার রক্ষার ভাবাবেগ নিয়ে তারা তখন বোধ করেছে নিজেদের খুব বিপন্ন। এ অবস্থা এই শতকের মধ্যদশক পর্যন্ত বিদ্যমান থাকার পর ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা-উত্তরকালে একই ভাষাভুক্ত দুটি পৃথক সাহিত্য-জগৎ আজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান বাস্তবরূপে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাতচল্লিশ-উত্তর আমাদের পৃথক জমিনে কোলকাতা থেকে হিজরত করে আসা নবীন-প্রবীণ সাহিত্য-কর্মীদের হাতে শুরু হয় আমাদের নতুন সাহিত্য যাত্রা। মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তকোটির সাহিত্যকর্মীই বেশীর ভাগ। নতুন দেশ নতুন উপকরণ নতুন প্রচারমাধ্যম ইত্যাদির সদ্ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন সাংস্কৃতিক দক্ষ জনশক্তি। আমাদের প্রধান সাহিত্যরথীদের অনেকেই তখন নবীন বয়সী। পরিণতি ও দক্ষতা অর্জনের জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তা অতিক্রম করার আগেই শাসক শ্রেণীর সঙ্গে ক্ষুদ্র বুদ্ধিজীবী সমাজের তীব্র মতবিরোধ ঘটলো ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে। উভয়ের মাঝে এই মতবিরোধজনিত কারণে রাষ্ট্রীয় সংহতি বিপন্ন হলো এবং রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলনের পথ মাড়িয়ে পঁচিশ বছর পর সশস্ত্র সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বাংলাদেশ। এখন এই পটভূমিতে আসুন, আমরা আমাদের সমকালীন ও আধুনিক সাহিত্যের গতিধারার সঙ্গে পরিচিতি লাভের চেষ্টা করি।

উনিশ শতকের শেষ দশকগুলোতেই বাঙালী মুসলমান শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতায় কোলকাতাকেন্দ্রিক নিউক্লিয়াস সংগঠন করেন এবং মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারের জন্য সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সূচনা করেন। ইসলামের ইতিহাস ও নবীজীবনভিত্তিক সন্দর্ভগ্রন্থ, চিত্তাকর্ষক হাম্দ-নাত সংকলন, কারবালা কাহিনীভিত্তিক ঐতিহাসিক উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস ও ছোটগল্প, ইসলামী ঐতিহ্যবাহী মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য, নাটক ও গীতি-কবিতা এবং এই সঙ্গে পবিত্র কুরআন মজিদসহ ইসলামী ক্লাসিক্সের বিপুল তর্জমাসম্ভার প্রকাশিত হয়ে সর্বস্তরে পঠিত হতে থাকলো। বলিষ্ঠপদক্ষেপে শিক্ষা ও সাংবাদিকতায়ও এগিয়ে আসলেন বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত।

www.pathagar.com

পাশাপাশি বাঙলা ও আসাম প্রদেশের রাজনীতিতে সাহস ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান এবং প্রতিভাদীপ্ত নেতৃত্ব মুসলিম জাতিসত্তার বিকাশকে ত্বরান্বিত করে তোলেন। স্বাধীনতাপূর্ব এই সময়লগ্নটিতে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে যাঁরা স্মরণীয় অবদান রেখেছেন তাঁদের নাম আমরা জানি, তবু একান্ত শ্রদ্ধাভরে যাদের কথা উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন– কায়কোবাদ, মীর মোশাররফ হোসেন, মুনশী মেহেরুল্লাহ, মোহাম্মদ নজীবর রহমান সাহিত্যরত্ন, কাজী ইমদাদুল হক, মোজাম্মেল হক, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, শেখ আবদুর রহিম, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ এনামুল হক, গোলাম মোস্তফা, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ এমদাদ আলী, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, জসীমউদ্‌দীন প্রমুখ সাহিত্যব্রতী, সংস্কারক, গবেষক ও সাংবাদিক। এদের উজ্জ্বল কর্মসাধনা মুসলিম বাঙলার রেনেসাঁ ও বিকাশের সম্ভাবনাকে সুচিহ্নিত করেছে কোলকাতাকেন্দ্রিক পর্যায়ে এবং এঁদের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার ঢাকাকেন্দ্রিক নবীন সাহিত্যযাত্রায় মূলধনরূপে যে বিনিয়োজিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সরদার জয়েনউদ্দীনের উপন্যাস 'অনেক সূর্যের আশা'য় কোলকাতা থেকে ঢাকায় আসার একটি প্রতীকী যাত্রার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, যেখানে শত মৃত্যু শত ধ্বংসের মাঝে নতুন জীবন রচনার আশাবাদের কথা আছে এবং যাত্রাপথের মাঝে একজন কবিকে দেখা যাচ্ছে কাফেলাটিকে উদ্বুদ্ধ করছেন, সাহস যোগাচ্ছেন হৃদয়ে হৃদয়ে। এই কবিকে অনায়াসে শনাক্ত করা যায় ফররুখ আহমদের ব্যক্তিস্বরূপে। ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, তালিম হোসেন প্রমুখ চল্লিশ দশকের আশাবাদী কবিদের প্রত্যেকেই নতুনকে তেজিয়ানভাবে গ্রহণ করার ব্রতে ছিলেন উদ্দীপ্ত ও প্রত্যয়ী। শতকত ওসমান, আবু ইসহাক, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, সরদার জয়েনউদ্দীন প্রমুখ কথা–শিল্পী গভীর বিশ্লেষণে জীবননিষ্ঠ গল্প উপন্যাস রচনার ধারা সৃষ্টি করলেন। আর স্বজাতিকে আবিষ্কারের যে গবেষণার ধারাটি সূচিত হয়েছিলো আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের হাতে, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সেটি আরও ব্যাপক পঠন–পাঠনের ধারায় বহু নবীন গবেষকদের নিয়োজিত করলো সেই ক্ষেত্রটিতে। অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ও অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই মুসলিম সাহিত্য–ধারার ইতিহাস প্রণয়ন করলেন পরবর্তীকালে এবং সুচিন্তিত গবেষণাকর্ম বিকাশলাভ করতে লাগলো ধীর গতিতে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী অখণ্ড দশকটি হলো পঞ্চাশের দশক। এই দশকটির কাঁধে প্রথমে যে উৎসাহ ভর করেছিলো, পরবর্তী সময়ে তাতে সূচিত হলো ভাটা। যদিও ইতোমধ্যে সৃজনশীলতার ধারা বিকাশ লাভ করছে এবং শক্তিমান কথাশিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ করছেন শাহেদ আলী, শামসুদ্দীন আবুল কালাম ও সানাউল্লাহ নূরী, শক্তিমান নাট্যকার হিসেবে আসকার ইবনে শাইখ ও মুনীর চৌধুরী, দার্শনিক–সন্দর্ভকার হিসাবে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। তবু একটি ভাঙন দেখা দিলো চিন্তার ঐক্যসূত্রে। ভাষা

www.pathagar.com

আন্দোলনের অব্যবহিত পরে অতীত মুসলিম জাতীয়তাবাদী উত্থান-চেতনা এখন আর সুরময় বলে মনে হচ্ছে না, বরং কিছুটা বেসুরো মনে হতে লাগলো। গণমুখীনতার নামে মাথা উঁচু করলো বামপন্থী সাহিত্য-চেতনা, ফলে স্বাভাবিকভাবে এর বিপরীতে আরেকটি মার্গ একান্ত নন্দনতাত্ত্বিক রূপে ইউরো-আমেরিকার চিত্তবৃত্তির প্রতিফলনকারী হয়ে দাঁড়ালো। আর সর্বশেষ থাকলো, ছিলো যা সর্বপ্রথম অর্থাৎ মুসলিম রিভাইভ্যালিজম ও ইসলামী রেনেসাঁ-চিন্তা। কথা-সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহকে চিহ্ন দেওয়া হলো পশ্চিমা নন্দনতাত্ত্বিকতার প্রতিভূরূপে আর কবিতায় সৈয়দ আলী আহসানকে। শওকত ওসমানসহ বাকী প্রায় সকল গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হলেন গণমুখী। শাহেদ আলী 'জিবরাইলের ডানা'য় ইসলামী ঐতিহ্য ও গণমুখীনতার সমন্বয় সাধন করে বেশ বিখ্যাত হয়ে রইলেন, কিন্তু পরে এজন্যে তাঁকে বিপদ বরণ করতে হয়েছিলো। বিভেদে প্রকট পঞ্চাশ দশকে এভাবে যে তিনটি ধারা প্রকাশ পেল। ষাটের দশকে তা আরও স্পষ্ট হলো এবং তীক্ষ্ম সূচীমুখ ধারণ করলো। সত্তর ও আশির দশকে এর অনুবর্তন অব্যাহতভাবে চলছে।

সাহিত্যচর্চা এখন প্রধানত দৈনিক পত্রিকাগুলোর সাহিত্যপাতা-নির্ভর এবং সাপ্তাহিক বিনোদনমুখী পত্রিকাকেন্দ্রিক। প্রতিটি পত্র-পত্রিকা দারুণভাবে মতবাদী। স্বজাতিবাৎসল্য এখন প্রায় শূন্যের কোঠায় এবং বিশেষ করে এক-দু'টি পত্র-পত্রিকা তো বিদেশী পরাশক্তির এজেন্সি খুলে বসেছে। সাহিত্যচর্চার নির্মলতা উধাও হওয়ার প্রেক্ষিতেও সুখের কথা হলো এই যে, আমাদের আধুনিক সাহিত্য-ধারার যে আদি প্রেরণা অর্থাৎ স্বজাতিবাৎসল্য ও ইসলামী রেনেসাঁ—সাম্প্রতিককালে এর প্রবৃদ্ধি ঘটছে। বহু তরুণ ছুটে এসেছেন এ ধারার পাল্লা ভারি করতে এবং এরা নিবেদিত প্রাণ ও প্রতিভাবান। এঁদের সৃষ্টির ফসলে আগামী দিনগুলোয় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুর্গতির ধারাটি ঘুচবে। আরও সুখের কথা, ফররুখ আহমদের বন্ধু ও স্বপ্নের সাথী প্রবীণ কবি সৈয়দ আলী আহসান, খণ্ডিত পঞ্চাশ দশকের অখণ্ড প্রতিভা কবি আল মাহমুদ, কথাশিল্পী শাহেদ আলী ও সানাউল্লাহ্ নূরী, নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ, কবি ও সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, কবি ও সমালোচক সৈয়দ আলী আশরাফ, কবি ও গীতিকার দিলওয়ার, কবি আবদুস সাত্তার, কবি জামালউদ্দীন মোল্লা, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, কবি আশরাফ সিদ্দিকী, কবি ওমর আলী, কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ যুগসচেতন সাহিত্য ও কাব্যস্রষ্টাগণ অন্তত এ বিষয়টি অনুধানে করেছেন যে, স্বজাতিবাৎসল্যের আদি-অকৃত্রিম ধারাটিকে পোষকতা দিতে হবে এবং বিশ্বদর্শন হিসেবে ইসলাম একটি আচরণীয় সুসংবাদ। এঁদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে নবীনের দল আমাদের চোখ জুড়ানো সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তাঁদের কারো কারো নাম নিয়ে আমার এ নিবন্ধের যতি টানবো। এঁরা হচ্ছেন ঃ রুহুল আমীন খান, হাসান আবদুল কাইয়ূম, জহুর উশ শহীদ, জামেদ আলী, সাজজাদ হোসাইন খান, লুবনা জাহান, আবদুল মুকীত চৌধুরী, রাগিব হোসেন চৌধুরী, খন্দকার হাসনাত করিম, আতা সরকার, শাহাদাত বুলবুল, মসউদ-উশ-শহীদ, মাহবুব বারী, মুশাররাফ করিম, মতিউর রহমান মল্লিক, মমতাজ শহীদ, মকবুলা পারভীন, বুলবুল ইসলাম, আবদুল হাই শিকদার, হোসেন মাহমুদ, মাখরাজ

www.pathagar.com

খান, নিজামউদ্দিন সালেহ, সোলায়মান আহসান, সৈয়দ মূসা রেজা, আসাদ বিন হাফিজ, মুকুল চৌধুরী, হাসান আলীম, কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার, তমিজউদ্দীন লোদী, মুহম্মদ রবীউল আলম, খাদেম হাফিজ, আহমদ আখতার, বুলবুল সরওয়ার, কামাল মাহবুব, মোশাররফ হোসেন খান, নাসরিন চৌধুরী, মুজতাহিদ ফারুকী, ফারুক হোসেন, খসরু পারভেজ, আশরাফ আল দীন, সালাহউদ্দীন নিযামী প্রমুখ।

এখন কিছু বয়স্কজনের নামও আমরা শ্রদ্ধার সংগে উল্লেখ করতে চাই, যাঁরা এই ধারাকে প্রাণান্ত প্রয়াসে গতিশীল করে রেখেছেন এবং যাঁদের কর্মকাণ্ড উল্লেখিতদের পথনির্দেশ দিচ্ছে ঃ ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, মুহম্মদ আবু তালিব, অধ্যাপক আবদুল গফুর, আবু ফাতেম মোহাম্মদ ইসহাক, দেওয়ান আবদুল হামিদ, সৈয়দ আবদুস্ সুলতান, এস্ মুজিবউল্লাহ, মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ, ডঃ আবদুল মান্নান, ডঃ গোলাম সাকলায়েন, ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, জাহানারা আরজু, ওসমান গণি, মুহিউদ্দীন খান, আবদুল হক চৌধুরী, আখ্তার-উল-আলম, ফজল শাহাবুদ্দীন, ফারুক মাহমুদ, ডক্টর মাহমুদ শাহ কোরাইশী, এম আর আখতার মুকুল, ইমরান নূর, হায়াৎ সাইফ, শাহাবুদ্দীন আহমদ, নূরুল আলম রইসী, আল মুজাহিদী, আফতাব-উদ্-দীন, ডক্টর খোন্দকার রিয়াজুল হক, আবুল আসাদ, ডক্টর আহমদ আনিসুর রহমান, শেখ দরবার আলম, অধ্যাপক আসদ্দর আলী, নূর আহমদ সিদ্দীক, হাস্নাইন ইমতিয়াজ, সৈয়দ মোস্তফা কামাল প্রমুখ।

সম্পন্ন আগামীদিনের স্বপ্ন আমরা দেখছি। এ–স্বপ্ন আশা করি ব্যর্থ হবে না, আর ব্যর্থ যদি হয়ও তবু—

স্বপন যদি মধুর এমন হোক সে মিছে কল্পনা
আমায় জাগিও না জাগিও না।

www.pathagar.com

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশে মুসলমানদের অবদান

আবদুল মান্নান সৈয়দ

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ১৯৪৩, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। শিক্ষাঃ এম, এ, (বাংলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পেশা ঃ অধ্যাপনা। সরকারী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে, ঢাকা।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কবিতা ঃ জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৭), জ্যোৎস্নারৌদ্রের চিকিৎসা (১৯৬১), ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ (১৯৭৪), নির্বাচিত কবিতা (১৯৭৫), কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (১৯৮২), পরাবাস্তব কবিতা (১৯৮২), পার্কস্ট্রিটে এক রাত্রি (১৯৮৩), মাছ সিরিজ (১৯৮৩), সকল প্রশংসা তাঁর (১৯৯৩)। কবিতা ছাড়াও তিনি গবেষণা, সম্পাদনা, সমালোচনাসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা শতস্পর্শী। পুরস্কার ঃ বাংলা একাডেমী পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার; ফররুখ স্মৃতি পুরস্কাসহ অনেক পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হয়েছেন।

লেখা-পরিচিতি ঃ 'অগ্রপথিক', ১৯৯০ সালের ১ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত। পরে 'অগ্রপথিক ঃ ভাষা আন্দোলন সংকলনে' (১৯৯৩) অন্তর্ভুক্ত।

"আমি মনে করি, বিশ্ব-কাব্যলক্ষ্মীর একটা মুসলমানী ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। ...বাঙলা কাব্য-লক্ষ্মীকে দুটো ইরানী 'জেওর' পরালে তাঁর জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও খুবসুরতই দেখায়। আজকের কলা-লক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অংলকারই ত মুসলমানী ঢং-এর। বাইরের এ-ফর্মের প্রয়োজন ও সৌকুমার্য সকল শিল্পীই স্বীকার করেন।"

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ ॥ কাজী নজরুল ইসলাম ॥
'আত্মশক্তি' ॥ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২৭

হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারার মাত্র এই সে-দিন, বছর ষাট আগে, ১৯২৭ সালে, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) কণ্ঠেই প্রথমবার বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হলো 'মুসলমানী ঢং'-এর আবশ্যিকতার কথা। মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায় (১৭০৫ ?-৬০) অবশ্য বহু পূর্বেই উচ্চারণ করেছিলন "না রবে প্রাসাদগুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।" এবং মধ্যযুগেও বাংলা সাহিত্য থেকেই নজরুল-কথিত 'মুসলমানী ঢং'-এর সুপ্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙালি-মুসলমানের আধুনিকতায় প্রবেশের কিছু কাল পরে মাত্র ওরকম দীপ্ত উচ্চারণ সম্ভব হলো। আর তাও নজরুলের মতো দুঃসাহসী, নজরুলের মতো হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামিতার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তার মুখে।

এখানে একবার বাংলা সাহিত্যের সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতের কথা মনে করা যেতে পারে। সমগ্র বাংলা সাহিত্যকে সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা তিনটি অংশে ভাগ করেছেন ঃ প্রাচীন

www.pathagar.com

যুগ–যা মোটামুটি সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত, মধ্যযুগ-ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, এবং আধুনিক যুগ-উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের ভূমিকা ছিলো না, হিন্দুদেরও ছিলো না, তা বৌদ্ধদের দ্বারা সৃষ্ট : চর্যাপদ। মধ্যযুগে বাঙালি-মুসলমান রোমান্স-কাব্যের মধ্য দিয়ে মানবিকতার উদ্বোধন করেন। সে-যে দেব-দেবী-অধ্যুষিত বাংলা সাহিত্যে মানবিকতার বন্দনা শুরু হলো, বাঙালি-মুসলমান আজো সেই মানবিকতারই জয়গান গেয়ে চলেছে। বাংলা সাহিত্যে বাঙালি-মুসলমানদের যদি শ্রেষ্ঠ অবদান এক কথায় চিহ্নিত করতে হয়, তাহলে এই 'মানবিকতা' শব্দেই তাকে সনাক্ত করতে হবে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাঙালি-মুসলমানদের অবদান নির্ধারণ। তার বিশদ বিশ্লেষণের জায়গা এটা নয়, আমি সংক্ষেপে কয়েকটি রেখায় তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করবো।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে আমরা দু'টি অংশে ভাগ করতে চাই :

একটি উনিবংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে আজাদী লাভের আগে পর্যন্ত (১৮০০-১৯৪৭)। অন্যটি আজাদী লাভের পরবর্তীকাল থেকে আজ পর্যন্ত (১৯৪৭-৯০)। প্রথম পর্যায় আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংগঠনের যুগ। দ্বিতীয়টি বিস্তারের যুগ। প্রথম পর্যায়ের সাহিত্যের কেন্দ্রীয় রাজধানী ছিলো কলকাতা; দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ হচ্ছে ঢাকায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে কলকাতাতেও যৎসামান্য কাজ হয়েছে।

১৯৪৭-এর আগে কলকাতা ছিলো বাংলা সাহিত্যের রাজধানী। '৪৭-এর আজাদীর পর সাহিত্যের আরেকটি রাজধানী হয়ে ওঠে ঢাকা। আরেকটি কিন্তু দ্বিতীয় নয়, অপ্রতিম, অতুলনীয়। এই শতাব্দীর বিশের দশকে, কিংবা আরো কোনো খণ্ডকালে হয়তো, ঢাকার সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক উজ্জ্বলতা জাজ্বল্য হয়ে উঠেছে। '৪৭-এর পরই এই শহর হয়ে ওঠে সাহিত্যের এক নতুন ও স্থায়ী কেন্দ্রকোরক-জায়মান সৃজনশীলতা ও মননশীলতাকে সে ধরে রাখতে থাকে তার আগ্রহ সেই কেন্দ্রে। এখন ইতোমধ্যেই মাত্র এই কয়েক দশকে (১৯৪৭-৯০) ঢাকাকেন্দ্রিক যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তা হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের অনবশ্যিক অংশ। ঢাকা থেকে সম্পূর্ণ নতুন এক সাহিত্যধারা প্রবাহিত হচ্ছে আজ। আবার সম্পূর্ণ নতুন ব'লে কোনো কিছু নেই সাহিত্যে, বীজ বা অন্তর্গত ফল্গুধারা ভিতরে ভিতরে তার রয়েই যায় কোথাও। ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যের আজকের যে প্রবাহ তার অন্তর্গত ফল্গুধারা তলে তলে বহমান ছিলো, শীর্ণভাবে কিন্তু তীব্রভাবে, কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্য-ধারায়।

উনিশ শতাব্দীর সূচনা মুহূর্ত থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মূল ভূমি হয়ে ওঠে কলকাতা। লিখিত কবিতা, লিখিত গদ্য, লিখিত নাটক বাংলা সাহিত্যে ক্রমাগতভাবে আধুনিকতায় দীক্ষিত হতে থাকে। সবাই জানেন, বাঙালি মুসলমান তাতে যোগ দেয় অনেক পরে শতাব্দীর অর্ধেক অতিক্রান্ত হওয়ার পর। তাও বিচ্ছিন্নভাবে ছেঁড়াছেঁড়াভাবে, যতো না সাহিত্যিক তার চয়ে বেশী সামাজিক ও ধার্মিক সংগ্রামে। প্রকৃত পক্ষে বিংশ

www.pathagar.com

শতাব্দীর শুরু থেকেই বাঙালি মুসলমান ব্যাপকভাবে সাহিত্যে যুক্ত হয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি মুসলমানের সেই প্রথম জাগরণের সময় সামাজিক রাজনৈতিক ভাবনা বেদনাই ছিলো তার মূখ্য আলোচ্য। তার আসন্ন পথ ও গন্তব্য জেনে নিতেই সে ছিলো ব্যাকুলভাবে সন্ধানী।

সেদিন কলকাতাই ছিলো কেন্দ্রভূমি। সমস্ত দেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ ছিলো অখণ্ডিত। একই কলকাতায় সাহিত্য চর্চা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণুদে, বুদ্ধদেব বসু, তারাশংকর, মানিক, বিভূতিভূষণ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ, সমরেশ বসু প্রমুখ এবং আবদুর রহীম, মোজাম্মেল হক, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন শিরাজী, বেগম রোকেয়া, কাজী ইমদাদুল হক, এয়াকুব আলী চৌধুরী, ডাক্তার লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্‌দীন, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবু রুশদ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ আবুল হোসেন প্রমুখ। ভাবতে অবাক লাগে, একই কলকাতায় বসে এঁরা একই বাংলা ভাষায় দুই স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা প্রবাহিত করেন। 'সুধাকর,' 'সওগাত,' 'মোহাম্মদী.' মুসলিম-সম্পাদিত প্রায় সব প্রধান পত্রিকা কলকাতা থেকেই বেরিয়েছিল। মুসলিম-সম্পাদিত পত্রিকাসমূহে-রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল, ভূজংগধর রায় চৌধুরী, অন্নদাশংকর রায় মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হয়েছেন। যেমন নজরুল, জসীম উদ্‌দীন প্রমুখ হিন্দু সম্পাদিত পত্রিকাসমূহে। কিন্তু মোটামুটিভাবে হিন্দু-সম্পাদিত পত্রিকাগুচ্ছে হিন্দু আদর্শ এবং মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকাসমূহে মুসলিম আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। অন্য মুসলিম লেখকদের প্রসংগ দূরে থাক, হিন্দু-মুসলমান মিলনের শ্রেষ্ঠ অগ্রদূত নজরুল ইসলামও আশ্চর্য-প্রধানত প্রকাশিত হয়েছেন মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকা নিচয়েই। মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকা নিচয়ের ছিলো তিনটি বিশিষ্টতাঃ এক. মুসলিম ইতিহাস--ঐতিহ্যের প্রচার প্রসার; দুই. বাঙালি মুসলমানের ভাষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও জবাব এবং তিন. হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামিতা। হিন্দু-সম্পাদিত পত্রিকাসমূহে নয়, আশ্চর্য, মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকাসমূহেই হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হতো। মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত 'হিতকরী' ছিলো হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামী। এস. কে. এম. মুহাম্মদ রওশন আলী সম্পাদিত 'কোহিনূর' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিলো ঃ 'হিন্দু-মুসলমানে' সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবাকল্পে এবং কলিকাতার অনাথ আশ্রমের সাহায্যার্থে 'কোহিনূর' প্রচারে ব্রতী হইয়াছি। সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত 'নবনূরের' সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃতি, ভারত বর্ষের অদৃষ্ট ফলকে হিন্দু-মুসলমানের সুখ দুঃখ এখন একই বর্ণে চিহ্নিতঃ বিজয়দৃপ্ত মুসলমান এখন হিন্দুর ন্যায়ই বিজিত। এই দুই মহাজাতির সম্মিলনের উপরেই ভারতের শুভাশুভ নির্ভর করে।"

www.pathagar.com

'সাহিত্যেই এই মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র।' এই মিলনকামিতাও ছিলো মুসলিম দৃষ্টি ও আকর্ষণ থেকে। এই মিলনকামিতা উভয় পক্ষের সদিচ্ছা সত্ত্বেও যে বাস্তবভাবে ফলপ্রসূ হচ্ছিলো না, তার সাক্ষ্য দেবে মুসলমান-সম্পাদিত কাগজে মুসলমান লেখকের উপস্থিতি, হিন্দু-সম্পাদিত কাগজে হিন্দু লেখকের উপস্থিতি। 'সবুজ পত্রে' এস. ওয়াজেদ আলী লিখেছিলেন বটে, 'কল্লোল' পত্রিকায় নজরুল, জসীম উদ্‌দীন, আবদুল কাদির ছিলেন বটে, 'সওগাত' রবীন্দ্রনাথ বা 'বুলবুলে' রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী-শরৎচন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছেন- কিন্তু তবু পত্রিকাগুলি ছিলো স্ব-স্ব সমাজের প্রতিনিধি। (একমাত্র 'কল্লোলে'র সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক এই নিরিখে বিচার্য নয়, নজরুল ছিলেন ঐ পত্রিকার অন্যতম নায়ক।) হিন্দু-মুসলমান পরস্পর মিলনকামিতা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুই ভাবনা-বেদনায় প্রবাহিত ছিলো, সামান্য ব্যতিক্রম বাদে এদের মধ্যে যথার্থ-অর্থে ছিলো না, চিন্তার বিনিময়ও। রবীন্দ্রনাথ ও মুন্সী মেহেরুল্লাহ একই বছরে জন্মেছিলেন (১৮৬১), কিন্তু সার্বভৌম কবি 'রবীন্দ্রনাথের বহুধা কর্মের মধ্যে তিনি ছিলেন একদা ব্রাহ্মণ সমাজের সেক্রেটারী', আর 'মুসলিম বাংলার রামমেহান' (মুহাম্মদ আবদুল হাই) মুন্সী মেহেরুল্লাহর ধ্যান-জ্ঞান ছিলো ইসলাম প্রচার। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৭) ও 'আনোয়ারা' উপন্যাসের প্রণেতা নজিবর রহমান (১৮৭৮-১৯২৩) ছিলেন সমসাময়িক-প্রথমোক্তের চারণক্ষেত্র ছিল হিন্দু সমাজ, দ্বিতীয়োক্তের মুসলিম সমাজ। সৃজন ও মননের দুই ক্ষেত্রেই হিন্দু মুসলমানের ছিলো স্বভাবী বিভিন্নতা। একই কলকাতার কেন্দ্রে থেকেও তারা ছিলেন দু'টি বিভিন্ন ধারার স্নাতক।

দু'টি দৃষ্টান্ত দেবো

১৯২৬ খৃস্টাব্দে ঢাকায় উত্থিত 'শিখা' গোষ্ঠীর কথা ধরা যাক। এঁরা 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন করেছিলেন। তার মধ্যে দ্রোহ ছিলো। কিন্তু বিপ্লব ছিলো না। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নামই ছিলো 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। তাঁরা ইসলাম ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন বুদ্ধি ও প্রযুক্তির উপরে। তাঁদের প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবেদনে ছিলো এই পরিষ্কার বক্তব্য ঃ 'শিখার প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্তন-সাধনা।' শিখা-গোষ্ঠীর কেন্দ্রনায়ক কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৬-১৯৭০) হযরত মুহম্মদ (সা)-এর জীবন রচনা ও কুরআন শরীফের অনুবাদ করেছেন। শিখা-গোষ্ঠীর তাবৎ কর্মকাণ্ডই মুসলিম সমাজ-কেন্দ্রিক।

দ্বিতীয়ঃ নজরুল ইসলাম। সত্য, উনবিংশ শতাব্দীতে মীর মশাররফ হোসেনের তুল্য গদ্যপ্রতিভা (রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে) বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া তৃতীয় কেউ নেই। মীর বঙ্কিমচন্দ্রেরও স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন, ঠিক, কিন্তু তিনিও পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজকে তেমন নাড়া দিতে পারেন নি, যা দিয়েছিলেন নজরুল। এই নজরুলই ছিলেন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আজ পর্যন্ত বিচারে শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। কিন্তু তাঁকেও হিন্দু-মুসলমান মিলনবাণী প্রচার করতে হয়েছে মুসলমান-সম্পাদিত পত্রিকায় এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলনবাণী প্রচার সত্ত্বেও এ তথ্যও সর্বদা স্মরণীয় যে, তিনি বাংলা ইসলামী গানের স্রষ্টা

www.pathagar.com

এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নির্মাতা। তাঁর সংক্ষিপ্ত সাহিত্যিক জীবনের পুরোটাই ইসলাম ও মুসলমানের ধ্যানে কেটেছে। বাঙালি-মুসলমানের হিন্দু-মুসলমান মিলনের চিন্তা তাঁর মধ্যে চূড়ান্তরূপ নিয়েছে, প্রতিবেশী হিন্দু সমাজকে তিনিই তীব্রভাবে সচেতন করে তোলেন বাঙালি-মুসলমানদের অস্তিত্ব বিষয়ে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একদা একটি সাহিত্যিক তর্কে তিনি উত্থাপন করেছিলেন বিশ্ব-কবিতার একটি অপ্রতিরোধ্য 'মুসলমানী ঢঙে'র কথা।

'প্রবাসী,' 'ভারতবর্ষ,' 'বসুমতী'র পাশে কলকাতাতেই উত্থিত হয়েছিলো 'সওগাত', 'বুলবুল', 'মুহাম্মদী'র মতো পত্রিকা। একই কলকাতায় পাশপাশি বাস করে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ তাদের আপন ঐতিহ্য ও গন্তব্য করে নিচ্ছিলো। মুন্সী মেহেরুল্লাহ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও ইসমাইল হোসেন শিরাজীর জাগরণকামী বক্তৃতা ও রচনামালা, সৈয়দ এমদাদ আলী, মওলানা আকরম খাঁ ও মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের কুশলী সম্পাদনাশক্তি; বেগম রোকেয়া, কাজী আবদুল ওদুদ ও মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর ভাবুকতা; আরো অসংখ্য লেখক ও কবির বহুমুখী উদ্যম; সর্বোপরি নজরুল ইসলামের অনন্যসাধারণ সাহিত্যকৃতি— এই সবই বাঙালি-মুসলানের আত্মচেতনাকে স্থানিকতা থেকে মুক্ত করে চৈতন্যের এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত করেছিলো। বাঙালি-হিন্দু লেখক, এমনকি সাহিত্য-ঐতিহাসিকেরাও পুরোপুরি সচেতন ছিলেন না যে, তাঁদের একান্ত পাশ দিয়েই একটি শব্দহীন ধারা এগিয়ে চলেছে। তবে এখানেই স্মরণীয়, ঐ স্বাতন্ত্র্য কোনো উন্মূল ব্যাপার ছিলো না। বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ধারাবাহিকতা আর নবোন্মেষিত স্বাতন্ত্র্য সাধনা-এই দু'য়ের মাত্রাবিতরণে এগিয়ে চলেছিলো তাঁদের সাহিত্য। এই স্বাতন্ত্র্য সাধনাই মোহনায় এসে পড়ে '৪৭-এর পর থেকে। অন্তত প্রায় একশো বছরের চাপ ছিলো তার উপরে। সাংস্কৃতিক চাপ। স্বাতন্ত্র্যের চাপ। একটি ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে সে মুক্তি পেলো। তারপর থেকে তার কেবল ক্রম-পরিণতি, অবিরল দুই ঝিনুকের চাপের ভিতর থেকে মুক্তার জন্ম-জন্মান্তরও বলা যেতে পারে।

সাহিত্য-ঐতিহাসিক মুহম্মদ আবদুল হাই বাঙালি-মুসলমান লেখকদের দু'টি দলে ভাগ করেছিলেন-স্বাতন্ত্র্যধর্মী ও সমন্বয়ধর্মী দল। 'সুধাকর' পত্রিকাকেন্দ্রী ও তাঁদের অনুবর্তীদের তিনি বলেছেন স্বাতন্ত্রধর্মী; এঁরা ছিলেন ইসলামচিন্তিত। শেখ আবদুর রহিম, মুন্সী রেয়াজউদ্দীন আহমদ, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন মাশহাদী, ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্রমুখ স্বাতন্ত্র্যধর্মী। অন্য লেখকেরা, নজরুল ইসলাম যেমন– সমন্বয়ধর্মী। কিন্তু শেষ-বিশ্লেষণে দেখা যাবে, শুধু স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখকেরাই নয়, সমন্বয়ধর্মী লেখকেরাও সততই স্বধর্মনিষ্ঠ– নজরুল ইসলাম বা কাজী আবদুল ওদুদের মতো সমন্বয়ধর্মীরাও সতত ইসলাম ও মুসলমান নিয়ে ভাবনা বেদনায় আক্রান্ত।

কী দেখা যাচ্ছে তাহলে? যাচ্ছে, একই স্থানের অধিবাসী হয়েও, একই দেশ-কালের বাসিন্দা হয়েও, বাঙালি-হিন্দু ও বাঙালি-মুসলমান লেখকেরা দুই ভিন্ন সাংস্কৃতিক আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিলেন বিভাগ-পূর্বকালে।

www.pathagar.com

স্বাতন্ত্র্য থাকে তাহলে ভূখণ্ডে নয়, পরাধীনতায় নয়—অর্থাৎ নয় রাষ্ট্রে বা স্বাধীনতায়—স্বাতন্ত্র্য থাকে একটি জাতির চৈতন্যে বা আত্মায় আর, কোনো বহিঃশক্তি নয় আত্মিক শক্তিই মানুষের সবচেয়ে বড়ো শক্তি। চৈতন্যই তার নীলিমাভেদী নিশান।

সৃষ্টিশীলতার ধারা

বাঙালি মুসলমানের সামাজিক রাজনৈতিক শিক্ষাগত সংস্কৃতিগত আর্থিক অনগ্রসরতা ও পশ্চাদপদতার জন্যে তার সাহিত্যও পিছনে পড়ে থেকেছে। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুসলমান নৃপতিরা। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের হাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর থেকেই ইংরেজ রাজত্বের সূচনা হয় এ দেশে। রাজত্ব হারিয়ে অভিমানী মুসলমানরা অশিক্ষার অন্ধকারে প্রবেশ করতে থাকে। ইতোমধ্যে ইংরেজ সংস্পর্শে বাংলা সাহিত্য কিন্তু আধুনিকতায় দীক্ষিত হয় এবং এগিয়ে যেতে থাকে। ১৮০১ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। ১৮৩৫ সালে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ফারসীর বদলে ইংরেজী গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিলো কলকাতায়। আধুনিক বাংলা গদ্য ও কবিতা, নাটক ও উপন্যাস সৃষ্টি হয়। অনগ্রসর বাঙালী-মুসলমানের হাতে রচিত হতে থাকে কেবল পয়ারে লেখা পুঁথিসাহিত্য। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক যথার্থই দেখিয়েছেন, ইংরেজ আমলের প্রথম শ-খানেক বছরের (১৭৫৭-১৮৬০) মুসলিম বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যিক ধারার অনুবর্তন চলেছিলো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বাঙালি মুসলমান আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রতী হয়- কেননা ততোদিনে সে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে উঠতে শুরু করেছে। স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী- এই তিনজনের কাছে বাঙালি-মুসলমান চিরদিনের মতো ঋণী হয়ে আছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাঙালী-মুসলমান প্রবেশ করেছে বেশ দেরিতে। আজ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বয়স যদিও দুশো বছর হয়ে এলো, তবু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের যুক্ততা মাত্র একশো বছরের—দু'টি প্রধান গ্রন্থ মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) 'বিষাদ-সিন্দু' (১৮৮৫-৯১) উপন্যাসের বা কায়কোবাদের (১৮৫৮-১৯৫২) 'অশ্রুমালা' (১৮৯৪) কাব্যের কথা মনে রেখে বলছি।

মীর মশাররফ হোসেন এক অসাধারণ লেখক। উনবিংশ শতাব্দীতে সারা বাংলা সাহিত্যেই বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে মীর মশাররফ হোসেনের তুল্য বড়ো লেখক আর নেই। তাঁর কালোত্তর গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু' বাদেও 'গাজী মিয়ার বস্তানী', আত্মজৈবনিক রচনাসমূহ কবিতা নাটক পত্রিকা সম্পাদনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মীরের সব্যসাচী প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' (১৯০৪) মহাকাব্য হিসেবে বিখ্যাত বটে, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য আসলে 'অশ্রুমালা'—একটি গীতিকবিতার বই। মোজাম্মেল হকের 'জোহরা' উপন্যাসটি আমাদের একটি সফল সামাজিক উপন্যাস। নজিবুর রহমানের 'আনোয়ারা', ইমদাদুল হকের 'আব্দুল্লাহ', বেগম রোকেয়ার 'পদ্মরাগ' ইত্যাদি পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। নজরুলের আগে মোটামুটিভাবে উত্তীর্ণ ও ভালো

www.pathagar.com

কবিতা লিখেছেন শাহাদাত হোসেন ও গোলাম মোস্তফা। নাটক ও ছোটগল্প রচনায় বাঙালী মুসলমানের কৃতিত্ব এই পর্যায়ে কম।

সমাজভাবুক গদ্যলেখকেরা

আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনায় সৃষ্টিশীলতার চেয়ে মনন কাজ করেছে বেশি পরিমাণে। 'সুধাকর' থেকে 'সওগাত' অবধি পত্রিকাগুলি—দেখা যাবে—নানা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক তর্কে-বিতর্কে আলোচনা পর্যালোচনায় উন্মুখর। মুন্‌শী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, মুন্‌শী মুহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী, শেখ আবদুর রহিম, মওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদীর মতো সমাজসংস্কারক, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও আবদুল গফুর সিদ্দিকীর মতো ইতিহাসন্ধানী, ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ও মুহম্মদ আকরম খাঁ-র মতো পণ্ডিত, সৈয়দ এমদাদ আলীর মতো সম্পাদক, সংগঠক, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর মতো ঐতিহ্যসচেতন, বেগম রোকেয়ার মতো জাগরণকামী, কাজী ইমদাদুল হক, ডাঃ লুৎফর রহমান, এয়াকুব আলী চৌধুরী, এস. ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর মতো ভাবুক– সকলেই চিন্তক ও প্রাবন্ধিক ও গদ্য লেখক। দুঃখের বিষয়, অন্য সব ক্ষেত্রের মতো এখানেও, বাঙালি-মুসলমান ইতিহাসকারদের দ্বারা অবহেলিত ও অনালোচিত রয়ে গেছেন। প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত 'বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫) সংকলন গ্রন্থে রামরাম বসু থেকে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় পর্যন্ত গদ্যলেখকদের দেড়শো বছরের ইতিবৃত্ত ও নমুনা সংগৃহীত হয়েছে— কিন্তু একজন মুসলমান লেখকও উল্লেখিত হননি।

নজরুল ও আমাদের নবজাগরণ

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সাধারণভাবে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে নজরুল চারজন শ্রেষ্ঠ কবির একজন– বাকি তিনজন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জীবনানন্দ দাশ। তবে নজরুল শুধু কবি হিসেবেই নন তাঁর প্রতিভার বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য বিশাল ঃ একাধারে তিনি কবি, গল্পকার, উপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, গীতিকার, গায়ক, বাদক, অভিনেতা, সংগীত-পরিচালক, সংগীত শিক্ষক, চলচ্চিত্র-পরিচালক এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই তিনি বিশিষ্টতার অধিকারী। নজরুল বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের পরে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। তাঁর লেখায় সাহসে বাঙালি মুসলমানের বদ্ধ দুয়ার খুলে যায়। নজরুলের আবির্ভাবের আগে আধুনিক বাঙালি-মুসলমানের কবিতা চর্চার অবস্থা ছিলো শোচনীয়। মধ্যযুগে অবশ্য কাজী দৌলত বা সৈয়দ আলাওলের মতো বড়ো কবির জন্ম হয়েছে— কিন্তু আধুনিককালে অনেকদিন আমরা পড়েছিলাম পুঁথির যুগে তারপর গদ্যে যতোটা সমৃদ্ধি ঘটেছে কবিতায় তার সিকির সিকিও হয়নি। আমি দুই যুগে তৈরি দু'টি কবিতা সংগ্রহ থেকে নজরুলের আগের মুসলমান কবিদের দু'টি তালিকা উদ্ধৃত করছি– কেবল কবিদের নামগুলি সংকলন করে দিচ্ছি।

www.pathagar.com

আবদুল কাদির ও রেজাউল করীম সম্পাদিত 'কাব্য মালঞ্চ' (১৯৪৫, নূর লাইব্রেরী, কলকাতা)-এর নজরুল-পূর্ব আধুনিক কবিদের তালিকা ঃ

> মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, কায়কোবাদ, সৈয়দ আবুল হোসেন, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, আবুল মা'আলী, মোহাম্মদ হামিদ আলী, সৈয়দ এমদাদ আলী, হোম্মদ মেহেরুল্লাহ, শেখ ফজলুল করীম, মিসেস এস, হোসেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, কাজী আবদুল ওদুদ, শেখ হাবিবুর রহমান, ফজলুল হক সেলবর্ষী, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, গোলাম মোস্তফা, শাহাদাৎ হোসেন।

'আধুনিক কাব্য সংগ্রহ' (১৯৬৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা)-এর নজরুল-পূর্ব আধুনিক কবিদের তালিকা এরকম ঃ

> খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী, মীর মশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ এমদাদ আলী, কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, আবু মালেক মোহাম্মদ হামীদ আলী, ইসমাইল হোসেন শিরাজী, শেখ ফজলুল করীম, ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শেখ হাবিবুর রহমান, শাহাদাৎ হোসেন, শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী, গোলাম মোস্তফা।

কবিদের তালিকা থেকেই ওয়াকিফহাল পাঠক অনুমান করতে পারবেন। আধুনিক মুসলিম বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ছিলো কতো সামান্য পূর্ব পটভূমি থেকে। নজরুলের পরে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের জয় জয়কার শুরু হলো। উনিশ শতাব্দীতে বাঙালি হিন্দুর যে নবজাগরণ ঘটেছিলো, আমাদের সাহিত্যে নজরুল ইসলাম তার তূর্যবাদক। বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণ শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকে এবং নজরুল ইসলাম তার পুরোধা পুরুষ।

'শিখা' গোষ্ঠী

বাঙালি মুসলমানের বয়স্ক চিন্তাধারার প্রথম প্রকাশ কবিতায় নয়— গদ্যে। ১৯২৬ সালে ঢাকায় গঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' কোনো অনাকাংখিত ব্যাপার নয়। পূর্বজ কারো চিন্তার ধারাতেই সুপ্ত ছিলো এর বীজ। গদ্যে বাঙালি মুসলমানের যে সমাজভাবনা শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঢাকায় 'শিখা গোষ্ঠী' বা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' যেন তারই একটি পরিণত রূপ। লক্ষণীয়, আগেকার বাঙালি মুসলমানের দু'টি প্রতিভূ সংস্থা নবাব আবদুল লতিফ প্রতিষ্ঠিত 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' (১৮৬৩) এবং সৈয়দ আমীর আলী প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৭৭) দু'টিই কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিলো এবং এমনকি তার কর্মকাণ্ডের ভাষা ছিলো ইংরেজী। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হলো ঢাকায় এবং তার চিন্তা প্রকাশের মূখ্য মাধ্যম হলো বাংলা।

www.pathagar.com

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর প্রধান পুরুষেরা হলেন কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল হোসেন (১৮৯৭-১৯৩৮), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), আবদুল কাদির (১৯০৬-৮৪) প্রমুখ। এঁরা বিশের দশকে মুসলিম সমাজে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এঁদের মুখপত্রের নাম ছিলো 'শিখা'। এঁদের লক্ষ্য ছিলো 'বুদ্ধির মুক্তি' চিন্তার চর্চা। ১৯২৭-৩৬ সময়কালে এঁরা দশটি বার্ষিক সম্মিলনীর ব্যবস্থা করেন। 'শিখা' পাঁচ বছর বেরিয়েছিলো। পত্রিকায় লেখা থাকতো, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।'

ব্যক্তিবৃন্দের কাছ থেকে এঁরা পাঠ করেছিলেন হযরত মুহম্মদ (সা) এবং কামাল আতাতুর্ক, রামমোহন-ডিরোজিও, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল, রোমাঁ রোলা, গ্যেটে, শেখ সাদী প্রমুখের কাছ থেকে।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বা 'শিখা' গোষ্ঠী সম্পর্কে নানা রকম চিন্তাহীন মন্তব্য করা হয়। এটা ঠিকই যে, তাঁরা সমকালে খুবই সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু এও ঠিক তাঁরা কখনো ঐতিহ্যহীন নন বরং সব সময়ই সকলকে ঐতিহ্যের পটে রেখেই তারা বিচার করেছেন। 'শিখা'র প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তেই বলা হয়েছিলো, 'শিখা'র প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্তন-সাধন।' 'শিখা'র প্রথম সংখ্যার (চৈত্র ১৩৩০) সূচিপত্রটি লক্ষ্য করুন ঃ

প্রকাশকের নিবেদন

খোশ-আমদেদ (গান)	ঃ	নজরুল ইসলাম
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ	ঃ	এ, এফ, রহমান
সভাপতির অভিভাষণ	ঃ	তসদ্দক আহমদ
আবাহন (কবিতা)	ঃ	হাবিবউল্লা
বাংগালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা	ঃ	কাজী আবদুল ওদুদ
বাংলার লোক সংগীত	ঃ	আবদুল কাদের
বাংগালী মুসলমানের আর্থিক সমস্যা	ঃ	রকীবউদ্দীন আহমদ
বাংগালী মুসলমানের সামাজিক গলদ	ঃ	আনোয়ারুল কাদির
হযরত মুহম্মদের প্রতিভা	ঃ	শামসুল হুদা
সংগীত চর্চায় মুসলমান	ঃ	কাজী মোতাহার হোসেন
শিক্ষা সমস্যা	ঃ	মমতাজউদ্দীন আহমদ
আমাদের নবজাগরণ ও শরিয়ত	ঃ	আবদুর রশীদ
নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ	ঃ	আবদুস সালাম খাঁ
বাংগালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা	ঃ	আবুল হোসেন
মুসলমানের আর্থিক সমস্যা	ঃ	আনোয়ার হোসেন

www.pathagar.com

দেখা যাচ্ছে, এঁদের চিন্তাধারা সবটাই বাঙালি মুসলমানকেন্দ্রিক। খুব স্বাভাবিকভাবেই এঁদের প্রতিষ্ঠানের নামও ছিলো 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'।... কাজী মোতাহার হোসেন-এর 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' বইয়ের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমজ'-এর প্রধান পুরুষদের সারা জীবনের কর্মকাণ্ড থেকেই দেখানো যেতে পারে, এঁরা সব সময়ই মুসলিম-ভাবিত। কাজী মোতাহার হোসেন-এর লেখা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণী থেকে একটুখানি অংশ উদ্ধৃত করবো ঃ

> আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চাই না-আমরা চাই বর্তমান মুসলমান সমাজের বদ্ধ কুসংস্কার এবং বহুকাল সঞ্চিত আবর্জন দূর করিতে। আমরা অতীতের মোহে ডুবিয়া থাকিয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতে চাই না। আমরা চাই কর্মস্রোতে ঝাঁপ দিয়া ইসলামের ভবিষ্যতকে মহিমান্বিত করিতে। আমরা জীবনকে 'ভোজের বাজী' মনে করিয়া ঐহিক উন্নতিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতে চাই না। আমরা চাই জগতের সমস্ত জাতির সহিত সম্পর্ক রাখিয়া জ্ঞানবান, বলবান ও ঐশ্বর্যবান হইয়া জীবনের পদ্ধতি মার্জিত করিতে এবং তাহাকে পূর্ণভাবে আস্বাদ ও ভোগ করিতে।

কাজী মোতাহার হোসেনের তখনকার দিনের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'আনন্দ ও মুসলমান গৃহ' কিংবা আবুল হোসেনের কথা ধরা যাক। আবুল হোসেন তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

> যে জাতির সাহিত্য নাই, সে জাতি মৃত। সাহিত্যের উৎস প্রাণময় জীবন। যে জাতির প্রাণ নাই; জীবনের স্পন্দন নাই, সে জাতির সাহিত্য নাই। বাঙ্গলার মুসলিম সমাজের অবস্থা মৃত জাতির অবস্থা। কোন দিকে যেন কোন সাড়া নাই, কোন স্পন্দন নাই।

এমনিভাবে দেখা যাবে, আবুল হোসেনের সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রেই ছিলো ইসলাম। আবুল হোসেনের আলোচ্য বিষয় ছিলো ইসলাম ধর্ম, ইসলামী সংস্কৃতি, বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা ব্যবস্থা, ভারতীয় মুসলমানের রাজনীতি। তাঁর দু'টি গ্রন্থের নাম থেকেই বিষয়ের হদিস পাওয়া যাবে, 'বাংগালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা' (১৯২৮) ও 'মুসলিম কালচার' (১৯২৮)। এমন যে কাজী আবদুল ওদুদ, যিনি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর প্রাণপুরুষ, তাঁর বিভিন্ন সময়ে রচিত কয়েকটি প্রবন্ধের নাম থেকেই বিষয়ের ইশারা পাওয়া যাবেঃ 'সম্মোহিত মুসলমান,' 'বাংগালী-মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা,' 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দাহম,' 'বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারা,' 'বাংলার মুসলমানের কথা', 'ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি', 'কুরআনের আল্লাহ', 'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ', প্রভৃতি। তাঁর উপান্তজীবনে কাজী আবদুল অদুদ হযরত মুহম্মদের (সা) জীবন চরিত্র লেখেন 'হযরত মুহম্মদ ও ইসলাম' (১৯৬৬) নামে, কুরআন শরীফ দুই খণ্ডে অনুবাদ করেন 'পবিত্র কুরআন' (প্রথম খণ্ড ১৯৬৬, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৬৭) নামে। এমন যে আবদুল কাদির, তিনি তো সারাজীবন মুসলমাঁনদের নিয়েই কাজ করেছেন, আবহমান বাঙালি মুসলমান কবিদের প্রথম সংকলন

www.pathagar.com

'কাব্য মালঞ্চ' (১৯৪৫) তিনি সংকলন করেন রেজাউল করীমের সহযোগিতায়, পাঁচ খণ্ডে 'নজরুল রচনাবলী' সম্পাদনা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি, এছাড়া তিনিই আবুল হোসেন, ডাঃ লুৎফর রহমান, বেগম রোকেয়া, এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রমুখের রচনাবলী সম্পাদনা করেন। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি, 'শিখা'গোষ্ঠী তথা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এ অখণ্ড চিন্তা ও তাবত কর্মকাণ্ড বাঙালি মুসলমানের বৃত্তেই জীবনভর সফর করেছে।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর প্রধান পুরুষেরা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, বাঙালি মুসলমান সমাজে এঁরাই প্রথম যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে চিন্তাবাদ চর্চা করেন (অবশ্য এঁদের উল্টোপিঠে মওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ বা মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীও যুক্তিবাদী), সাহিত্য এঁদের চিন্তার কেন্দ্র হলেও এঁরা সামাজিক বহু বিচিত্র বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। এঁদের মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হোসেন ছিলেন অর্থনীতির ছাত্র। কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র—সামগ্রিকভাবে এঁরা ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক। এঁরা ততো সৃষ্টিশীল শক্তির অধিকারী ছিলেন না। ফলে সামাজিক প্রভাব সম্পাত করতে পারেন নি তেমন ভাবে।

এঁদের সেই সৃজনশীলতার অভাব পূর্ণ করেছিলেন, কবি নজরুল ইসলাম—যাঁর সম্বন্ধে এঁরা সকলেই উৎসাহী ছিলেন। এঁদের তিনজন— কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবদুল কাদির—নজরুলের উপরে স্বতন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছেন। অন্য কাউকে নয়—নজরুল ইসলামকেই প্রথম বার্ষিক সম্মিলনীতেই আহ্বান করে এনে, তাঁকে দিয়ে গান গাইয়ে, কবিতা আবৃত্তি করিয়ে বক্তৃতা দিয়েই এঁরা তাঁকে যে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, তাতেও তাঁদের মনোভাবনা প্রতিফলিত হয়, সে দিন এ যাবতকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক পুরুষকেই তাঁরা শ্রদ্ধাঞ্জলী দিয়েছিলেন।

দরোজা খুলে যাওয়ার পর

নজরুল ইসলাম বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য চর্চার রুদ্ধ দরোজা পুরো খুলে দিলেন। তারপরই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমান পূর্ণ সাহসে বেরিয়ে এলো। তিরিশের দশকে নজরুল সংগীত জগতে চলে গিয়েছিলেন অনেকখানি। এই সময়ে জসীম উদ্‌দীন এবং অন্যান্য অনেক কবি কবিতার জগতে পদচারণা শুরু করেন। তবে জসীম উদ্‌দীন কাহিনী কবিতার ধারাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে যে-ভাবে রূপ দিলেন, অন্যদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। আমাদের আধুনিকতার বীজ রোপিত হয় চল্লিশের দশকে- কবিতায় ও কথা সাহিত্যে। চল্লিশের দশকের প্রধান কবি (ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন, আহসান হাবীব, সৈয়দ আলী আহসান) এবং প্রধান কতক (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত ওসমান, আবু রুশদ, শাহেদ আলী) সকলেই ঢাকায় পূর্ণ-বিকশিত হন। পরবর্তীরা এঁদের কাছ থেকেই আধুনিকতায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিরিশের কবিদের পর ফররুখ আহমদ সবচেয়ে বড়ো কবি। আর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা উপন্যাসিক।

www.pathagar.com

বিকাশের ধারা ঃ ১৯৪৭-৯০

১৯৪৭-এর পর বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যধারা শতধারে উৎসারিত হয়ে উঠলো। ব্যাপারটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন আমাদের দীর্ঘকালীন ভাষা বিতর্কের সমাধান করে দেয়। এক্ষেত্রে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই হাসান হাফিজুর রহমান কবি ও প্রাবন্ধিক বটে, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো তিনি সম্পাদক ও সংগঠক। বস্তুতঃ তাঁর দিক-নির্দেশনাতেই আমাদের সাহিত্যে ঐতিহ্য ও বর্তমানের মধ্যে একটি অপরূপ মেলবন্ধন ঘটে। পঞ্চাশের দশকে একসংগে এতো কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, উপন্যাসিক, নাট্যকার আমাদের সাহিত্যে দেখা দেন, যা বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য ধারায় আর কখনো দেখা যায়নি— তাতেও প্রমাণ হয় আমাদের সুপ্ত সাহিত্য প্রতিভা। '৫২-র ভাষা আন্দোলনের পর আমাদের আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কবিতা ও ছোটগল্পে আমরা দ্রুত অগ্রসর হয়ে যাই। আরেকটি বড়ো কাজ হতে থাকে— পুরানো অবহেলিত অনাদৃত লেখকদের রচনাবলী প্রকাশ, সংরক্ষণ, পুনর্মূল্যায়ন। '৫২-র ভাষা আন্দোলনই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা। বাংলাদেশের জন্মের পর কাজ হয় বিশেষত উপন্যাস ও নাটকে। অনেক বছর আগে 'বাংলার কাব্য' নামক কালোত্তর গ্রন্থে হুমায়ুন কবীর দেখিয়েছিলেন পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার চরিত্রে পার্থক্য। সব মিলিয়ে আজ আমাদের সাহিত্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমবয়সী হয়ে উঠেছে।

পশ্চিম বাংলার লেখক

১৯৪৭-এর পর সাহিত্যের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার মুসলমান লেখকরা খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেন নি। তারই মধ্যে কয়েকজনের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। পুরানো নামী লেখকদের মধ্যে এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), হুমায়ুন কবির (১৯০৬-৬৯), গোলাম কুদ্দুস, রেজাউল করীম, এম, আবদুর রহমান প্রমুখ কলকাতায় থেকে যান। অন্যরা সকলেই ঢাকায় চলে আসেন। পূর্ব বাংলায় জন্মগ্রহণকারী লেখকরা তো বটেই, পশ্চিম বাংলায় জন্মগ্রহণকারী অনেক লেখকও— যেমন শওকত ওসমান, আবু রুশদ। যাঁরা থেকে যান তাঁদের মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদ বিকশিত হন প্রাবন্ধিক, সমালোচক, জীবনী রচয়িতা ও অনুবাদক হিসেবে; হুমায়ুন কবির প্রাবন্ধিক ও কবি হিসেবে; গোলাম কুদ্দুস কবি হিসেবে। কাজী আবদুল ওদুদ 'সংকল্প' 'তরুণপত্র' নামে দু'টি পত্রিকা সম্পাদনা করেন—কোনোটিই স্থায়ী হয়নি। হুমায়ুন কবির অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন, তার মধ্যে সাহিত্যপত্র 'চতুরঙ্গ' আধুনিক বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে, পত্রিকাটি বেরিয়ে চলেছে আজো। 'কাব্য মালঞ্চে'র অন্যতম সম্পাদক রেজাউল করীম থেকে যান কিন্তু তেমনি সক্রিয় নন। প্রবীণ এম. আবদুর রহমান আজো কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন নিখাদ নিখীয়। 'বল্লরী' নামে পশ্চিম বাংলার মুসলমান কবিদের কবিতার একটি

www.pathagar.com

সংকলন তিনি সম্পাদনা করেছেন। কবি শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) '৪৭-এর পর এ দেশে এসেছিলেন, ঢাকা বেতারের সঙ্গে যুক্তও হয়েছিলেন, বেতারে মুখপত্র 'এলান'-এর সম্পাদনাও করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি, তিনি চলে গিয়েছিলেন এবং কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। স্বনামধন্য রম্য রচনার প্রবর্তক সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-৭৪) শান্তিনিকেতনে অধ্যায়ন করেন, '৪৭-এর পর বগুড়ায় কিছুদিন কলেজের অধ্যক্ষতা করেন, তারপর কেন্দ্রীয় কর্মস্থল হিসেবে কলকাতাকেই বেছে নেন, যদিও বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার পর তিনি এদেশে চ'লে আসেন এবং এখানেই মৃতুবরণ করেন। লেখক হিসেবে তিনি সম্পূর্ণ একটি নতুন রীতি প্রবর্তন করেন এবং একটি ধারারই সূচনা করেন। স্বাধীনতা-উত্তর নতুন প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। গল্পকার ও উপন্যাসিক হিসেবে তিনি পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাশের দশকের সেরা লেখকদের অন্যতম। তাঁর সমসাময়িক আবদুল জব্বারও প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছেন অজ্ঞাতপূর্ব জীবনের রূপকার হিসেবে-'বাংলার চালচিত্র' তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বই। আজহার উদ্দীন খান ও আবদুল আজিজ আল আমান নজরুল গবেষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। আজহার উদ্দীন খানের 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল'-এর অনেকগুলো সংস্করণ হয়েছে। নজরুলের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত রচনা সম্পাদনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন আবদুল আজীজ আল আমান। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'কাফেলা' আশির দশকের সূচনায় একটি সাড়া জাড়িয়েছিল। মুসলিম সম্পাদিত আরো দু'টি সাহিত্য-পত্রিকা উল্লেখযোগ্য ঃ 'রাহিলা' ও 'কলম'। অন্যান্য খ্যাতিমানদের মধ্যে আছেন- রম্য রচনায় ইবনে ইমাম, কবিতায়-কবিরুল ইসলাম, সামসুল হক, শামশের আনোয়ার, টিকেন চৌধুরী। ঐতিহাসিক রচনায়-হোসেনুর রহমান, খজিম আহমদ, গল্প-উপন্যাসে আবুল বাশার, আফসার আহমদ প্রমুখ।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে
মুসলিম অবদান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভাষার উৎপত্তি ও সাহিত্যের গতি

মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর)

লেখক-পরিচিত : মোজাম্মেল হকের জন্ম ১৮৬০ সালে, শান্তিপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গে। তিনি একজন মুসলিম ঐতিহ্যবাদী প্রবন্ধকার ও কবি হিসাবে বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ, তাপস কাহিনী, মহর্ষি মনসুর প্রভৃতি। তিনি ইন্তিকাল করেন ১৯৩৩ সালে।

লেখা-পরিচিতি : সওগাত, মাঘ ১৩২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।

জীবমাত্রই জগতের জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে থাকিতে পারে না, তাহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে হয়। জীব যখন কোনও কিছুর অভাব অনুভব করে এবং সেই অভাব মোচন নিজ ক্ষমতার বহির্ভূত বলিয়া বোঝে, তখনই তাহাকে পরের সাহায্য লইতে বা পরের মুখের দিকে চাহিতেই হইবে। সুতরাং এই অভাবই যে পরমুখাপেক্ষী করিবার একমাত্র কারণ, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে।

অভাব অনুভূত হইলেই জীবের অন্তরে একটী ভাবের তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই ভাব-তরঙ্গের অভিব্যক্তি এবং তাহার আদান-প্রদানই জীবের অভাব পূর্ণ হইবার একমাত্র উপায়। অভাব পূর্ণ করিতে হইলেই জীবকে অন্তরস্থ ভাবের অভিব্যক্তি ও তাহার আদান-প্রদান করিতেই হইবে। জীব-জগতের আদিম কালে এই ভাবের অভিব্যক্তি ও তাহার আদান-প্রদান কিরূপে কোন সূত্র অবলম্বনে সম্পাদিত হইত, তাহা অতি উর্ব্বর মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণও ভাবিয়া ঠিক করিতে সমর্থ নহেন। ফলতঃ এই ভাব-অভিব্যক্তি যে প্রথমে ইশারা-ইঙ্গিতে বা শব্দ দ্বারা সম্পাদিত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জীবের* অন্তরের ভাব-অবিব্যক্তি-জনিত ইশারা-ইঙ্গিত বা সঙ্কেত-শব্দ হইতেই ভাষা এবং ভাষা হইতেই সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এই-ইশারা-ইঙ্গিতজনিত শব্দ বা সঙ্কেত একদিনে বা এক সময়ে উৎপন্ন হয় নাই— এক একটী অভাবজনিত ভাবের অভিব্যক্তি হইতে এক একটী সঙ্কেত বা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ বিবিধ অবস্থায় বিবিধ ভাবের অভিব্যক্তি হইতে বিধি সঙ্কেত বা শব্দ উৎপন্ন হইয়া তৎসমুদয় ভাষায় পরিণত হইয়াছে। ভাষা শব্দ-বহুল বা পুষ্টাঙ্গ হইতে কত দিন, কত যুগ বা কত শতাব্দী লাগিয়াছিল,

---

* এ স্থলে জীব শব্দ ব্যবহার করায় হয়তো অনেকে হাসিয়া বলিবেন, "জীবমাত্রেরই কি সাহিত্য আছে?" জীবশ্রেষ্ঠ মানব জাতির ন্যায় অপর কোনও ইতর জীবের সাহিত্য নাই সত্য, কিন্তু তাহাদের ভাষা যে আছে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের ন্যায় ইতর প্রাণীদেরও স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি, দ্বেষ-হিংসা প্রভৃতি আছে এবং তৎসমুদয় তাহারা স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে নিজেদের ভাষাতেই প্রকাশ করিয়া থাকে। আমরা তাহা বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু তাহাদের ভাষা শিক্ষা করিলেই বুঝা যাইতে পারে। কিছু দিন হইল, জনৈক সাহেব বানরের ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আফ্রিকার জঙ্গলে অবস্থান করিয়াছিলেন, অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন।

www.pathagar.com

তাহা কে বলিতে পারে? আর মানবের মুখ হইতে প্রথমে কোন্ ভাষায় শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহাই বা কে জানে? ইহার উত্তরে নানা জনে নানা কথা বলিবেন—কেহ বলিবেন হিব্রু, কেহ বলিবেন আরবী, কেহ বলিবেন সংস্কৃত, কেহ বা ফারসী ভাষার উল্লেখ করিবেন। আবার কেহ বলিবেন— যখন আদিম মানব সকলে ইরান অঞ্চলের উত্তরাংশে একত্রে বাস করিতেন, তখন তাঁহাদের মুখ হইতে একই প্রকার সঙ্কেত বা শব্দ উচ্চারিত হইয়া ক্রমে তাহা ভাষায় পরিণত হইয়াছিল এবং সেই আদিম ভাষাই আবার কালক্রমে মনুষ্যের বংশ-বিস্তার হেতু দেশ-দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপনের সহিত পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত ও নানাভাবে অদল-বদল হইয়া নানা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ কতকগুলি শব্দ কয়েকটী ভাষায় প্রায় সমভাবেই পাওয়া যায়। যেমন—

শব্দ	পারসী	সংস্কৃত	ইংরাজী
পিতৃ	পেদর	পিতৃ	ফাদার
মাতৃ	মাদর	মাতৃ	মাদার
দুহিতৃ	দোখতর	দুহিতৃ	ডটার
ভ্রাতৃ	বেরাদর	ভ্রাতৃ	ব্রাদার
নাম	নাম	নাম	নেম।

সে যাহাই হউক, তদ্বিষয়ে আমাদের আর মাথা ঘামাইবার আবশ্যক করে না, ভাসাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ সে সমস্যার আলোচনা করিতে পারেন। আমাদের আলোচনার বিষয় বঙ্গভাষা ও তৎসাহিত্যের গতির কথা, আমরা এক্ষণে তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

অতীতের কোন্ যুগে কোন্ সময়ে বঙ্গভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নিঃসংশয়রূপে বলিতে অসমর্থ। তবে ভাষাটা প্রাচীন বটে, কিন্তু খুব প্রাচীন নহে। ইংরাজী ভাষা যেমন নানা ভাষার শব্দ লইয়া পরিপুষ্ট, বাঙ্গালা ভাষাও তেমন যুগযুগান্তর ধরিয়া বহু ভাষার শব্দ গ্রহণে সৌষ্ঠব সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এ ভাষায় প্রাকৃত, হিন্দী, পালী, মারাঠা, মাগধী প্রভৃতি ভাষার, বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ ও ভাব প্রাথমিক অবস্থায় গৃহীত হইয়াছিল। আবার যখন মুসলমানগণ দিগ্বিজয়ীবেশে ভারতে প্রবেশ করিয়া পরে এখানে স্থায়ীরূপে বসতি স্থাপন করেন, তখন হইতে আরবী পারসী ও উর্দ্দু, এই ইসলামিক ভাষাত্রয়ের ভাব ও বহু শব্দ বঙ্গভাষায় ক্রমে ক্রমে প্রবেশ লাভ ও ভাষাকে পুষ্টাঙ্গ করিতে থাকে। পরিশেষে সাত শত বৎসর হিন্দু-মুসলমানের এক সঙ্গে অবস্থান হেতু উক্ত ভাষাত্রয়ের অসংখ্য শব্দ বঙ্গীয় হিন্দু ও মুসলমানের এরূপ অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা আহারে-বিহারে, লিখনে-কথনে, জীবনের প্রত্যেক কার্যে আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষার শব্দোচ্চারণ করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকেন। লোকে কথায় কথায় বলেন— মজলিশ, গুলজার, নবাবী কায়দা, আজব কারখানা, বজ্জাত-বেইমান, সৌখিন পুরুষ, সদর দরজা, আহম্মকের বাদশা, পর্দ্দা-নশিন ইত্যাদি। বাস্তবিক বঙ্গভাষায় গৃহীত উল্লিখিত ভাষাত্রয়ের কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে যে ভাব সহজে ব্যক্ত হইয়া থাকে, খাঁটী বাঙ্গালা শব্দ উচ্চারণ দ্বারা সে ভাবটা বিশদরূপে প্রকাশ হইতে পারে

www.pathagar.com

এমন শব্দ বঙ্গভাষায় নাই। কাজেই বাঙ্গালী সাধারণকে আরবী, পারসী ও উর্দ্দু শব্দের সাহায্য লইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। বাস্তবিক বলিতে গেলে আদব, আবদার, আবাদ, আসবাব, ইজ্জত, ইমারত, ওজোর, ওয়ারিশ, আতোর, জামা, মোজা, সওকিন, সাবান, চশমা, মোরব্বা, আচার, শরবৎ, দালান, রোয়াক, জমা, খরচ, রসিদ, নগদ, মৌজুদ, ক্রোক ইত্যাদি শব্দের প্রতি শব্দ কি বাঙ্গালা ভাষায় আছে?

কোন বঙ্গভাষাভিজ্ঞ তার্কিক পুরুষ হয় ত বলিবেন,— "আছে বৈ কি? বঙ্গভাষায় গৃহীত আরবী, পারসী ও উর্দ্দু শব্দের ভাব প্রকাশক প্রতিশব্দ বঙ্গভাষায় অবশ্যই আছে। যেমন মুদীখানা-বিবিধ ভোজ্য দ্রব্যগার, আদালত- বিচারালয়, খাজনা-রাজস্ব ইত্যাদি।" কষ্ট স্বীকার করিয়া এইরূপ কতকগুলি শব্দের যোগাড়ে ২,১০টী ইসলামিক শব্দের ভাব বঙ্গভাষায় ব্যক্ত হয় বটে, কিন্তু সমস্ত নহে, আর যাহা হয়, তাহা কিম্ভূতকিমাকার-সহজবোধ্য নহে। কাগজ, কলম, খাজনা, খুন, হাসি, জমা, জবাব, জখম, জোর, দখল, দাঙ্গা, নগদ, নকল, পর্দ্দা, পসন্দ, ফসল, ফেরেব, বজ্জাত, বেহায়া, মহল, মোহর, রদ, রাজী, শরিক, শয়তান, হাওলাত, হয়রান ইত্যাদি শব্দ যাহা বাঙ্গালী নিত্য ব্যবহার করে এবং যাহা শ্রবণ মাত্র, হৃদগত হয়, সেই সকল কোমল ও সহজবোধ্য শব্দের বদলে অন্য শ্রুতিকটু শব্দ ব্যবহারের আবশ্যকতা কি আছে? ফলতঃ তাহাতে ভাষাকে অবোধ্য করা ভিন্ন লাভ আর কিছুই হয় না।

প্রাথমিক বঙ্গভাষায় যে সকল রচনা পাওয়া যায়, তাহার অনেক শব্দ কোথা হইতে যে গৃহীত হইয়াছে এবং সেই রচনা প্রকৃত বাঙ্গালা, কি প্রকৃত উড়িয়া, তাহা ঠিক করিয়া উঠা কঠিন। ফলতঃ সেই মলিন শ্রীহীন অবস্থায় থাকিতে থাকিতে কিছুদিন পরে বঙ্গভাষার শ্রী-অঙ্গে অবিনব বেশভূষার আবির্ভাব হইল। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ সংস্কৃতের শব্দ-সম্পদ লইয়া বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্য্যার্থ রত হইলেন। এই সময়ে বঙ্গভাষা যেরূপ ধারণ করিল, তাহা সংস্কৃত শব্দমালায় ভরা—অতি জটিল। সে ভাষা টোলের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ ভিন্ন অপর সাধারণের পক্ষে দুর্ভেদ্য দুর্গ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার ভাব গ্রহণ করা সাধারণ জনগণের সহজ সাধ্য হইল না। উদাহরণস্বরূপ সেই সময়ের ভাষার একটু নমুনা এস্থলে উদ্ধৃত হইল, "স্বস্তি গীর্ব্বাণচর-চূড়া রত্ন-রাজি-রোচিসচুম্বিত-চন্দ্র-চরণ-নখেন্দু-বৃন্দ-চন্দ্রিকা" ইত্যাদি "অসংখ্য সেনানী সদৃশ্য ক্ষমতা-শালিনী কার্য্যসাধনী মদীয় বুদ্ধিই একাকিনী সমস্ত সম্পাদিত করিবে।" মুদ্রারাক্ষস।

ভাষার এইরূপ কঠোরত্বের মধ্যে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, বৈষ্ণব কবিকুল, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি মনীষীগণ ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত হইয়া ললিত পদবিন্যাসে বঙ্গভাষার কঠোরত্ব কিছুটা দূর করিয়া দিলেন। বিশেষতঃ বঙ্গের ভাগ্য-চক্র কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মুসলমান বাদশাহ-নবাবদিগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বঙ্গবাসীর হাড়েহাড়ে আরবী ও পারস্য ভাষার প্রভাব প্রবেশ করায় কয়েকজন কবি আরবী-পারসী শব্দ-সম্পদ লইয়া বঙ্গভাষার অঙ্গপুষ্টি ও সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন।

ইহার পরই রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাবে ভাষার গতি অন্য দিকে ফিরে—রামমোহন গদ্য-সাহিত্যের সূচনা করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে মিশনারী সাহেবদের কল্যাণে

www.pathagar.com

দুই একখানি গদ্য গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সকলের ভাষাও উৎকট সংস্কৃত শব্দাড়ম্বরে ভরা। পরন্তু রাজা রামমোহনের ভাষা নির্দ্দোষ না হইলেও উহা যে বর্ত্তমান গদ্য সাহিত্যের পথ-প্রদর্শক, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনন্তর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের প্রদর্শিত পথানুসরণে বঙ্গভাষার গতি দীর্ঘকাল চলিয়া আসিয়াছে।

বর্ত্তমানে সাহিত্যের এক অভিনব যুগ আসিয়া পড়িয়াছে। ভাষার গতি দোটানায় পড়িয়াছে। একদিকে কতকগুলি লেখক সংস্কৃত ভাষার শব্দ সংযোগে গ্রন্থাদি লিখিয়া ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে প্রস্তুত, অন্যদিকে আর এক দল সাধু ভাষার মধ্যে সাদাসিধে শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদের মুসলমান লেখকগণ এই দো-টানা স্রোতের কোন্ দিকে অঙ্গ ঢালিয়া দিবেন? ভাষার এই উভয় গতির কোনটী পসন্দ করিয়া আমাদের গ্রহণ করা উচিত?

একজন মনস্বী পণ্ডিত বলিয়াছেন, "যাহা চলিয়াছে, তাহা চলুক।" যদি কথাটী লিখিত ভাষায় যাহা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই চলুক, এই ইঙ্গিতে বলা হইয়া থাকে, তবে তাহা অনুমোদনীয় হইতে পারে। আমার বোধ হয়, লিখিত ভাষার দিকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার এই ইঙ্গিত। লিখিত বাঙ্গালা ভাষায় আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষার যে সকল শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়া আসিয়াছে, এবং যে শব্দগুলি বাঙ্গালা ভাষায় বেশ খাপ খায়, সেই শব্দগুলি, এখন বাদ দিয়া জটিল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে ভাষাকে দুর্ব্বোধ্য করিতে কতকগুলি হিন্দু লেখক যত্নবান। আমার ন্যায় অনেকেই ইহার পক্ষপাতী নহেন। তাই বলিয়া আমি যে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের বিপক্ষ, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রাঞ্জল ও সহজ ভাবপ্রকাশক, যাহা ব্যবহারে ভাষাটা মধুর, কোমল, সুন্দর ও গুরুত্ব-ভরা হয়, সে সকল শব্দ ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমাদের কোন্ পথে চলা উচিত, ইহার উত্তর সকলে অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। আর এ উত্তর বোধ করি, অনেকেরই অনুমোদিত হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে শেষে একটা কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমাদের ইসলামিক শব্দ দিয়া বঙ্গভাষার অঙ্গ-শোভা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য বোধে কেহ যেন জোর করিয়া অপ্রচলিত আরবী পারসী শব্দ ব্যবহার করিয়া ভাষাকে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের ন্যায় কঠোর বা অশ্রাব্য না করিয়া ফেলেন।

www.pathagar.com

মুসলিম সাহিত্য-সমাজ

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

লেখক-পরিচিতি ঃ পূর্বের অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

লেখা-পরিচিতি ঃ সওগাত ১৩৩৬ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

আজ দেশের মধ্যে মুক্তির ডাক এসেছে। কিন্তু সে ডাক অতি ক্ষীণ। দূরের বাঁশীর সুরের মত কখন সে কানে এসে লাগে, কি না লাগে। অলস ভীরু কাপুরুষ আমরা, তার উপর তন্দ্রা-ঘোরে ভোর। চাই আমাদের জন্য তুরী ভেরীর তীক্ষ্ণ বিকট নিখাদ নাদ। তা না হ'লে জীবনের রাঙা পতাকার নীচে দলে দলে মুক্তি ফৌজ এসে জম্‌বে না; তা না হ'লে মুক্তির লড়াই আমাদের চল্‌বে না; তা না হ'লে মুক্তি আমাদের মিল্‌বে না।

তাই চাই আমাদের বীর্য্যবন্ত সাহিত্য। মাত্র একখানি পুস্তক আরবের বহু যুগের কাল ঘুম ভেঙে দিয়ে সমস্ত দুনিয়া তোলপাড় ক'রে এক নতুন প্রাণ গড়ে তুলেছে। মাত্র একটী গীত প্রাচীন ফরাসীর শিরায় শিরায় আগুনের শিখা জ্বালিয়ে পুরাণকে ছাই ক'রে এক নতুন ভাব-জগতে জাগিয়ে দিয়েছে। কলাম ও কুলমের বাণী ও লেখনীর এমনই অপূর্ব্ব ক্ষমতা! তাই কুর্‌আন তার দৈবী ভাষায় ঘোষণা কর্‌ছে– "নূন্ ওয়া-ল্ ক্বলম, ওয়া মা য়স্‌তুরূন" "(লক্ষ্য কর) দোয়াত, কলম এবং যা তারা লেখে" (সূরাহ্ ক্বলম)

সাহিত্য যদি সত্যিকার সাহিত্য হয় সে মুক্তি দিবেই— দেহের মুক্তি, মনের মুক্তি, আত্মার মুক্তি। এই তিনটী নিয়েই মানুষ। একটী ছেড়ে অন্যের মুক্তিতে মুক্তি নেই। সাহিত্যের সকল উদ্দেশ্যই ঘুরে ফিরে এসে দাঁড়ায় এখানে। এই মুক্তিকেই মাঝের বিন্দু ক'রে সাহিত্য চারিদিকে ঘুরবে। আলঙ্কারিক মম্মট ভট্ট কাব্যের ফল সম্বন্ধে বল্‌ছেন ঃ

> কাব্যং যশসেহর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতর ক্ষতয়ে।
> সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিত তয়োপদেশযুজে ॥

"কাব্য যশের জন্য, টাকা-কড়ির জন্য, আচার ব্যবহার আন্‌বার জন্য, অমঙ্গল দূর করবার জন্য, সদ্য সদ্য পরম শান্তি লাভের জন্য, প্রেয়সীর ন্যায় উপদেশ দিবার জন্য।" সে সাহিত্য বিফল, ষোল আনাই বিফল, যা মুক্তির সন্ধান দেয় না।

আজ সাহিত্যের মার্কা নিয়ে একটা জিনিস বাজারে চল্‌ছে। শুনি তার খাঁকতিও কম নয়, বিশেষ করে যুবক মহলে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তরুণ-তরুণীদের একটা অপূর্ণ দুর্দ্দান্ত ইচ্ছাকে রক্তমাংসময় কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করা। রহ্‌মানে ও শয়তানে যে তফাৎ, আঙুরে ও শরাবে যে তফাৎ, প্রেমে ও কামে যে তফাৎ, মুক্তি ও বন্ধনে যে তফাৎ, আসল সাহিত্যে ও এই নকল সাহিত্যে সেই তফাৎ। হায়! অবোধ পাঠক জানে না সাইরেনের বাঁশরীর

www.pathagar.com

সুরের ন্যায় এই অসাহিত্য তাকে ধ্বংসের দিকে পলে পলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জাতির সমস্ত যৌব-শাক্তি এই সাহিত্য জোঁকের মত নিঃসাড়ে চুষে নিচ্ছে।

সাহিত্যের হাটে যে কেবল এই কামাগ্নিসন্দীপনী বটিকাই বিক্রি হ'চ্ছে তা নয়। এর চেয়েও ভয়ানক জিনিস– একেবারে সাক্ষাৎ বিষ– নানা মনোহর নামে ও রূপে কাট্‌তি হচ্ছে। পরখ্‌ করলেই অনায়াসেই দেখা যাবে সেগুলির ভিতর আছে কুসংস্কার,ধর্ম্মান্ধতা, জাতীয় বিদ্বেষ প্রভৃতি। এসমস্ত জাতির আত্মা ও মনকে বিষাক্ত ক'রে দেশে কি অশান্তিই না ঘটাচ্ছে!

আমি অরসিক নই; আর্ট বুঝি। কিন্তু আর্টের নামে কি গণিকার উলঙ্গ অঙ্গ-ভঙ্গীকেও প্রশ্রয় দিতে হবে? তারীফ করতে হবে? আমি সাহিত্যের স্বাধীনতা বুঝি। কিন্তু তাই ব'লে কি সাহিত্যের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে অমৃতের নামে বিষ কিংবা রসের নামে প্রস্রাব বিক্রীরও লাইসেন্স দিতে হবে? আমাদের এক জিহাদ ঘোষণা ক'রতে হবে এই অপসাহিত্যের বিরুদ্ধে। তবেই জানি "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ" একটা ফাঁকা আওয়াজ নয়– সে এক "হয়্‌দরি হাঁক" অসত্য অশিব অসুন্দরের বিরুদ্ধে অভিযানের। আজ সমস্ত মুসলিম-বঙ্গ অনিমিষে চেয়ে আছে তার খিযরের জন্য যে তাকে পরাণ ভ'রে এই সত্যিকার সাহিত্যের "আবে হয়াতের" পরিচয় ক'রে দেবে। বোধ হয় শূন্যে খিযরের আবির্ভাব হয়েছে, নইলে এত সাকী জুট্‌ল কোথা থেকে?

> "উম্‌রি তাঁ বাদা দরায আয়্‌ সাকীয়ানি বয্‌ মে জম্‌।
> গর্‌চি জামি-মা ন শুদ পর্‌ ময় ব-দওরানি শুমা।"
> জম্‌ বাদ্‌শার সাকী ভাই সব! আয়ু তোদের বৃদ্ধি হো'ক,
> যতই কেন পেয়্‌লা মোদের তোদের দানে শূন্য রো'ক।" (হাফিয)

বাহন উপযুক্ত না হ'লে কেউ তার অভীষ্ট স্থানে পৌঁছতে পারে না! লক্ষ্য লাভ করতে গেলে সাহিত্যেরও বাহন উপযুক্ত হওয়া চাই। সেই বাহন মাতৃভাষা। মাতৃভাষা ছাড়া আর কোন্‌ ভাষা কানের ভিতর দিয়ে মরমে প'শে পরাণ আকুল করে? ডন কুইকসোট একটা রোগা ঘোড়ায় চড়ে বাহাদুরি জাহির কর্‌তে বেরিয়েছিলেন। তার চেয়ে বাহাদুরি বল্‌তে হবে তাঁদের, যাঁরা বিদেশী ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গড়্‌তে চান্‌। মিল্‌টনের ল্যাটিন কবিতা এখন ঘুণের খোরাক হ'য়েছে। মধুসূদনের Captive Lady এখন ভোলা দরিয়ার অথই জলে ডুলে গেছে। বঙ্কিমের Rajmohon's wife এর সন্ধান দুএকটী বইয়ের পোকা ছাড়া আর কে রাখে?

এই প্রসঙ্গে উর্দ্দুর কথা উঠ্‌তে পারে। মানি উর্দ্দু শেখা দরকার। কিন্তু তার চেয়ে বেশী দরকার আরবী শেখা। যদি উর্দ্দুর সাহায্যে আব্রহ্ম ভারতে আমরা পরস্পরকে জান্‌তে পারি, আরবীর সাহায্যে ফিলিপাইন থেকে মরক্কো, সাইবিরিয়া থেকে জাভা পর্য্যন্ত সমস্তকে চিন্‌তে পারি। কিন্তু আরবী বা উর্দ্দু শেখা এক কথা, আর তাকে সাহিত্যের বাহন করা আর এক কথা। বলা হয় বাঙ্গলায় মুস্‌লিম সাহিত্য নেই। কিন্তু গোড়ায় উর্দ্দুতেই কি ছিল? ফারসীর কথা ধরা যা'ক। তা'তে এক বিরাট মুস্‌লিম সাহিত্য আছে। অল্প-বিস্তর

www.pathagar.com

তুর্কীতে আছে; সিন্ধীতে আছে, মালয় ভাষায় আছে। শুরুতে এদের কোনটাই মুস্‌লিম সাহিত্যের ভাষা ছিল না। তবে বাংলার বেলা কেনই বা দোষ হবে? একটা মস্ত কথা আমরা ভুলে যাই যে আজ নতুন ক'রে নয় বরং প্রায় চা'রশ বছর ধ'রে মুসলমান এই বাংলা সাহিত্যের সেবা কচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমরা আরও জানি যে মুসলমান আমীর ওমরার নেক্ নজরেই বাংলা-সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছিল। সেই য়ুসুফ শাহ্, হোসেন শাহ্ নসরৎ শাহ, পরগল খান, ছুটী খানের নাম বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকবে। ক্বাযী দৌলত আরকান রাজ থিরি থুধম্মা রাজার সময়ে (১৬২২-১৬৩৮ খ্রীঃ অব্দে) "সতী ময়নাবতী ও লোর চন্দ্রানী" রচনা করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ক'রবার পূর্ব্বেই মারা যান। তা পুরা করেন সৈয়দ আলাউল। সৈয়দ আলাউল মধ্য যুগের বাঙালী মুস্‌লিম সাহিত্যিকদের মাথার তাজ। তিনি আরবী, পারসী, উর্দ্দু, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রথম রচনা "পদ্মাবতী" আরাকান রাজ থদো মিন্তার রাজার রাজত্ব সময়ে (১৬৪৫-১৬৫২ খ্রীঃ অব্দে) খুব সেকেলে ব'লেই এঁদের নাম করলাম। এঁদের ছাড়াও অসংখ্য কবি, গায়ক ও লেখক বরাবরই বাংলা ভাষায়ই তাঁদের রচনা প্রকাশ করে ধন্য হ'য়েছেন। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেনের ও বন্ধুবর মৌলভী আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদের প্রসাদে তাঁদের অনেকের খবর আমরা পেয়েছি। আজ আমরা কেমন ক'রে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করতে পারি? তিন শতাব্দীর পূর্ব্বের কবি ক্বাযী দৌলতের বাংলার নমুনা দেখুন ঃ

বিছমিল্লা প্রধানেক নাম নিরঞ্জন।
যে নাম স্মরণে কার্য্য সিদ্ধি সর্ব্বক্ষণ ॥
কি করিব যমদূতে বিপক্ষ বিবাদ।
সর্ব্বসিদ্ধি জয় জয় সে নাম প্রসাদ ॥
রহমান নাম অর্থ করুণা সদায়।
যে নাম স্মরণে দুঃখ দারিদ্র্য খণ্ডায় ॥
সুজন দুর্জ্জন আদি যত জীব-জান।
ভক্ষকেরে কুশলে করান্ত ভক্ষ দান ॥
রহিম নামের অর্থ কি কহিমু আর।
দীন দয়াময় প্রভু মহিমা অপার ॥
দয়ার সাগর প্রভু পতিত পাবন।
দুঃখী পাপী নৃপতির সহায় কারণ ॥
লীলায় পাপের মূল করয় বিনাশ।
তূলা রাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ ॥

এক শ্রেণীর কাছে বাংলা ভাষা বল্‌তে বোঝায় অনুস্বার বিসর্গ ছাড়া সংস্কৃত। বাংলার সৌভাগ্য সে-শ্রেণী এখন এক রকম লোপ পেয়েছে। তেমনি অন্য দিকে আর এক শ্রেণী আছে তাদের কাছে বাংলা মানে আরবী-ফারসী উর্দ্দু-বাংলার এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী। দুই রকমের দুটো উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

www.pathagar.com

১ নম্বর

চমকি বিশ্ব নব-বীর্য-সূর্য্য নৃপ রজনি-রাজ্য অবসন্নে,
উদিত উদয়-গিরি-কনক-মরু 'পরি গঞ্জি মঞ্জমণিবর্ণে।
দীপ্ত রশ্মিচয় সৈন্য নিচয় সম, (বিষম যুগাগ্নি বিনিন্দে)
ভস্মিল হতকর-পতিত-রজনিকর যোদ্ধ নিকর উড়ু বৃন্দে।

২ নম্বর

হল্‌কুমে হানে তেগ ও কে ব'সে ছাতিতে?
আফতাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে!
আসমান ভ'রে গেল গোধূলিতে দুপুরে,
লাল নীল খুন ঝরে কুফারের উপরে!

এই দু'দলের হাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে হবে। তবেই বাংলার প্রাণ বাঁচবে। তা না হ'লে বাংলা ম'রে ভূত হ'য়ে যাবে—একটা নয় দুটো। একটী ব্রহ্ম দৈত্যি, আর একটা মামদো। আমরা জীবন্ত বাংলাকেই চাই, তার ভূতকে নয়।

টেকচাঁদ, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষার অনেকটা সংস্কার হয়েছে। এখন কিছু বাকী ভাষার দিক দিয়ে। কিন্তু বাংলার বানান বিভীষিকা এখনও ঘোচে নি। সেখানে মস্ত বড় একটা সংস্কারের দরকার। সংস্কৃতের দুটো ব বাংলায় একাকার হ'য়ে বানান সংস্কারের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। তিনটে শ, ষ, স দু'টো ণ, ন দু'টো জ, য এদেরও একাকারের দরকার আছে। বানান সংস্কারের নযীর পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে পাওয়া যাবে। কিন্তু কারো ত সাহসে কুলায় না। ব্রহ্মশাপের ভয়ে নাকি!

খালি বানানে নয়, অক্ষরেও তার সংস্কারের দরকার আছে। যুক্তাক্ষরগুলি অনেক স্থলেই রাসায়নিক মিশ্রণের মত হ'য়ে আছে। এতে যে খুঁট আখুরে ছেলেমেয়ের প্রাণান্ত হ'য়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বাংলা যখন ইংরেজি ফরাসী আদি ভাষার মতন পৃথিবীর একটা গণ্য-মান্য ভাষা হ'য়ে উঠবে, তখন হয়ত লাতিন হরফ চালাতে হবে। আপাততঃ যুক্তাক্ষরের একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মতটা সকলে মেনে নিলেই গোলমাল চুকে যায়। কিন্তু আমরা এমনই প্রাচীন পন্থার যে এই সংস্কারটুকুও বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নই।

আমরা অনেকবার বলেছি মুস্‌লিম সাহিত্য। কেউ হয়ত বল্‌তে পারেন "কি গোঁড়ামি! সাহিত্যেও আবার জা'ত বিচার।" তাই একটু খোলাসা ক'রে বলা দরকার—মুস্‌লিম সাহিত্য বল্‌তে কি বুঝি। আমাদের ঘর ও পর, আমাদের সুখ ও দুঃখ, আমাদের আশা ও ভরসা, আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য, তাই আমাদের সাহিত্য। কেবল লেখক মুসলমান হ'লেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতায়, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুর্‌আন ও হাদীস, মুস্‌লিম ইতিহাস ও মুস্‌লিম জীবনী থেকে। হিন্দুর সাহিত্য রস

www.pathagar.com

সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য কর্‌বে মুস্‌লিম সমাজ থেকে। এই সাহিত্যের ভিতর দিয়েই বাংলা হিন্দু মুস্‌লমানের চেনা পরিচয় হবে। চেনা হ'লেই ভাব হবে। "To know is to love," এই সেদিন দীনেশবাবু বলেছেন, "যদি মুসলমানগণ তাঁহাদের সমাজের উন্নত চরিত্রগুলি সুন্দর মহিমান্বিত বর্ণে চিত্রিত করিয়া বাংলা-সাহিত্যে উপস্থিত করেন, তবে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবেন।" আমরা একেই বাংলার মুস্‌লিম সাহিত্য বলি। হিন্দু সাহিত্য ও মুস্‌লিম সাহিত্য হিন্দু মন্দির ও মুসলমানের মসজিদের মত এক সম্প্রদায়ের একচেটে জিনিস নয়। সুহৃদ্বর সত্যেন্দ্র দত্ত, ভক্তি ভাজন গিরিশচন্দ্র সেন, মাননীয় কৃষ্ণ কুমার মিত্র, শ্রদ্ধেয় জলধর সেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি হিন্দু লেখকও অনেক মুসলমান সাহিত্য রচনা করেছেন। বাস্তবিক বাংলা সাহিত্য বাংলার হিন্দু মুসলমানের অক্ষয় মিলন মন্দির হবে। হিন্দু-সাহিত্য ও মুস্‌লিম সাহিত্য হবে তার দুই কুঠরী। সর্ব্বত্রই সকলের অবাধ প্রবেশ অধিকার। যে পর্য্যন্ত মুস্‌লিম-সাহিত্য না গড়ে উঠ্‌ছে সে পর্য্যন্ত মিলন মন্দির পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না।

তবে, এস, হিন্দু ও মুসলমান! এস সাহিত্যিক ও সাহিত্য ভক্ত! এস কবি ও গায়ক! এস ঐতিহাসিক ও দার্শনিক! আমরা এই মিলন মন্দির গড়ে তুলি। এস কিশোর কিশোরী, এস তরুণ তরুণী, এস জরৎ জরতী, এই মিলন-মন্দিরে এক মন হয়ে মুক্তি সাধনা করি। এখন ঋষি-কবির ভাষায় প্রার্থনা ক'রে আমার অভিভাষণ শেষ করি ঃ

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস শর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি',
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হ'তে
উচ্ছসিয়া উঠে, যেথা নির্ব্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থ তায়;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালি রাশি
বিচারের স্রোতঃ পথ ফেলে নাই গ্রাসি',
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি' পিতঃ
আমাদের সেই স্বর্গে ক'র জাগরিত।

www.pathagar.com

বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য
মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্মঃ ১৮ কার্তিক ১২৯৫; (১৮৮৮) মাগুরাডাঙ্গা গ্রাম, পাংশা, ফরিদপুর। মৃত্যুঃ ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০। পেশাঃ সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতা।
প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ধর্মের কাহিনী (১৯১৪), নূরবনী (১৯১৮), শান্তিধারা (১৯১৯), মানব মুকুট (১৯২২) প্রভৃতি।
লেখা-পরিচিতি ঃ কোহিনূর, মাঘ ১৩২২ সালে প্রকাশিত।

মাতৃভাষা

বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা দিনের আলোর মত সত্য। ভারতব্যাপী জাতীয়তা সৃষ্টির অনুরোধে বঙ্গদেশে উর্দ্দূ চালাইবার প্রয়োজন যতই অভিপ্রেত হোক না কেন, সে চেষ্টা আকাশে ঘর বাঁধিবার ন্যায় নিষ্ফল। বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞানহীন মৌলবী সাহেবগণের বিদ্যা ও বঙ্গদেশে উর্দ্দূ পত্রিকার বিফলতা তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। বাঙ্গালী মুসলমানকে বাঙ্গালা ছাড়িয়া উর্দ্দূ পড়িতে বলাও যা, আর তাহাদিগকে প্রতি বেলা ভাতের পরিবর্ত্তে রুটী খাইতে বলাও তাই। যিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন তিনি বোধ হয় নদীর স্রোতও পাহাড়ের দিকে ফিরাইয়া দিতে পারেন।

বাঙ্গালার অধিকাংশ মুসলমান কুটিরবাসী কৃষক। তাহারা উর্দ্দূতে কথা কহিবে ও কাজকর্ম্ম চালাইবে? বাঙ্গালী শিশু মাতৃদুগ্ধের সহিত উর্দ্দূ বুলি গলাধঃকরণ করিবে? এইরূপ অস্বাভাবিক চেষ্টার সফলতায় জাতীয় শক্তি ব্যয় করা নিদারুণ মূর্খতা মাত্র।

সুখের বিষয় এই অদ্ভুত চেষ্টার গতি থামিয়া গিয়াছে এবং তাহার শিকড় শুকাইয়া যাইতে বসিয়াছে। ভাল হউক বা মন্দ হউক, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা মানিয়া লইয়াই জাতীয়তা পুষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জাতীয়তার অনুরোধও উর্দ্দূ ভাষাকে বাঙ্গালায় আর বলবতী করিতে পারিতেছে না। কেননা আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সমস্ত বাঙ্গালী মুসলমানগণ লীগ্ কনফারেন্সে যোগদান করিতেছেন তাহারা ইংরেজীর সহায়তায় বেশ কাজ চালাইয়া লইতে পারিতেছেন। যাঁহারা উর্দ্দূ জানেন না তাঁহাদের পক্ষেও ভাবের আদানপ্রদানে ব্যঘাত ঘটিতেছে না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরেজী ভালরূপে বলিতে না পারিলেও উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন। পক্ষান্তরে সুশিক্ষিত গ্রাজুয়েটগণও উর্দ্দূ বুঝিতে অক্ষম নহেন। তাঁহারা উর্দ্দূর আলোচনা না করিলেও জাতীয় স্বার্থসংক্রান্ত রাজনীতি ঘটিত ব্যাপারের আলোচনা উর্দ্দূতে হইলেও বুঝিতে পারেন। জাতীয় ব্যাপারের আলোচনা এখন একরূপ ইংরেজী ভাষাতেই নির্ব্বাহিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন সুশিক্ষিত

www.pathagar.com

বাঙ্গালী মৌলবী একথাও তুলিয়াছেন যে, সভা সমিতিতে যেমন ইংরেজীর সহিত উর্দ্দূতেও বক্তৃতা করা চলে, তেমন বাঙ্গালাতেও ভাব প্রকাশ করিবার প্রথা চালান হউক।

বাঙ্গালার কোটী কোটী কৃষক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের ধার ধারে না। যাঁহারা মুসলমানের জাতীয় স্বার্থ লইয়া চিন্তা ও আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই ইংরেজীতে কাজ চালাইতে সক্ষম আছেন ও ভবিষ্যতেও হইবেন; তাঁহাদিগকে উর্দ্দূর জন্য ভাবিতে হইবে না। সুতরাং জনসাধারণকে উর্দ্দূশিক্ষা হইতে নিষ্কৃতি দিলে নিশ্চয়ই জাতীয়তা-বৃদ্ধির অনিষ্ট হইবে না।

সাহিত্যের ভাষা

বিরুদ্ধ চেষ্টা যাহাই হউক না কেন, বাঙ্গালাভাষা মুসলমান সমাজে আপন বলে পথ কাটিয়া অগ্রসর হইতেছে। মুসলমানেরা রীতিমতভাবে বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন। কে কোথায় কি করিতেছেন বা বলিতেছেন তাহার অপেক্ষায় সাহিত্যসেবিগণ বসিয়া থাকিতেছেন না। বাঙ্গালা মুসলমানের মাতৃভাষা কি না, বা বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানদিগের সাহিত্য-চর্চ্চা করা উচিত কি না, ইহা আলোচনা করিবার সময় এখন আর নাই; এখন ইহাই ঠিক করিতে হইবে যে বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যের ভাষা কিরূপ আকারের হইবে বা তাহাদিগকে সাহিত্য-চর্চ্চা কোন্ পথে পরিচালিত করিলে জাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক হইবে।

আমাদের সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে এই একটা কথা উঠিয়াছে যে, আমরা বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিব না; কারণ ইহা বুঝিতে আমাদের কষ্ট হয়। পক্ষান্তরে আমরা গৃহে ও সমাজে, কথাবার্ত্তা কাজ কারবারে যে সমস্ত আরবী ও পার্শী শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, সেগুলি আমরা সাহিত্যে অবাধে চালাইতে চাই। কারণ ঐ সমস্ত শব্দ আমাদের বালকেরা ও আমরা অতি সহজে বুঝিতে পারি।

এই প্রশ্নের মীমাংসা করা অত্যন্ত কঠিন। যুক্তিবলে যে ইহা কেহ সম্পন্ন করিতে পারিবেন তাহাও নিতান্ত সন্দেহের বিষয়। এই প্রশ্নের মীমাংসা অন্য একটি বৃহত্তর প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে এবং তাহা লইয়া হিন্দু সাহিত্যিক মণ্ডলে বহুদিন ধরিয়া তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে।

এই প্রশ্ন সাহিত্যে ব্যবহারের জন্য সাধুভাষা ও চলিত ভাষা লইয়া বিবাদ। একজন সাহিত্যিকের মতে সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃত অনুযায়ী বিশুদ্ধ ও উন্নত রাখিতে হইবে; কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত ও দেশ-প্রচলিত সামান্য গ্রাম্য শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না, যিনি ব্যবহার করিবেন তাঁহাকে শাসন করা যাইবে। কারণ চলিত ভাষা বঙ্গদেশে নানা প্রকারের; উহা চালাইলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নানা রূপ ধারণ করিবে এবং ভাষাও নিতান্ত হীন ও দুর্ব্বল হইয়া উঠিবে। সাহিত্যের ভাষা আদর্শ সুন্দর, সতেজ ও শিক্ষনীয় রাখা চাই। এই যুক্তি প্রবল হইলে আমাদের কিছু বলিবার নাই।

অন্যদল চলিত ভাষার পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথ এই দলের গুরু। ইঁহারা বলেন চলিত কথা আমরা আমাদের সাহিত্যে বেশী করিয়া ব্যবহার করিব, কারণ তাহাই খাঁটি বাঙ্গালা

www.pathagar.com

এবং তাহাতেই ভাল করিয়া ভাব ফুটে, লোকেও সহজে বুঝিতে পারে। লোকে পড়িবে বলিয়াই ত লেখা। যেমন করিয়া বলিলে আমাদের মনের কথাটা বিনা চেষ্টায় প্রকাশ পায়, কলম আপনা আপনি চলে, শব্দের জন্য ভাবিতে হয় না, আমরা তেমন করিয়াই বলিব। শুধু তাহাই নয়, কথা আমরা যেমন করিয়া উচ্চারণ করি, সাহিত্যও তেমন করিয়াই লিখিব। ফলে এই শ্রেণীর লোকগণের দ্বারা বহু গ্রাম্য ইতর জনোচিত শব্দ সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় এমন কোন চলতি শব্দ নাই যাহা ইঁহারা ব্যবহার করেন না। ইঁহারা 'রন্ধন গৃহ' ত দূরের কথা 'পাকশালা' 'রান্নাঘর' পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া 'হেঁসেলে' ঢুকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের কাছে 'নবীন' ত একরকম তীরস্থ, 'নূতন' পর্য্যন্ত 'নতুন হইয়া দেখা দিয়াছে। 'পুচ্ছ' উহ্য রহিয়াছে, এবং 'লেজের' মধ্য দিয়া তাহার কেবল 'ল্যাজা'টুকু দেখা যাইতেছে। ওদিকে 'মুড়ো' মহাশয় 'প্রান্তের' উপর দৃঢ়ভাবে আসন গাড়িয়া বসিয়াছেন।

এখন মুসলমানেরা যদি ইঁহাদের দেখাদেখি আপনাদের নিত্য ব্যবহার্য্য শব্দগুলি সাহিত্যে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে এই শ্রেণীর লেখকদিগকে তাহাতে বাধা দিবার অণুমাত্র উপায় ও অধিকার নাই। তাঁহারা যদি ব্যবহারের দোহাই দিয়া ঐ সমস্ত নিতান্ত জঘন্য শব্দ সাহিত্যে চালাইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা 'জল' না লিখিয়া 'পানি' লিখিলে বা 'নিমন্ত্রণের' পরিবর্তে 'দাওৎ' করিলে, 'বে আক্কেলির দরুন' কোন কাজে 'লোকসান' হইলে 'অনুতাপ' না করিয়া যদি 'আবসোস' করি এবং কোন বিষয় হইতে ফল প্রাপ্তির আশা না করিয়া 'ফায়দা' উঠাইবার জন্য 'কোশেশ' করি, তাহা হইলে এই সমস্ত কথ্যভাষা চালাইবার পক্ষপাতী হিন্দু লেখকগণের আপত্তি করিবার কি অধিকার আছে?

তাহারা যে একেবারে "নাচার" হইয়া পড়িবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ আমরা ত আমাদের ঘরে বাহিরে আচারে অনুষ্ঠানে মজলিষে ও দরবারে এই সমস্ত শব্দই দিনরাত ব্যবহার করিয়া থাকি।

কিন্তু সাধুভাষা ও চলতিভাষার এই বিবাদের নিষ্পত্তি হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, "আমরা যাহা বলি তাহাই লিখিব" এই মতের পক্ষপাতী লেখকগণ এখনও হিন্দু সাহিত্যিক মণ্ডলে একরূপ উপহাসের পাত্র হইয়া আছেন। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বঙ্গভাষার সমুদয় শক্তিশালী সাহিত্যিকগণ বিশুদ্ধ রচনারীতিতে সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। 'প্রবাসী'র কোন কোন প্রবন্ধ ব্যতীত বঙ্গের অধিকাংশ মাসিক ও সমুদয় সাপ্তাহিক পত্র বিশুদ্ধ সাধুভাষায় লিখিত হয়। সুতরাং জোর করিয়া বা যুক্তি দ্বারা প্রচলিত ও অপ্রচলিত অজস্র আরবী পার্শী শব্দ সাহিত্যের ভাষায় ব্যবহার করিয়া বর্ত্তমান বঙ্গভাষা হইতে পৃথক আর একটি নূতন বঙ্গভাষার সৃষ্টি করিতে যাওয়া সমীচীন কিনা তৎসম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ বিদ্যমান। এইরূপ চেষ্টায় আমরা যে বর্ত্তমান সমৃদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের আনন্দ ও সৌন্দর্য হইতে অনেকাংশে বঞ্চিত হইব তাহাই নহে, সে চেষ্টায়

www.pathagar.com

আমাদের বহুশক্তি ব্যয়িত হইয়া যাইবে। এবং আমরা আরম্ভেই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিব। পরন্তু যুক্তির বলে ঐ সমস্ত শব্দ চালাইলেই যে সাহিত্যের ভাষার সৃষ্টি হইবে এরূপ মনে করাও ভুল। তজ্জন্য ক্ষণজন্মা লেখকের উন্মাদিনী প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শের অপেক্ষা করিতে হইবে। শব্দ লিখিলেই হইবে না; সুন্দর করিয়া লেখা চাই। সে শব্দ এরূপ বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করিতে হইবে এবং তাহার এরূপ টান থাকা চাই যে শুনামাত্র ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হয় এবং মোহমুগ্ধ মন অজ্ঞাতসারে সে শব্দকে নিঃশেষে গ্রহণ করে, মন যেন অপরিচিত কোন কিছুর আভাষ পাইয়া কিছুমাত্র সন্দিগ্ধ হইবার অবকাশ না পায়। আজ যে বঙ্গসাহিত্যে কয়েকখানি মাসিক পত্রে ও পুস্তকে দেশ-প্রচলিত খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ অজস্র পরিমাণে ব্যবহার হইতেছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ইন্দ্রজালই তাহার কারণ, তাঁহার প্রতিভার ইন্দ্রজাল না থাকিলে ঐ সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিতে কখনই কেহ সাহস করিত না। তিনি যাহা লেখেন তাহাই মিষ্ট শুনায়,—তজ্জন্যই দেশজ শব্দ সাহিত্যে চলিয়া যাইতেছে।

আমরা মুসলমান ঐক্যের উপাসক। সকল কাজেই ঐক্য সমন্বয়ের আমরা পক্ষপাতী। বিভিন্ন জেলার দেশ-প্রচলিত কথ্যশব্দ প্রচলনে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নানামূর্ত্তি গ্রহণ করুক ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। বঙ্গভাষা একে নিতান্ত কোমল প্রকৃতির; তাহার উপরে নিতান্ত মৃদু খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের একাধিপত্য ঘটিলে বঙ্গভাষা একরূপ অবলার ভাষা হইয়া পড়িবে। মুসলমানের নিকট এরূপ নীতি মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

তবে এক বিষয়ে আমাদের ধারণা অত্যন্ত পরিষ্কার। ভাষাকে মুসলমানী করিবার চেষ্টায় শক্তিক্ষয় না করিয়া বঙ্গভাষার ভাবের ঘরে মুসলমানী প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ গুণে প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই আসল কথা। বাঙ্গালা ভাষার যে সমস্ত শব্দ আমাদের ধর্ম্মমতে বিরুদ্ধ ভাব সম্পন্ন তাহা আমরা কখনও ব্যবহার করিব না; পক্ষান্তরে যে সমস্ত শব্দ আমাদের জাতীয় ভাব প্রকাশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে আমরা তৎপরিবর্ত্তে আরবী বা পারশী শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করিব। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা যাউক।

বাঙ্গালায় "হস্তমুখ প্রক্ষালন" বলিলে যাহা বুঝায় মুসলমানের "ওজু" তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। হিন্দুর উপসনার আসন ও মুসলমানের "মোছল্লা" বা "জায়নামাজ" ভিন্ন পদার্থ। হিন্দুর "উপাসনা" ও "উপবাস" মুসলমানের "নামাজ" ও "রোজার" ভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ। মুসলমানের "কেবলা নিয়ত ও 'ইমানের' প্রতিশব্দ বঙ্গভাষায় অজ্ঞাত। "বেহেস্ত ও দোজখের" পরিবর্ত্তে "স্বর্গ ও নরক" "হালাল ও হারামের" পরিবর্ত্তে "বৈধ ও অবৈধ", "গোছল ও খানার" পরিবর্ত্তে "স্নান ও আহার" অবশ্য চলিতে পারে।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানের স্থান

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন

লেখক-পরিচিতি : জন্ম : ১৮৮৯ পাইকারদী, নন্দিপুর, কুমিল্লা। মৃত্যু : ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪০১, ২১ মে ১৯৯৪। শিক্ষা : দশম শ্রেণী পর্যন্ত। পেশা : ১৯১৮ সালে সওগাত পত্রিকার প্রকাশ এবং সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সওগাত সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : শিরি ফরহাদ (১৯১৮)। আল্লার নবী মোহাম্মদ (দ:), বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম প্রভৃতি।

লেখা-পরিচিতি ঃ 'সওগাত' প্রত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান শীর্ষক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়। 'সওগাতে' প্রকাশিত এই লেখাগুলোকে কেন্দ্র করে নাসিরউদ্দীন লিখেছিলেন চারটি সম্পাদকীয় মন্তব্য। এগুলো হচ্ছে ঃ ১. 'আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে সমস্যা এবং তার সমাধান', ২. 'বাঙ্গলা ভাষা ও মুসলমানী শব্দ', ৩. 'ঈশ্বর শব্দের ব্যবহার', এবং ৪. 'বাংলাভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানের স্থান'। তাঁর প্রতিটি উদ্ধৃতিতে এবং ব্যক্তিগত মন্তব্যে রয়েছে আমাদের জাতীয় চেতনার ছাপ। রয়েছে স্বতন্ত্র এক দৃষ্টিভঙ্গী। বিষয়ের গুরুত্বের কারণে 'বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ' (১৯৮৫) সংকলন থেকে সংগৃহীত লেখাগুলোর সমন্বয়ে একটি শিরোনামে গ্রন্থভূক্ত করা হলো।

আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে সমস্যা এবং তার সমাধান

সে কালে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় লিখিত বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা মুসলমান সমাজে সমাদৃত হয়নি। কি কি কারণে বাঙালী মুসলমানরা "বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা"র প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিল, কেন তারা এরূপ ভাষায় মুদ্রিত পত্র-পত্রিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি, নব পর্যায়ের 'সওগাত' বের করার প্রাক্কালে আমরা তার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলাম।

তৎকালের সাহিত্যিক ও সমাজসেবী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ বিদ্যাসাগর যুগের বিশুদ্ধ বাংলায় প্রবন্ধাদি লিখতেন। ১৮৯১ সালে তিনি "ইসলাম প্রচারক" নামে একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিছুকাল পরে পত্রিকাখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। তখন আত্মনিবেদনে সম্পাদক মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ বলেন ঃ

"কতকগুলো গুরুতর কারণ পরম্পরায় এই পত্রিকাখানি এতদিন বন্ধ ছিল!.... এক শ্রেণীর লোক ভাল বাঙ্গালা জানা, আর এক শ্রেণীর লোক সাধারণ বাঙ্গালা জানা। সাধারণ বাঙ্গালা জানা লোকের সংখ্যাই অধিক।... ইহারা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় পত্রিকাদি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন। এই শ্রেণীর লোকেরা "ইসলামী বাঙ্গালা" অর্থাৎ মুসলমানী পুঁথিগুলির ভাষা খুব পছন্দ করেন।"

১৯০১ সালে উক্ত পত্রিকায় এস, ইসমাইল হোসেন সিরাজী মুসলমানদের কাছে আবেদন করেন ঃ

"মাতৃভাষা প্রাণের ভাষা— ইহা অতি পবিত্র। ইহার সেবা না করিলে অধর্ম্ম হয়। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে।... ভ্রাতঃ বঙ্গীয়

www.pathagar.com

মুসলমান! বাঙ্গালা ভাষাকে অবহেলো এবং অশ্রদ্ধা না করিয়া ইহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হও।"

কিন্তু এরূপ আবেদনেও ফল লাভ হয়নি। যে বাংলা ভাষায় তাদের কথিত শব্দের ব্যবহার নেই সেরূপ ভাষাকে মুসলমানরা নিজেদের ভাষা বলে গ্রহণ করলো না।

১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত পত্রিকায় সুসাহিত্যিক মৌলবী ওসমান আলী বি, এল বলেন ঃ

"সত্যই কি মুসলমান হিন্দুদের ঘৃণার পাত্র? বিধাতার ইচ্ছাক্রমে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান একই বন্ধনে আবদ্ধ, একই নিয়মে শাসিত ও পরিচালিত।... কিন্তু হিন্দুমাত্রেই সাধারণতঃ মুসলমানের নাম শ্রবণ করিবামাত্র উৎকৃষ্ট ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। বাঙ্গলা ভাষাকেও তাঁহারা মুসলমান বর্জ্জিত করিতে চাহেন এবং এই কারণেই বিশুদ্ধ ভাষার প্রতি মুসলমানদের এত অবজ্ঞা।"

সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত 'নবনূর' পত্রিকায় (১৯০৩ সালের ৫ম সংখ্যা) "মুসলমানদের প্রতি হিন্দু লেখকগণের "অত্যাচার" শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয় ঃ

"এখনকার বাঙ্গলা ভাষা হিন্দুগণের ভাষা। সুতরাং হিন্দুগণই যে বঙ্গ সাহিত্য চর্চায় অগ্রণী ও প্রধান হইবেন, ইহা কিছুই অস্বাভাবিক নহে।... সাহিত্যরথী সুধীপ্রবর বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নগণ্য পুঁটিরাম পর্য্যন্ত মুসলমান সমাজের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া জগতের চক্ষে তৎসমাজকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিবার প্রয়াসী হইয়াছেন এবং হইতেছেন।"

কি কি কারণে বাংলার মুসলমান সমাজ "বিশুদ্ধ" বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি, উপরের মন্তব্যগুলিতে তার নিদর্শন পাওয়া যায় এবং এ কারণেই "বাবু ভাষায়" লিখিত পত্র-পত্রিকা তারা পছন্দ করেনি। তারা এরূপ ধরনের ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা বলে আখ্যায়িত করে। তৎকালে প্রকাশিত মুসলমানদের এরূপ ভাষায় প্রকাশিত কোনো পত্রিকাই বেশী দিন স্থায়ী থাকেনি।

এই পরিস্থিতিতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, মুসলমানদের রুচি অনুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করলে তা' অবশ্যই সমাদৃত হবে।

মুসলমান সমাজের অভাব-অভিযোগ ও তাদের সমস্যাবলী বিবেচনা করে তাদের আশা-আকাংখা অনুযায়ী সাহিত্য গঠনের কাজে আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে 'সওগাত' নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহের প্রাধান্য দিবে বলে স্থির করা হলো ঃ

১। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের স্থান নির্ধারণ করা এবং বাঙালী মুসলমানদের নিত্য ব্যবহার্য শব্দ আমাদের ভাষায় প্রয়োগ করে একে শক্তিশালী করা।

২। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমানদের রুচি অনুযায়ী ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি করলে তা' জন-ভাষা ও জন-সাহিত্য হবে কি না— এবং তা' জাতীয় সমাজ-গঠনে সহায়ক হবে কিনা— এ সব বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা।

www.pathagar.com

৩। যুগোপযোগী একদল প্রগতিশীল লেখক সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা।

৪। সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ দূর করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। হিন্দু-মুসলমানের বর্তমান মতবিরোধ ও তাদের মধ্যে সংঘটিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিরসনের জন্যও এরূপ প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

৫। সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ভাব ও ভাষার সংমিশ্রণ ঘটলে তা-ই হবে বাঙালীর জন-ভাষা ও জন-সাহিত্য। এতে উভয়ের মিলনের ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হবে। হিন্দু জল লিখলে বা মুসলমান পানি লিখলে ভাষার বিশুদ্ধতা নষ্ট হবে না, এ বিশ্বাসে অটল থাকা।

মুসলমানদেরকে বাংলা সাহিত্যের প্রতি অধিক আকৃষ্ট করার জন্য তাদের কথিত শব্দ আমাদের ভাষায় ব্যবহার করা কর্তব্য। এ নিয়ে আমি তৎকালীন চিন্তাশীল মুসলমান লেখকদের সংগে আলাপ-আলোচনা শুরু করলাম।

প্রথমে এ সম্পর্কে আমি যাঁদের সংগে আলোচনা করেছিলাম তাঁদের মধ্যে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল মনসুর আহমদ, এয়াকুব আলী চৌধুরী, কবি শাহাদাৎ হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কাজী নজরুল ইসলাম, এস. ওয়াজেদ আলী বার-এট-ল, অধ্যাপক আবদুল মজিদ, হাবিবউল্লাহ্ বাহার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী আমাদের ভাষা সম্পর্কে সওগাতের নীতি সমর্থন করে অভিমত প্রকাশ করলেন ঃ

"হিন্দুর প্রাচীনতম সভ্যতার উপর ভিত্তি করেই তাঁরা বর্তমান বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। হিন্দু সভ্যতার সাথে ইসলামী সভ্যতার কোন মিল নেই। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের স্বজাতীয়তা লোপের সম্ভাবনা রয়েছে বলেই আমাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার দ্বারা নতুন সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে।

"হিন্দু লেখকগণ বাংলা ভাষা থেকে মুসলমানী শব্দগুলি ছেঁটে ফেলছেন। বাংলাকে জনভাষা করতে হলে এরূপ ছাঁটাই করা চলবে না। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে মুসলমানরা যে সব প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেন, সেগুলি বুঝতে হিন্দু জনগণের কোথাও বাধা হয়না। এ ভাষায় সাহিত্য গঠন করলে মুসলমান সমাজ অন্তরের সাথে তা' গ্রহণ করবে। অবশ্য জোর করে দুর্বোধ্য নতুন নতুন আরবী-ফারসী শব্দ বাংলায় ঢোকানো উচিত হবে না। যা চলিত আছে তা-ই ব্যবহার করতে হবে।"

আবুল মনসুর আহমদসহ অন্যান্যদের অভিমতও এরূপই পাওয়া গেল। আমাদের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে লিখবার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হলেন।

আমাদের সাহিত্যিক মহলে আলোচনা শুরু হবার সাথে সাথেই "বাংলা ভাষায় মুসলমানী শব্দ", "বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান" ইত্যাদি নানা প্রবন্ধ ও আলোচনা আমার হস্তগত হতে লাগলো। নব পর্যায় সওগাতের প্রথম সংখ্যা থেকেই সেগুলি ছাপা আরম্ভ হয়।

www.pathagar.com

হিন্দু সমাজের কতিপয় উদার মনোভাবাপন্ন কবি-সাহিত্যিকও মুসলমানদেরকে সাহিত্য কর্মে উৎসাহিত করার জন্য এরূপ পদক্ষেপ সমর্থন করলেন।

বাঙালী মুসলমানের ভাষা সাহিত্য সম্পর্কে যখন সওগাতে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছিলাম, তখন ভাবতে পারিনি যে, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের লেখকগণ এ বিষয়ে এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনামূলক প্রবন্ধ লিখবেন। প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু আমাদের সমাজ অত্যন্ত গুরুত্ব ও আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছিল এবং এর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল।

বাঙালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সওগাতে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। পূর্বপুরুষ থেকে আজ পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশের অধিবাসী, পূর্বপুরুষ থেকে আজ পর্যন্ত আমরা বাংলাভাষায়ই কথা বলে আসছি, বাংলাই আমাদের মাতৃভাষা এবং বাংলা সাহিত্যই আমাদের সাহিত্য। আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি কি প্রকারে করা সম্ভব সে বিষয়েও আমাদের লেখকগণ আলোচনা করেছেন। 'সওগাত' সাধ্যমতো এই আলোচনার ধারা প্রচার করেছে এবং অবিলম্বে তার সুফল পাওয়া গেছে। আমাদের লেখকগণ নবউদ্যমে ভাষা ও সাহিত্য গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। আমাদের সাহিত্য ও সাহিত্যিক সৃষ্টির গতি অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলে।

এ সময়ে আমাদের লেখকগণ কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় মুসলামনী শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে লিখেই ক্ষান্ত হন নি। তাঁরা বাংলা ব্যাকরণ সমস্যা, বাংলা বর্ণমালার কথা এবং বাংলা সাহিত্যে পরিভাষা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও বহু প্রবন্ধ সওগাতে লিখেছেন। সর্বোপরি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমানের ভাষা ছাড়া যে বাংলা তথা জন-সাহিত্যের গঠন হতে পারে না, এ বিষয়ে আমরা সকলেই দৃঢ় মত পোষণ করেছিলাম।

জন-সাহিত্য সম্পর্কে কবি কাজী নজরুল ইসলামের অভিমত এই যে— "সাহিত্যের সবারই প্রয়োজন আছে। জন-সাহিত্যের উদ্দেশ্য হোল জনগণের মতবাদ সৃষ্টি এবং তাদের জন-রসের পরিবেশন করা। আজকাল সাম্প্রদায়িক ব্যাপারটা জনগণের একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সমাধানও জন-সাহিত্যের একটা দিক। উপদেশের শিলাবৃষ্টির দ্বারা জনগণের মনের উপর কোন ছাপ পড়ে না। ...তাদের মত ভেবে, তাদের কথা তাদের গল্প বলুন। আপনাদের মুরব্বীয়ানা ভাব যেন প্রকাশ না পায় তার মধ্যে। তা হলে তারা পালিয়ে যাবে। চাষারাও আয়না রাখে নিজেদের চেহারা যদি তাতে দেখতে পায়।

জনসাধারণের যা সমস্যা তা সাহিত্যিকরাই সমাধান করতে পারবেন। জনগণের সাথে সম্বন্ধ করতে হলে তাদের আত্মীয় হতে হবে। তারা আত্মীয়ের গালি সহ্য করতে পারে! কিন্তু অনাত্মীয়ের মধুর বুলিও গ্রাহ্য করে না। এ প্রয়োজন সিদ্ধ করবেন যে সাহিত্যিক, তিনিই হবেন জন-সাহিত্যিক।"

জন-ভাষায় নজরুলের লেখা কয়েকটি লাইন ঃ

www.pathagar.com

“গিন্নি-পাগল” চালের ফিরনী
তস্‌তরী ভ’রে নবীনা গিন্নি
হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে
খুশিতে কাঁপিছে হাত।
শিরনী রাঁধেন বড় বিবি, বাড়ী গন্ধে তেলেস্‌ মাত!”

নজরুলের বহু কবিতায় ও গানে জন-ভাষার অফুরন্ত প্রয়োগ রয়েছে।

কবি শাহাদাৎ হোসেনও নজরুলের এ ধরনের কবিতাগুলির প্রশংসা করতেন। তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশুদ্ধ ভাষায় কবিতা লিখতেন। পরবর্তীকালে নজরুলের ন্যায় তিনিও মুসলমানের ব্যবহৃত বহু শব্দ তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন। যেমন ঃ

এ কি আফ্‌সোস– ওরে বেদুইন দুর্জ্জয় মরুচর!
বলম তোর কেড়ে নিল কে রে ভেঙ্গে দিল খঞ্জর?

এ সময় থেকে আমাদের অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকরাও তাঁদের রচনায় মুসলমানদের নিত্য ব্যবহার্য শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে মুসলমানদের সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ না করলে বিরোধের সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ কারণে তৎকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সওগাতে প্রকাশিত আমাদের কতিপয় চিন্তাশীল লেখকের বক্তব্য এ অধ্যায়ে উদ্ধৃত করা হলো।

বাঙ্গলা ভাষা ও মুসলমানী শব্দ

উপরোক্ত নামে নবপর্যায়ের পৌষ, ১৩৩৩ সংখ্যা সওগাতে মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরীর একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। উক্ত প্রবন্ধের কতকাংশ উদ্ধৃত করা হ’ল:

“মুসলমান শাসন ও মুসলমান সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে এককালে বাঙ্গালী সমাজে ধর্ম্ম, সমাজ, সভ্যতা ও ভাষা বিষয়ে অভূতপূর্ব উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। সে যুগে মুসলমানী আদব-কায়দা, রীতি অনুসারে চলিতে মুসলমানী পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতে, মুসলমানী খানা খাইতে, আরবী-ফারসী, উর্দ্দু ভাষায় কথোকথন করিতে— এক কথায় মুসলিম সভ্যতার অনুকরণ করিতে ভারতের হিন্দুগণ, গৌরব বোধ করিতেন। এ সকল ইতিহাসের কথা। যে কোন পরাধীন জাতির পক্ষে অপেক্ষাকৃত সভ্য ও উন্নত বিজেতা জাতির অনুকরণ করা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু নিতান্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, অধুনা এ দেশের হিন্দু লেখকগণ মুসলমানী বলিতে যা কিছু সমস্তই বর্জ্জন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ...জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প ও সভ্যতার সকল স্তরে বর্জ্জন নীতির অনুকরণ করা আর জাতি হিসাবে আত্মঘাতি হওয়া একই কথা। বস্তুতঃ জাতিতে জাতিতে সভ্যতা ও ভাব বিনিময়ের ভিতরে চিরকাল উন্নতি ও কল্যাণের বীজ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং আমরা কিছুমাত্র চিন্তার অবসর না লইয়া এখনই ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে, ঐ গোঁড়া দলের অস্বাভাবিক প্রয়াস কদাচ সফল হইবে না; অধিকন্তু তাহাতে রাজনীতিক ব্যাপারের ন্যায় ভাষার ক্ষেত্রেও হিন্দু মুসলমানে ভীষণ দলাদলি ও সংঘর্ষ

www.pathagar.com

উপস্থিত হইবে। তাহাদের এই চেষ্টা বরং আংশিক সফল হইতে পারিত, যদি বাঙ্গলাদেশ হইতে সমস্ত জনসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশজন বাঙ্গালী মুসলমানকে বিতাড়িত ও নির্ব্বাসিত করা যাইত। কিন্তু যতদিন বাঙ্গলাদেশ আছে, ততদিন ত তাহা আদৌ সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে সংখ্যার দিক বিবেচনা করিলে বঙ্গভাষার উপর হিন্দুর চাইতে মুসলমানের দাবীই অগ্রগণ্য।

বাঙ্গলা ভাষার শত শত বৎসরাবধি এত অসংখ্যা আরবী-ফার্সী-উর্দ্দু ও তুর্কী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে যে, এখন তাহা কোন সংখ্যা দ্বারা নিরূপণ করা সহজ নহে। ফলতঃ ঐ সকল শব্দ বাঙ্গলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়া এমনি দায়াধিকার লাভ করিয়াছে যে, উহা আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু, তুর্কী ভাষার শব্দ, না খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ তাহা নির্ণয় করা ভাষাতত্ত্ববিদের পক্ষেও মুশকিল বিবেচিত হয়। ঐ সুপ্রচলিত উন্নত ভাষাসমূহ হইতে বিবিধ শব্দরাজি চয়ন করায় দীনা বঙ্গভাষা যথেষ্ট সম্পদশালী হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। এমন অনেক মুসলমানী শব্দ আছে, সেগুলি বঙ্গভাষা হইতে উঠাইয়া দিলে তদুপযোগী ভাব প্রকাশক সহজ বাঙ্গলা শব্দ পাওয়া যায় না। হাজার হাজার মুসলমানী শব্দ বাঙ্গলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, বাঙ্গলাদেশের অনেক স্কুল কলেজ ও পাঠশালার অধ্যাপক ও শিক্ষক মহাশয়রা বিজাতীয় ঘৃণা ও ভাষাতত্ত্বজ্ঞানের অভাব-বশতঃ মুসলমান ছাত্রদের রচনায় ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন। আর যে মুসলমান ছাত্র সাহস করিয়া "আল্লা", "খোদা", "রোজা", "নামাজ", "পানি", "ওজু" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে, শিক্ষক মহাশয়রা তাহাদের উপর খড়গহস্ত হইয়া উঠেন। ফলে তাহাদের দুর্গতির সীমা থাকে না।

ঐরূপ অস্বাভাবিক চেষ্টা স্কুল পাঠশালায়ই সীমাবদ্ধ তাহা নহে, সংক্রামক রোগের ন্যায় উহা মহামনীষীদের পুণ্যপীঠ বহু বিদ্বজ্জন-সমাবেশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও বিসপিত হইয়াছে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বপণ্ডিতগণ বিচক্ষণ মালীর ন্যায় বা পাকা ঝাড়ুদারের মতো বঙ্গভাষা হইতে মুসলমানী শব্দের আবর্জ্জনা-জাল সরাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

১১ই ভাদ্র, ১৩৩১ সালের 'বসুমতী' এ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা এ স্থলে অবিকল তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 'বসুমতী' লিখিয়াছেন— "বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্ব্বাচন কমিটি যেভাবে পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করিতেছেন, তাহাতে নানাদিকে নানাজন আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। — কোন গ্রন্থে "বন্দুকের আওয়াজ" কথা ছিল বলিয়া গ্রন্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এ কথা সত্য হইলে বলিতে হইবে অন্যায় বিচার করা হইয়াছে।"

'বসুমতী' সম্পাদক আরও লিখিয়াছেন— "মুসলমান শাসনকালে বহু আরবী ও ফার্সী কথা বাঙ্গলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, যথা— কাগজ, কলম, দোয়াত, আদালত, জবানবন্দী, আরজী, হাকিম, হুকুম, নাজির, উজির, মেজাজ, বহালতবিয়ত ইত্যাদি। "আওয়াজ" কথাটিও এই প্রকৃতির। এসব কথা যদি এখন বাঙ্গলা ভাষা হইতে বিদায়

www.pathagar.com

করিতে হয় তাহা হইলে বাঙ্গলা যে অনেকাংশে নিরাভরণা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ আমাদের বাঙ্গলা ভাষা-ভাষী মুসলমান ভ্রাতৃবর্গ ইহাতে নিশ্চিতই আপত্তি উত্থাপন করিবেন। সুতরাং এ সকল কথ্য ভাষায় ব্যবহার করিলে নির্ব্বাচন কমিটি পুস্তক নামঞ্জুর করেন কেন?"

এই ত গেল মুসলমানী শব্দের কথা। এতদ্ব্যতীত যে সকল ইংরেজী, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি বিদেশী ভাষার শব্দ এবং হিন্দুস্তানী, দ্রাবিড়ী, সাঁওতালী, উড়িয়া, আসামী, টিপ্‌রাই প্রভৃতি দেশীয় ভাষার শব্দ বাঙ্গলা ভাষার সামিল হইয়া গিয়াছে, সেগুলির ভাগ্যচক্র কোন্ পথে আবর্ত্তিত হইবে? ঐগুলিও কি যদৃচ্ছাক্রমে বয়কট করা হইবে, না কালাপানিতে বিসর্জ্জন দেওয়া হইবে। বরং দিনদিনই নানা সম্পর্কে, বহুজাতি ও বহুভাষার সংস্পর্শে আসিয়া বঙ্গভাষা আরও শঙ্কর হইয়া উঠিবে। অতিপ্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই বঙ্গভাষা এরূপ ঋণ গ্রহণে বাধ্য। কেহই ইহার এই "উচ্ছল চল চল যৌবনতরঙ্গের" গতি-বেগ রোধ করিতে পারিবে না।

সুতরাং আমরা আশা করি, আমাদের সংস্কৃতপন্থী হিন্দুভ্রাতৃগণ আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু ও তুর্কী ভাষার যে সকল শব্দ অপরিহার্য্যরূপে বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সেগুলিকে অপাঙ্‌ক্তেয় বা বয়কট করিবার অবৈজ্ঞানিক চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন। ভাষার ইতিহাসে এরূপ চেষ্টা একেবারেই অভিনব। অবশ্য আরবী ফার্সীই হউক আর ইংরেজী সংস্কৃতই হউক, নিতান্ত অপ্রচলিত ও অনাবশ্যক শব্দসমূহ বাঙ্গলা ভাষায় আমদানী করিয়া ভাষাকে কণ্টকিত করিয়া তোলার পক্ষপাতী আমরা নহি। মুসলমানদের মধ্যে যে সকল শব্দ নিত্যপ্রচলিত তাহাই বাঙ্গলাভাষায় ব্যবহৃত হইবে।"

ঈশ্বর শব্দের ব্যবহার

মুসলমানরা এক আল্লায় বিশ্বাসী। বহু ঈশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতা তাঁদের জন্য নিষিদ্ধ। কাজেই পৌত্তলিক ভাবাপন্ন শব্দ তাঁরা ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁদের মতে আল্লা ও ঈশ্বর শব্দের অর্থ এক নয়। অন্যান্য বহু শব্দ ছাড়া এই একটি মাত্র শব্দ সম্বন্ধে মুসলমানদের মনোভাব কি, তা' ব্যক্ত করেছেন মোহাম্মদ আহ্‌বাব চৌধুরী তাঁর "ঈশ্বর শব্দের ব্যবহার" শীর্ষক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি নব পর্যায়ের ফাল্গুন (১৩৩৩) সংখ্যা সওগাতে মুদ্রিত হয়েছিল। আমরা সংক্ষেপে প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম।

"বাঙ্গলা সাহিত্যে ঈশ্বর শব্দের ব্যবহার লইয়া একটা তর্কবিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। কোন কোন মুসলমান ভ্রমবশতঃ এখনও আল্লার পরিবর্তে ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখন ইহা সাহিত্যের গণ্ডী ছাড়াইয়া ধর্মের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করা অতিশয় জরুরী হইয়া পড়িয়াছে।

আল্লার পরিবর্তে ঈশ্বর ভগবান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। দুনিয়ার কোন সাহিত্যেই আল্লার প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"– আল্লা ভিন্ন আর কোন উপাস্য নাই, মুসলমানগণ ইহাতে বিশ্বাসী।

ঈশ্বর শব্দ পৌত্তলিকতাপূর্ণ। মুসলমানগণ কর্তৃক এই শব্দ কখনও ব্যবহৃত হইতে পারে না। "শব্দকল্পদ্রুম" নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধানে ঈশ্বর শব্দের অর্থ দেওয়া

www.pathagar.com

হইয়াছে-১। শিব। বায়ু পুরাণ মতে ঈশ্বর একাদশ রুদ্রের মধ্যে একজন। ২। ব্রহ্ম। ৩। কন্দর্প। ৪। পাতঞ্জল মতে- ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক। ৫। আশয় দ্বারা অপরাভূত চৈতন্য। ৬। অধিপতি, স্বামী, ৭। শ্রেষ্ঠ। ৮। সমর্থ। (বা, বি, স্ত্রী, দুর্গা) শিং-১। ঈশ্বরী মেশ্বরী প্রিয়াম। ২। লক্ষ্মী, ৩। সরস্বতী। ৪। যে কোন শক্তি। ৫। যোগিনী বিশেষ। ৬। লিঙ্গিনী বৃক্ষ। ৭। বন্ধ্যাক কোটকী বৃক্ষ। ৮। রুদ্র জটলতা। ৯। লাকুলিকন্দ শিং- রাজ্যে কপি মহারাজা মাং বাসয়িতুমি শবঃ।

ভগবানেরও এরূপ অর্থ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া ঈশ্বরের স্ত্রীলিঙ্গ, বহুবচন ও অনেক শ্রেণী বিভাগ আছে। শিব, ইন্দ্র, ব্রহ্ম প্রভৃতি পুরুষ জাতীয় ঈশ্বর। এবং দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতি স্ত্রীজাতীয় ঈশ্বর। এই সকল ঈশ্বর ও ঈশ্বরীরা পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

শিবের স্ত্রীর নাম পার্ব্বতী। এই রূপে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর স্ত্রী ও পুত্র আছে। আর স্বর্গ-রাজ্যের ঈশ্বর অপ্সরা প্রভৃতি নর্ত্তকীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদা আমোদ ও আনন্দে দিন কাটাইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি এমন দুর্ব্বল ঈশ্বর যে, অসুরেরা তাঁহার পদমর্য্যাদা না বুঝিয়া তাঁহাকে ও দেবগণকে কতবার স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের নিজ অধিকার স্থাপন করিয়াছে। এই সকল কথা পুরাণ শাস্ত্র পড়িলেই জানিতে পারা যায়। কেবল ইন্দ্র বা শিব নহেন তেত্রিশ কোটি দেবতাই হিন্দু জাতির পূজ্য ও আরাধ্য।

এই সকল ঈশ্বরের আরও শ্রেণী বিভাগ আছে। যথা-গৌরেশ্বর, দিল্লীশ্বর, ভারতেশ্বর, জগদীশ্বর, পরমেশ্বর, মহেশ্বর প্রভৃতি। গৌড়ের প্রাচীন পালরাজগণ গৌড়েশ্বর নাম গ্রহণ করিতেন। প্রাচীন কবি বিদ্যাপতি গৌড়ের নাসির শাহকে "চিরঞ্জীব পঞ্চগৌড়েশ্বর" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ আকবর বাদশাহকে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো" বলিয়া অভিহিত করিতেন। ইংলণ্ডের সম্রাটকে "ভারতেশ্বর" বলিতেন। মানুষের প্রতিও এই শব্দ আরোপ করা হইয়া থাকে। যেমন- ভগবান রামকৃষ্ণ প্রভৃতি।

আল্লাহ্ বলিতে ওয়াহিদ (এক) ও লা-শরিক আল্লাকেই বোঝায়। আল্লাতা'লা পবিত্র কোরানের ছুরা এখলাসে ফরমাইয়াছেন- "বল, আল্লা এক, আল্লা অভাব শূন্য, তিনি জাত নন এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।"

হিন্দু ধর্মমতে সমস্ত জগতের পালন কর্তা বলিতে বিষ্ণুকেই বুঝাইয়া থাকে। বিষ্ণুর আবার স্ত্রী আছে-তাঁর নাম লক্ষ্মী। কিন্তু আল্লাতা'লা এই সকল কার্য ও অপবিত্রতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত— পাক ও পবিত্র। পবিত্র কোরানের ছুরা জেন-এ বলা হইয়াছে— "আল্লা, আর এই যে আমাদের একমাত্র পালনকারী, তাঁর সম্মান মহা উচ্চ, তিনি স্ত্রী বা কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই।"

অতএব এখানে প্রমাণিত হইল যে, কোন প্রকারেই পৌত্তলিকতাপূর্ণ ও দ্ব্যর্থবোধক ঈশ্বর শব্দ পাক পবিত্র আল্লা শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে না।"

পূর্বোক্ত "ঈশ্বর শব্দের ব্যবহার" প্রবন্ধটি ছাড়াও ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা সওগাতে মোহাম্মদ আহ্বাব চৌধুরী "বাঙ্গালা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দের স্থান" শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধ লিখেন। এতে তিনি মন্তব্য করেনঃ

www.pathagar.com

"বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাথমিক জীবনে হিন্দু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাকে অপভাষা বলিয়া অভিহিত করতেন। এমন কি ধর্ম্মশাস্ত্রের বাঙ্গলা অনুবাদকগণকে 'রৌরব' নামক নরকবাসের ব্যবস্থা করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। শিশু বাঙ্গলাও কালে তাঁহাদের একচেটিয়া প্রতিপত্তি নষ্ট করিতে পারে, এজন্য সূতিকাগারেই ইহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের এই কঠিন দুর্দিনের সময় মুসলিম বাদশাহ্গণ (নিজেরা ফারসী ভাষা ব্যবহার করিলেও) কলা খাওয়াইয়া শিশু বাঙ্গলার পরওয়ারিশ করিলেন। শান-শওকাত ও জাঁকজমকপূর্ণ আরবী-ফার্সী শব্দ বাঙ্গলা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিল। আমির হামজা, রুস্তমের গুর্জ্জের আঘাতে নির্জ্জীব বাঙ্গলা সাহিত্য সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল।

বঙ্গকবিরা সে সময়—

"গুলের বুলবুল আমি গুলে মেরা কাম
না চাহি বাদ্শাহী আমি বাড়াইতে নাম।"

বলিয়া বঙ্গের পল্লীগ্রামগুলি মুখরিত করিয়া তুলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় ইংরাজ সৈন্যরা পলাশীর আম্রবন কাঁপাইয়া বাঙ্গলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষ দখল করিয়া ফেলিলেন।

.... ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মৃত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যকে নিশ্চল ও নির্জীব করিয়া ফেলিলেন। এই নিস্তেজ ভাষা প্রচলন করিয়া কেবল যে মুসলমানদের ক্ষতি করা হইল, এমন নহে,— হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের গতিকে অচল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— "তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন; যাহার কেবল বিধিই আছে, গতি নাই। সীতাকে নির্বাসন দিয়া যজ্ঞকর্তার ফরমাসে তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন ঃ

"সাতশত বৎসর মুসলমানের সহিত একত্র বাস করিয়া বাঙ্গলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিষ লইয়া ফেলিয়াছে। সে সব জিনিষ বাঙ্গলার হাড়ে-মাংসে জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া কিছুতেই চলিবে না। মুসলমানরা বাঙ্গলা ভাষাকে যেরূপ বদলাইয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোন ভাষাকে সেইরূপ পারে নাই।"

আজ ভারতবর্ষের মুসলমান ভাগ্যহারা হইলেও এদেশীয় হিন্দুগণ এখনও মুসলিম সভ্যতার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। এখনও মুসলমানের দোয়াত, কলম, কাগজ না হইলে বাঙ্গালী সাহিত্যিকেরা সাহিত্যসেবা করিতে পারিবেন না। মুসলমানের উকিল মোক্তার না হইলে মক্কেলের মোকদ্দমা চালান কঠিন হইয়া পড়িবে। মুসলমানের দরজি ও পাজামা পিরহান না হইলে হিন্দুগণ লজ্জা নিবারণ করিতে পারিবেন না। মুসলমানের জুতা, মোজা না হইলে বাঙ্গালায় বাবুগিরি করা চলিবে না। মুসলমানের আতর গোলাব না হইলে সৌখিন হওয়া মুশ্কিল। মুসলমানের ঝাড়, ফানুস ও দেওয়ালগিরি না হইলে বিবাহ-উৎসব সম্পূর্ণ হইবে না। মুসলমানের গালিচা ও তাকিয়া না হইলে ফরাসের উপর বসিয়া তাকিয়ায় ঠেস দিয়া আরাম করা চলে না। মুসলমানের থানা, দারোগা ও

www.pathagar.com

জমাদার না হইলে দেশে শান্তি স্থাপন করা যায় না। মুসলমানের হাকিম, মুন্সেফ ও আদালত না থাকিলে দেশ শাসন করিতে পারা যাইবে না। মুসলমানের নায়েব, মোহরার, পেয়াদা, বরকন্দাজ না থাকিলে জমিদারেরা রায়তের নিকট হইতে খাজনা উশুল করিয়া বাড়ীতে দালান ও ইমারত তৈয়ার করিতে পারিবেন না। মুসলমানের চোগা-চাপকান না হইলে আর লাট সাহেবের দরবারে যাওয়া চলিবে না। রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য হিন্দু মনীষীরা মুসলমানের চোগা চাকপান ও পাগড়ী পরিধান করিয়া সভ্য জগতে পরিচিত হইয়াছেন।"

১৩২৭ সালের চৈত্র মাসের "ভারতবর্ষে" ড. দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র সমালোচনায় সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় নিরপেক্ষ ভাবে বলিয়াছেন— "তাঁহাদের (মুসলমান রাজগণের) সময়ে যে সকল ফারসী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের অনেকগুলি চিরদিনের জন্য বঙ্গভাষার স্থায়ী অংশে পরিণত হইয়াছে। আজিও আমরা 'তাকের' উপর 'কিতাব' রাখি। 'পিরানের' ছেঁড়া 'আস্তিনা' "খলিফা' ডাকিয়া 'রিফু' করাইতে দেই। রবি বাবুর কবিতায়ও "বোচকা বোচকি" স্থান পাইয়াছে, 'বাগবাগিচা-বাগানের' ত কথাই নাই। বঙ্গ সাহিত্য হিন্দু মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে; উহা কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে। অতএব মুসলমান ভ্রাতৃগণ এই সাহিত্যের প্রতি আপনাদের উত্তরাধিকারের দাবী কেন ছাড়িয়া দিতেছেন, বুঝিতে পারি না।"

সুপ্রসিদ্ধ লেখক রাজ্যেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী তাঁর 'সরল বাঙ্গলা রচনা শিক্ষা'র ২৯৩ পৃষ্ঠায় বলেন— "মুসলমান ছাত্রগণ যেন তাহাদের উর্দ্দু, ফার্সি বা আরবী শব্দ ব্যবহার না করেন; কারণ তাহা হইলে উহা কখনও বিশুদ্ধ বাঙ্গলা হইবে না।"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন— "আমাদের পণ্ডিত মহাশয়রা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করবেন না। 'কলম' মুসলমানী শব্দ। তাঁহারা কলমের পরিবর্তে 'লেখনী' শব্দ ব্যবহার করিবেন, অথচ লেখনীর অর্থ উড়িয়াদের তাল পাতায় আঁচড় কাটিবার লোহার খন্তি,—তাহাতে কালি লাগে না। কলম ও লেখনী একেবারে ভিন্ন জিনিষ। 'দোয়াত' মুসলমানী কথা; দোয়াত লেখা হইবে না, 'মস্যাধার' লিখিতে হইবে। 'পাট্টা' মুসলমানী কথা। পাট্টা লিখিবেন না, 'ভোগ বিধায়ক পত্র' লিখিবেন। আদালত লিখিবেন না,—লিখিবেন 'বিচারালয়'। এইরূপে তাঁহারা বাঙ্গলাকে শুদ্ধ বা মার্জ্জিত করিতে চাহেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা কখনও সফল হইবার নয়।"

১৩২৮ সালের আশ্বিন মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" প্রাচীন ভারত আগ্নেয়াস্ত্র নামক প্রবন্ধে বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় বন্দুক, কামান ও বারুদের অদ্ভুত প্রতিশব্দ বাহির করিলেন— শতঘ্নী, ভূষণ্ডী, অগ্নিচূর্ণ।

বাঙ্গলা ভাষায় এই সকল আবর্জ্জনা বাড়াইবার অনাবশ্যকতা সম্পর্কে যোগেশ বাবু বলিয়াছেন— "যিনি কেবল সংস্কৃত ভাষাকেই বাঙ্গলা ভাষা করিতে বলেন, তিনি অজ্ঞাতসারে বাঙ্গলা ভাষাকে মৃত ভাষায় পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন!"

www.pathagar.com

কোন কোন মুসলমান লেখকও উপরোক্ত পণ্ডিতগণের অনুকরণে নামাজ না লিখিয়া উপাসনা, রোজার পরিবর্তে উপবাস, আল্লার পরিবর্তে ঈশ্বর বা ভগবান, বেহেশ্ত দোজখের বদলে স্বর্গ নরক এবং মসজিদের পরিবর্তে উপাসনালয় লিখিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের কোন প্রতিশব্দ অন্য কোন ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানের স্থান

সওগাতের প্রথম নীতি হ'ল বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান নির্ণয় করা, এতে তাঁদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া এবং বাংলার মুসলমান সমাজে নিত্য ব্যবহার্য শব্দ আমাদের সাহিত্যে প্রচলন করা। নব পর্যায়ের প্রথম সংখ্যা থেকেই সাহিত্যিকরা এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন।

প্রথম সংখ্যাতেই (আষাঢ়, ১৩৩৩) অধ্যাপক আবদুল মজিদ "বাঙ্গালী মোসলেমের ভাষা ও সাহিত্য" নামে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। তিনি ভাষার উপর বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে বাংলা ভাষা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"১২০৩ খৃষ্টাব্দে আফগানী মোসলেমরা বাঙলা জয় করে গৌড়ে রাজত্ব কায়েম করেন। তখন থেকে ক্রমে ক্রমে বাঙলা ভাষারও সৃষ্টি হয়ে বাঙলা সাহিত্যের গৌড়ীয় যুগের পত্তন হয়। মুসলমান আমল থেকেই বাঙলাদেশের হিন্দু ও বৈষ্ণব কবিগণ মঙ্গল কাব্য ও বৈষ্ণব কাব্য এবং মুসলমান কবিগণ পুঁথি সাহিত্য রচনা করতে শুরু করেন। এই নূতন করে গড়া ভাষাকে হিন্দুর ভাষাই বলুন আর মুসলমানের ভাষাই বলুন, ইহা বাঙালীরই ভাষা। এতে করেই বাঙালী নিজের প্রাণের কথা বলেছে; শুনেছে, গেয়েছে।

মুসলমানের হাত থেকে ইংরেজের হাতে রাজ্য চলে যাওয়ায় বাঙলা ভাষা তার নিজের স্বরূপ হারিয়ে ফেল্ল। সে গতি রুদ্ধ হলো এবং পুরাতন হিন্দু মুসলিম কবিরা ডুবে গেলেন বিস্মৃতির গর্ভে, আর তাঁদের স্থান অধিকার করে বসলেন সংস্কৃত বাঙলার রচনাকারীগণ।

বঙ্কিমের পরবর্তী সাহিত্যিকগণ বুঝতে পারলেন, এই কৃত্রিম ভাষায় বাঙালীয় প্রাণ মজবে না, তাই রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিরা বাঙালীর বাঙলায় লিখিতে শুরু করে বাঙলাকে বিশ্ব ভাষায় স্থান দিতে চেষ্টা করলেন।

ঠিক এমনি সময়ে বাঙলার একদল আশ্‌রাফ মুসলমান বাঙলা ছেড়ে উর্দ্দুকেই বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা করার চিন্তা করতে লাগলেন। আর অপর দিকে জনকয়েক মুসলেম লেখক মুসলমানদের জন্য সংস্কৃতানুগ সাহিত্য গড়তে চেষ্টা করলেন। তাতে ফল এই হ'ল যে, তাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নিজের সমাজের সাথে চলতে পারলেন না। আর যাঁরা আরবী ফারসী শব্দ মিশিয়ে বাঙলা লিখতেন, তাঁরা সমাজের নিম্নস্তরের মধ্যে তাঁদের আধিপত্য বজায় রাখলেন না। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে শক্তি সঞ্চয় হলো না বলেই বাঙালী মুসলমানেরা আঁধারে পড়ে আছেন।

যে বাঙলায় মুসলমান অধিবাসী শতকরা পঞ্চান্ন জন, সেখানকার ভাষায় যদি তাদের কথা শব্দের প্রচলন না থাকে, তবে তা' কি বাঙলা? তাকে আর যে কোন নামে চালিয়ে নাও, কিন্তু তার বাঙলা ভাষা নাম দিয়ে তাকে পঙ্গু করো না।

www.pathagar.com

ভাষা সমাজের তৈরী জিনিষ এবং সমাজকে ইহা এক সূত্রে বেঁধে রাখে। যে কোন সম্প্রদায়ের জাতীয় চিন্তাধারা, ভাব বা খেয়ালাৎ, চেষ্টা ও উদ্দেশ্য প্রস্ফুটিত দেখা যায় তাঁদেরই ভাষায়। আইনের কথা মানতে গেলে আমাদের ভাষা এখনও গড়ে উঠেনি। কারণ, বাঙালী হিন্দুদেরও মুসলমানদের ভাষার দিক দিয়ে একতা নেই। যা আমাদের এখনকার ভাষা, যা আমাদের এখনকার সাহিত্য তা' হিন্দু মুসলমানের এক ঘরে বসে করা নয়। মুসলমানের গড়া সাহিত্য ফেলে দিয়ে হিন্দু ভ্রাতারা সাহিত্য গঠন করতে চেয়েছেন। কিন্তু বাঙলাদেশ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই। অতএব, বাঙলা ভাষায়ও মুসলমানের অধিকার থাকা উচিত।

হিন্দুগণ রচনা লিখতে গেলেই তাঁদের মনে বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ ও ব্রাহ্মণ, স্মৃতি ও পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের সংস্কৃত কথা, ভাব-ভঙ্গিমা ও কাব্য-সাহিত্যের রীতি ও রচনাভঙ্গি সব জেগে উঠে। আমরা বাঙলার মুসলমানরা সংস্কৃত জানি না! তাই আমরা নিজের ভাবধারা ও ব্যবহৃত শব্দ নিয়ে সাহিত্য রচনা করলে তা' হিন্দু সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়না।

একশত বছর হিন্দুদের এরূপ লেখা পড়ে আমরা সাহিত্যে কোন উন্নতি করতে পারিনি। আমরা যদি নিজের ভাষার সেবা ও সাধনা করতাম তা'হলে পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই আমাদের ভাষা ও সাহিত্য শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠত। আর আজ আমরা যে অভাব ও দৈন্যের মধ্যে পড়ে হা-হুতাশ করছি তা' কখনো করতে হত না।

সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা পুরাদমের মোনাফেক। মজলিসে, ঘরে, বাইরে, হাটে, বাজারে, মুসলমান মুসলমানেরা বলি আল্লাহ্, রসুল, নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব, জাকাত, ঈমান; আর লেখবার বেলায় লিখি-ঈশ্বর, স্বর্গীয় বাণীবাহক, উপাসনা, উপবাস, ব্রত, তীর্থযাত্রা, দান-দক্ষিণা! কোন্ মোহে পড়ে আমরা নিত্যব্যবহার্য শব্দ বেহেশ্‌ত না লিখে বৈকুণ্ঠ বা স্বর্গ লিখব? অথবা সোবেহ্ সাদেককে বলব উষাদেবী?

বাঙলার মুসলমানরা ভাব প্রকাশের জন্য যে সকল সহজবোধ্য আরবী, ফার্সী শব্দ কথ্য ভাষায় ব্যবহার করেন, সে সকল শব্দ তাঁরা বাদ দিয়ে কোনরূপেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারেন না। যেমন বাংলার কোন মোসলমানই পানিকে জল বলে উচ্চারণ করেন না। কাজেই তাঁদের ভাষায় পানি শব্দই ব্যবহৃত হবে।

লেখ্য ভাষার গতি এখন কথ্য ভাষার দিকেই যখন চলেছে, তখন মুসলমানগণ যদি তাঁদের নিত্য ব্যবহার্য শব্দ লেখ্য ভাষার মধ্যে ব্যবহার করেন, তবে ওগুলির সর্বত্র প্রচলন হতে কোন বাধাবিপত্তি উপস্থিত হবে না। যাঁরা এখন ওগুলির প্রচলনে ঘোর আপত্তি করেছেন, তাঁরাও তখন ওগুলি ব্যবহার না করে পারবেন না। এটা করতে পারলেই বাঙলা ভাষার উপরে আমাদের যে অধিকার আমরা হারিয়েছি, নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। বাঙলা ভাষার গঠন কার্যে এটাই হবে বাঙালী মুসলমানের শ্রেষ্ঠ দান। বাঙলার সর্বত্র এক কথ্য ভাষা প্রচলিত হয়। তাই কথ্য ভাষার আদর্শ হবে শান্তিপুর ও কলিকাতার কথ্য ভাষা মিলিয়ে যে ভাষা— সেই ভাষা। এতে ফল এই হবে যে, বাঙলার সর্বত্র কথ্য ভাষার প্রকৃতি এক হয়ে যাবে।"

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

লেখক-পরিচিতি ঃ 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

লেখা-পরিচিতি ঃ 'বাংলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য' প্রবন্ধটি 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র মাঘ ১৩২৫ সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'আল-এসলাম' পত্রিকার ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৫ সংখ্যায় লেখকের পাদটীকাসহ পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। 'মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী' রচনাবলী প্রথম খণ্ড, ১৯৯০; প্রকাশক ঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে গৃহীত।

তর্ক জিনিসটা অনেক সময় ভাল; মতভেদ জিনিসটাও অনেক সময় মন্দ নয়। যতক্ষণ যথার্থ সত্যোপলব্ধির চেষ্টার সীমা অতিক্রম করিয়া গোঁড়ামীর গহবরে নিপতিত না হয় ততক্ষণ, বাস্তবিক পক্ষে, তর্ক ও মতভেদের একটা সার্থকতা, একটা সৌন্দর্য্য, একটা সর্ব্ববাদীসম্মত মূল্য আছে। কিন্তু যখন কোনো দুর্দ্দম অযুক্তি বা কুযুক্তি, অজ্ঞতা বা অন্ধতা, স্বার্থপরতা বা স্বার্থজ্ঞানহীনতা আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া উহাদের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং যথার্থ আপনাকে প্রকাশ না করিয়া আশ্রয় ও আশ্রিতের পার্থক্য বিলুপ্ত করিতে চায়, তখনই যত দ্বন্দ্ববিরোধ, কলহভেদ অসুর মূর্ত্তিতে মাথা উঁচু করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হয়। বিশ্বজগতের কোনো মনীষী প্রকৃত তর্ক বা মতভেদকে নিন্দা করিয়া যান নাই, এবং বোধ হয়, বর্ত্তমানেও কেহ করিবেন না। কিন্তু আপনার স্বাভাবিক স্বচ্ছতা নষ্ট করিয়া যখন সঙ্কীর্ণ কূপবদ্ধ জলের ন্যায় দুষ্ট ও বিষাক্ত হইয়া উঠে, তখনিই উহারা মঙ্গলের পৃষ্ঠপোষক না হইয়া অমঙ্গলের সহায়ক হয়, তখনই অন্ধতা সত্যোপলব্ধির চেষ্টাকে গ্রাস করিয়া বসিবার সুযোগ পায় এবং বিচারশক্তিকে স্বাস্থ্যহীন করিয়া বিকল ও পঙ্গু করিয়া ফেলে।

বাঙলা দেশবাসী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙলা—সে বিষয়ে কাহারো সহিত কাহারো মতবিরোধ নাই। আমরা বাঙলায় কথাবার্ত্তা কহি, বাঙলায় স্বপ্ন দেখি, বাঙলায় চিন্তা করি, আমাদের প্রাণ বাঙালীর প্রাণ, হাসিকান্না বাঙালীর হাসিকান্না, এমনকি আমাদের রক্তমাংস বাঙালীর রক্তমাংস। অতএব, অপ্রতিরোধনীয়রূপে আমাদের মাতৃভাষা—যে দেশের বায়ু আমাদের শ্বাস, যে দেশের মাটীতে আমাদের বাস, যে দেশের ফলজলে আমরা পালিত, যে দেশের নদ-নদীর স্নেহধারায় আমরা পরিপুষ্ট, সেই দেশের ভাষা—বাঙলা। এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না যে, বাঙলা ভাষা হিন্দুর নিজস্ব ভাষা, উহা কখনো মুসলমানের ভাষা হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, জগতে কোনো ভাষা কোনো কালে বিশিষ্ট ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নিজস্ব খাস সম্পত্তি হয় নাই এবং বোধ হয়, কোনো কালে হইবেও না।

কিন্তু বাঙলার অতিভক্ত কেহ কেহ বাঙলাকে মাত্র মাতৃভাষার আসনে বসাইয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বলেন, বাঙলা বাঙালী মুসলমানের কেবল মাতৃভাষা নহে, জাতীয় ভাষাও বটে। মাত্র এইটুকু বলিয়াই যদি তাঁহারা ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলে

www.pathagar.com

কোন কথা বলিবার ছিল না। কারণ, কোনো একটা মত প্রকাশ বিশেষ দোষের কথা নয়। কিন্তু সেই মতটাকে দিগ্বিজয়ী বীরের মত খাড়া করিবার চেষ্টা হইতে দেখিলে আহত না হইয়া পারা যায় না। যাঁহারা বাঙলাকে জাতীয় ভাষারূপে বরণ করিতে সমুৎসুক, তাঁহাদের যুক্তিগুলি মোটামুটি এইরূপঃ-১. মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাষা বলিয়া স্বীকার না করাতে দেশের ও সমাজের বিষম ক্ষতি হইতেছে; ২. মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ বিদেশীয় ভাষা আমদানী করিবার চেষ্টা কখনো ফলবর্তী হইবে না; ৩. মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাষারূপে বরণ করা ব্যতীত কোনো জাতি কখনো উন্নত হইতে পারে না; ৪. যাহাদের মাতৃভাষা এক, জাতীয় ভাষা অন্য, কোনো ভাষাই তাহাদের জাতীয় জীবন গঠনে সহায় হইয়া উঠে না; ৫. গাছ যেমন মাটী হইতে রসাকর্ষণ করিয়া বড় হয়, জাতি তেমনি জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য হইতে রসাকর্ষণ করিয়া বড় হয়; এবং ৬. আরবী, পারসী, উর্দ্দু ভাষার কোনো রস সমাজ-দেহে অভিসিঞ্চিত হইতে না পারায়, বাঙালী মুসলমানের জাতীয় জীবনের প্রবাহ অত্যন্ত মৃদু।

এই যুক্তিগুলি মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষার বিভিন্নতার পথে দাঁড়াইতে কতদূর সক্ষম বা অক্ষম, তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে 'জাতীয় ভাষা' এই কথাটার মানে কি নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। কারণ, ইচ্ছা হইলে, গড়িয়া পিটিয়া ঐ কথাটীর অনেক রকম মানে করা যাইতে পারে। যদি জাতীয় ভাষা অর্থে মাত্র বাঙালী মুসলমানের 'ন্যাশনাল ল্যাঙ্গোয়েজ' (National Language) হয়, তাহা হইলে, মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষার অভিন্নতা স্বীকার করিতে, বোধ করি, কাহারো কোনো আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু জাতীয় ভাষার এইরূপ একটী সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়া লওয়া কখনই সঙ্গত বা শুভদায়ক হইবে না। কূপমণ্ডুকতার আবহাওয়ার মধ্যে কোনো জাতি কোনো কালে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই এবং বিশেষ করিয়া মুসলমানের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে, ঐরূপ কূপমণ্ডুকতার ফলে আমাদের জাতীয় জীবন কখনো স্ফূর্ত ও মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পাইবে না। আরবী এবং উর্দ্দুকে বাদ দিয়া বাঙলায় বাঙালী মুসলমানের জাতীয় জীবনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না। মুসলমানের মনে 'নেশন' শব্দ জাগিয়া উঠিলে, সে কখনো আপনাকে বাঙলার অধিবাসী বলিয়া মনে করিতে পারে না, এমনকি মাত্র ভারতের অধিবাসী বলিয়াও মনে করিতে পারে না;— সমগ্র বিশ্বের সহিত তখন তাহার যোগ সাধিত হইয়া যায়। সে যোগ অতি সুন্দর, অতি সত্য এবং অতি সনাতন। অতএব ন্যাশ্‌নাল ল্যাঙ্গোয়েজ বা জাতীয় ভাষা অর্থে বাঙালী মুসলমান জাতির ভাষা ধরিয়া লইলে মুসলমানের বিশ্বানুভূতিকে হত্যা করা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়-জীবন নামক পদার্থটী স্বর্গরাজ্য ছাড়াইয়াও দূরে বহুদূরে চলিয়া যাইবে।

তারপর, যদি জাতীয় ভাষা ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বাঙলা কি করিয়া আমাদের জাতীয় ভাষা হয়? সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাষা কি হইতে পারে তাহা এখনো স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে যেরূপ ভাবগতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে যদি মুসলমান পক্ষ হইতে বিশেষ বাধা না দেওয়া হয়, হিন্দীই জাতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইবে। যাহা হোক্, বর্ত্তমানে ভারতে জাতীয় ভাষা বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে তাহা উর্দ্দু ভাষা। কিন্তু তাহা হইলেও আরবী

www.pathagar.com

ভাষাকে বাদ দেওয়া চলে না। 'দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনের' সভাপতির মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি ঃ– 'আল্লার শেষ প্রত্যাদেশ আরবীতে। আল্লার শেষ নবী আরবী। আমরা সেই শেষ নবীর উম্মত (মণ্ডলী)। সেই শেষ প্রত্যাদেশের উত্তরাধিকারী। অনুবাদে মূলের ছায়া পাওয়া যায় মাত্র। মূলের প্রাণ অনুবাদে থাকিতে পারে না। যদি ইস্‌লাম ধর্ম্মকে তাহার প্রাথমিক যুগের অনাবিল অবস্থায় রাখা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, যদি শত দেশভেদ, সহস্র ভাষাভেদ সত্ত্বেও ইসলামের ভ্রাতৃবন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়, তবে মুসলমানকে তাহার কোর্-আন হাদীস মূল ভাষায় পড়িতে হইবে, পড়িয়া বুঝিতে হইবে, বুঝিয়া মজিতে হইবে। যদি মরুকে নগর করিবার, পশুকে মানুষ করিবার, অন্ধকে চক্ষুষ্মান করিবার, কাঙ্গালকে আমীর করিবার, ভীরুকে বীর করিবার অমোঘ মন্ত্র শিখিতে চাও, তবে আরবী কোর্‌আন শিখ। যেমন প্রত্যেক খৃষ্টান বালক তাহার বাইবেল জানে, যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক মুসলমান বালক তাহার কোর্‌আনকে না জানিবে, সে পর্য্যন্ত বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ জাগিবে না।' অতএব আরবীকে বাদ দেওয়া চলে না। কোর্‌আনকে বাদ দিয়া যদি জাতীয়তা নামক কোনো বস্তুর প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব হয়, তবে তাহাতে প্রাণের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে না, অস্থিচর্ম্ম লইয়া আমাদিগকে টানাটানি করিতে হইবে। আরবী ভাষাকে বাদ দিয়া কোর্‌আনের প্রাণের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে না। অতএব আরবীকে পরিত্যাগ করা চলে না। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানের মধ্যে আরবী কোর্‌আন বন্ধুত্বের সূত্র, প্রীতির বন্ধন, প্রেমের ডোর। সেই বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া আমাদের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অতএব বাঙলা সহস্রবার আমাদের মাতৃভাষা হইলেও, কখনো জাতীয় ভাষা হইতে পারে না—উর্দ্দুও পারে না। যদি ন্যাশনাল ল্যাঙ্গোয়েজ চাও যে বিশ্বানুভূতি ব্যতীত মুসলমান প্রাণহীন অস্থিসমষ্টি মাত্র, সেই বিশ্বানুভূতিকে জাগাইতে চাও, তবে আরবীকেই জাতীয় ভাষার পদে বরণ করিত হইবে। বাঙলা আমাদের জাতীয় ভাষা হইলে আমরা আনন্দিত হইতাম, কিন্তু শ্রেয়কে প্রেয়ের উপর স্থান দিতেই হইবে।

বাঙলা, তাহা হইলে আমাদের মাতৃভাষা—জাতীয় ভাষা নহে। যাঁহারা বাঙলাকে জাতীয় ভাষা বলিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের যুক্তিগুলির উত্তরে এই বলিতে পারা যায় যে, আমাদের সমাজের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা আমরা বাঙলাকে জাতীয় ভাষারূপে বরণ করি নাই এজন্য নহে, বরং আমরা বাঙলাকে সাধারণভাবে উপেক্ষা করিয়া সাহিত্য সমালোচনা হইতে বিরত ছিলাম এই জন্য। আরবী চিরকাল আমাদের জাতীয় ভাষা ছিল এবং থাকিবে,—উহাকে বিদেশীয় নূতন আমদানী বলা কখনই সঙ্গত হইবে না। মূল যেমন মাটীতে রসিয়া বৃক্ষের স্বাস্থ্য সজীবতা সম্পাদন ও সংরক্ষণে সহায় হয় আমাদের মাতৃভাষা বাঙলাকে তেমনি আরবী কোর্‌আনের বিচিত্র রসে রসাইয়া বাঙলী মুসলমানের জাতীয় জীবনের স্ফুরণ ও সংরক্ষণে সহায় করিয়া তুলিতে হইবে। তবেই মুসলমান-বাঙলা-সাহিত্য সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠিবে, তবেই মুসলমানের সাহিত্য-সাধনা সফল ও ধন্য হইবে। আরবী এবং বাঙলা উভয় ভাষাই আমাদের জাতীয় জীবন গঠনে সহায়তা করিবে—কিন্তু বিভিন্ন প্রকারে আরবীকে তাহার আশ্রয়স্থল এবং বাঙলাকে তাহার অবলম্বন করিতে হইবে। মূল ব্যতিরেকে যেমন একটি গাছকে মাটীর

www.pathagar.com

উপর বসাইয়া দিলেও তাহার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব, তেমনি আরবী প্রাণ স্ফুরণের সহস্র বিচিত্র রসের ভাণ্ডার হইলেও বাঙলাকে বাদ দিয়া আমরা কখনো বাঁচিতে পারিব না। আরবী, পারসী বা উর্দ্দুর রসে অভিষিক্ত হইয়া বাঙালী মুসলমান সমাজ যে এতদিন প্রাণের দুর্ব্বার স্পন্দনে জাগিয়া উঠে নাই, তাহার অর্থ ইহা নহে যে আরবী, পারসী বা উর্দ্দু মরুক্ষেত্রের নীরস ভাষা ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার অন্তরায় স্বরূপ, বরং তাহার সুস্পষ্ট [অর্থ] ইহাই যে, বাঙলাকে বাদ দিয়া আমরা কখনো আরবীর অনন্ত রসভাণ্ডারের আস্বাদন লইতে পারিব না—মূলের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া মোস্‌লেম সমাজবৃক্ষ প্রাণের রসে রসিবে না, রসিয়া জাগিবে না। বাঙালী মুসলমান সমাজে চেতনার যে সামান্য মাত্র স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, তাহা কয়েকজন আরবী ও বাঙলা শিক্ষিত লোকের চেষ্টার ফল। যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে মাত্র আরবী কিংবা বাঙলার উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনের উন্মেষ সাধিত হইবে না— হইতে পারে না। আরবী কোরআনের সোনার কাঠির স্পর্শ লাভ না করিলে জীবনমন্দিরের রাজকন্যার অনন্ত নিদ্রার অন্ত হইবে না—জীবনের রঙে বাঙলা রাঙিবে না। আরবীর গম্ভীর উদাত্ত সুর বাঙালীর কণ্ঠে, বাঙালীর সুরে গীত না হইলে তাহা কানের ভিতর দিয়া আমাদের মরমে পশিবে না, আমাদের অন্তরের সুপ্ত তন্ত্রীগুলি সেই সুরের তালে তালে বাজিয়া উঠিবে না।

তারপর, সাহিত্যের কথা। বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা। অতএব বাঙলা সাহিত্য আমাদের মাতৃ সাহিত্য। দুই দিন পরে হয়ত আমরা সমগ্র বাঙলা সাহিত্যকে অথবা তাহার একাংশকে জাতীয় সাহিত্য বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারিব, কিন্তু এখনো বাঙলায় মুসলমানের জাতীয় সাহিত্য গঠিত হয় নাই। কিন্তু কেহ কেহ একথা স্বীকার করিতে নারাজ। তাঁহাদের মত এই যে, বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্য নামক কোনো বস্তুর অস্তিত্ব অনুভূত না হইলেও আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে বিরাট প্রাচীন সাহিত্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাকে আমরা জাতীয় সাহিত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারি। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, আমাদের জাতীয় সাহিত্য কোন পথে চলিবে তাহা লইয়া কাহারো শিরোবেদনা সৃষ্টি হওয়ার আবশ্যকতা নাই—সে সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। প্রাচীন কবিরা আমাদের জন্য যে বুনিয়াদ গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। নূতন করিয়া ভিত্তি স্থাপন করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ অসার্থক ও অনাবশ্যক।

কিন্তু এই মন্তব্যগুলি কতদূর অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে তাহা বিচার্য্য। আমাদের প্রাচীন কবিদের রচনাগুলিকে হিন্দু সাহিত্যের বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত তুলনা করিতে, বোধ করি, কাহারো আপত্তি নাই। এবং বৈষ্ণব পদাবলী যে একেবারে হিন্দুর নিজস্ব সম্পত্তি একথাও বোধ হয়, অনেকেই স্বীকার করিবেন। আমাদের প্রাচীন কবিগণ বৈষ্ণব কবিগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া যাহা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা জাতীয় সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কি? মুসলমান রচনা করিয়া গিয়াছেন, এই অর্থে হয়ত তাহাকে মুসলমান সাহিত্য অর্থাৎ মোসলমান কর্তৃক সৃষ্ট সাহিত্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু মুসলমানের প্রাণের ছাপ তাহাতে দেখিতে পাই কি? কোনো মুসলমান তাহাকে আপনার ভাব ও চিন্তার কল্পনা ও কলার যথার্থ অভিব্যক্তি বলিয়া অভিনন্দন করিতে পারেন কি?

www.pathagar.com

বৈষ্ণব পদাবলীর রচনার পরবর্তী কাল হইতে হিন্দু সাহিত্যের ধারা অবিরল গতিতে চলিয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দু সাহিত্যের সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর কোনো প্রকার সম্পর্ক আছে কি? বাঙালীর প্রাণের যে ছাপ বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, বৈষ্ণব পদাবলীতে তাহা পাওয়া যায় কি? প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব পদাবলী যেমন বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যের সহিত সম্পর্কশূন্য আমাদের প্রাচীন কবিদের রচনাগুলির সহিত তেমনি বর্ত্তমান মোস্‌লেম সাহিত্যের কোনো সম্বন্ধ থাকিতে পারিবে না। আমি এমন কথা বলি না যে, প্রাচীন কবিদের রচনা সংগ্রহ বা সংরক্ষণের কোনো আবশ্যকতা নাই। কিন্তু তাহাকে প্রাচীন যুগের জীবকঙ্কালের ন্যায় শুধু দেখিবার জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। তাহাকে যেরূপ ইচ্ছা, যতবার ইচ্ছা দেখিতে পার, কিন্তু তাহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া একটা নিরর্থক অসার্থকতার সৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা নাই। যে সাহিত্যে প্রাণের সাড়াশব্দ, জীবনের স্পন্দন, মূর্চ্ছনা এবং অনুভূতির স্ফূর্ত্তি নাই, তাহাকে অবলম্বন করিয়া, তাহার উপরেই আপনার অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করিয়া আমাদের সাহিত্য- প্রাণবন্ত মুসলমান জাতির সাহিত্য, জীবনীশক্তিতে পূর্ণ ও পুষ্ট, গঠিত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে পারিবে না, যাঁহারা বলেন, পারিবে, যুগধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের স্পষ্ট সাক্ষ্যবাক্যের বিরুদ্ধাচারী। অসার ভস্মস্তূপের উপরে কখনো আমাদের বিরাট সাহিত্য-সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারিবে না। যদি হিন্দুর ছাইভস্ম মুসলমানের অন্তরের স্পর্শমণির সহযোগে সোনা হইয়া বাহির হইত, যদি হিন্দুর অশ্লীলতা মুসলমানের স্পর্শে তাহার প্রাণের জিনিস হইয়া বাহির হইত, তাহা হইলে সকলের চেয়ে সন্তুষ্ট আমি হইতাম। কিন্তু তাহা হয় নাই—পূর্ব্বে যাহা ছিল, প্রাচীন মুসলমান কবিরা তাহা গলাধঃকরণ করিয়া উদগীরণ করিয়া রাখিয়াছেন মাত্র। অতএব প্রাচীন সাহিত্যকে বর্জ্জন করিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে দণ্ডায়মান হইতে হইবে—জাতীয় সাহিত্যের বুনিয়াদ নূতন করিয়া আমাদিগকে গড়িতে হইবে।

অতএব বর্ত্তমান যুগের মুসলমান সাহিত্যিকের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর। তাঁহার ভ্রমণ-পথ অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল-বাধাকন্টকিত। মুসলমান সমাজে জাতীয় জীবনের উদ্বোধনই তাঁহার কঠোরতম ব্রত—পবিত্রতম লক্ষ্য; তাঁহার সকল সাধনা, সকল কার্য্যের চরম গতি। এজন্য তাঁহাকে গভীর-গম্ভীর হইতে হইবে— হাল্‌কা আবহাওয়া হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। হিন্দুর বর্ত্তমান সাহিত্যকে আদর্শ করিয়া চলিলে আমাদের সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে চিরকালের জন্য একটা ফাঁক থাকিয়া যাইবে— আমাদের সাহিত্য সমগ্র মুসলমান সমাজের সাহিত্য হইয়া উঠিবে না। হিন্দু সাহিত্য যেভাবে, যে গতিতে তালে তালে সমস্ত হিন্দু সমাজকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, আমাদিগকেও সেইভাবে, হয়ত একটু দ্রুততর গতিতে আগাইয়া চলিতে হইবে। আমাদের সাহিত্যিকগণের অনেকে একলাফে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া উচ্চ মৌলিক সাহিত্য রসাত্মক প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং অন্যকে করিতে বলেন। কিন্তু তাঁহাদের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহাদের প্রাণ হয়ত সহসা বড় হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সমগ্র জাতির প্রাণ একদিনে সম্প্রসারিত হইতে

www.pathagar.com

পারে নাই। নিজের বড় মন দিয়া জাতির মনের বিচার করা চলিবে না—আপনাকে নিজের মনের মহত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া জাতিকে বুঝিতে হইবে—বুঝিয়া তাহার ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-সাধনার উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে। জাতির গৌরবোজ্জ্বল অতীত তাহার নয়ন সমক্ষে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাকে চমকাইয়া দিতে হইবে—তাহার সুপ্ত প্রাণকে বিস্মিত মুগ্ধ করিয়া দিতে হইবে। হীনতা নীচতা তাহার সনাতন ধর্ম্ম নহে—এই ধারণাকে জাতির প্রাণের মরুক্ষেত্রে আত্মসম্মানের অভিসিঞ্চনে সিক্ত করিয়া অতি যত্নে পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে হইবে। অতীতে আমরা ছিলাম—শুধু ছিলাম নহে—বাঁচিয়া ছিলাম, এখন আমরা মরিয়াছি, আবার আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, এই কথাগুলি সাহিত্যিকগণকে লেখনীর সাহায্যে জাতির প্রাণের পাথর কাটিয়া বসাইয়া দিতে হইবে। শুধু আপনার ভাবে মশগুল হইয়া, মন যেদিকে চায় সেদিকে গিয়া সাহিত্যালোচনা করিলে তাহা সার্থক হইয়া উঠিবে না। হেমচন্দ্র যেভাবে প্রতীচ্যের সহায়তা লইয়া নিজের সমাজকে জীবনমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকে সেইরূপ জাতীয় জীবনের উদ্বোধন মন্ত্র সংগ্রহ করিতে পরের দ্বারস্থ হইতে হইবে না। আমাদের নিজেরই অতীত বীর্য্যগরিমা, শৌর্য্যমহিমা যাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সোনার অক্ষরে ঝলমল করিতেছে তাহাই বাঙালীর সুরে, বাঙালীর ভাষায় গাও—শত প্রকারে সহস্র কণ্ঠে মুরজ মন্দ্রে গাহিয়া উঠ। উহাই আমাদের জীবনমন্ত্র, প্রাণপ্রতিষ্ঠার উহাই সম্মোহনী বাণী। মৌলিক সাহিত্য, মৌলিক সাহিত্য করিয়া গোল বাধাইও না—এই মরণের যুগে উহা তোমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নহে। আগে জাতীয় জীবনের প্রভাত হোক্, তারপর পিককলরব শ্রবণের জন্য উৎকর্ণ হইও। অতীত মহিমার হিরণ কিরণে অন্ধকার আগে দূরীভূত কর, তখন প্রভাতকাকলীর অপেক্ষা করিও।

দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যে ইতিহাসালোচনা ভাল করিয়া জমিয়া উঠিতেছে না—সাহিত্যিকেরা ভাল করিয়া ইতিহাসের দিকে মনোনিবেশ করিতেছেন না। হিন্দুর উন্নত সাহিত্যের মোহে আমরা এমনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের সাহিত্যালোচনা একটা উদ্দেশ্যহীন ব্যাপারে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আমাদের সমাজে এখন রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা মাইকেল ও হেমচন্দ্রের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। মোসলেমের সাহিত্যিক জীবন সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু হিন্দুর সাহিত্যিক জীবন অনেক আগাইয়া গিয়াছে। মোসলমান সাহিত্যালোচনা করিতে আসিয়াই হিন্দু সাহিত্যের চমকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে; কাযেই তাহার ঝোঁক হিন্দু সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির দিকে হইয়া যায়। কিন্তু অগ্রে জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। সমাজকে পশ্চাতে রাখিয়া আমাদের সাহিত্য আগাইয়া চলিয়াছে—আমার এইরূপ মনে হয়।

বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে অনেক ভাল গল্পলেখকের আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু শক্তিশালী ঐতিহাসিকের আবির্ভাব হয় নাই। কবি অর্থাৎ কবিতালেখকের এত বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছে যে, তাঁহাদের জায়গা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু সাহিত্যাকাশে একটীও হেমচন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। আমি বলিতেছি না যে, মুসলমান সাহিত্যে গল্পের কোনো আবশ্যকতা নাই। আমি এই মাত্র বলিতে চাহি যে নিরর্থক লঘু

www.pathagar.com

সাহিত্য সৃষ্টি করিও না—উহার উপযোগী এখনো আমাদের সমাজ হয় নাই। ফাজলাম করিয়া সখ মিটাইবার জন্য যে সাহিত্যক্ষেত্র তাহার প্রতিষ্ঠা এখনো আমাদের সমাজে হয় নাই— হইতে এখনো অনেক বিলম্ব থাকা উচিত। জাতীয় জীবন স্ফূরণের জন্য যেরূপ বিস্তৃতভাবে ইতিহাস আলোচিত হওয়া আবশ্যক, তাহার কিছুমাত্র অদ্যাপি আমরা করি নাই। আমাদের সাহিত্যিকদের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা তাঁহারা ইতিহাস আলোচনা করুন। অন্য সব কিছু আপাততঃ থাক। ইতিহাসচর্চ্চা ও জীবনচরিতাদি প্রণয়ন করিয়া জাতির মনে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি না করিয়া বর্ত্তমানে মৌলিক সাহিত্য বা লঘু সাহিত্যের জন্মদান করিতে যাওয়া সাহিত্যিকগণের অমার্জ্জনীয় অপরাধ। হিন্দু সমাজের অদ্ভুত মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অজ্ঞাত অখ্যাত সামান্য লোক পর্য্যন্ত সকলেরই বিস্তৃত জীবনচরিত লিখিত হইয়া সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু মুসলমান সাহিত্যে কয়খানা জীবনচরিত বা ইতিহাস রচিত হইয়াছে? কবিতা অর্থাৎ পদ্য লেখা এক হিসাবে বড় সহজ। ছন্দ বা কাব্যসৌন্দর্য্যের কোনো ধার না ধারিয়াও একটা বিশেষ ভাব কোনো রকমে মিত্রাক্ষর পদ্যে প্রকাশ করিতে পারিলেই একটা কবিতা লেখা হইয়া গেল। কিন্তু একটী গদ্য প্রবন্ধ রচনা করিতে হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক শক্তির প্রয়োজন। আজকাল অনেক খ্যাতনামা হিন্দু সাহিত্যিককে অনুযোগ করিতে শুনিতেছি যে মুসলমান সমাজে গদ্য লেখক অপেক্ষা পদ্যলেখক বেশী দেখা যাইতেছে। ইহা জাতির বর্ত্তমান অবস্থায় শুভপ্রদ নহে। জানি আমাদের অনেকে ইচ্ছা করিয়া রবীন্দ্রনাথ সাজিতে যাইতেছেন, কিন্তু আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলিব, আমাদের মধ্যে কোনো রবীন্দ্রনাথ জন্মিবার এখনো ঢের বাকী। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন ভাব ধারণ করিবার মত হৃদয় এখনো কোনো মুসলমান সাহিত্যিক বা কবির হয় নাই—একথা আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিব। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের কবিতা একান্ত ব্যক্তিত্বসর্ব্বস্ব হইয়া উঠিতেছে। অতএব যে কাব্যসুন্দরীর কণ্ঠমণির উপযাচকগণ, তোমরা যদি বাস্তবিক কবিপ্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাক, তবে কাহারো অনুকরণ না করিয়া জাতির কর্ণকুহরে আপন প্রাণের অমিয়ধারা ঢালিয়া দাও, মরণের বিভীষিকা জীবনের দুর্ব্বার পুলকে পূর্ণ হউক, মরা গাঙে জীবনের বাণ ডাকুক, মরুক্ষেত্র পুষ্প পল্লবে পূর্ণ হইয়া কুঞ্জ কাননে পরিণত হউক।

আর একটী কথা বলিয়া আমার অসার প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। মুসলমান সাহিত্যই হউক, আর হিন্দু সাহিত্যই হউক সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে এবং সমগ্রভাবে বাঙালী সাহিত্য হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হইলেও মুসলমানকে তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। পৌত্তলিক এবং যে কোনো কারণে হউক, মোসলেম বিদ্বেষী হিন্দুর নিজস্ব ভাব ও ধারাকে গরল জ্ঞানে ত্যাগ করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, আমাদের অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকও সর্ব্বত্র খাস হিন্দু সাহিত্যের বিষক্রিয়া হইতে আপনাকে একেবারে বাঁচাইয়া চলিতে পারেন নাই। ভাষা ভেদ ও দেশ ভেদকে তুচ্ছ করিয়া যে বিরাট মুসলমান বিশ্বসাহিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে, বাঙলা সাহিত্যকে তাহারই একটী সমর্থ অঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে—মুসলমানের নিজস্ব ভাব ও চিন্তা দ্বারা বাঙলাকে সুশোভিত করিতে হইবে। মুসলমান সাহিত্যিকের সমগ্র সাধনা সমগ্র চেষ্টা ও চিন্তা এই দিকেই পর্য্যবসিত হওয়া উচিত।. . . .

www.pathagar.com

আমাদের ভাষা ও সাহিত্য
তসদ্দুক আহমদ

লেখক-পরিচিত : বিশের দশকের একজন মননশীল গদ্য লেখক।
লেখা-পরিচিতি : সওগাত ১৯৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

ইসলামের ভাবধারা ও অনুপ্রেরণা আপাততঃ আরবী, পারসী এবং উর্দ্দু ভাষার মধ্যেই নিবদ্ধ। সাধারণের মধ্যে এই সব ভাষার প্রচলন আমাদের বাঙ্গলা দেশে তত বেশী নাই। ইহার কোনটিকেই দেশবাসীর মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষা করাও সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই সকল ভাষাবিদগণের নিকট আমাদিগকে বহুদিন পর্য্যন্ত ইসলামের ভাবধারার জন্য ঋণী থাকিতে হইবে। যাঁহারা ঐ সকল ভাষা জানেন তাঁহাদিগকে বাঙ্গলা ভাষায় ইসলামের আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আবশ্যক মত ইসলামী ভাবাপন্ন শব্দাদি ধীরে ধীরে বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলন করিতে হইবে। তাহাতে হিন্দু সাহিত্যিকগণ প্রথম আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন কিন্তু আপনাদের শব্দের প্রযুজ্যতা বা ভাবের মহত্ত্বতা উপলব্ধি করিলে তাঁহারা তাহা গ্রহণ না করিয়া পারিবেন না। ভাষা ও সাহিত্য এইরূপেই শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। জীবিত ভাষামাত্রেই এইরূপে তাহার বর্ত্তমান সম্পদ লাভ করিয়াছে। আমাদের কোন কোন নবীন কবির আরবী ও পারসী শব্দ-বহুল পদ্যসাহিত্য আপাততঃ টীকা, টিপ্পনী সম্বলিত হইলেও সেই সময় সুদূরপরাহত নয় যখন সেগুলি সাহিত্যের বুকে বেমালুম স্থায়ী আসন অধিবার করিয়া বসিবে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সমাজে বলুন, সাহিত্যে বলুন, এমন কি মানব-শরীরেও যখনই কোন নূতন কিছু প্রবেশাধিকার লাভ করিতে চায় তখনই বিষম দ্বন্দ্ব, তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় কিন্তু কালে সেই নূতনই পরম পুরাতন, পরম মিত্র হইয়া দাঁড়ায়। আজ যদি টেবিলকে পীঠিকা, থিয়েটারকে রঙ্গমঞ্চ, সিনেমাকে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আদালতকে ধর্ম্মাধিকরণ বলিতে যাই, তাহা হইলে আপনারা প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও মনে মনে নিশ্চয়ই হাসিবেন। নিপুণ শিল্পীর ন্যায় আপনি যদি উক্ত ভাব সম্বলিত বৈদেশিক শব্দসমূহ সহজ সরল ভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করান, তাহা হইলে ভাষা বা সাহিত্যের উপর নিশ্চয়ই কোন অত্যাচার করা হইবে না। তাই বলিয়া ইদানীং মক্তব ও মাদ্রাসার জন্য মধ্যে মধ্যে যে একপ্রকার অস্বাভিক সাহিত্য দেখিতে পাই, তাহাতে সাহিত্যের পুষ্টি সাধন না হইয়া বরং অনিষ্টই হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। এ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, এই কার্য অত্যন্ত নিপুণতার সহিত করিতে হইবে এবং যিনি এ বিষয়ে তত সিদ্ধহস্ত নন তিনি যদি এ চেষ্টা না করেন তাহা হইলেই ভাল হয়। যাঁহারা এ কাজে পাকা, তাঁহারাই করুন; আমরা সকলে তাঁহাদের অনুসরণ করি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিয়া পারিলাম না। বঙ্গ সাহিত্যের কোন কোন খ্যাতনামা লেখকের অনুকরণে আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল লেখক দেখা দিতেছেন যাঁহারা তাঁহাদের অর্থটা ভাষার বাঁধুনিতে ও ভঙ্গিতে লুকাইয়া রাখিতে চান। তাঁহারা ইচ্ছা

www.pathagar.com

করিয়াই অর্থটাকে দুর্বোধ্য করেন অথবা নকলের নাকালেয় মধ্যে পড়িয়া করেন তাহা বুঝিতে একটু কষ্ট হয়। "বড্ড বোঝা যাচ্চে" এই ভয়ে যদি ইচ্ছা করিয়াই দুর্বোধ হন তাহা হইলে তাহারা পাঠকবর্গের প্রতি অবিচার ত করেনই পরন্তু সৎসাহিত্যেরও সৃষ্টি করেন না। সৎসাহিত্য তাহাকেই বলিব যাহা আপনার ভিতরকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে জগতের লোকের নিকট তাহাদের উপকারার্থে নিবেদিত হয়। এরূপ সৎসাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। আবার শিক্ষার জন্য আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক।

সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যে শিক্ষার এরূপ প্রয়োজন সেই শিক্ষার বাহন কি হইবে তাহা লইয়া আমাদের দেশে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমার মনে হয় এই আন্দোলনের মধ্যে অনেকটা কৃত্রিমতা আছে। কারণ যাহা সহজ, সরল বুদ্ধিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান তাহাকে তর্কের জালে আচ্ছন্ন করিয়া আসল কথাটাকে হারাইয়া ফেলি কেন? মানুষের ভাব সমুদ্রে যখন আন্দোলন উপস্থিত হয় তখনই ভাষার সৃষ্টি হয়। ভাবরাশি যদি আমায় মাতৃভাষাতেই প্রথম মূর্ত্ত হয় তাহা হইলে তাহার প্রকাশই বা কেন অন্য ভাষাতে হইবে? হইতে পারে ইংরাজী আমাদের রাজভাষা, হইতে পারে উর্দ্দু, আরবী, পারসী আমার ধর্ম্মের ভাষা কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষার বাহন হইবার জন্য উহাদের একটিও ত উপযুক্ত নহে। ইংরাজী শিখিলে আমাদের সংসার জীবনে উন্নতি হইতে পারে, আমাদের নিকট জ্ঞানরাজ্যের দ্বারোদ্ঘাটন হইতে পারে; উর্দ্দু, আরবী, পারসী শিখিলে আমরা ইসলামের তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ অনেক জানিতে পারি সত্য, কিন্তু যখন এই সকল জ্ঞানরাশিকে আমার নিজস্ব করিতে হইবে, আমার রক্ত, মাংস, অস্থির ন্যায় আমারই এক মানসিক ও নৈতিক উপাদানে পরিণত করিতে হইবে তখন তাহা মাতৃভাষা ব্যতিরেকে কিরূপে সম্ভবপর হয় আমি বুঝি না। এ সম্বন্ধে আমি অধিক বলিতে চাহি না, কারণ ইতিপুর্ব্বে ইহার আলোচনা হইয়াছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা আবশ্যক। জগতটা আজকাল ক্রমেই ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিতেছে। নানা দেশের নানা ভাষার লোক আসিয়া আজ আমাদের কুটীরদ্বারে আঘাত করিতেছে। আমরা কুপমণ্ডুকের ন্যায় মাথা লুকাইয়া থাকিলে আর চলিবে না। সুতরাং অপরের সহিত মনের ভাবের আদান প্রদান করিবার জন্য, লেনাদেনার জন্য মাতৃভাষা ব্যতীত আমাদিগের আরও দুএকটা ভাষা শিক্ষা করা দরকার। আজকাল পাশ্চাত্য দেশ সমূহে মাতৃভাষা এবং ব্যক্তিবিশেষের জন্য একটী প্রাচীন ভাষা ব্যতীত এক বা ততোধিক আধুনিক ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। বাঙ্গালী মুসলমানের জন্যও আমার মতে অন্ততঃ দুইটী ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু ইংরাজী রাজভাষা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান ভাষা এবং সাহিত্যের হিসাবে বড় সম্পদশালী ভাষা অতএব ইংরাজী আমাদিগকে শিখিতেই হইবে।

তারপর আরবী আমাদের কোরানের ভাষা; যাঁহারা কোরানের রত্নরাজি আহরণ করিবার জন্য অনুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন না তাঁহাদিগকে মূলভাষা শিক্ষা করা

www.pathagar.com

দরকার। এই ভাষা শিক্ষা-বিভ্রাট লইয়া আমাদের বহু সময় কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে পথও আবিষ্কৃত হয়। আমরা যদি মুসলিম বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করি তাহা হইলে আমাদিগকে আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃত সাধকের ন্যায়, ভক্তের ন্যায় নম্রভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত এই কঠিন সমস্যার সমাধান কৃত সঙ্কল্প হইতে হইবে। আলাদীনের প্রদীপ আমাদিগকে কেহ হাতে তুলিয়া দিবে না। একদিনেই আমাদের মুসলিম সাহিত্য সমাজকে সর্ব্ববিষয়ে গরীয়ান করিতে পারিব না।

বাঙ্গলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আমাদের অভাব এবং মুসলিম সাহিত্যিকগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুই চারি কথার উল্লেখ করিতেছি। নবীন লেখকদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাই, তাঁহারা সাহিত্যের আসরে নামিয়াই অন্ততঃ কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিবার জন্য এক দুর্নিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের কবিত্বের পরিচায়ক স্বরূপ চাঁদের আলো, কোকিলের কুহুধ্বনি, পত্রের মর্ম্মর শব্দ, স্রোতস্বিণীর কুল্‌কুল্ রাগিনী হইতে আরম্ভ করিয়া চটিজুতা, পুঁইশাক, মিনি বিড়াল প্রভৃতি কোন বিষয়ই বাদ যায় না। বোধ হয় এটা কাল মহাত্ম্যের দরুণই হয়। যৌবনের প্রথম উন্মেষে সমস্ত পৃথিবীটাই রঙ্গীন মনে হয়। তখন কল্পনা রথে চড়িয়া বাস্তব জগতের উপর কেবল চোখ বুলাইয়া যাওয়া হয়। সুতরাং সংসারের বন্ধুর, কঙ্করময় পথগুলি তখন চোখে পড়ে না। তারপর যত বয়ঃবৃদ্ধি হইতে থাকে ততই বাস্তবের সহিত পরিচয়টা ঘনীভূত ও ঘাঢ়তর হয়। তখন কবিত্ব, হা-হুতাস, ধীরে ধীরে উবিয়া যায়। ইহা হইতে আপনারা মনে করিবেন না যে আমি কাব্যসাহিত্যের নিন্দা করিতেছি। কাব্যের যে কি মহিয়সী ক্ষমতা তাহার প্রমাণ ইতিহাসে ভুরি ভুরি রহিয়াছে। তবে তাহা কাব্যের মত কাব্য হওয়া চাই। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের এখন যে ঘোর দুর্দিন তাহাতে অসার কল্পনার দাস হইয়া আল্‌নশ্‌করের আকাশ কুসুম গড়িয়া কালক্ষয় করিলে আর চলিবে না। সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তাহার জন্য আল্লাহ্ তালা যাহাকে যেটুকু ক্ষমতা দিয়াছেন তাহার ষোল-আনা সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। ওমর খাইয়ামের অনুবাদ করেন কান্তিবাবু, নরেন্দ্রবাবু, কোরান ও হাদিসের অনুবাদ করেন গিরীশ বাবু। আমরা কবে আমাদের রত্নরাজি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া পৃথিবীর সমক্ষে উপস্থিত করিব? বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্" ইকবালের 'তারাণা" আমাদের মধ্যে কবে শুনিব? রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান কথা, দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য কৌতুক, রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা, দীলিপকুমারের সঙ্গীত চর্চ্চা, পুলিন দাসের লাঠিখেলা সবই আমাদের মধ্যে চাই। তবেই আমাদের সাধনার ফল পাইব। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবি, দার্শনিক হইতে না পারি, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় ঔপন্যাসিক হইতে না পারি কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের আদর্শ ছোট হইবে কেন?

আসুন আমরা সকলে মিলিয়া সেই করুণাময় সর্ব্বনিয়ন্তা আল্লাহ্‌তালার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের সকল চেষ্টা, সকল পরিশ্রম সার্থক করুন, আমাদিগকে বিজয়মাল্যে বিভূষিত করুন, আমাদের সাহিত্য সেবাকে সফল করুন। আমিন!

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমান

আব্বাস আলী খান

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ১৯১৪, জয়পুরহাট (বৃহত্তর বগুড়া)। আব্বাস আলী খান একজন প্রবীণ শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক এবং রাজনীতিবিদ। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস'। প্রকাশক ঃ এ.কে.এম. নাজির আহমদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা। প্রকাশ কাল ঃ ১৯৯৪। অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ : স্মৃতি সাগরের ঢেউ (১৯৭৬), সীরাতে সরওয়ারে আলম (অনুবাদ), ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ (অনুবাদ) প্রভৃতি।

লেখা–পরিচিতি ঃ 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

বাংলার মুসলমান ও বোধনকৃত নতুন বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষার এবং বিশেষ করে বাংলা গদ্যের জন্ম ও ক্রমবিকাশের উপরে বাংলা ভাষার পণ্ডিতগণ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং এর উপরে বিরাট বিরাট গ্রন্থও রচিত হয়েছে। সে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস থেকে বাংলা ভাষার আলোচনা বাদ দিলে ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে। সেজন্য সংক্ষেপে হলেও এ বিষয়ে মূলকথা কিছু বলে রাখা দরকার। বাংলাভাষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় ১৭৭৮ সালের পূর্বে এর রূপ ও আকৃতি ছিল একরূপ এবং পরে এ ভাষা ধারণ করে আর এক রূপ।

এদেশের ইংরেজদের আগমনের পূর্বে বাংলাভাষার যে রূপ ছিল তার মধ্যে ছিল অজস্র আরবী–ফার্সী শব্দের মিশ্রণ। এ ছিল তৎকালীন সর্ববংগীয় মাতৃভাষা। এ সাহিত্যের বিকাশ ছিল প্রধানতঃ পদ্যে। গদ্য সাহিত্যের ততোটা প্রচলন ছিল না। থাকলেও তার উন্নতি কল্পে কোন প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। এই যে আরবী–ফার্সী শব্দবহুল বাংলা ভাষা এ শুধু এ দেশের মুসলমানের ভাষা ছিল না। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই ছিল এ ভাষা। চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, সরকার সমীপে আবেদন নিবেদন হিন্দু–মুসলমান উভয়েই এ ভাষা ব্যবহার করতো। প্রাচীন রেকর্ড থেকে গৃহীত জনৈক হিন্দু কর্তৃক একখানি পত্রের উদ্ধৃতি দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা হচ্ছে—

শ্রীরাম। গরীব নেওয়াজ সেলামত। আমার জমিদারী পরগণে কাকজোল তাহার দুইগ্রাম শিকিস্তি হইয়াছে সেই দুই গ্রাম পয়স্তি হইয়াছে— ্রকালে একবেলপুরের শ্রী হরে কৃষ্ট রায় চৌধুরী আজ জবরদস্তি দখল করিয়া ভোগ করিতেছে। আমি মালগুজারীর সরবরাহতে মারা পড়িতেছি—উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিও এক চোপদার সরেজমিনেতে পঁহুচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া আদালত করিয়া হক দেলাইয়া দেন। ইতি ১১৮৫ তারিখ ১১ শ্রাবণ। ফিদবী জগতাধিব রায়। (চিঠিখানির ইংরেজী তারিখ হবে ১৭৭৮ সালের ২৬শে জুলাই)

এ চিঠিখানির উল্লেখ করে সমকালীন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর সজনীকান্ত এরূপ মন্তব্য করেন ঃ

www.pathagar.com

এক হিসেবে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে যে ভাষার প্রমাণিক আত্মপ্রকাশ দেখিতেছি তাহা দেশে মুসলমান প্রভাবের ফল। পরবর্তীকালে হেনরী-পিটার ফ্রস্টার ও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ৬২)

সজনীকান্ত আরও বলেন ঃ কিন্তু ইংরেজের আগমন না ঘটিলে আজিও আমাদিগকে 'গরীবে নেওয়াজ সেলামত' বলিয়া শুরু করিয়া 'ফিদবী' বলিয়া শেষ করিতে হইতো। তাহা মংগলের হইত কি অমংগলের হইত, আজ সে বিচার করিয়া লাভ নাই।.... ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই আরবী পারসী নিসূদন যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সময় সদর-মফস্বল আদালতসমূহে আরবী পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজীর প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আরবী পারসীকে অশুদ্ধ ধরিয়া শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি অভিধান রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সাহেবরা সুবিধা পাইলেই আরবী ও পারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন। ফলে দশ পনের বৎসরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণই পরিবর্তিত হইয়াছিল। (বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস-পৃঃ ৩২)

উপরে বর্ণিত ইউলিয়াম কেরী সায়েবদের আরবী-ফার্সীর বিরুদ্ধে ওকালতির কারণ ছিল। আবদুল মওদূদ যথার্থ বলেছেন— প্রাচ্য খণ্ডে ইউরোপের বিজয়াভিযান হয়েছিল সুপরিকল্পিত তিনটি উপায়ে ঃ পণ্যবাহী বণিকরূপে, তার পিছনে অস্ত্র নিয়ে পণ্য নিরাপত্তার অজুহাতে এবং তাদের পিছনে মিশনারী নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির তালিম দেয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে। (আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, পৃঃ ৩৬৩)

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির তালিম দেয়ার জন্যে তৃতীয় পর্যায়ে এসেছিল খৃষ্টান মিশনারীগণ। কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন দেশগুলোতে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্যে ইংলণ্ডে কতকগুলি ধর্মীয়সংস্থা গঠিত হয়েছিল; তাদের মধ্যে উইলবাফোর্সের নেতৃত্বে ক্লাপহাম উপদলটি (Clapham Seer) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চার্লস্ গ্রান্ট ছিলেন এ উপদলটির সদস্য এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর। তিনি ভারত ভ্রমণের পর এ দেশের অধিবাসীদের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থার এক নৈরাশ্যজনক চিত্র তুলে ধরে বলেন, "তারা যে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে তার একমাত্র সমাধান হচ্ছে—তাদের মধ্যে খৃষ্টধর্মের আলোক প্রজ্জ্বলিত করা। হিন্দুরা অজ্ঞ বলে তারা ভুল করছে। তাদের ভ্রান্তি তাদের কাছে তুলে ধরা হয়নি। তারা যে উচ্ছৃংখলতা ও পাপাচারে লিপ্ত আছে, তা দূর করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে তাদের মধ্যে আমাদের আলোক ও জ্ঞান বিতরণ করা।"

(Grant's Obsrevations, published in the printed parliamentary paper relating to the affairs of India Several Vol. viii (734), Appendix I. Published 1832, pp. 3-60; M. Fazlur Rahman: The Bengali Muslims & English Education, pp. 30-32)

www.pathagar.com

খৃষ্টান মিশনারীগণ তাদের ধর্ম প্রচারের জন্যে প্রধানতঃ এ দেশের হিন্দুকে বেছে নিয়েছিল। এ কাজের জন্যে তাদের অনিবার্যরূপে প্রয়োজন হয়েছিল বাংলাভাষা শিখবার ও শিখাবার। হুগলী শ্রীরামপুরে এ উদ্দেশ্যে তারা একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করে। পূর্বে বলা হয়েছে— এযাবত বাংলায় যে বাংলা ভাষা রূপ লাভ করেছিল—তা ছিল মিশ্র বাংলা অর্থাৎ আরবী-ফার্সী শব্দ মিশ্রিত বাংলা। যদিও এ বাংলা হিন্দু মুসলমান উভয়ের কথ্যভাষা ছিল, তথাপি হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এ ভাষাকে ঘৃণা করতেন। মুসলমান জাতি তাদের কাছে 'ম্লেচ্ছ', 'যবন' ও ঘৃণিত জীব। তাদের আরবী-ফার্সী ভাষাও তাদের কাছে ছিল ঘৃণিত। সম্ভবতঃ গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিতগণ আরবী-ফার্সী শব্দের মধ্যে 'গোমাংসের' গন্ধ অনুভব করতেন। এ ভাষাকে তাঁরা প্রাকৃত বা লৌকিক আখ্যা দিয়ে অভিশাপ করলেন। ইতিপূর্বে মুসলমান সুলতানদের আমলে এ ভাষায় অনেক হিন্দুধর্ম-গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল। একালের পণ্ডিতগণ ফতোয়া দিলেনঃ

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ,
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

—ভাষায় অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় অষ্টাদশ পুরাণ রামচরিত ইত্যাদি যে মানব শুনবে, তার ব্যবস্থা রৌরব নরকে। (আবদুল মওদূদঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ— পৃঃ ৩৪৪)

একথা খৃষ্টান মিশনারীগণও ভালোভাবে উপলব্ধি করেন যে, যে ভাষার প্রতি হিন্দু পণ্ডিতগণ ঘৃণা পোষণ করেন, সে ভাষার শুদ্ধিকরণ ব্যতীত তার দ্বারা খৃষ্টধর্ম আকৃষ্ট করা কষ্টকর হবে। তাই তাঁরা এক ঢিলে দুই পাখী মারার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। ভাষাকে আরবী-ফার্সীর ছোঁয়াচ থেকে রক্ষা করে হিন্দুর গ্রহণযোগ্য করা, এবং মুসলমানদের বাংলা মাতৃভাষার নিসূদন যজ্ঞ বা ধ্বংসযজ্ঞ সম্পাদন করা যার উল্লেখ সজনীকান্ত করেছেন। এ মহান (?) উদ্দেশ্যে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড (Halhed) ১৭৭৮ সালে A Grammar of the Bengali Literature নামে বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন এবং শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত গ্রন্থ হিসাবে এইটিই ছিল প্রথম যাতে প্রথম বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হয়। এ ব্যাকরণের মাধ্যমে এতদিনের প্রচলিত বাংলা ভাষার পরিবর্তে এক নতুন বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়। যে ভাষা ছিল একেবারে আরবী-ফার্সী শব্দ বিবর্জিত এবং সংস্কৃত শব্দবহুল। ব্যাকরণটির ভূমিকায় হ্যালহেড বলেন, "এ যুগে তাঁরাই মার্জিত ভাষায় কথা বলেন, যাঁরা ভারতীয় ক্রিয়াপদের সংগে অজস্র আরবী ফার্সী বিশেষ্যের মিশ্রণ ঘটান।" অতএব একথা নিঃসন্দেহ যে, আঠারো শতকের মার্জিত বাংলা কথ্যভাষা এবং গদ্য ভাষার কাঠামোতে ছিল অজস্র আরবী-ফার্সী শব্দের মিশ্রণ—যার দৃষ্টান্ত উপরে বর্ণিত জনৈক হিন্দু জগতাধিব রায়ের পত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি।

উল্লেখযোগ্য যে, কোম্পানীর ইংরেজ সিভিলিয়ানদেরকে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্যে ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। উইলিয়াম কেরী হন এ বিভাগের অধ্যক্ষ। তাঁর অধীনে আটজন পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়

www.pathagar.com

তর্কালংকার ও রামরাম বসুর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁদের সহায়তায় কেরী বাংলা গদ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করতে থাকেন। প্রথমে রচিত হয় 'কথোপকথন' ও পরে 'ইতিহাসমালা'। বলা বাহুল্য গ্রন্থ দুটির ভাষা ছিল সংস্কৃত স্টাইলের এবং বিষয়বস্তুও ছিল মুসলমানবর্জিত। প্রতাপ আদিত্য, রূপ সনাতন ও বীরবল ছিলেন ভারতীয় ইতিহাসের উপজীব্য চরিত্র। অতএব ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পণ্ডিতদের সাধনায় ও হিন্দুত্বের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায়— ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় হয়েছিল ক্ষেত্র প্রশস্ত। একদিকে মিশনারীদের ছিল একটা অসভ্য জাতিকে অন্ধকার হতে আলোকে নিয়ে যাওয়ার দম্ভ। আর অন্যদিকে ছিল পণ্ডিতদের সংস্কৃতের তনয়ারূপে বাংলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে হিন্দুদের মাহাত্ম্য প্রকাশের অসীম উদ্যম ও আগ্রহ। এ দুটি উদ্দেশ্যের ধারা সম্যকভাবেই প্রতিফলিত দেখা যায়—এই কেরীর সৈনাপত্যে পণ্ডিতদের রচিত ওই সময়ের গ্রন্থগুলির ভাষা ও বিষয়বস্তুর মূল্যায়নকালে। (বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, সজনীকান্ত দাস : পৃঃ ১১২; আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩৬৪)

অতএব এসব তথ্যের ভিত্তিতে একথা আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, ইংরেজ ও হিন্দুর যোগসাজসে মুসলমানরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকেই বিতাড়িত হয়নি। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে তাদের যে মাতৃভাষাটি গড়ে উঠেছিল তাকেও নস্যাৎ করা হলো। সমাজের উচ্চস্থান থেকে নীচে নিক্ষেপ করা হলো। মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে অন্যকে দেয়া হলো এবং শেষ সম্বল মুখের ভাষাটিও ধ্বংস করা হলো 'নিসূদন যজ্ঞের' মাধ্যমে।

শ্রদ্ধেয় আবদুল মওদূদ বলেন— "এই মিশ্ররীতির বাংলাভাষায় সাহিত্য গড়ে উঠার মুখেই বণিকের তুলাদণ্ড হলো রাজদণ্ডে রূপান্তরিত এবং বণিকের তল্পীবাহক মিশনারীরাও দিলেন সাহিত্যের ভাষার মোড় পরিবর্তন করে।..... পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তকরা বাংলা ভাষার কাঠামোকেও নতুন ছাঁচে তৈরী করে দিলেন- বাবু সম্প্রদায়ের জন্যে। তার দরুন বাবু কালচারের আবাহন হলো যে ভাষায়, তা কেবল সংস্কৃত ঘেঁষা নয়, একেবারে সংস্কৃতসম। আর এটিও হয়েছে সুপরিকল্পিত সাধনায়—হিন্দু পণ্ডিতরা উল্লসিত হলেন তার দরুন—সংস্কৃত ভাষা ও কৃষ্টির নব প্রবর্তনের সম্ভাবনায় এবং মিশনারীকুল তৎপর হয়েছিলেন মুসলমানদের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে তাকে সাহিত্য ও কাল্‌চারের দিক দিয়েও নিঃস্ব করে দিতে।"(আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ পৃঃ ৩৫৮)

ইংরেজ তথা মিশনারী-পূর্ব বাংলা ভাষাকে ভিত্তি করে মুসলমানদের যে এক নতুন বাংলাভাষা গড়ে উঠে, যার মধ্যে শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করছিল আরবী ও ফার্সী তাকে বলা যেতে পারে মুসলমানী বাংলা। স্বভাবতঃই তা মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিল না হিন্দুদের কাছে। ১৮৩৭ সালের পর হিন্দুবাংলা (আরবী-ফার্সী শব্দ বর্জিত সংস্কৃত শব্দবহুল বাংলা) প্রাদেশিক মাতৃভাষা হিসাবে সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি লাভের পর মুসলমানী বাংলার অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। অফিস-আদালত থেকে এতদিনের প্রচলিত ফার্সী ভাষা তার আপন মর্যাদা হারিয়ে ফেলে এবং নতুন বোধনকৃত বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে থাকে। নতুন বাংলা ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

স্থাপনের পর এ ভাষা হিন্দু সংস্কৃতি ও জাতীয় আশা-আকাংখার বাহন হিসাবে মর্যাদা লাভ করে।

এ নতুন বাংলা ভাষাকে স্কুল কলেজে মাতৃভাষা হিসাবে বাধ্যতামূলক করা হয়। এমনকি যে কোলকাতা মাদ্রাসায় অনেক ছাত্র মুসলমানী বাংলাও জানতোনা, সেখানেও এই নতুন বাংলা পাঠ্য করা হয়। প্রফেসর উইলসন প্রমুখ ইউরোপীয় শিক্ষাবিদগণ সংস্কৃত ভাষার সপক্ষে এমন জোর ওকালতি শুরু করেন যে, সায়েবদের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করাটা একটা চরম বাতিকে পরিণত হয়। উইলসন একটি সহজ সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করে সায়েবদের সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করে দেন। ১৮২৮ সালে তিনি 'বাংলাভাষায় ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতির' প্রেসিডেন্ট হন এবং General Committee of Public Instruction বা জনশিক্ষা সাধারণ কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন বাংলাভাষায় বহু পুস্তক রচনা করেন। এসব বইপুস্তক পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হয়। মুসলমানী বাংলা এবং নতুন বাংলার মধ্যে শুধু ভাষার দিক দিয়েই নয়-বিষয়বস্তু, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে এমনই আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল যে, মুসলমানদের জন্যে নতুন ভাষা গ্রহণ অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়ে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

> করুণা নিধন বিলাস, পদাংক দূত, বিল্ব মংগল, গীতা গোবিন্দ-শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত, চণ্ডী, আনন্দ মংগল দূর্গা সম্পর্কিত, মহিমা স্তব, গংগা ভক্তি-শিব গংগা সম্পর্কিত, চৈতন্য চরিতামৃত, রস মঞ্জরী, আদিরস, পদাবলী, রতিকাল, রতি বিলাস-প্রেমোদ্দীপক।

স্কুলে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গৃহীত ঃ

শিশু বোধক- বাংলার সর্বত্র এবং গ্রাম্য স্কুলগুলিতে ব্যাপকভাবে পড়ানো হয়। এর মধ্যে ছিল বহু সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ যা প্রধানতঃ হিন্দু দেব-দেবী সম্পর্কে লিখিত। এর প্রথম পাঠগুলি-সরস্বতী, গংগা প্রভৃতি সমীপে প্রার্থনা দিয়ে শুরু করা হয়েছে।

তারপর আসে আনন্দ মংগলের কথা। এটাও আগগোড়া হিন্দুধর্ম ও তাদের দেব-দেবীদের স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ। এ ধরনের বহু পাঠ্যপুস্তকের নাম পাওয়া যায় (M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & Eng. Education, pp. 106-108)।

উল্লেখযোগ্য যে, সংস্কৃতসম হিন্দুবাংলার পূর্বে যে বাংলা ভাষা কয়েক শতাব্দী যাবত লালিত-পালিত ও পরিপুষ্ট হচ্ছিল তা প্রধানতঃ ছিল পদ্যসাহিত্য বা পুঁথিসাহিত্য। এ সাহিত্যকে আধুনিককালে পুঁথিসাহিত্য হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এ সাহিত্যের যারা চর্চা করেছেন, তাঁদের দুজন 'মালে মুহাম্মদ' ও 'মুহাম্মদ দানিশ' এ সাহিত্যের রীতিকে বলেছেন 'চলতি বাংলা' এবং 'রেজাউল্লাহ' (১৮৬১) বলেছেন 'ইসলামী বাংলা'। ১৮৫৫ সালে পাদরী লং তাঁর গ্রন্থতালিকায় এ ভাষাকে বলেছেন 'মুসলমানী বাংলা' আর এ ভাষায় রচিত সাহিত্যের নামকরণ করেছেন 'মুসলমানী বাংলা সাহিত্য'।

(আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩৫৫)

www.pathagar.com

এ সাহিত্যের প্রতি হান্টার সায়েবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি বলেন ঃ আজ পর্যন্ত বদ্বীপ অঞ্চলের কৃষক সমাজ মুসলমান। নিম্নবংগে ইসলাম এতই বদ্ধমূল যে, এটি এক নিজস্ব ধর্মীয় সাহিত্য ও লৌকিক উপভাষার উদ্ভব ঘটিয়েছে। হিরাতের ফার্সী ভাষা থেকে উত্তর ভারতের উর্দু যতোখানি পৃথক, 'মুসলমানী বাংলা' নামে পরিচিত উপভাষাটি উর্দু হতে ততোখানি পৃথক।" W.W. Hunter: The Indian Musalmans, p. 146)

এ সাহিত্যের যে নামই দেয়া হোক, তা ছিল না প্রাণহীন। কয়েক শতাব্দী যাবত তা লক্ষ লক্ষ মুসলমান নর-নারীর প্রাণে সাহিত্য তরংগ তুলেছে। তাদের চিন্তা-ভাবনা ও আশা-আকাংখাকে প্রভাবিত করেছে। শ্রী শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায় বলেন—

মুসলমান সাহিত্যের গল্প ভাণ্ডারও নিতান্ত দরিদ্র ছিল না। 'আরব্য উপন্যাস', 'হাতেম তাঈ', 'লায়লা মজনু', 'চাহার দরবেশ', 'গোলে বাকাওলী' প্রভৃতি আখ্যায়িকাগুলি নিশ্চয়ই বাঙালী পাঠকের সম্মুখে এক অচিন্তপূর্ব রহস্য ও সৌন্দর্যের জগত উন্মুক্ত করিয়াছিল।... উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শে আমাদের গল্পের সাহিত্য ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল তখন এই শ্রেণীর মুসলমানী গল্পের অনুবাদ আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার একটা প্রধান অংগ হইয়াছিল। উহারা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ ও রুচি আকর্ষণ করিতে না পারিলে আমাদের সাহিত্যিক উদ্যমের একটা মুখ্য অংশ কখনই উহাদের অনুবাদে নিয়োজিত হইতে পারিত না। অন্ততঃ এই সমস্ত গল্পের মধ্যে একটা চমকপ্রদ (Sensational), বর্ণবহুল (Romance), একটা নিয়ম-সংযমহীন সৌন্দর্য বিলাসের অপরিমিত প্রাচুর্য আছে, তাহাই আমাদের একশ্রেণীর ধর্মশাস্ত্রাস্বাদক্লিষ্ট, অবসাদগ্রস্ত রুচিকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করিয়াছিল। (বংগসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায়, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৮-১৯)

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িকতা

আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি এবং সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে যাঁদের অবদান রয়েছে, তাঁদের মধ্যে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ও রাজা রামমোহনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত দু'জন উইলিয়াম কেরী কর্তৃক নিযুক্ত পণ্ডিতগণের অন্তর্ভুক্ত। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য' গ্রন্থ ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তার মধ্যে রাজাবলী (১৮০৮) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারপর আসে রামমোহনের নাম। তাঁর গদ্যসাহিত্য ছিল বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত। কিন্তু এঁদের সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বা মুসলিম বিদ্বেষ ছিল না। অবশ্যি মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলী' ছিল চন্দ্র বংশের ক্ষেত্রজ সন্তান বিচিত্রাবলী থেকে বাংলাদেশের কোম্পানী শাসন প্রতিষ্ঠার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার প্রথম প্রয়াস এবং মুসলমানী আমলটা অত্যন্ত অযত্নের সংগে বিদ্বেষদুষ্ট ভংগীতে লেখা।

পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের অংগনে দু'জন দিকপালের আবির্ভাব হয়। বাংলা পদ্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের এবং গদ্য সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের। বাংলা সাহিত্যে তাঁদের শ্রেষ্ঠ অবদান অনস্বীকার্য।

www.pathagar.com

আবদুল মওদূদ বলেন—

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশক্ষেত্রে যখন মধ্যাহ্ন গগন বিরাজমান, তখন বাংলার রাজনৈতিক গগনেও মোড় ফিরে গেছে। তখন ইংরেজের সংগে হার্দিক সম্বন্ধে বিদারণ রেখা দেখা দিতে শুরু করেছে। ইংরেজের অনুগ্রহের ষোলআনা অংশটার এক পক্ষ প্রবল দাবী জানাচ্ছে আত্মসচেতন হয়ে। শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সমাজে বেকার সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এবং তার দরুন তাদের মনে নৈরাশ্যভাব দেখা দেয়ায় তারা হিন্দুজাতীয়তা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগমানসের সন্তান। তিনি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ-মনের প্রতিভূ হিসেবে এবং হিন্দু জাতীয়তা মন্ত্রের উদ্যোক্তা ঋষি হিসেবে বাংলার সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হলেন। এবং এভাবে তীব্র সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবহ্নি তিনি ছড়িয়ে দিলেন লেখনী মুখে, জগতের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় নজীর নেই। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও গভীর বিশ্লেষণ শক্তির অধিকারী হয়েও সংকীর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের আদর্শের-উদ্দেশ্যের ক্রীড়নক হয়ে তিনি মানবতার যে অকল্যাণ ও অসম্মান করে গেছেন, তারও পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনা নেই। অস্ত্রের মুখে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, কালের প্রলেপে সে ক্ষতও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু লেখনীর মুখে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তার নিঃশেষ নেই, নিরাময় নেই—যুগ থেকে যুগান্তরে সে ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে।

– (আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩৬৯-৭০)।

সাহিত্যের মাধ্যমে বঙ্কিম মুসলিম সমাজ ও জাতির বিরুদ্ধে যে বিষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করে গেছেন।. . . . বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের চরম অবনতির জন্যে তাঁর সাহিত্যই প্রধানতঃ দায়ী।

বঙ্কিম তাঁর 'রাজসিংহ' ও 'আনন্দমঠে' মুসলমান বিদ্বেষের যে বিষবহ্নি উদগীরণ করেছেন যে বিষজ্বালায় এ বিরাট উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে যেটুকু সম্প্রীতির ফল্গুধারা ছিল, তা নিঃশেষে শুষ্ক ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।..... এ উপমহাদেশে মুসলমানের অস্তিত্বও বঙ্কিমচন্দ্র অস্বীকার করে তাদের বিতাড়িত করে সদাশয় ব্রিটিশজাতির আবাহনে ও প্রতিষ্ঠায় তিনি বার বার মুখর হয়ে উঠেছেন। (ঐ, পৃঃ ৩৭০)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পূর্বে মুসলমানদের যে সাহিত্য সাধনা ছিল, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোন লেশমাত্র বিদ্যমান ছিল না। একথা হিন্দু সাহিত্যসেবীগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

মুসলমানদের কাব্য কাহিনীতে সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্মের পরিবর্তে আছে সুফী মতবাদের প্রভাব ও ছদ্মবেশী রূপকাভিপ্রায়, ও ইহার ঘটনাবলীও প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিবিম্ব নহে। জীবনোদ্ভুত এক উচ্চতর আদর্শ কল্পনার সুকুমার ভাবরঞ্জিত ও অসাধারণত্বের স্পর্শদীপ্ত।

(বংগ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায়, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৮-১৯)

একথা উল্লেখ্য যে, সাহিত্যের অংগনে সাম্প্রদায়িকতার বীজ প্রথম বপন করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অঙ্গুরী বিনিময়ে' (১৮৫৭)। সম্ভবত তাঁর থেকে প্রেরণা লাভ করে বঙ্কিম সে বীজকে সাম্প্রদায়িকতার বিরাট বিষবৃক্ষে পরিণত করেন। বঙ্কিমের মৃত্যুর পর বাংলা সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতার পংকিলতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। তাঁর পদাংক

www.pathagar.com

অনুসরণ করে পরবর্তীকালেও লেখনী চালনা করেছেন পণ্ডিত-অপণ্ডিত, সাহিত্যিক-অসাহিত্যিক বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়। বাংলা সাহিত্যকে যে দু'জন মনীষী—কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সুষমামণ্ডিত ও কিরীটশোভিত করেছেন, তাদের লেখনীও সে পংকিলতার স্পর্শমুক্ত হতে পারেনি। শরৎচন্দ্রে সাম্প্রদায়িকতা বিষদুষ্ট লেখনীর উদ্ধৃতি আমরা উপরে দিয়েছি।

কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথকেও যখন এ আবর্তে অবগাহন করতে দেখি তখন ক্ষোভে ও লজ্জায় বেদনার্তকণ্ঠে মুসলমান বলে উঠে জুলিয়াস সীজারের মতো ঃ Et tu Brute! তোমাকে ত রবীন্দ্রনাথ, এসবের উর্দ্ধে ভেবেছিলাম। এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ না করে রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পটি ও 'শিবাজী উৎসব' কবিতা পাঠ করে দেখতে পাঠক সমাজকে অনুরোধ করি। (আবদুল মওদূদ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩৭১)

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলমান

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা যখন সাফল্যের শীর্ষে, তখন তারই সমসাময়িক একজন মুসলমান বাংলাসাহিত্য গগনে উদিত হন। তিনি হলেন মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর সাহিত্য ছিল আলবৎ আধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্ধ্বে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্যের অংগনে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছিলেন, তখন মশাররফ হোসেন সেদিক ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে শিল্পীসুলভ মনোভাব নিয়ে মুসলমানদের প্রতি উপদেশমূলক সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। চল্লিশ বছরেরও অধিক সময় তিনি সাহিত্য সাধনা করেন এবং উপন্যাস, জীবনী, ঐতিহাসিক কাহিনী, নাটক, রম্যরচনা, কবিতা ও গান তাঁর সাহিত্য সাধনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা 'বিষাদসিন্ধু'। বিষাদসিন্ধুর চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে গৃহীত হলেও এটাকে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলা যায় না। তথাপি মুসলমান সমাজে এটা ছিল সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের গগনে আর একটি জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে এবং তা হলো বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। বাংলা সাহিত্যের অংগনে আরও অনেক মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের আগমন সমসাময়িককালে হয়েছে। যথা- কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুন্সী মেহেরুল্লাহ প্রমুখ। নিজেদের স্বতন্ত্র ধারায় সাহিত্য সৃষ্টি করে তাঁরা মুসলমান জাতিকে আত্মসচেতনতায় ও স্বাতন্ত্রবোধে উদ্বুদ্ধ করেন। নজরুলের আগেও বাংলা সাহিত্যের আসরে বহু মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু তাঁদের ও নজরুলের সাহিত্য ধারায় ছিল সুস্পষ্ট পার্থক্য। অন্যান্যগণ সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেছেন, মনে হয় ভীরু পদক্ষেপে, মনের দুর্বলতা সহকারে। বাংলা সাহিত্যকে হিন্দুর, সংস্কৃত-তনয়া মনে করে গা বাঁচিয়ে যেন তাতে ছোঁয়া না লাগে মুসলমানের আরবী-উর্দু-ফার্সীর শব্দাবলীর, এমনকি উপমায়, অলংকারে ও রচনানীতিতে মুসলমানী নিদর্শন-আলামতকে সতর্কতার সাথে বাঁচিয়ে চলেছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নজরুলের হঠাৎ আবির্ভাব যেমন সৃষ্টি করলো বিস্ময়, তেমনি সূচনা করলো এক বৈপ্লবিক যুগের। যে মুসলমানের বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে বোধনকৃত

www.pathagar.com

করে বেদ-পুরাণ ও হিন্দু-জাতিত্বমুখী করা হয়েছিল, নজরুল তার গতিমুখ ফিরিয়ে করলেন মুসলমানের কেবলামুখী। মানুষের তাজা খুনে লালে-লাল করা যুদ্ধের ময়দানে তিনি প্রবেশ করেছিলেন যেমন বীরবিক্রমে, তেমনি যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসে তীব্র গতিতে ও বীরবিক্রমে প্রবেশ করলেন সাহিত্যের ময়দানে। তাঁর মনে কোন দিন স্থান পায়নি দ্বিধাসংকোচ, ভীরুতা ও কাপুরুষতা। তাই তিনি তাঁর বিজয় নিশান উড়াতে পেরেছিলেন সাহিত্যের ময়দানে। তিনি তৎকালীন মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের দ্বিধাসংকোচ ঘুচিয়ে দিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলমানসুলভ আযাদী এনে দিয়েছিলেন। তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে আরবী-ফার্সীর ঝংকার পুনরায় শুনা যেতে থাকে। তাঁর আরবী ফার্সী শব্দাবলীর ব্যবহার পদ্ধতি এত সুনিপুন, সুশৃংখল ও প্রাণবন্ত যে, ভাষা পেয়েছে তার স্বচ্ছন্দ গতি, ছন্দ হয়েছে সাবলীল এবং সুরের ঝংকার হয়েছে সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী। তিনি আধুনিক বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দ আমদানী করে ভাষাকে শুধু সৌন্দর্যমণ্ডিতই করেননি, বাংলা ভাষায় মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলা ভাষায় মুসলিম সাহিত্যসেবীদের জন্যে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে দেন তিনি। কবি নজরুল ছিলেন কাব্য সাহিত্য জগতের এক অতি বিস্ময়। তাঁর এ প্রতিভা ছিল একান্ত খোদাপ্রদত্ত। তাঁর আবির্ভাব হয় ধূমকেতুর মতো এমন এক সময়ে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে তাঁর সম্মানজনক আসন করে নিয়েছেন। বিপ্লবী কবি নজরুল-প্রতিভার স্বীকৃতি তাঁকে দিতে হয়েছে এ আশিষের ভাষায়—

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধার বাঁধ অগ্নি-সেতু
দুর্দিনের ঐ দুর্গ শিরে-
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোকনা লেখা
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

নজরুলের কাব্য প্রতিভা যেমন তাঁকে সুউচ্চ আসনে সমাসীন করেছে সাহিত্য জগতের, তেমনি তাঁর বিপ্লবী কবিতা সুপ্ত মুসলিম মানসকে করেছে জাগ্রত, তাদের নতুন চলার পথে দিয়েছে অদম্য প্রেরণা ও প্রাণশক্তি। এতোদিন মুসলমানরা যে সাহিত্যক্ষেত্রে ছিল অপাংক্তেয় তাদের সে গ্লানি গেল কেটে। তাদের জড়তা গেল ভেঙে। জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো নতুন উৎসাহ উদ্যমে। নজরুল সুপ্ত মুসলিমকে এই বলে ডাক দিলেন—

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীন ইসলামী লাল মশাল,
ওরে বেখবর তুইও ওঠ জেগে, তুইও তোর প্রাণপ্রদীপ জ্বাল।....

তাঁর এ আহ্বান ব্যর্থ যায়নি। শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মুসলমানের নতুন কাফেলা শুরু করলো যাত্রা অবিরাম গতিতে।

www.pathagar.com

ভাষা সংস্কৃতি জাতীয়তা

শাহেদ আলী

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ১৯২৫, মাহমুদপুর, সিলেট। শিক্ষা ঃ এম. এ (বাংলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পেশা ঃ অধ্যাপনা, সম্পাদনা। বর্তমানে অবসর।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গল্প ঃ জিবরাইলের ডানা (১৯৫২), একই সমতলে (১৯৬৩)। নতুন জমিন্দার, অমর কাহিনী, সোনারখনি, অতীত রাতের কাহিনী, শাহেদ আলীর শ্রেষ্ঠ গল্প প্রভৃতি। প্রবন্ধ ঃ বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান (১৯৬৫), একমাত্র পথ, তরুণ মুসলিমের ভূমিকা, সাম্রাজ্যবাদ ও রাশিয়া, জীবন হইতে জীবনান্তর, তওহীদ। অনুবাদ ঃ মক্কার পথ। পুরস্কার ঃ ছোটগল্পে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৬৪, ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার, নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদক, 'তমঘা'-এ-ইমতিয়াজ, ভাষা আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি ও কর্মী হিসেবে ভাষা আন্দোলন পদক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পুরস্কার, একুশে পদক প্রভৃতি পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হয়েছেন।

লেখা-পরিচিতি ঃ 'ঐতিহ্য' ভাষা আন্দোলন সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৯৫; জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।

মানুষ আর অপরাপর জীবের মধ্যে মৌলিক তফাতটি কি, আলোচনা করতে গিয়ে কোনো এক পাশ্চাত্য লেখক মন্তব্য করেছেন, মানুষের জবান বা ভাষাই হচ্ছে সেই একক বৈশিষ্ট্য। মানুষ হরদম যে-সব শব্দ ব্যবহার করছে সেগুলো কেবল বস্তু বা জীবের নাম নয়—তার বিশ্বাস-প্রত্যয়-উপলব্ধি-অনুভূতি এবং আশা-আকাংখারও প্রতীক। অর্থাৎ মানুষ যেমন বস্তু বা প্রাণীর একেকটি নাম দিয়েছে, তেমনি তার অন্তর্লোককে প্রকাশের জন্যও শব্দ এবং প্রতীক উদ্ভাবন করেছে। আর এভাবে, এক মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের ভাব এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য নির্মাণ করেছে সেতু। প্রাণী এবং বস্তুর নামকরণে দেশ এবং পরিবেশের প্রভাব মুখ্য, কিন্তু মানুষ তার অন্তর্লোকের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য যেসব ধ্বনি শব্দ ও বাকভঙ্গির আশ্রয় নেয়, সেগুলোর উপর অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করে তার বিশ্বাস ও প্রত্যয়, তার জীবন-দৃষ্টি, তার গূঢ় অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধ। অর্থাৎ মানুষ যখন নিজেকে ভাষায় প্রকাশ করে তখন সে কেবল জীব-জন্তু, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত নিয়ে গড়া তার পরিবেশেরই পরিচয় দেয় না, সে তার অন্তর্লোককেও ব্যক্ত করার চেষ্টা করে। তাতে ক'রে তার বিশ্বাস ও জীবনবোধের রঙ লেগে তার প্রকাশভঙ্গি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

অন্যকথায় মানুষের ভাষা দিয়ে মানুষকে চেনা যায়, তার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয় (ব্যক্তি এবং জাতি উভয় পর্যায়ে)। মানুষের বিশ্বাস, তার অন্তর্গূঢ় অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধ দ্বারা তার আবেগ-অনুভূতি অনুরঞ্জিত হয়। বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতে তার অন্তর্লোকে যেমন দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, তেমনি তার প্রবল বিশ্বাস এবং মন ও আত্মার প্রচণ্ড অভিজ্ঞতাও সৃষ্টি করে আবেগ-অনুভূতির ঘুর্ণিঝড়। তার এই দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ এই আবেগ-অনুভূতির

www.pathagar.com

ঝড়ে যখন বাঙময় হয়ে উঠে, তখনই তা একটা বিশিষ্ট রূপ লাভ করে, একটি ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর হৃদয়ের মূল সুর; তার অন্তরের রঙ-সুরভি অন্যদের কাছেও তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভাব এবং বস্তু উভয় থেকেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে আদানপ্রদান চলছে হরহামেশা। কোন দেশে যেসব ফলমূল, গাছ-পালা, জীবজন্তু জন্মে, যেসব জিনিস তৈরী হয়, সেগুলোর নাম সেদেশই দিয়ে থাকে; কিন্তু কোনো দেশ যখন অন্য দেশ থেকে বিভিন্ন জিনিস আমদানী করে, তখন সেগুলোর নামও সেগুলোর সঙ্গেই আসে। মানুষ যেমন বস্তুটিকে গ্রহণ করে, তেমনি তার নামটিও গ্রহণ করে। মনোজগতে ও ভাবলোকে এ গ্রহণ ও স্বীকৃতি নদীপ্রবাহের মতোই অবাধ এবং নিরবচ্ছিন্ন। কারণ ওখানে কোন দেয়াল বা প্রাচীর নেই। ভাবের বিবরণ আকাশের হাওয়ার মতোই অবারিত ও উদ্দাম। মানুষের খালিস ফিতরাত, তার শুদ্ধ প্রকৃতি সত্যকে গ্রহণ করার জন্য নিয়তই উন্মুখ। সে তার সকল দরজা-জানালা এ জন্য উন্মুক্ত রাখে। এভাবে সত্যকে গ্রহণ করার পর একটি ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর অন্তর্লোক রূপান্তরিত হয়—রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে নতুনের আবির্ভাবের মতোই। বস্তুর নামের মতোই সে তার বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের প্রকাশক ধ্বনি বা শব্দসমষ্টি গ্রহণ করে—তার আঞ্চলিক ভাষায় সেই সব ধ্বনি বা শব্দকে সেগুলির বিশেষার্থক ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতসহ আত্মস্থ করার প্রয়াসে তার ভাষাদেহকে নতুন রূপ দেয়, নতুন রঙ মাখায়।

আমাদের ভাষার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। এদেশে যাদের প্রথম বসতি ছিল, তারা মূক কিংবা বোবা ছিল না, তাদেরও নিজস্ব ভাষা ছিল, সেই ভাষার কাঠামোর মধ্যেই কখনো সংস্কৃত, কখনো পালি-প্রাকৃত শব্দভাণ্ডার নিজেই ঠাঁই করে নিয়েছে, ইসলামের সংস্পর্শে আসার পর অজস্র আরবী-ফার্সী, উর্দু-তুর্কী শব্দ এবং নতুন নতুন প্রকাশভঙ্গি এই ভাষার অবয়বে মিশে গিয়ে একে দিয়েছে এক নতুন রূপ, নতুন বৈশিষ্ট্য, যা এই নবজাত জনগোষ্ঠীর বিশিষ্ট মন-মানস ও জীবনের অনিবার্য অভিব্যক্তি। কখনো কোনকালেই সাধারণ মানুষের ভাষা ছিল না সংস্কৃত। এ ছিল একটি অতিশয় কৃত্রিম ভাষা, আর্য ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের উচ্চকোটির শাসকবর্গ ও পুরুত শ্রেণীর যাগযজ্ঞে শাসনকার্যে ব্যবহৃত ভাষা। স্বভাবত এর পরিমণ্ডল ছিল একান্তই সীমিত। তবু ক্ষমতা যেহেতু উচ্চকোটির এই মুষ্টিমেয় লোকের হাতেই ছিল কেন্দ্রীভূত, তাই তাদের দলিলপত্র, ফরমান, শিলালিপি ও তাম্রলিপিগুলি সংস্কৃতেই লিখিত হয়েছে এবং তাদের দরবারে আশ্রিত পণ্ডিতেরা সংস্কৃতেই লিখেছেন তাদের গ্রন্থাদি, তাদের কাব্য, নাটক। প্রাকৃতজনের এ ভাষা বোঝার শিখার ছিল না, তারা তখনো নিজেদের ভাষায় কাজ-কর্ম চালাত, ভাবের আদান-প্রদান করতো। সে ভাষাই ছিল প্রথমে পালি ভাষা ও পরে প্রাকৃত ভাষা। এ দু'ভাষাই ছিল তখন সাধারণ মানুষের ভাষা, তাদের মুখের ভাষার কাছাকাছি ভাষা। আরও পরে বৌদ্ধ আমলে নির্মিত হয় এক নূতন ভাষা। ফলে বাংলা ভাষার আদি নমুনা সৃষ্টি হয়। এ ভাষা হচ্ছে বৌদ্ধ গান ও দোহার ভাষা। এ গান ও দোহার গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে তখনকার সাধারণ মানুষেরই জবানীতে, তাদের জীবন থেকে আহরিত শব্দ-উপমা অলংকার ও প্রতীকের

www.pathagar.com

সাহায্যে। বৌদ্ধ প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বর্ণাশ্রম ও শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নিপীড়িত ও অবহেলিত জন মানুষের মধ্যে এক সুদূরপ্রসারী বিপ্লব এনে দেয়। এর ফলে যে সংস্কৃতি বিকশিত হলো তা ছিল জনগণের সংস্কৃতি, ব্যাপক অর্থে তখনকার দিনে বাঙ্গালীদের সংস্কৃতি। আর্য বা ব্রাহ্মণদের সংস্কৃতি ছিল বহিরাগত সংস্কৃতি, কেবল এদেশের আদি জনগোষ্ঠীর উপরই নয়, গোটা আর্যাবর্তের উপরই একদিন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই কৃত্রিম সংস্কৃত ভাষা। কিন্তু এ প্রবল চাপের মুখেও, ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমের বহির্ভূত বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের ভাষায় প্রকাশ করেছে নিজেদের, তার কিছুটা প্রমাণ মিলে নিম্ন, কোটির নিগৃহীত মানুষগুলির মুখের ভাষায়। বৌদ্ধ আমলে প্রাকৃতজন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে! তাদের মন-মানস বিশ্বাস, প্রত্যয় ও জীবনবৃত্তির প্রকাশ মাধ্যম হয়ে ওঠে তাদের নিজেদের ভাষা। প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম, জবরদস্তিমূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়া কোন ভাষাই কখনো কোন জনগোষ্ঠী সানন্দে গ্রহণ করে না। পরাজিত হলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধতা থেকেই যায়

আবার ব্রাহ্মণ্য পুনর্জাগরণের পর এদেশ থেকে বৌদ্ধদের নির্মূল করার জন্য পরিচালিত হয় এক সর্বাত্মক অভিযান। এদেশে বৌদ্ধরা ধ্বংস হয়ে যায়, অনেকে ঝাড়ে-জংগলে পালায় জান নিয়ে। অনেকে তাদের পুথি-পুস্তক বগলদাবা করে নেপাল হয়ে তিব্বতের দিকে পাড়ি জমায়। যারা পালাতে পারলো না, তারা শূদ্র বা অচ্ছ্যুত হয়ে টিকে রইলো ব্রাহ্মণ্য গণ্ডির বাইরে। ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়গুলো এই চাপিয়ে দেওয়া বিধানের কাছে নতী স্বীকার করে বর্ণাশ্রমের-কাঠামোর মধ্যে হীনতর অস্তিত্ব বজায় রাখলো।

এই যখন অবস্থা—জন্মগত শ্রেণীবৈষম্য, ধর্ম নির্দেশিত বর্ণাশ্রম, মানুষে মানুষে বর্ণে-বর্ণে অলংঘনীয় ভেদ, নারী যখন কেবল 'রমণী' আর 'কামিনী', মন্দিরে সেবাদাসী যখন বারাঙ্গনা মাত্র, যেখানে সূদ আর মদে সমাজ হাবুডুবু খায়, মানুষ ইট-পাথরের মূর্তি বানিয়ে তাকেই দেবতা জ্ঞানে পূজা করে, যেখানে অব্রাহ্মণ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে কিংবা সংস্কৃত থেকে কোন ধর্মগ্রন্থ বাংলায় তরজমা করলে তার জন্য রৌরব নামক নরক নির্ধারিত, যেখানে বিপত্নীক পুরুষ অগণিত বিয়ে করতে পারলেও বাল্য-বিধবাকে সহমরণে যেতে হয় বা আমৃত্যু বৈধব্যবরণ করতে হয়—এই অবস্থায় এ দেশের মানুষের দেহ-মন-আত্মা যখন মুক্তির অন্বেষায় ব্যাকুল এবং অস্থির, ঠিক তখনি এ-দেশের মুক্তিপাগল মানুষের পরিচয় ঘটলো ইসলামের সংগে। তার তৌহিদ, মানুষে মানুষে সাম্য, সামাজিক সুবিচার, ধর্ম কর্মে সকলের সমঅধিকার, নারীর মর্যাদা ও উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি, পৌরহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত, এ দেশের নিপীড়িত নিগৃহীত মানুষের চিন্তা-ভাবনা বিশ্বাসে ঘটালো এক ইনকিলাব। সুফী-দরবেশদের জীবনের সারল্য, আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস ও নির্ভরতা, সৃষ্টির প্রতি মমতা ও ভালোবাসা, নির্ভয় নিরহংকার নিরভিমান আচরণ, কেবল বঞ্চিত ও উৎপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের জীবনেই বিপ্লব আনলো না, উচ্চকোটির লোকদের মধ্যে যে সব মানুষ অগণিত দেব-দেবী এমনকি জীব-জন্তু, ইট-পাথরের অসার অর্থহীন পূজা, কুসংস্কার, ভোগ-লালসা, কামাচার এবং মানুষে

www.pathagar.com

মানুষে বৈষম্যের মধ্যে জীবনের মানে খুঁজে পাচ্ছিল না সেই সকল সত্যার্থীর সামনেও উদঘাটিত হলো এক আলোয় উদ্ভাসিত পথ— মুক্তির জানালা। যুগপৎ এ বিপ্লব ঘটলো অন্তরে ও বাইরে, চিন্তা-ভাবনার জগতে এবং সমাজজীবনে। এই নূতন জীবনাদর্শের মৌল সত্য ও নীতিমালার রয়েছে নিজস্ব শব্দভাণ্ডার, উপমা, অলংকার ও প্রতীক। এই দর্শনকে হৃদয়ে বরণ করে নেওয়ার সংগে সংগে এই সব শব্দ উপমা অলংকার ও প্রতীকও হয়ে উঠলো তার একান্ত নিজস্ব সম্পদ। কোথাও আদি অবিকৃতরূপে কোথাও বা রূপান্তরিত হয়ে এগুলো মিশে গেল এখানকার ভাষায়। তেমনি এ বিশ্বাস ও জীবনবোধ যে সভ্যতার জন্ম দিয়েছে, সেই সভ্যতার বাহকদের সংগে সংগে তাও এল এ দেশে। তারা সংগে করে যে সব বস্তুসম্ভার নিয়ে এল, সে সবের নাম এবং সংজ্ঞাও এল এ দেশে এবং এখানকার ভাষায় অঙ্গীভূত হয়ে এ ভাষাকে দিল যেমন একটি নূতন রূপ, নূতন পরিচয়, তেমনি এ সব দ্রব্যের ব্যবহার, স্থাপত্য ও শিল্পকলা সমাজের বহিরঙ্গকে করলো রূপান্তরিত, এবং নূতন সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটলো।

এক নূতন বিপ্লবী জীবনাদর্শ গ্রহণ এবং এ জীবনাদর্শের মশালবাহীরূপে বাইরে থেকে যারা এলেন এদেশকে স্বদেশ মেনে নিয়ে, এখানে তাদের বসতি স্থাপন এবং তাদের রক্তের সাথে স্থানীয় অধিবাসীদের রক্তের মিশ্রণ ধীরে ধীরে জন্ম দিল এক নূতন জাতিসত্তার। এদেশে নিসর্গ ও আবহাওয়ার প্রভাবে এ অতিথি মানবগোষ্ঠীও হলো কিছুটা রূপান্তরিত। স্বাভাবিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি এক নূতন শংকর জাতির বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি হয়ে পড়লো। এভাবে প্রায় সাতশ' বছর ধরে উপমহাদেশের এ পূর্বাঞ্চলে এক নূতন জাতিসত্তার বিকাশ ঘটে।—যাদের ভাষা বাংলা, যারা ইসলাম-বহির্ভুত আর সকলের থেকে ধর্মে-কর্মে, শিল্পে-সাহিত্যে, নির্মাণে-স্থাপত্যে, খাদ্যে-পানীয়ে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। ক্রমে এই জাতিসত্তার নিজস্ব আইডেন্টিটি বা পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। এই পরিচয় বা আইডেন্টিটির মধ্যে স্ফূর্তি ঘটলো তার প্রাণের।

বাংলা ভাষা আরও বহু মানুষের ভাষা-কিন্তু মুসলিম জনগোষ্ঠী যে ভাষা গড়ে তুললো, অর্থাৎ ইসলাম অবলম্বন করে যে ভাষা বিকশিত হলো, তাতে ইসলামের বিশ্বাস, জীবনদৃষ্টি, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য-প্রকাশক শব্দ-মালা এ ভাষার একটা বিশিষ্ট ভূষণ হয়ে উঠলো। তৈরী হলো অনেক নূতন নূতন বাকরীতি। এই ভাষায় বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দেয় এক সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য, এবং তার সংস্কৃতিকে দেয় এক উজ্জ্বল দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য। তার আল্লাহ-রসূল, হায়াত মউত, হাশর নসর, কোরআন-কিতাব, দোয়া-দরূদ, নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত, তসবিহ-তাহলিল, কলেমা-কালাম, তার আকীকা-খতনা, তার নিকাহ্ শাদী, এজিন-কাবিন, দেন-মোহর, মিরাস-ফরায়েজ, দাফন-কাফন, কবর-মাযার, সালাম-তসলিম, অযু-গোসল, বেহেস্ত-দোযখ, হুর-গেলমান, মসজিদ-মাদ্রাসা, ওস্তাদ-শাগরিদ, আযান-তকবীর, রুকু-সিজদা, পর্দা-পুশিদা ইত্যাদি আরও অসংখ্য শব্দ তার সাংস্কৃতিক স্বীকয়তাকে, তার জৈবনিক নিজস্বতাকে দিয়েছে একটা বিশেষ মহিমা ও বিশিষ্ট রূপ। এসব ও এ জাতীয় আরও হাজারো শব্দ যে আবহ, যে ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য এদেশী মানুষের মনে ও কল্পনায়

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে, তার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি প্রগাঢ়-বিশ্বাস, একটি প্রবল জীবনবোধ ও প্রবহমান ঐতিহ্যচেতনা।

এই জীবনবোধ ও ঐতিহ্যচেতনার অভিব্যক্তি যে কেবল অজস্র শব্দ তথা ভাষায় ঘটেছে তা নয়, তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের বহিরাংগের মধ্যেও দেখি তার প্রকাশ—তার স্থাপত্যে, তার গৃহনির্মাণ পরিকল্পনায়, পোশাকে-পরিচ্ছদে, খানা-পিনায়, বিভিন্ন উৎসবে, গৃহস্থালী আসবাবপত্রে, একপংক্তিতে বিশাল মেহমানী বা ভোজ উৎসবে, অভিবাদন বিনিময়ে, বিচার ও আইনব্যবস্থায়, উত্তরাধিকার আইনে, সন্তান-সন্ততির নামকরণে, চলনে-বলনে আসনে-শয়নে।

এ সবের সামগ্রিক অভিব্যক্তিই তার সংস্কতি। এ সংস্কৃতি তাকে দেয় একটা আইডেন্টিটি, যার দ্বারা ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর একটা স্বকীয় রূপ ও পরিচয় হয় পরিস্ফুট। ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর মৌল বিশ্বাস এবং জীবন ও বিশ্বদৃষ্টির সঙ্গে এই সংস্কৃতির যোগ অবিচ্ছেদ্য। এ তার মৌল সত্তারই রঙ, রূপ, সুর ও সুরভি। এই পরিচয় বা স্বরূপকে তার মূল সত্তা থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন করা যায় না। —যেমন ফুলের রঙ আর খুশবুকে ফুল থেকে আলাদা করলে ফুলের অস্তিত্ব থাকে না। প্রকৃতিপক্ষে, তার সংস্কৃতি তার স্বকীয় অস্তিত্বেরই ঘোষণা। এবং তাই, তার জীবনের মতোই তার সংস্কৃতিও তার অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। স্বতন্ত্র প্রতিটি ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর সৃষ্টির সার্থকতাই নির্ভর করে তার এই আইডেন্টিটি ও পরিচয়ের উপর অর্থাৎ তার সংস্কৃতি তথা তার তাহযিব ও তমদ্দুনের উপর। এই জীবন ও বিশ্বদৃষ্টিতে লালিত ব্যক্তিরা মিলিত হয়েই গড়ে তোলে জনগোষ্ঠী এবং গূঢ়তর অর্থে জাতিসত্তা। মেলবন্ধন বাইরে থেকে আরো পিত হলে তা টেকে না; তখন ঐক্য ও সংহতি শক্তি না হয়ে পীড়ন ও ভার হয়ে দাঁড়ায়। সত্যিকার ঐক্য ও সংহতির উৎস কেবল রক্ত কিংবা ভাষা নয়, বিশ্বাস ও জীবনবোধ ও বিশ্ব-দৃষ্টির অভিন্নতায়। এভাবে বিশ্বাসের নিউক্লিয়াস মানব-জীবনে যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায় মানুষ তাকে তার প্রাণের চাইতেও বড় মনে করে, তাকে নিয়েই তার যত গর্ব ও গৌরববোধ। তার হেফাজতের জন্যই দরকার হয় তার রাজনৈতিক স্বাধীনতার, তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার।

আমাদের এই স্বরূপ ও আইডেন্টিটি একান্তই সদর্থক, ইতিবাচক। একটি বাস্তবতা, এর মধ্যে কারো প্রতি বিদ্বেষ বা বৈরিতার কোন অবকাশ নেই—অন্যকোন সংস্কৃতির প্রতি অসহিষ্ণুতা নেই—আছে কেবল নিজের বিনম্র অথচ দৃঢ় ঘোষণা : আমি আমার নিজ পরিচয় নিয়েই অন্য সকলের সাথে সকল প্রকার মানবিক সম্পর্ক গড়ে তুলবো—স্বপরিচয় বিসর্জন দিয়ে নয় বা অপরের অনুকরণ ক'রে, আত্মপরিচয়হীন হয়ে নয়। অন্যেরাও আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে পূর্বাহ্নেই জানতে পারবে কার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে যাচ্ছে। এই পরিচয়ই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করে—স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নিয়েই দু'টি ভিন্ন সাংস্কৃতিকগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠী লেনদেন ও বিনিময়ের স্বাভাবিক মানবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

www.pathagar.com

এই সংস্কৃতির গর্ব ও গৌরব, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা একটা জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বকে মর্যাদামণ্ডিত করে বিশ্বের বহু জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে তার জীবনকে একটা মহৎ তাৎপর্য দান করে। এ কারণে সে তার সংস্কৃতির বিকাশ, সম্প্রসারণ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতি প্রতিমুহূর্তে তৎপর থাকে, সংগ্রাম ও জেহাদ করে। এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে আসলে সে নিজেকেই বাঁচাতে চায়—আর এজন্যই স্বাধীনতা তার কাছে এত মূল্যবান। এজন্যই সে তার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে, দরকার হলে প্রাণ দেয়। আমাদের অস্তিত্ব—যার অভিব্যক্তি হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি ও জীবনাচরণ, তার বিনষ্টির আশংকা থেকেই (দৃষ্টান্ত-স্পেনে মুসলমানদের বিলুপ্তি, ভারতে বৌদ্ধদের) আমরা আমাদের নিজস্ব আবাসভূমির জন্য একটা সংগ্রাম করেছিলাম। পরে পাকিস্তানেও যখন অর্থনৈতিক বৈষম্য ও প্রশাসনিক অবহেলার সংগে ভাষাগত প্রশ্নটি, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে, মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য ও সংহতির প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াল, তখন আমরা বাধ্য হয়ে আবার বাংলাদেশী হিসাবে আমাদের সার্বভৌমত্ব কায়েম করলাম—একটা রক্তাক্ত সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। আমরা আমাদের নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি হেফাজতের জন্য তৈরী করলাম একটি নতুন দেশ, নতুন রাষ্ট্র—এই বিশ্বাস ও আশায় যে, এই নতুন রাষ্ট্রে আমরা আমাদের বিশ্বাস ও বিশ্বদৃষ্টির আলোকে আমাদের ভাগ্যকে গড়ে তুলতে পারবো—অনায়াসে না হলেও অবাধে তো বটেই। এই স্বাধীনতার জন্যই তো প্রয়োজন স্বদেশ ও স্বরাষ্ট্র। আমাদের মৌল অস্তিত্ব—যার উৎস হলো বিশ্বাস আর অভিব্যক্তি হলো আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের তাহযিব ও তমদ্দুন—তার লালন ও বিকাশ এবং তার আলোকে আমাদের ভাগ্যকে গড়ে তোলার অধিকার ও ক্ষমতাই আমাদের সার্বভৌমত্ব। যার এই বিশ্বাসের নিউক্লিয়াস নেই, তার নিজস্ব কোন ভিত্তি নেই, তার কোন নিজস্ব চেহারা এবং স্বকীয়তা নেই। সে পানির মতই, যখন যে পাত্রে রাখা হয় তারই রঙ ধারণ করে; তার কাছে স্বাধীনতা আর দাসত্ব একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

তমদ্দুন ও তাহযিব, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রবহমানতা একটা জাতিসত্তাকে ক্রমবিকাশের স্রোতোধারায় ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যায়— তার লক্ষ্য ও মনযিলকে প্রতিমুহূর্তে তার সামনে সমুদ্রে অন্ধকার রাতে লাইট হাউজের মতো স্থির, উজ্জ্বল রাখে। যে মুহূর্তে এ প্রবহমানতা ছিন্ন হয়ে পড়ে বা বাধা পায়, তখনই সেই জনগোষ্ঠী ছিন্নপাল কাণ্ডারীহীন কিশতির মতো দিকভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এবং পরিণামে সে তার আপন মনযিল আর কখনও খুঁজে পায় না। স্বদেশের কূলে সেই তরী আর কখনও ভিড়ে না— ধ্বংসই হয়ে উঠে তার জন্য অনিবার্য।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমান

ডক্টর আসকার ইবনে শাইখ

লেখক -পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ১৯২৫, মাইজহাটি গ্রাম, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। শিক্ষা ঃ এম. এস. সি. (সংখ্যা বিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পি এইচ ডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পেশা ঃ অধ্যাপনা। সংখ্যাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে অবসর।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নাটক ঃ বিরোধ (১৯৪৯), পদক্ষেপ (১৯৫০), বিদ্রোহীপদ্মা (১৯৫১), দুরন্ত ঢেউ (১৯৫১), প্রতীক্ষা (১৯৫৮), অনুবর্তন (১৯৫৯), অগ্নিগিরি (১৯৫৯), বিল বাওয়ারের ঢেউ (১৯৬১), এপার ওপার (১৯৬১), রক্তপথ (১৯৬৩), অনেক তারার হাতছানি (১৯৬৫), প্রচ্ছদপট (১৯৬৭), তীতুমীর, লালন ফকির (১৯৬৯)। শিশুসাহিত্য ঃ দানব মাছের আজব কথা (১৯৬১)। অনুবাদ ঃ অমর শিল্পী দ্য-ভিঞ্চি (১৯৬৩), কাজের দিনের ভোরে (১৯৬৫), মার্কিন পুঁজিবাদ (১৯৬৬), যন্ত্রণা চাপ। পুরস্কার ঃ নাটকে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৬০।

লেখা-পরিচিতি ঃ লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসংগে' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

১৭৫৭ সালে পলাশী বিপর্যয়ের পর থেকে প্রকৃত প্রস্তাবে সুবে বাংলা চলে গেল ইংরেজ অধিকারে। আরম্ভ হল মীরজাফরী নবাবীর আড়ালে সমগ্র বাঙালী জাতির, বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানের ভাগ্য বিপর্যয়; এবং ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় সুবে বাংলার স্বাধীনতার শেষ আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল গিরিয়া–উধুয়ানালা–বকসারে নবাব মীর কাশিমের উপর্যুপরি পরাজয়ে। ১৭৬৫ সালে দিল্লীর 'বাদশাহ" শাহ্ আলমের ফরমান বলে ইংরেজ কোম্পানী পেল সুবে বাংলার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা। ১৭৫৭ সালে পাওয়া দেশ রক্ষার ক্ষমতার সঙ্গে দেওয়ানী ক্ষমতার সমন্বয়ে এ দেশে ইংরেজ আধিপত্য হল নিরংকুশ। পুরোপুরিভাবে আরম্ভ হল কোম্পানী শাসন এবং শাসনের নামে শোষণ ও উৎপীড়ন। কোম্পানী সমর্থক লর্ড মেকলেও লর্ড ক্লাইভের উপর রচিত প্রবন্ধমালার ৬৩ পৃষ্ঠায় বলেন, "ইহা সত্য যে, বাংলার মানুষ শোষণ ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে অভ্যস্ত, কিন্তু এই প্রকারের শোষণ ও উৎপীড়ন তাহারাও কোন দিন দেখে নাই।"

১৭৭০ সালে, বাংলা ১১৭৬ সনে, বাংলায় এল এক মহামন্বন্তর, 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। ১৭৭২ সালে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে লিখিত পত্রে এ দেশের তদানীন্তন গভর্ণর–জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস নির্লজ্জভাবে উল্লেখ করেন, "..... মন্বন্তরে বাংলার সমগ্র জনসংখ্যার এক–তৃতীয়াংশের মৃত্যু এবং তাহার পরিণামে চাষের চরম অবনতি সত্ত্বেও ১৭৭১ সালের নীট রাজস্ব আদায় এমনকি ১৭৬৮ সালের রাজস্ব অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে। যে কোন লোকের পক্ষে ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে, এইরূপ একটা ভয়ংকর বিপর্যয়ের মধ্যে রাজস্ব অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হইবার কারণ এই যে, সকল শক্তি দিয়া রাজস্ব আদায় করা হইয়াছে।" কোম্পানী শোষণ–উৎপীড়নের এই-ই ছিল স্বরূপ। কার্ল মার্কস বলেছিলেন, "বিজিত ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করবে ইংরেজঃ একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক, অর্থাৎ একটি পুরনো

www.pathagar.com

সমাজের ধ্বংস এবং অন্যটি বিজিত দেশে পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা। সুবে বাংলা বিজয়ের পর ইংরেজ কোম্পানী এ দেশে তা-ই করেছিল। 'প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ' গ্রন্থে কার্ল মার্কস আরও বলেছিলেন, "কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছা সহকারে ও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে যারা সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন......।" (পৃঃ ৩৪) এই নতুন শ্রেণীটিই ইংরেজ পক্ষীয় এ দেশের প্রথম দালাল শ্রেণী। এদের সাহায্যেই ইংরেজ কোম্পানী এ দেশের পুরনো সমাজকে ধ্বংস করে দিয়ে পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থের উপযোগী বৈষয়িক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই বৈষয়িক ভিত্তির আওতাভুক্ত ছিল সমাজ–সংসার, ধন–দৌলত শিক্ষা–সাহিত্য সবকিছু।

১৭৭২ থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত কোম্পানী কর্তৃপক্ষ বাংলার শাসনে নানা পরিবর্তন আনতে থাকে। এ সময়ের গোড়ার দিকে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হয় কলকাতায়, 'নবাব' হন বৃত্তিভোগী; ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত হয় জমিদারীর 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। এই বন্দোবস্তের ফলে বাংলার মুসলমানগণ সর্বনাশের সম্মুখীন হল। ১৮৩৬ সালে অফিস–আদালত থেকে ফরাসী ভাষার ব্যবহার উঠে গেল; ফলে, বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের কিছুটা সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার শেষ সম্বলও নিঃশেষ হয়ে গেল। তার প্রায় ৪০ বছর আগে থেকেই দেশে ইংরেজী শিক্ষা চালু করার চেষ্টা চলতে থাকে। চার্লস গ্রান্ট ছিলেন তার প্রথম উদ্যোক্তা। এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয় ইংরেজ মিশনারীদের কার্যক্রম। ১৭৯৩ সালে উইলিয়াম কেরী কলকাতায় এসে শ্রীরামপুরের ইংরেজ মিশনে যোগ দেন। তার প্রচেষ্টায় সেখানে স্থাপিত হয় ইংরেজী স্কুল, আর বাইবেলের বাংলা গদ্য অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তারপর ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহন রায়ও ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হয়ে ওঠেন। ১৮০১ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয় ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ এবং ১৮২৩ সালে গঠিত হয় 'কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন' এবং তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'সংস্কৃত কলেজ'। এভাবে দেশে আরম্ভ হল ইংরেজী শিক্ষার অগ্রযাত্রা। হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন, আর মুসলমানেরা ঘৃণাবশতঃ সে শিক্ষা থেকে সরে থাকেন অনেক দূরে।

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এই এক শ' বছরের কাহিনী বাংলার মুসলমানদের জন্য লাঞ্ছনা ও বঞ্চনাভরা এক সুদীর্ঘ তমসাকালের রক্তঝরা কাহিনী। তারই সঙ্গে সে কাহিনী যুগপৎ এক দৃঢ়সংকল্প মরণপণ সংগ্রামেরও কাহিনী; সে কাহিনী অপূর্ব ত্যাগ ও অবর্ণনীয় দুঃখ–কষ্টের মোকাবিলায় বীরত্বভরা কাহিনী। সে কাহিনী রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য, দারিদ্র আর লাঞ্ছনার নাগপাশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পুনরুজ্জীবনের জন্য, নিজেদের সভ্যতা ও কৃষ্টিকে ধারণ করে বেঁচে থাকার উপযোগী এক জীবন রচনার জন্য বেদনা ও প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষরে উজ্জ্বল এক কাহিনী। সে কাহিনীতে আছে মজনুশাহ্–তিতুমীর–শরীয়তুল্লাহ–দুদুমিয়াদের সংগ্রামের কথা, আছে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ প্রবর্তিত পুনর্জাগরণ আন্দোলনের 'বালাকোট'–মুখী সংগ্রামের কথা, আছে

www.pathagar.com

শহীদী খুনে ভাসমান অসংখ্য রক্তপদ্মের কথা। শত বছরের সেসব সংগ্রাম-কথা বুকে নিয়ে বিক্ষুব্ধ অগ্নিগিরি ১৮৫৭'র বিস্ফোরণে নিঃশেষিত হয়ে গেল; মুক্তি তখনও বহুদূরে!

'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেনঃ "বাংলার মুসলমানের এই কাহিনী অত্যন্ত করুণ ও অতিশয় মর্মবিদারী। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে হান্টার সাহেব তাঁহার 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্' নামক গ্রন্থে বাংলার মুসলমানদের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, নিম্নে আমি তাহারই সংক্ষিপ্তসার সংকলন করিয়া দিতেছিঃ 'পলাশী যুদ্ধের সময় হইতে সিপাহী বিদ্রোহের বহুদিন পর পর্যন্ত প্রায় ১২৫ বৎসর যাবৎ বাংলার মুসলমানদের প্রতি আমাদের অবিচারের সীমা ছিল না। এই সেদিন পর্যন্ত যাঁহারা দেশের বিজেতা ও শাসক সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁহারা আজ গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেও অসমর্থ। এই সম্প্রদায় আজ সর্বপ্রকারে নিঃস্ব ও ধ্বংসোন্মুখ। ইহার জন্য দায়ী আমাদের কল্পনাবিরহিত শাসন। বাংলার অভিজাত মুসলমান ধ্বংস হইয়াছে। ...... তাঁহাদের আয়ের পথ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বড়-ছোট সমস্ত রাজপদের দরজাও এখন তাঁহাদের জন্য বন্ধ ও হিন্দুর জন্য মুক্ত।' বাংলার মুসলমানদের এই অবস্থার জন্য হান্টার সাহেব একমাত্র তাঁহার স্বজাতিকেই দায়ী করিয়াছেন।" (পৃঃ ২৭১-২৭৩)

এমনি অবস্থায় বাংলার মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের কাব্যচর্চার কথা ভাবাই তো যায় না! তবুও তাঁরা নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিলেন না। এই তমসাকালেও যাঁরা বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করে যাচ্ছিলেন, কাব্য-কৃতিসহ তাঁহাদের একটা তালিকা এখানে তুলে ধরতে চাই। উল্লেখ্য, এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রায় সব তথ্যই ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক রচিত 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' থেকে নেয়া।

তালিকা

কবিদের নাম	তাঁদের জীবন/ রচনা-কাল	বাংলায় কাব্য-কৃতি
মুহম্মদ রেজা	১৬৯১-১৭৬৭	তমীম-গোলাম, মিসরী জামাল
আলী রেজা	১৬৯৫-১৭৮০	সিরাজকুলুব, জ্ঞান-সাগর, আগমন ধ্যানমালা, যোগকলন্দর, ষটচক্রভেদ
মুহম্মদ মকীম	১৭৭৩ সালে জীবিত	গুল-ই বকাওলী, ফায়দুল মুকতাদী
মুহম্মদ আলী	১৭৭৩ সালে জীবিত	হায়রাতুল ফিকাহ, শাহাপরী, মল্লিকজাদা, হাসনা বানু
মুহম্মদ কাসিম	১৭৩০-১৮০০?	হিতোপদেশ, সুলতান জমজমা, সিরাজুল কুলুব
সৈয়দ নূরুদ্দীন	১৭৩০-১৮০০?	দকায়িকুল হকাইক, মুসার সওয়াল, কিয়ামতনামা, হিতোপদেশ।
রহিমুন্নিসা	১৭৬৩-১৮০০ (সম্ভবতঃ)	পদ্মাবতীর অনুলিখনে 'আত্মবিবরণী,' ভ্রাতৃবিলাপ, দোরদানার বিলাপ।
সৈয়দ হামজা	১৭৩৩-১৮০৭ (কাব্য-জীবন)	মধুমালতী, আমীর হামজা, জৈগুনের পুঁথি, হাতিমতাঈ, সোনাভান
কবি চুহর	১৮০৪-১৮৩৫ -এর মধ্য জীবিত	আজর শাহ-সমনরুখ, মনোহর-মধুমালতী, দিলারাম
হামীদুল্লাহ খান	১৮০৮-১৮৭০	রাহ-ই-নাজাত, গুলজার-ই-শাহাদাত

www.pathagar.com

উপরোক্ত তালিকার কাব্য-কৃতি সম্পর্কে কিছু বলার আগে তার পটভূমি কিছুটা তুলে ধরা প্রয়োজন। এই সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য একটা ক্রান্তিলগ্নে উপনীত হয়েছিল। নতুন রাজশক্তির আমলে দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হচ্ছে, মিশনারী ধর্ম প্রচারের সহায়ক হিসাবে গদ্যে বাইবেলাদি গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় গদ্যরীতি প্রচলন শুরু করেছে। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠাকালে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতিকে এদেশে অনুপ্রবেশের সহায়তাকল্পে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপরও রাজানুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে। এমনি অবস্থায় যেহেতু হিন্দুরা ছিলেন পরিবর্তিত রাজশক্তির পক্ষে, সেহেতু হিন্দু কবি-সাহিত্যিকরা পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে এক নতুন দিগন্তপানে তাঁদের দৃষ্টি ফেরালেন। সুলতানী ও মুঘল আমলে মুসলিম কবিরা যেমন জাতীয় ও ভারতীয় উৎস ছাড়াও কাব্য প্রেরণার জন্য আরবী-ফারসী সাহিত্যের সঞ্চয়কে আত্মস্থ করে তার প্রকাশে মনোযোগী ছিলেন, এবার হিন্দু কবি-সাহিত্যিকরা দেশের সীমানাতিক্রান্ত সাহিত্য-উৎস হিসেবে, প্রথমদিকে অন্ততঃ ফর্মের জন্য, ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী হলেন। মুসলিম কবিদের অবস্থা থাকল আগের মতই। গদ্যরীতি গ্রহণ করলেন হিন্দু সাহিত্যিকরা; পদ্যে-গদ্যে পাশ্চাত্যধারায় প্রভাবিত হয়ে এগিয়ে চললেন নব উদ্যমে। আর অসহায় মুসলিম কবিরা বাধ্য হয়ে হাত দিলেন প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এমন রচনায়, অবজ্ঞাভরে যা চিহ্নিত হল 'বটতলার পুঁথি' বলে। প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়লেন মুসলিম কবিরা। তখনই আবার দেশে কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে আরম্ভ হয় প্রচণ্ড প্রতিরোধ সংগ্রাম। কার্যতঃ সে সংগ্রাম ছিল মুসলিম নিয়ন্ত্রিত এবং সে সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন মুসলিম কবিরাও। ইংরেজরা সে সংগ্রামকে 'ওহাবী' আন্দোলন বলে অভিহিত করে তার প্রভাবকে খর্ব করতে চাইলেও তা ছিল মুসলিম নেতৃত্বে পরিচালিত এদেশীয়দের মরণপণ মুক্তিসংগ্রাম। এ মনোভাবের প্রভাবে বিদেশী শাসক প্রভাবিত হিন্দু সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কৃতির প্রতিবাদেই যেন তাঁদের ব্যবহৃত বাংলা ভাষাকে আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দের আধিক্য দিয়ে তাকে মুসলমানী রূপ দিতে চাইলেন। হিন্দু ও মুসলিম কবিরা আগে থেকেই তো দু'টি ভিন্ন খাতে নিজেদের লক্ষ্য অনুযায়ী তাঁদের কাব্য-কৃতিকে এগিয়ে নিচ্ছিলেন, এবার দু'টি খাতের ভিন্নতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। খাত দু'টি এবার সম্প্রদায়গত না থেকে অনেকটাই সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠল।

উপরোক্ত কবিদের কাব্য-কৃতির এই হল পটভূমি। কাব্যগুলোর শ্রেণীবিভাগে দেখা যায়, ধর্মীয় কাব্য এবং কাহিনী কাব্যের সংখ্যা প্রায় সমান। অন্য ধরনের কাব্য-কৃতি এখানে অনুপস্থিত। ডক্টর হকের মতে, এইসব কাব্যে "সাহিত্য আছে, রস আছে, শিল্পও আছে। তবে তাহার বেশীর ভাগই মোগলাই।"

আঠার শ' সাতান্ন-আটান্ন'র মুক্তি-প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেল; মুঘল ঐতিহ্যের পরিমণ্ডলে কাব্যচর্চায় উপরোক্ত মুসলিম কবিদের দিনও গত হয়ে গেল। ইংরেজ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হল ভারতবর্ষে। মুসলিম সাহিত্যসেবীরা দেখতে পেলেন, আলো ঝলমল সেই নিরুদ্বিগ্ন দিনে হিন্দু সাহিত্যসেবীরা তাঁদের পথ পরিক্রমায় বহুদূর এগিয়ে গেছেন। ১৮০০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত,

www.pathagar.com

বিহারীলাল চক্রবর্তী, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকের অক্লান্ত চেষ্টায় আধুনিক বাংলা সাহিত্য হল দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে-সাহিত্য ততদিনে হিন্দু ঐতিহ্যবাহী। মুসলিম সাহিত্যিকরা স্বাভাবিকভাবেই অনুভব করলেন, হিন্দু সাহিত্যিকদের কাছ থেকে মুসলিম ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য সৃষ্টির আশা বাতুলতা মাত্র।

এই অনুভবের প্রেক্ষিতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে মুসলমানদের বিলম্বিত পদক্ষেপ। বাস্তবতার তাগিদে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হওয়া ছাড়া মুসলিম 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণীর আর কোন গত্যন্তর রইল না। ভীরু ও ধীর পদক্ষেপে নবজীবনের পথে এগোলেন তাঁরা। এগোলেন সাহিত্যের পথেও। এঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি মীর মোশাররফ হোসেন, 'সাহিত্য-সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) কনিষ্ঠ সমসাময়িক। ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রত্নাবতী' উপন্যাস। ৪০ বছরেরও বেশী সাহিত্য সাধনাকালে তিনি 'বিষাদ সিন্ধুসহ রচনা করেন প্রায় ৩০টি গ্রন্থ। তাঁরই প্রদর্শিত পথে এগিয়ে আসেন অন্যরাও। নীচে দেয়া হল 'আধুনিক' মুসলিম সাহিত্যিকদের একটি তালিকা। আধুনিক মুসলিম বাংলা সাহিত্যের এঁরা প্রথম দল।

তালিকা

কবি-সাহিত্যিকদের নাম	জীবন/ রচনা-কাল	তাঁদের সাহিত্য-কৃতি
মীর মোশাররফ হোসেন	১৮৪৭-১৯১২	রত্নাবতী, বিষাদ সিন্ধু, মদীনার গৌরব, জমিদার দর্পণ প্রভৃতি উপন্যাস-নাটক-ধর্মীয় রচনা প্রায় ৩০টি গ্রন্থ
কায়কোবাদ	১৮৫৭-১৯৫১	অশ্রুমালা, মহাশ্মশান কাব্যসহ বেশ কটি গ্রন্থ
কবি দাদ আলী	১৮৫২-১৯৩৬	ভাঙ্গাপ্রাণ, শান্তিকুঞ্জ, আশেকে রসূল, অন্তিমে মৃত্যু
শেখ আবদুর রহীম	১৮৫৯-১৯৩১	'সুধাকর' 'মিহির ও সুধাকর' মোসলেম-হিতৈষী' সংবাদ পত্রের সম্পাদনাসহ প্রায় ১১টি গ্রন্থ
মোজাম্মেল হক	১৮৬০-১৯৩৩	কুসুমাঞ্জলী, প্রেমহার, জাতীয় ফোয়ারাসহ ১৫টি গ্রন্থ
মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ	১৮৬১-১৯০৭	মিশনারীদের বক্তব্য বিরোধী এই সুবক্তার বেশ কিছু গ্রন্থ
আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ	১৮৭১-১৯৫৩	দুই হাজারের মত পাণ্ডুলিপির সংগ্রাহক ও প্রাবন্ধিক
মওলানা মুনীরুজ্জামান	১৮৭৫-১৯৫০	খগোল শাস্ত্রে মুসলমান, ভূগোল শাস্ত্রে ইসলামাবাদী মুসলমান, ভারতে মুসলমান সভ্যতা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, সুবক্তা ও সমাজসেবক।

www.pathagar.com

তাছাড়াও ওই সময়ে সাহিত্য চর্চা করেছেন যেসব কবি-সাহিত্যিক, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন মাশহাদী, ডাক্তার আবুল হোসেন, মৌলভী মেয়রাজ উদ্দীন আহমদ, তসলিম উদ্দীন আহমদ, মুনশী মোহাম্মদ জমীরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, মৌলভী আব্বাস আলী, কবি আরজুমন্দ আলী, কবি আবু মা'লি মোহাম্মদ হামিদ আলী, আবদুল হামিদ খান ইউসুফ জায়ী, মওলানা রুহুল আমীন প্রভৃতি।

এঁদের সাহিত্য কৃতি সম্পর্কে 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেনঃ "সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ইহাদের দান সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনকে বাদ দিলে সেই যুগের অন্যান্য হিন্দু সাহিত্যিকদের তুলনায় ইহাদের সাহিত্যিক দান উৎকৃষ্ট বই নিকৃষ্ট নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা বাঙালী হিন্দুর মধ্যে হিন্দু ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবোধ জাগাইয়াছিল। ঠিক তেমনিভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় অল্প হইলেও এই শিক্ষা মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম ঐতিহ্য ও মুসলিম জাতীয়তাবোধ জাগাইয়াছে।.....

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাহা মূলতঃ এক-একবারেই এক; ইহাকে আত্মবিশ্লেষণের প্রতিক্রিয়া নামে অভিহিত করা যায়।

আত্মবিশ্লেষণের ফলেই আমাদের আত্মোপলব্ধি ও আত্মপরিচিতি ঘটে। এইখানে আসিয়াই বাংলার হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন পথ ধরিল তাঁহারা বুঝিলেন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু হিন্দুই এবং মুসলমান মুসলমানই, তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিশিয়া একজাতি হইতে পারে নাই ও পারিবে না। তাঁহারা আরও উপলব্ধি করিলেন, মধ্যযুগের বিশেষ করিয়া পঞ্চাশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ সময়ের হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি-সমন্বয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।" (পৃঃ ৩১৭)।

উপরোক্ত তালিকা কবি-সাহিত্যিকগণ এই বোধ থেকেই প্রাচীন মুসলিম কাহিনী, ইতিহাস থেকে শৌর্য-কথা ও বীরত্ব গাঁথা তুলে ধরে জীবনমৃত মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য তাঁদের সফল হয়েছিল। সাংস্কৃতিক বোধের এই বাস্তবতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, ইংরেজ কর্তৃপক্ষের যুক্তিতে প্রশাসনিক সুব্যবস্থার কারণে, বাংলা বিভক্ত হয়ে গঠিত হয় দু'টি প্রদেশঃ ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশ এবং বিহার-উড়িষ্যার অঞ্চলাদি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ। পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশ গঠন ছিল মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে। কিন্তু হিন্দু স্বার্থে ঘাটতি পড়ায় ধনে-জ্ঞানে উন্নততর বাঙ্গালী হিন্দুরা এ ব্যবস্থার ঘোর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। এর আগে ১৮৮৫ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল; ১৯০৬ সালে গঠিত হল নিখিল ভারত মুসলিম লীগ। প্রচণ্ড আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর রহিত হয়ে গেল প্রদেশ গঠনের এই ব্যবস্থা। কয়েক বছর পর ক্ষুব্ধ মুসলিম মনোভাবকে শান্ত করার লক্ষ্যে ১৯২১ সালে চালু করা হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ওদিকে হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য ভাবদীপ্ত

www.pathagar.com

আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির যে সাধনা আরম্ভ হয়, তা পূর্ণতা লাভ করে বিশ্ববিশ্রুত কবি রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) অবদানে। আর এদিকে স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রেরণায় বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে যে দ্বিতীয় দলটি এগিয়ে এলেন, তার পুরোভাগে ছিলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী। এঁদের সাহিত্য-কৃতি একাধারে বহুমুখী এবং সংখ্যায়ও অনেক। তাই তাঁদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে গ্রন্থাদির নামোল্লেখ না করে শুধুমাত্র নাম আর বন্ধনীর মধ্যে জীবনকাল দিয়েই তা শেষ করছি। তাছাড়া উল্লেখিতদের সাহিত্য-কৃতি সম্পর্কে অনেকেই সুপরিচিত। এই সাহিত্যিকবৃন্দ হচ্ছেনঃ অনল প্রবাহ, রায়নন্দিনী, প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা সৈয়দ ইসমাইল হোসেনে শিরাজী (১৮৮০-১৯৩১); ধর্মীয় গ্রন্থাদির প্রণেতা খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ (১৮৭৮-?); 'আনোয়ারা' ও অন্যান্য উপন্যাস রচয়িতা মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৬০-১৯২৩); রূপজালাল-এর লেখিকা নওয়াব ফয়জুন্নিসা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩); 'অবরোধ বাসিনী', 'মতিচুর' প্রভৃতির লেখিকা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত (১৮৮০-১৯৩২); 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসখ্যাত কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬); ইকরামুদ্দীন (১৮৮২-১৯৩৫);শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬); মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬২); স্বনামখ্যাত সুপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯); মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০); ডাঃ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬); এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১); কবি শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩); শেখ মুহম্মদ ইদ্রিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৫); ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮); কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪); মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪); মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৬৩); কাজী আকরাম হোসেন (১৮৯৬-১৯৬৩); আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮); কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) মাহবুব উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১); আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯); এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। এই উল্লেখ থেকে নিশ্চয়ই কিছু কিছু নাম বাদ পড়েছে, তবে তা স্মরণে না আসার জন্য। তাছাড়া, প্রবন্ধে আমরা বিশ শতকে জন্মগ্রহণকারী কবি-সাহিত্যিকবৃন্দের নামোল্লেখ করেই ইতি টানছি।

'মুসলিম বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেনঃ "অতঃপর বাংলা সাহিত্যে যে মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইল, তিনি বাংলার খ্যাতনামা কবি নজরুল ইসলাম। তাঁহার আবির্ভাবে শুধু মুসলিম সাহিত্যের নহে, সমগ্র বাংলা-সাহিত্যের মোড় ফিরিয়া গেল। তিনি বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্র যুগের অবসান ও নতুন যুগের আগমন বার্তা ঘোষণা করিলেন।" (পৃঃ ৩৩৩)

এই নতুন যুগ নির্যাতিত মানবতার বন্ধন-মুক্তির যুগ; মানুষকে মানুষেরই মর্যাদাদানের, তার অধিকার প্রতিষ্ঠার ও শান্তিময় বিশ্ব রচনার মহান লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামী যুগ। এ যুগের সংগ্রামীকে দূর করতে হয় মৃত্যু-ভয়, ছিন্ন করতে হয় ক্ষুদ্রতার বন্ধন আর মিথ্যার মায়াজাল। বজ্র-নির্ঘোষে নবযুগের যৌবন-দিপ্ত কবি এ বাণীই ঘোষণা করলেন।

www.pathagar.com

এই ঘোষণা বিপ্লবী ইসলামের মর্মবাণীরই ঘোষণা। এমনি ঘোষণার অপেক্ষাতেই ছিলেন যেন এতদিনকার মুসলিম সমাজ-সেবক আর কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ। বিশ শতকে পৌঁছে তারুণ্য-চঞ্চল এই কবির ঘোষণায় ইসলামের সে মর্মবাণীকেই যেন খুঁজে পেলেন তাঁরা। হঠাৎ করেই জীয়ন-কাঠির ছোঁয়ায় যেন প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠল মুসলিম বাংলা-সাহিত্যের পরিমণ্ডল। দেশ-দেশান্তর ও ভাষা-ভাষান্তরের মনীষা-সঞ্চয় থেকে আহরিত বিষয়-বৈচিত্র্যে আর শব্দ-সম্ভারে নজরুল সাহিত্য যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম মানস প্রত্যাশিত এক অনুপম স্বপ্ন-বর্ণালী! অস্পস্টতা আর বিভ্রান্তিকর পরিবেশে এমনি এক বর্ণালীর সন্ধানেই ছিল যেন শত শত বছরের মুসলিম সাহিত্য-চর্চার পথ পরিক্রমা! এখন আর রইল না কোন অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি। ইংরেজ আমলে পিছিয়ে পড়া অর্ধ-চেতন জাতি সহসাই হল এক সংগ্রামী কাফেলা।

www.pathagar.com

একশত বছরের সাহিত্য

ডক্টর গোলাম সাকলায়েন

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ মার্চ, ১৯২৬, উল্লাপাড়া, পাবনা। শিক্ষা ঃ এম. এ. (বাংলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৩। পি এইচ.ডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩। পেশা ঃ অধ্যাপনা।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গবেষণা-প্রবন্ধ ঃ বাংলার মর্সিয়া সাহিত্য (১৯৬৪), মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক (১৯৬৭), ফকির গরীবুল্লাহ (১৯৬২), পূর্ব পাকিস্তানের সূফী সাধক (১৯৮০), শেখ ফজলুল করিম (১৯৭১), বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান (১৯৬৯), সাহিত্যিক পরিচয় (১৯৭৫)। অনুবাদ : হিটলারের বিচিত্র জীবন (মধুকর ছদ্মনামে, (১৯৬৯), নেপোলিয়ন।

লেখা-পরিচিতি ঃ 'কলম' ১৯৯৩ সালের আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিগত এক শত বৎসরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থিত করা গেল। তবে স্বীকার করা দরকার যে, যে-অর্ধশতাব্দীকাল ব্রিটিশ শাসনের নিয়ন্ত্রণাধীনে বঙ্গদেশ নামক ভূখণ্ড শাসিত হয়েছিল সেই সময় পরিধির মধ্যে বাংলাদেশ তথা বাঙালী জাতি সামগ্রিক অর্থে তার আপন বিশিষ্টতায় ও আদর্শে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। বাঙালীর অধিকারকে তারা বরাবরই ক্ষুণ্ন ক'রে এসেছে। উত্তরকালে অখণ্ড বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমা খণ্ডিত হয়েছে এবং পাকিস্তান নামক ভূখণ্ডের কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষ বাঙালির জাতীয়তাকে নানাভাবে খর্ব করেছে, তাদের ঐতিহ্যকে পঙ্গু করে রাখার প্রয়াস চালানো হয়েছে। তথাপি গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আমরা আমাদের পরিচিতিকে ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট করতে পারলাম। সাবেক পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের এবং এই পূর্বাঞ্চলের মানুষের যে আপন ভুবন আছে, তার পরিচয় আছে, সেই ভুবনের কথা, পরিচয়ের কথা জানতে পারা গেল গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে (১৩৫৪ বঙ্গাব্দে)।

বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকেরা তাঁদের লেখার মাধ্যমে নিজেদের সুখ-দুঃখের পাঁচালি গাইলেন, অভাব-অভিযোগ বঞ্চনার কথা তুলে ধরলেন। বাঙালির জাতীয় চেতনা যে তার সামাজিক, ঐতিহ্যিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এ-বক্তব্য বইপুস্তক, সংবাদ মাধ্যম ও পরস্পরের যোগাযোগের ফলে বিকাশ লাভ করলো। লেখকদের মধ্যে অনেকেই প্রবীণ ছিলেন, প্রাজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা দার্শনিকবোধ ও যুক্তির সাহায্যে এই বিবেচনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন যে, বাঙালি মুসলিম আলাদা কোন জনগোষ্ঠী নয়, ভুঁইফোড় কোন জাতি নয়, আবহমান কাল ধরে বাংলার ভূখণ্ডে জন্মসূত্রেই তাঁরা তাদের ঐতিহ্য নির্মাণ করেছেন। কত কাল কত যুগ ধরে মুসলমানগণ বসবাস ক'রে আসছেন পুরুষানুক্রমে; তবু আপন ব'লে স্বীকার করতে নারাজ কোন কোন মহল। যা হোক মুসলমানের জাতিসত্তার পরিচয় তাদের লেখক ও কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় বলিষ্ঠভাবে ফুটে উঠল সে প্রসঙ্গই বর্তমান পরিচ্ছেদে নিবেদন করি।

www.pathagar.com

মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যকর্ম বহুমাত্রিক। তাঁর ধ্রুপদী রচনা 'বিষাদ-সিন্ধু' এক অনন্য সাহিত্যকর্ম। গত একশ' বছর যাবত এই গ্রন্থখানি সর্বস্তরের পাঠকসম্প্রদায়ের কাছে বিপুল আগ্রহে পঠিত হয়ে আসছে। একটি ইতিহাস-নির্ভর কাহিনীকে লেখক মানব-যন্ত্রণার অবলম্বন করেছেন। এবং এ-যন্ত্রণা পাঠককে অভিভূত করে। মীর মশার্‌রফের সাহিত্য সৃষ্টিপ্রয়াস অনুসরণ করেছেন উত্তরকালের সুধিগণ, লেখক সম্প্রদায়। তাঁরা কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প লিখেছেন, নাটক লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন। এই যে সাহিত্য-স্রষ্টারা সৃষ্টির আনন্দে অবগাহন করেছেন, উপহার দিচ্ছেন সাহিত্যকর্ম তাঁরা সংখ্যায় অনেক। তাঁদের সম্পর্কে আলোচনার সুবিধার জন্য আমি দু'টি পর্যায়ে তাঁদের ভাগ করতে চাই। প্রথম পর্যায়ের অন্তর্গত করা হয়েছে তাঁদেরকে, যাঁরা বাংলা সাহিত্যের ভিৎ তৈরি করেছিলেন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের কবি-সাহিত্যিক ও লেখকবৃন্দ। এই পর্যায়ের অপেক্ষাকৃত তরুণ সাহিত্যশিল্পীরা সাহিত্যের ভুবনকে রচনা-গৌরবে পূর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ক'রে তুলেছেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, শেখ আবদুর রহীম, রেয়াজ উদ্দীন আহমদ মাশহাদী, মোজাম্মেল হক, মুন্সী মোহাঃ মেহেরুল্লাহ, মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী ইমাদাদুল হক, মোহাম্মদ নজিবর রহমান, নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, বেগম রোকেয়া ইকরামুদ্দীন, শেখ ফজলুল করিম, এয়াকুল আলী চৌধুরী, ডা. লুত্‌ফর রহমান, সৈয়দ এমদাদ আলী, দাদ আলী, খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ্‌, শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী, ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন, নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদনী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, গোলাম কাসেম প্রমুখ প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হয়েছেন যাঁরা তাঁরা হলেন ঃ এস. ওয়াজেদ আলী, শাহাদাৎ হোসেন, ইব্রাহীম খাঁ, গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ বরকতুল্লা, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী মোতাহার হোসেন,কাজী আবদুল ওদুদ, মাহবুব-উল-আলম, আবুল মনসুর আহমদ, জসীম উদ্দীন, বন্দে আলী মিয়া, আশরাফ আলী খান, সুকান্ত ভট্টাচার্য, ফররুখ আহমদ, হাবীবুল্লাহ বাহার, শামসুন নাহার মাহমুদ, হুমায়ুন কবীর, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, খান মঈনুদ্দীন, মোহাম্মদ নাসির আলী, আবদুল মওদুদ, ড. এম, আবদুর রহীম, আবুল হোসেন, রওশন ইজদানী, সিকান্দার আবু জাফর, কাজী কাদের নওয়াজ, সানাউল হক, আবদুল কাদির, মুহম্মদ আবদুল হাই, নূরুল মোমেন, আবুল ফজল, সরদার জয়েনউদ্দীন, মনির উদ্দীন ইউসুফ, ইব্রাহীম খলীল, কাজী আকরম হোসেন, মতিন উদ্দীন আহমদ, মহীউদ্দীন, মুনীর চৌধুরী, শেখ গোলাম মকসুদ হিলালী প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রয়াস বিচিত্র। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনার ফলশ্রুতিতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছে। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত এই কবির সাহিত্য চিন্তা ছিল উচ্চ স্তরের। সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে কবি রবীন্দ্রনাথ ঐশ্বর্য ফলিয়েছেন। কাব্যে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে-প্রত্যেক বিভাগেই তাঁর যাদুকরী হাতের স্পর্শ পড়েছে। এবং

www.pathagar.com

এই স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্য। তাঁর উৎকৃষ্ট গানগুলোকেও উৎকৃষ্ট গীতি কবিতা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এক কথায়, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-ভাণ্ডার বিশাল। সাহিত্যে-শিল্পে-সংগীতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে কবির একনিষ্ঠতার কারণে। কিন্তু মূলত 'কবি' অভিধায়ই চিহ্নিত করা হয় তাঁকে; কেননা তাঁর কাব্য-গ্রন্থের সংখ্যা ৫৬। কায়কোবাদের আসল নাম কাজেম আল্ কুরেশী। তিনি কবি-নাম গ্রহণ করেছিলেন 'কায়কোবাদ'। আরো অনেকের মতো কবি কায়কোবাদও মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'মহাশ্মশান' রচনা করেন। 'মহাশ্মশান' মহাকাব্যের বিচারে সার্থক সৃষ্টিরূপে বিবেচন্য নয়, তবে এটা একখানি অসাধারণ কাব্য। এর আংশিক কাহিনী নিয়ে মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটক রচনা করেন। যে সময়ে কাব্যের স্বভাবে পরিবর্তন এসেছে তখন কায়কোবাদ সময়ের পরিবর্তনকে মান্য করেন নি। 'অশ্রুমালা' গীতিকাব্যখানি হৃদয়বেদনার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। শেখ আবদুর রহীমের জীবনচরিতমূলক রচনা 'হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি', রেয়াজ উদ্দীন আহমদ মাশহাদীর 'সমাজ ও সংস্কার', 'অগ্নিমুকুট', 'সুরিয়া বিজয়', এবং মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্র 'বিধবা-গঞ্জনা', 'মেহেরুল ইসলাম' সেকালের ধর্মপ্রাণ মুসলিম পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের রচিত 'হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার জীবন চরিত' মূল্যবান বই।

শান্তিপুরের (নদীয়ার) কবি-সাংবাদিক ছিলেন মোজাম্মেল হক। তিনি 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদকতা করতেন; তাঁর কাব্য 'কুসুমাঞ্জলি', 'জাতীয় ফোয়ারা' ও 'হজরত মোহাম্মদ' কবি হিসেবে তাঁকে মর্যাদা দান করেছিল। কিন্তু গদ্য সাহিত্যের শক্তিশালী লেখক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব আজও অম্লান। 'ফেরদৌসী রচিত' জীবনীগ্রন্থ এবং 'জোহরা' উপন্যাস এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সাহিত্য-সাধনা, পত্রিকা-সম্পাদনা এবং ভাষণ-বক্তৃতাদির মাধ্যমে গণ-সংযোগ স্থাপন গত শতাব্দীর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে গণ্য। সিরাজগঞ্জের সিরাজী পরাধীনতার গ্লানি মোচনে এবং মুসলমানদেরকে নব জাগরণে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে রচনা করেছিলেন 'অনলপ্রবাহ' কাব্য। এ-কাব্য নির্মাণের কারণে কবি ইংরেজ শাসকের রোষানলে পড়েন। তাঁর কাব্যখানি বাজেয়াপ্ত হয় এবং তিনিও কারাবরণ করেন। কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ-সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে অনায়াস বিচরণ সেকালে সিরাজীকে এক বিশিষ্ট 'লেখক' ও 'নেতা' রূপে আখ্যায়িত করেছিল। বাগ্মী হিসেবেও তিনি অতুলনীয় ছিলেন। মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী রাজনীতিক ও সাহিত্যিক কিন্তু সংবাদপত্র পরিচালনা ও সম্পাদনা ক'রেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

পুঁথি-সংগ্রহ ও পুঁথি-সম্পাদনার দুরূহ কাজে চট্টগ্রামের আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ নিয়োজিত ছিলেন। সারা জীবন এই কাজে আত্মনিয়োগ ক'রে সতের শতকের মুসলিম কবিদের সাহিত্য সৃষ্টির মূল্যবান তথ্য ও উপাদান এ-যুগের পাঠকদের উপহার দেন। 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' (মুহম্মদ এনামুল হকের সহযোগে) তৎসম্পাদিত একখানি মূল্যবান গবেষণা-গ্রন্থ। কাজী ইমদাদুল হক সাহিত্য-প্রতিভার অধিকারী

www.pathagar.com

ছিলেন। মোহাম্মদ নজীবর রহমানও ছিলেন তাই। উভয়েই কথাসাহিত্যের ভুবনে এখনো অম্লান মহিমায় দীপ্যমান। কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' এবং নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' শিল্পের বিচারে ক্রটিহীন নয়, কিন্তু পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষেত্রে উপন্যাস দুইখানির আবেদন অসামান্য। মুসলিম সমাজচিত্রের সার্থক রূপকার হিসেবেই তাঁরা চিহ্নিত। কথা সাহিত্য ছাড়াও অন্য ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁরা। বেগম ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ও বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন সেকালের সামাজিক ও ব্যক্তিগত অবস্থার শিকার হয়েছিলেন। ফয়জুন্নেসার 'রূপ জালাল' গদ্যে-পদ্যে রচিত আত্মজীবনীমূলক একটি রচনা। 'রূপ জালাল'- যে লেখিকার দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতার অম্ল-মধুর কথকতা আছে এবং স্বামীসান্নিধ্য বঞ্চিতা বেগম রোকেয়ার 'মতিচুর', 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী', 'Sultana's Dream'. বইগুলোতে মুসলমান নারী সমাজের নিষ্করুণ অবস্থার চিত্র প্রতিফলিত। জ্ঞানে-কর্মে সর্বক্ষেত্রে মুসলিম মেয়েরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক এই ছিল রোকেয়ার জীবন-স্বপ্ন।

বর্ধমান জেলার সন্তান একরামুদ্দীন পেশায় সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। 'রবীন্দ্রপ্রতিভা' নামক সমালোচনা-গ্রন্থখানি তাঁকে সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। বইখানি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে চাওয়া হ'লে কবি একরামুদ্দীনকে লেখেন, 'এই বই সম্বন্ধে আমি অভিমত জানাইতে পারিব না, আমাকে ক্ষমা করিবেন। কেবল এইটুকু বলিলে দোষ নাই যে, আপনি যে সরল বাংলা ভাষায় আমার রচনার সমালোচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি।' 'কাঁচ ও মনি', 'নতুন মা' উপন্যাসদ্বয় একরামুদ্দীনকে ঔপন্যাসিকের সম্মানও দান করেছিল। শেখ ফজলল করিমের প্রতিভা ছিল বহুমাত্রিক। তিনি সাংবাদিক ছিলেন। কবি ছিলেন এবং গদ্য সাহিত্যের লেখক ছিলেন। 'বাসনা', 'জম্‌জম'-এর সম্পাদনায়, 'পরিত্রাণ', 'ভগ্নবীণা' প্রভৃতি কাব্য-নির্মাণে এবং 'পথ ও পাথেয়', 'রাজর্ষি এব্‌রাহিম', 'লাইলী-মজনু' গদ্য গ্রন্থাদি রচনায় ফজলল করিম নিজ অধিকারের দাবি নিয়ে উপস্থিত হ'তে পেরেছিলেন। এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'শান্তিধারা', 'মানব-মুকুট', 'নূরনবী' প্রভৃতি গ্রন্থগুলোর মধ্যে লেখকের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমানসের পরিচয় বিদ্যমান। গত শতাব্দীর অধিকাংশ লেখকের বাংলা ভাষার কাঠামো ছিল সাধু বাংলা। এই সাধু বাংলা ভাষায় চৌধুরী সাহেব রচনাবলী প্রকাশ করেছিলেন। তবে তাঁর বাক্যরীতি সরস ও গতিময় ছিল। এবং সেই সঙ্গে বিষয়বস্তুর প্রকাশকালে একটি সুনিশ্চয় কথকতা ছিল।

মানব-কল্যাণ ডাঃ লুত্‌ফর রহমানের সাহিত্য সাধনার মূল প্রেরণা। তিনি মূলত প্রাবন্ধিক। 'উন্নত জীবন', 'মানব জীবন', 'মহৎ জীবন', 'উচ্চজীবন' রচনাবলী লুত্‌ফর রহমানের মানব ও মনুষ্যত্বের সর্বাংগীন উন্নতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়োজিত। 'রায়হান', 'সরলা', উপন্যাস হিসেবে অসার্থক কিন্তু এখানেও লুত্‌ফর রহমানের আদর্শবাদী চেতনা সহজ সাবলীলতায় প্রকাশ লাভ করেছে। সৈয়দ এমদাদ আলীর একক কাব্যগ্রন্থ 'ডালি'। গদ্যে তেমনি লেখেন 'তাপসী রাবেয়া'। 'ডালি'-তে মুসলিম জাগরণ যেমন কবির লক্ষ্য ও আদর্শ, তেমনি পরম আন্তরিকতায় তাপসী রাবেয়ার পবিত্র জীবন-কাহিনীর চমৎকার

www.pathagar.com

বর্ণনা-দান কবির অভিলাষ। 'ভাঙ্গাপ্রাণ', 'আশেকে রসূল', 'শান্তিকুঞ্জ'-য়ের কবি দাদ আলী নিজের কাব্য প্রতিভার সীমাবদ্ধতার কারণে একালের পাঠকদের কাছে স্মরণীয় চরিত্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেন নি কিন্তু কবির কবিতাবলীর মধ্যে আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিত হয়েছে। 'ভাঙ্গাপ্রাণ' কাব্যের সেই বিখ্যাত চরণ 'কি যেন আমার নাই খুঁজি আমি তাইরে' এখনো মনে পড়ে। খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ্ দর্শনশাস্ত্রে এম, এ পাশ ক'রে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। দীর্ঘকাল চাকরি ক'রে সবশেষে অবিভক্ত বঙ্গের শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডি.পি আই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; কিন্তু তাঁর সাহিত্য সাধনা বরাবরই অব্যাহত থাকে। তাঁর ৯২ বৎসরের যে-জীবন সে জীবন ছিল ধর্মীয়বোধের দ্বারা দীপ্ত, আবার সমাজ সেবা ও জাতীয় উন্নতির অভিপ্রায়ে আপন বিশ্বাসের ধারাক্রমের মধ্যে পরিচালিত। বিভিন্ন বিষয়ে ৫৭ খানি গ্রন্থের গ্রন্থকার ছিলেন খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ। তন্মধ্যে 'হজরত মোহাম্মদ', 'History of Muslim World', 'ইসলামের ইতিবৃত্ত', 'আমার জীবন ধারা' পড়বার মতো বই। জন্মসূত্রে হাওড়া, শিবপুরের (প. বঙ্গ, ভারত) মানুষ শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী কবি ও কথাশিল্পী ছিলেন। পত্রিকা-সম্পাদক ছিলেন। আমাদের কালের একজন সেরা কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় মুসলমান বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়লে মুসলিম-সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলীও ক্ষুব্ধ হন। এবং তাঁর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে 'বঙ্কিম-দুহিতা' উপন্যাসে। রচনাটি রসোত্তীর্ণ হয়নি কিন্তু সেকালে (১৩২৪) বঙ্গাব্দ) হিন্দুসমাজের বিপক্ষতা করা নিঃসন্দেহে সাহসের কাজ। কবি ইদরিস আলী প্রতাপী পুরুষ ছিলেন। সেজন্য তিনি বহু আলোচিত মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তার অন্যান্য উপন্যাস ও কাব্য নান্দনিক উৎকৃষ্টতা লাভ করেনি।

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ও ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গত শতাব্দীর দুই সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব। তাঁরা উভয়েই শিক্ষাবিদ্ ছিলেন, সাহিত্যিক ছিলেন এবং লোক সাহিত্যের গবেষক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যায়ের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই লেখেন দীনেশ সেন যার নাম 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'। সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত গবেষণামূলক রচনার ভাষা যে কবিত্বপূর্ণ ও লোকায়িত হ'তে পারে, দীনেশ বাবুর এ-বই তার পরিচয় বহন করে। এ-বিষয়ে ইংরেজী গ্রন্থ 'History of Bengali Language and Literature' চমৎকার বই। লোক সাহিত্য ও লোক গীতি সম্পর্কে তাঁর সম্পাদিত ও প্রকাশিত (৮ খণ্ড) 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' এবং ইংরেজীতে প্রকাশিত 'Eastern Bengal Ballads' তাঁকে মর্যাদার অধিকারী করেছে। অন্যান্য সাহিত্য-গবেষণার মধ্যে 'বৃহৎ বঙ্গ' (২ খণ্ড) ডঃ দীনেশ সেনের ব্যাপক পড়াশোনা ও ইতিহাস চর্চার পরিচয়বহ। বাংলা সাহিত্য ও লোক সাহিত্যের গবেষণা যখন নিজস্ব পথ খুঁজে পায় নি তখন তাঁর নিশ্চিন্ত পদচারণায় কোন বিচ্যুতি ঘটেনি। বহুমাত্রিক সাহিত্যের স্রষ্টা ছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। জীবনের নানা বিচিত্র পথে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত। ছিলেন পত্রিকা-সম্পাদক, অনুবাদক, ছোটগল্প লেখক এবং ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ গবেষক। কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি নিজেকে নিবেদন ক'রে দিতেন ভাষার গবেষণায়, সাহিত্যের উৎস নির্দেশনায়। তিনিই সর্বপ্রথম ইউরোপে

www.pathagar.com

গিয়ে (প্যারিস) 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' নিয়ে গবেষণা করেন। জীবনের সেরা মুহূর্তগুলি তিনি কাটিয়ে গেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে; কিন্তু তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা-কর্ম ঢাকার বাংলা একাডেমীতে চাকরির সময় সম্পন্ন হয়। 'পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান'-এর সম্পাদনা ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র এক অনন্য কীর্তি। কেবল প্রশংসার শব্দ উচ্চারণ ক'রে তাঁর মূল্যায়ন করা যায় না। 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (১ম খণ্ড), 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' Traditional Culture in East Pakistan' 'পদ্মাবতী' (সম্পাদিত) উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম।

শেখ হবিবর রহমান গদ্যে-পদ্যে কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তাঁর সাহিত্য নির্মাণের পেছনে মুসলিম ঐতিহ্যপ্রীতি লক্ষণীয়। তিনি সততায়, বিনয়ে এবং বিশ্বাসে অচঞ্চল ছিলেন। 'পারিজাত', 'বাঁশরী' প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থের কবি এবং 'আলমগীর' ঐতিহাসিক গ্রন্থের লেখক ছিলেন শেখ হবিবর রহমান। সাহিত্য ক্ষেত্রে পারঙ্গমতার কারণে তাঁকে 'সাহিত্য রত্ন', খেতাবে ভূষিত করা হয়। কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ না করা সত্ত্বেও সেকালে একজন মুসলিম মহিলা অনায়াস ভঙ্গিতে কথা সাহিত্য নির্মাণ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, তার পেছনে ছিল নূরুন্নেসা খাতুনের স্বামী কাজী গোলাম মহম্মদের উৎসাহ এবং লেখিকার স্বাভাবিক মনোভঙ্গি। মুসলমান সমাজের গার্হস্থ্য জীবন নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনীর উপন্যাসে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। 'স্বপ্নদ্রষ্টা', 'আত্মদান', 'ভাগ্যচক্র', 'বিধিলিপি' প্রভৃতি উপন্যাস প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

আধুনিক কালের জীবন-জিজ্ঞাসা ও সাহিত্যরুচির আলোকে আমাদের যে লেখক ও চিন্তাবিদদের সাহিত্য ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠেছে তাঁদের প্রসঙ্গ নিবেদন করি। গত শতকের এই লেখকদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য এস. ওয়াজেদ আলী। ব্যারিষ্টারী পেশা সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যচর্চা বরাবর অব্যাহত ছিল। গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনীসহ তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ২০। 'মাশুকের দরবার', 'গুলদাস্তা', 'গ্রানাডার শেষ বীর', 'আকবরের রাষ্ট্রসাধনা', 'ইকবালের পয়গাম', 'ভবিষ্যতের বাঙ্গালী'- এসব রচনার স্রষ্টা এস. ওয়াজেদ আলী সমকালীন মুসলিম সাহিত্যিকদের অনুপ্রেরণাস্থল বলে গণ্য হতেন। কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক শাহাদাৎ হোসেন স্বপ্নচারিতার ফলে চিরন্তন সৌন্দর্য লাভের অকাংক্ষায় ব্যাকুল ছিলেন সারা জীবন। অনেক ক'খানি কাব্য, নাটক ও গল্প গ্রন্থের স্রষ্টা শাহাদাৎ হোসেন ক্লাসিক আদর্শের অনুসারী ছিলেন। তিনি কবিতায় আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসাকে গ্রহণ করেন নি। আধুনিক শব্দাবলী ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কবিকে পুরাতন জীবন-চেতনার অনসঙ্গে অগ্রসর হ'তে দেখি। 'রূপচ্ছন্দা' কবিতা- সংকলন ও 'মসনদের মোহ' নাটক পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এ-ছাড়া কবিতাগ্রন্থ 'চিত্রপট', 'কল্পলেখা' এবং নাট্যসাহিত্য 'আনারকলি', 'সরফরাজ খাঁ' উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহিত্যিক অবদানের কারণে প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। উত্তরকালে রাজনীতি চর্চায় মনোযোগী হওয়া সত্ত্বেও কখনো সাহিত্যচর্চা থেকে বিচ্ছিন্ন হন নি এই সাহিত্যিক ও নাট্যকার। 'কামাল পাশা' ও 'আনোয়ার পাশা' নাটকের স্রষ্টা হিসেবে তিনি পাঠকসাধারণের কাছে সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

সামাজিক দুর্নীতি মোচনের লক্ষ্যে ইব্রাহীম খাঁর লেখনী পরিচালিত। প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও ভ্রমণ কাহিনী নির্মাণ ক'রে আমাদের বাংলা সাহিত্যকে শ্রীমণ্ডিত করেছেন এই সমাজ-দরদী লেখক। তাঁর কোন কোন রচনায় বিদ্রূপের দংশন আছে। কবি গোলাম মোস্তফা বিচিত্র গুণাবলীর অধিকারী। গত শতাব্দীর কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি প্রভাবশালী ছিলেন। জীবনীকার, প্রবন্ধকার, শিশু সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি ভূমিকা পালন করতেন। মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের লালন তাঁর রচনাবলীকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। কবি গোলাম মোস্তফার কবিতা বলুন, জীবনী বলুন, প্রবন্ধ বলুন, শিশু সাহিত্য বলুন- সর্বত্র শব্দ ব্যবহারের প্রাঞ্জলতার সঙ্গে মিশেছে স্বাভাবিক কবিত্ব। 'বিশ্বনবী'র জীবনীকার রূপে গোলাম মোস্তফা অভাবনীয় মর্যাদা লাভ করেছেন। 'রক্তরাগ', 'খোশরোজ', 'সাহারা', 'বনি আদম' কাব্য গ্রন্থাদি কবির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত।

সাংবাদিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহিত্য সৃষ্টিতেও অবদান রেখেছিলেন। সহজ ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গিতে লেখা তাঁর গ্রন্থগুলো হ'ল- 'মরু ভাস্কর', 'সৈয়দ আহমদ', 'ছোটদের হজরত মোহাম্মদ' প্রভৃতি। গত শতাব্দীর এক বি.সি.এস অফিসার ছিলেন মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্। 'পারস্য প্রতিভা' (২ খণ্ড) গ্রন্থের প্রথিতযশা লেখক হিসেবেই তাঁর সাহিত্য চর্চার অবলম্বন। তাঁর রচনাশৈলী পরিচ্ছন্ন ও জীবনময়। 'মানুষের ধর্ম', 'নবীগৃহ সংবাদ', 'নয়া জাতির স্রষ্টা হযরত মোহাম্মদ' তাঁর লেখক পরিচিতিকে সুদৃঢ় করেছে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন মূলত সাংবাদিক। সুদীর্ঘকাল 'দৈনিক আজাদ'-এর সঙ্গে জড়িত থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজের অধিকারের দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। ভ্রমণ কাহিনী, স্মৃতি কথা, অনুবাদ-এ সব শাখায় নিরাভরণ তীক্ষ্ণতায় কথা বলেছেন শামসুদ্দীন সাহেব। 'অতীত দিনের স্মৃতি' স্মৃতিকথা বটে কিন্তু চমৎকার একখানি বই। 'নতুন চীন নতুন দেশ' (ভ্রমণ), 'অনাবাদী জমি' (অনুবাদ) লেখকের সৃজন প্রতিভার পরিচায়ক।

সাহিত্য ও সংগীত সাধনায় কাজী নজরুল ইসলাম প্রবাদ-পুরুষ। দরিদ্রের ঘরের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও কেবল অসাধারণ প্রতিভার ফলশ্রুতিতে নজরুল দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে সশ্রদ্ধায় স্মরণীয়। প্রথম মহাযুদ্ধ ফেরত কবির কাব্য জীবনের সূত্রপাত হয় কলকাতায়। তিনি কখনো পত্র-পত্রিকার সম্পাদকতা করেছেন, কখনো সরকার বিরোধিতার দায়ে কারাবরণ এবং কারাগারে অনশন করেছেন। জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসার পর কবির কর্মপ্রবাহ আপন স্বভাব অনুসারে গতিময় হয়ে ওঠে। গানের ভুবনে নজরুল বিস্ময়কর অবদান রাখেন। একদিন তরুণ বয়সে 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। সেই যে খ্যাতি তা কবি সুস্থ থাকা পর্যন্ত অটুট ছিল এবং এই খ্যাতি আজ কবির অবর্তমানেও বেড়েই চলেছে। নজরুল ছিলেন জীবন-রসিক আনন্দময় পুরুষ। জীবনকে স্পর্শ করেই কবি জীবন্ত ছিলেন যতদিন স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছিলেন। কত বড় প্রতাপী ছিলেন নজরুল যে, নিজের দারিদ্রকে ভুলে থাকার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ক্ষমতা ছিল বলেই বাংলা সাহিত্যে জয়ধ্বনি শোনা গিয়েছিল ঃ

বল বীর/ বল, উন্নত মম শির!

www.pathagar.com

সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে কবির অনায়াস পদচারণা ছিল। কাব্যে 'অগ্নিবীণা', 'দোলন চাপা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চক্রবাক' কথাসাহিত্যে 'মৃত্যুক্ষুধা', 'কুহেলিকা' গল্প সংকলনে 'শিউলীমালা' উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হিসেবে পাঠকচিত্ত জয় করেছে।

কাজী আবদুল ওদুদ ও কাজী মোতাহার হোসেন—উভয়ে জন্মসূত্রে ফরিদপুরের মানুষ। উভয়েই ছিলেন সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ্। কাজী মোতাহার হোসেন গানের চর্চাও করতেন। আর ছিলেন বিখ্যাত দাবাড়ু। কাজী আবদুল ওদুদ সম্পর্কে বড় কথা এই যে, তিনি ছিলেন প্রখ্যাত যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিক। সে দিক থেকে ছিলেন প্রতাপী পুরুষ; তাঁর এই প্রতাপ সাহিত্য চিন্তায় লক্ষণীয়। চিন্তার ক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আহুত হয়ে যে বক্তৃতা দান করেছিলেন তার বিষয় ছিল 'হিন্দু–মুসলিম বিরোধ' এবং 'বাংলার জাগরণ'। 'কবিগুরু গ্যেটে', 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ', 'শরৎচন্দ্র ও তারপর' রচনাগুলি প্রসঙ্গত স্মরণীয়। 'নদীবক্ষে' উপন্যাস ও 'মীর পরিবার' গল্প সংকলনও প্রশংসিত হয়েছিল। মূলত বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে কাজী মোতাহার হোসেনের অবদান উল্লেখ্য। প্রবন্ধ–সংকলন 'সঞ্চরণ, 'নজরুল কাব্য পরিচিতি' প্রভৃতি রচনা তাঁর কৃতিত্বের পরিচয়বহ। সাবলীল ও গতিশীল ভাষার শিল্পী ছিলেন মাহ্বুব-উল-আলম। যুক্তিবাদিতা তাঁর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য; ফলে গল্পগ্রন্থ ও স্মৃতিকথাও পাঠক–চিত্তকে সহজেই আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। 'মোমেনের জবানবন্দী', 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' এ– বিষয়ে স্মরণীয় অবদান রূপে গণ্য। কথাশিল্পী আবুল মনসুর আহমদ পরবর্তীকালে রাজনীতির চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। এক সময়ে সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সহ–সম্পাদক রূপেও তিনি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। কথাশিল্পী হিশেবে 'সত্যমিথ্যা', 'জীবন ক্ষুধা'র স্রষ্টা হলেও গল্পগ্রন্থ 'আয়না', 'ফুড কনফারেন্স' তাঁকে সাহিত্যিক হিশেবে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর কোন কোন লেখায় ব্যঙ্গ–বিদ্রুপের কশাঘাত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

গত শতাব্দীর একজন প্রধান কবিরূপে জসীম উদ্দীন সমাদৃত। পল্লীজীবন, প্রকৃতি ও পরিবেশ এই কবির কাব্য সৃষ্টির উপজীব্য বিষয়। আমাদের অবহেলিত যে পল্লী জীবন সেই পল্লীজীবনের রূপকার ছিলেন কবি জসীম উদ্দীন। পল্লীর নিরাবরণ ও নিরাভরণ সরল মানুষগুলো তাঁর কাব্য–কবিতায় উঠে এসেছে। 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কাব্য নির্মাণের ফলে তিনি প্রথম বাংলা সাহিত্যে কবির মর্যাদা লাভ করেন। গত শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ কবি–সাহিত্যিকের রচনায় যে যুগ–যন্ত্রণা ও বঞ্চনার প্রতিফলন আছে কবি জসীম উদ্দীনের কাব্য ও সাহিত্য তা থেকে ভিন্ন। তাঁর অন্যান্য কাব্য হ'ল 'রাখালী', 'বালুচর', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'হাসু', 'এক পয়সার বাঁশি' প্রভৃতি। কবিতার মতো গদ্য সাহিত্যেও কবির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এ–বিষয়ে 'চলে মুসাফির', 'ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনায়', 'জীবন কথা', 'বাঙালীর হাসির গল্প' সুখপাঠ্য রচনা। কবি জসীম উদ্দীনের গদ্য–ভাষা রীতি অবশ্যই চমৎকার।

বন্দে আলী মিয়া জসীম উদ্দীনের ন্যায় পল্লী জীবনকেন্দ্রিক পরিবেশ নিয়ে নির্মাণ করেন 'ময়নামতির চর'। কাব্যখানি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা–ধন্য হয়। তিনি ক'খানি উপন্যাসেরও

www.pathagar.com

লেখক; রচনাগুলি বৈশিষ্ট্যবর্জিত। কিন্তু বন্দে আলী মিয়ার প্রকৃত যে ক্ষেত্র সেটা হল তাঁর শিশু সাহিত্য। নানা বিষয়ে শতাধিক শিশু সাহিত্যের বইয়ের গ্রন্থাকার ছিলেন তিনি। এ-ক্ষেত্রে তিনি এক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'কঙ্কাল'-কাব্যখ্যাত কবির নাম আশরাফ আলী খান। তবে অনুবাদক হিশেবে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। 'ছন্নছাড়ার ক্লাব' নামক একখানি উপন্যাসের লেখক হিশেবে তাঁর অন্য পরিচয় আছে। কিন্তু লেখাটি কলকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্টের নির্দেশে বাজেয়াপ্ত হয়। প্রসঙ্গতঃ বর্তমান প্রজন্মের পাঠকসম্প্রদায়ের কাছে অল্পজীবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করেছে। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে এই কবির জীবনাবসান না হলে বাংলা কবিতা শব্দের সাবলীল প্রবাহে অধিক দূর অগ্রসর হ'তে পারতো। কিশোর কবির কাব্যগুলির মধ্যে 'ঘুম নেই', 'ছাড়পত্র', 'মিঠে কড়া' উল্লেখযোগ্য। তাঁর একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করিঃ

এসেছে নূতন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান,
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংস-স্তূপ পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাবো তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ।
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি
নব জাতকের কাছে এ-আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

ফররুখ আহমদ কাজী নজরুলের মতো ছিলেন প্রতাপী কবিপুরুষ। তিনি বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ অবস্থানে বিরাজমান। ইসলামের যে মৌল আদর্শ, সেই আদর্শের প্রতিফলন আছে কবির কাব্যে। তাঁর প্রথম কাব্য 'সাত সাগরের মাঝি'তে মুসলিমদের পুনরুজ্জীবনের আশাবাদ অভিব্যক্তি লাভ করেছে। ফররুখ ছিলেন আদর্শবান কবি, স্বাপ্নিক কবি। তাই কবিতার ভেতরকার কল্লোল আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। কবি যখন বলেন ঃ

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হল জানি না তা'।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?

তখন মনে হয় আপন বিশ্বাসে অটল কিন্তু বক্তব্যের প্রাঞ্জলতায় তিনি পাঠক সাধারণের গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে এসেছিলেন।

হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী এবং শামসুন্নাহার মাহমুদ সাহিত্যক্ষেত্রে 'বাহার' ও 'নাহার' নামে সুপরিচিত। এই দুই ভাইবোন 'বুলবুল' নামে একখানি পত্রিকা বের করেছিলেন; পত্রিকাখানি পাঠক মহলে প্রশংসিত হয়। একখানি শালীন পত্রিকা হিশেবে তৎকালে 'বুলবুল'-য়ের ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। সাহিত্য-চর্চা ছিল বাহারের নেশা। পরবর্তীকালে রাজনীতি চর্চায় মনোযোগী হওয়ার ফলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন লাভ করেন নি।

www.pathagar.com

তিনি বিগত শতাব্দীতে কলকাতা মহামেডান স্পোর্টিং ফুটবল ক্লাবের খেলোয়াড় ছিলেন। সেদিক থেকে বলা যায় অনুজা শামসুন্নাহার মাহমুদ সাহিত্য-সাধনায় সারা জীবন একাগ্রচিত্ততার পরিচয় দেন এবং বেশ ক'খানি গ্রন্থের লেখিকা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি বেগম রোকেয়ার ছাত্রী ছিলেন; সুতরাং একজন মহীয়সী মহিলার কর্মসহচরী হিসেবে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পান। 'রোকেয়া জীবনী', 'পুণ্যময়ী', 'আমার দেখা তুরস্ক', 'নজরুলকে যেমন দেখেছি' প্রভৃতি গ্রন্থ শামসুন্নাহার মাহমুদকে পারঙ্গমতা দান করেছিল।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি, দর্শন ও ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স ডিগ্রী লাভের পর অসাধারণ মেধা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হুমায়ুন কবীর কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন। ভারত সরকারের প্রাক্তন শিক্ষা-সচিব ও শিক্ষামন্ত্রী কবীর সাহেব সৃষ্টিশীল রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'চতুরঙ্গ'-এর সম্পাদক হিসেবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ইংরেজি ও বাংলা বহু বইয়ের লেখক ছিলেন হুমায়ুন কবীর। 'নদী পারাপার', 'বাঙলার কাব্য', Rabindra Nath Tagore, the Bengali Novel ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন আজীবন লোক সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতির সংগ্রাহক ও গবেষক ছিলেন। দ্বাদশ খণ্ডে সংকলিত ও প্রকাশিত 'হারামণি' প্রকৃতপক্ষে মনসুর উদ্দীনকে 'লোক সাহিত্য প্রেমিক' অভিধায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ-ক্ষেত্রে তিনিই পথিকৃৎ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যায়ে 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' (৩ খণ্ড) অন্যান্য সাহিত্য কর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন 'মুসলিম জগৎ' পত্রিকায় (কলকাতা থেকে প্রকাশিত) প্রবন্ধ লেখার দায়ে কারারুদ্ধ হন এবং হুগলি জেলে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে একসঙ্গে কাটান। কবি বিশেষণে আখ্যায়িত হলেও গদ্য-পদ্যে তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। কাব্য, উপন্যাস, জীবনী-এসব বিভাগে গ্রন্থাদি রচনা ক'রে কৃতিত্ব অর্জন করেন মঈনুদ্দীন। 'যুগস্রষ্টা নজরুল' তাঁর জন্য সম্মান বয়ে আনে। মোহাম্মদ নাসির আলী মূলত একজন শিশু সাহিত্যিক। অনেক বই নির্মাণ ক'রে তিনি বাংলা দেশের শিশু সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। অত্যন্ত সহজ, প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা এ-বইগুলো আমাদের শিশুতোষ সাহিত্যের অভাব পূর্ণ করেছে। বিচারপতি আবুল মওদুদ কর্মজীবনের অবসর ক্ষণে সাহিত্য চর্চায় নিবেদিত ছিলেন। জীবনী সাহিত্য ও প্রবন্ধ রচনার মধ্যেই তাঁর সাহিত্য চর্চা সীমাবদ্ধ থাকতো। ইসলামি ঐতিহ্য ও ইতিহাস তাঁর সাহিত্য নির্মাণের ভিৎ গড়েছিল। 'মুসলিম মনীষা', 'হযরত ওমর', 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর','ওহাবী আন্দোলন' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান।

ডঃ এম. আবদুর রহীম ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতার ফলে তাঁর পক্ষে ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা ও চর্চা করার সুযোগ আসে। ইংরেজীতে লেখা তাঁর Social and Cultural History of Bengal (Vol I & II) গ্রন্থ দেশ-বিদেশে সমাদরের অধিকার অর্জন করেছে। বাংলা একাডেমী (ঢাকা) থেকে উপরোক্ত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হ'লে তাও সুধিমহলে প্রশংসিত হয়েছে। তিনি আবুল হোসেন যিনি

www.pathagar.com

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে (১৩৩৩ বঙ্গাব্দে) ঢাকায় কতিপয় সমমনা সুধিব্যক্তির সহযোগিতায় 'মুসলিম-সাহিত্য-সমাজে'র প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য সমাজের মুখপত্রের নাম ছিল 'শিখা'। শিখা মনীষী আবুল হোসেনের জীবন-স্বপ্ন রূপায়ণের মাধ্যম হিসেবে প্রকাশিত হয়। 'বাংলার বলশী' তাঁর লেখা গ্রন্থগুলির অন্যতম। ১৯৭৬ সালে আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'আবুল হোসেনের রচনাবলী' ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাঁর রচনার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হ'ল মুক্তবুদ্ধির অবতারণা ও যুক্তিবাদী বক্তব্যের উপস্থাপনা। রওশন ইজদানী কবি ছিলেন। প্রাবন্ধিক ছিলেন। লোক সাহিত্যের ক্ষেত্রে পদচারণা ছিল। তৎরচিত 'মোমেনশাহীর লোক সাহিত্য' বাংলা একাডেমী (ঢাকা) থেকে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'খাতেমুন নবীঈন', 'চিনুবিবি', 'রঙিলা বন্ধু' কাব্যের নাম উল্লেখ্য। 'খাতামুন নবীঈন' কাব্যগ্রন্থের জন্য রওশন ইজদানীকে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সাংবাদিক, কবি, নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর বহুমাত্রিক সাহিত্য প্রতিভায় ভাস্বর ছিলেন। কিন্তু সমকাল প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা ও 'সমকাল' পত্রিকার নিপুণ সম্পাদক রূপে তার কর্মকাণ্ড সুধিমহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।'প্রসন্নপ্রহর', 'বৈরী বৃষ্টিতে', তিমিরান্তিক' কাব্য; 'মহাকবি আলাওল', 'শকুন্ত উপাখ্যান', 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক; 'রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম', 'সেন্ট লুইয়ের সেতু', প্রভৃতি অনুবাদ গ্রন্থ তাঁর দক্ষ সৃষ্টি প্রয়াসের উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁর নাম কাজী কাদের নওয়াজ যিনি প্রাকৃতিক বৈভবের অকৃত্রিম অনুরাগী ছিলেন। তাঁর কবিতায় যে পল্লীপ্রেম লক্ষণীয় তাতে কবির বাণী নৈপুণ্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। সেকালের পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত 'টুপী' কবিতার অংশ বিশেষ এখানে কানে বাজে ঃ

টুপী আমার হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে ভাইরে।
বিহনে তার এই জীবনে কতই ব্যথা পাইরে ॥

রোমান্টিক আবহ সৃষ্টি সানাউল হকের কবিতার অন্যতম বিশিষ্টতা। 'নদী ও মানুষের কবিতা', 'সূর্য অন্যতর', 'বিচূর্ণ আর্শিতে'- এ সব কাব্য সানাউল হককে যুগের বলিষ্ঠতায় হাত ধরে রাখতে পেরেছে। কবিতা নির্মাণে যে স্বাচ্ছন্দ ও স্পষ্টতার প্রয়োজন হয়, শব্দকে কবির আপন ইচ্ছায় স্থান করে নিতে হয়, তা আমরা কবির কাব্যে প্রত্যক্ষ করি। 'বন্দর থেকে বন্দরে' সানাউল হকের একখানি চমৎকার ভ্রমণ কাহিনী। অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা জীবন ও প্রকৃতির সম্ভারের মধ্যে বিচিত্র ভঙ্গিতে ধরা পড়েছে।

আবদুল কাদির কবি ও প্রাবন্ধিক। ছন্দের ক্ষেত্রেও তিনি পারঙ্গম ছিলেন। সাহিত্যে ও কাব্যে স্থায়ী আসন লাভের জন্য শিল্প-সাহিত্য লেখকের কাছে পুনঃ পুনঃ চর্চার যে অধিকার দাবি করে সে অধিকার আবদুল কাদির পেয়েছিলেন কিন্তু সারা জীবনে তিনি মাত্র দু'খানি মৌলিক কাব্য প্রকাশ করেছিলেন। অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবদ্দশায় কোন প্রবন্ধ-সংকলন বের হয়নি এটা বিস্ময়কর নিঃসন্দেহে। তবে

www.pathagar.com

'মাহে নও' মাসিক সাহিত্য-পত্রিকার সুদক্ষ সম্পাদক হিসেবে এবং কতিপয় প্রখ্যাত লেখক লেখিকার রচনাবলীর নিপুণ সম্পাদক হিসেবে অবশ্যই কবি আবদুল কাদির বাংলা সাহিত্যে চিরদিনই সম্মানের আসনে সমাসীন থাকবেন এই আমার ধারণা। আর এক কথা। কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য ও সংগীত নিয়ে আমাদের দেশে আজ যে ব্যাপকভাবে চর্চা শুরু হয়েছে তারও সূত্রপাত করেছেন আবদুল কাদির। সাম্প্রতিককালে তাঁর মতো মনস্বী ব্যক্তিত্ব আমাদের সাহিত্যে নিতান্তই বিরল। 'দিলরুবা', 'উত্তর-বসন্ত', 'কবি নজরুল', 'কাব্য মালঞ্চ' (কাব্য সংকলন), 'কাব্য বীথি' আবদুল কাদিরের গৌরবময় সাহিত্যকর্ম রূপে গণ্য হবে।

মুহম্মদ আবদুল হাই সাহিত্যিক, ধ্বনিবিজ্ঞানী ছিলেন, শিক্ষাবিদ্ ছিলেন। চাকরি-জীবনের অবসরে তিনি করতেন সাহিত্যের চর্চা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছিল তার সুযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে ষান্মাষিক 'সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশ করেন। তিনিই ছিলেন পত্রিকাখানির প্রথম সম্পাদক। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে) রচনা ক'রে এ-ক্ষেত্রে মুসলমানদের সম্পর্কে আলোচনার দিকনির্দেশ করেন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই। এদেশে ধ্বনি-বিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ রূপেও তিনি মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। একজন নাট্যকার ছিলেন নূরুল মোমেন কিন্তু পেশায় ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পেশা তাঁকে প্রতিষ্ঠা দেয়নি; তিনি দেশ-বিদেশের পাঠকমহলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন 'নেমেসিস', 'রূপান্তর', 'যদি এমন হতো', 'নয়া খান্দান' প্রভৃতি নাট্যসাহিত্য নির্মাণ ক'রে এবং এগুলিই নূরুল মোমেনের উল্লেখযোগ্য রচনা।

আবুল ফজল নিজের মেধা ও একাগ্রচিত্ততার কারণে ইস্কুলের শিক্ষক থেকে শেষ জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পর্যন্ত হয়েছিলেন। তিনি সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্ রূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি ঢাকার মুসলিম-সাহিত্য-সমাজ-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও জীবনী পর্যায়ে আবুল ফজলের গ্রন্থের সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন একজন প্রতাপী পুরুষ। এই প্রতাপের পরিচয় তাঁর লেখার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। 'সমকাল'-এর কোন এক সংখ্যায় তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটির নাম ঃ 'শিল্পীর আত্মহত্যা'। এ-রচনায় সমকালীন শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। ফলে পত্রিকার উক্ত সংখ্যাটি তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকেরা বাজেয়াপ্ত করেন। 'চৌচির', 'সাহসিকা', 'জীবন পথের যাত্রী', 'রাঙা প্রভাত', 'বিচিত্র কথা', 'সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন', 'রেখাচিত্র', তাঁর উৎকৃষ্ট অবদান হিশেবে গণ্য হয়। 'নয়ান ঢুলি', 'বীর কণ্ঠির বিয়ে', 'পান্নামতি', 'অনেক সূর্যের আশা', 'বেগম শেফালি মির্জা', 'উল্টো রাজার দেশ'-এসব গ্রন্থের সুলেখক ছিলেন সরদার জয়েনউদ্দীন। মূলত কথাশিল্পী ছিলেন তিনি। তাঁর সাহিত্যের ভুবনে গ্রামীণ সমাজের পরিচিত নর-নারীকে লেখক মমতার স্বস্তিতে উদ্‌ঘাটন করেছেন।

www.pathagar.com

'আমার জীবন, আমার অভিজ্ঞতা' মনির উদ্দীন ইউসুফের আত্মজৈবনিক রচনা। এই রচনার লেখক নিজেকে মেলে ধরেছেন। জীবনের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে মনির উদ্দীন ইউসুফ দেশের কথা বলেছেন, সমাজের কথা বলেছেন, দেশের মানুষ অনায়াসে সাবলীলতায় উঠে এসেছে তাঁর রচনায়। কবিতা, কথা সাহিত্য, নাটক বঙ্গানুবাদ, জীবনী, প্রবন্ধ নানাক্ষেত্রে পদচারণা করেছেন লেখক; কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচিতি বিখ্যাত কবি ফেরদৌসী তুসীর ফার্সী মহাকাব্য 'শাহনামা'র (৬ খণ্ড) বাংলা গদ্যানুবাদ। বাংলা একাডেমীর এই গ্রন্থ প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ অনুবাদককে আপন বিশিষ্টতায় অধিষ্ঠিত করেছে। ইব্রাহিম খলীলের কৃতিত্ব ঐতিহাসিক নাটক রচনায়। 'সমাধি', 'নূরজাহান', 'স্পেন বিজয়ী মুসা'– এ সব নাট্য–সাহিত্য ব্যতীত উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনীর লেখক হিসেবেও তাঁর পরিচিতি আছে। কাজী আকরম হোসেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকতা করতেন, কিন্তু তাঁর নেশা ছিল সাহিত্য চর্চায়। কবি ও অনুবাদক ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর খ্যাতি সুবিস্তৃত হয়েছিল 'ইসলামের ইতিহাসের' লেখক হিশেবে। ইতিহাস বিষয়ক তাঁর অন্যান্য বই 'ইসলাম কাহিনী', 'ইসলামের ইতিকথা'। এক সময়ে তাঁর কাব্য 'নওরোজ' 'পল্লীবাণী' পাঠকদের কাছে উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল।

কথা–সাহিত্যিক ও অনুবাদক ছিলেন মতিনউদ্দীন আহমদ। মাত্র একখানি উপন্যাসের ('বুদ্বুদ' ১৯৬১) স্রষ্টা হ'লেও তাঁর সাহিত্য–কৃতি অনুবাদকর্মে প্রকাশ পায়। আসলে তিনি অনুবাদ সাহিত্যকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। 'ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট', 'অশান্ত পৃথিবী', 'বিজনবনের রূপকথা', 'চালক হওয়ার পয়লা কেতাব' প্রভৃতি অনুবাদ গ্রন্থগুলি পাঠকদের আগ্রহ সৃষ্টি করে। রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেও সাহিত্যে যিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি ঢাকা মুন্সিগঞ্জের কবি মহীউদ্দীন। কবি অভিধায় চিহ্নিত হলেও তিনি উপন্যাস লিখেছেন, অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। মহীউদ্দীন কাজী নজরুল ইসলামের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। তাঁর লেখায় মেহনতি মানুষের কথা আছে। তাঁর কাব্য ঃ 'পথের গান', 'দিগন্তের পথে একা', 'দুর্ভিক্ষ'; উপন্যাসঃ 'নতুন সূর্য', কঙ্কা নদীর তীরে', নাট্যসাহিত্য ঃ 'রক্তাক্ত পৃথিবী', অনুবাদ গ্রন্থ ঃ 'জরথুস্ত্র বললেন', 'ফাউস্ট' প্রভৃতিতে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত।

মুনীর চৌধুরী নাট্যকার, অনুবাদক এবং প্রাবন্ধিক ছিলেন। অধ্যাপনার অবসরে সাহিত্য চর্চায় তিনি নিবেদিতচিত্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া অসাধারণ বক্তা ছিলেন এবং মঞ্চাভিনেতা রূপে তাঁর ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছিল। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের দায়ে মুনীর চৌধুরী কারাভোগ করেন। কিন্তু কারাবাস কালে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'কবর' নাটক নির্মাণ করেন। তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনার পথিকৃৎ হিভেবেও তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য রচনার মধ্যে 'চিঠি', 'রক্তাক্ত প্রান্তর', 'মীর মানস', 'বাংলা গদ্যরীতি', 'কেউ কিছু বলতে পারে না', 'মুখরা রমণী বশীকরণ' প্রভৃতি উল্লেখের দাবি রাখে। অসাধারণ মনীষার অধিকারী ছিলেন ডঃ শেখ গোলাম মকসুদ হিলালী। বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত হিভেবে প্রশংসিত হয়েছিলেন তিনি। ইংরেজি ও বাংলায় লেখা তাঁর বইগুলি দীর্ঘদিনের সাধনা ও জ্ঞানচর্চার ফসল। তাঁর ন্যায় মহান–ব্যক্তি আমাদের পণ্ডিত

www.pathagar.com

মহলেও বিরল। বাংলা, ইংরেজি, আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে পারঙ্গমতার ফলে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থের গ্রন্থকার হয়েছিলেন। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'হালিদা হানুম', 'আল্ বেরূণী', Islamic Attitude Toward Non-Muslims, Perso-Arabic Elements in Bengali প্রভৃতি সুধিসমাজে গৃহীত হয়।

সহায়ক গ্রন্থ

১. চরিতাভিধান ঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম সং ১৯৮৫

২. মুসলিম বাংলা সাহিত্য ঃ ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ঢাকা ২য় সং ১৯৫৭

৩. উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা ঃ ড. ওয়াকিল আহমদ

৪. বাংলা সাহিত্য পরিচয় ঃ ড. গোলাম সাকলায়েন

৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)ঃ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ মোতাহার হোসেন সুফী

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ বর্তমান প্রবন্ধে জীবিত কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি — লেখক।

www.pathagar.com

শতাব্দীর মুসলিম বাংলা সাহিত্য

শাহাবুদ্দীন আহমদ

লেখক-পরিচিতি : জন্ম : ২১ মার্চ, ১৯৩৬, বসিরহাট, চব্বিশ পরগনা। পেশা : সম্পাদনা ও সাংবাদিকতা।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রবন্ধ : শব্দ ধানুকী নজরুল ইসলাম (১৯৭০), সাহিত্য চিন্তা (১৯৭৫), নজরুল সাহিত্য বিচার (১৯৭৬), ইসলাম ও নজরুল ইসলাম (১৯৮০), নজরুল সাহিত্য দর্শন (১৯৮৩), দ্রষ্টার চোখে স্রষ্টা (১৯৮৯), কবি ফররুখ : তাঁর মানস ও মনীষা। অনুবাদ : তিনবোন (১৯৭০), চেখভের শংখচিল (১৯৭২)। শিশুসাহিত্য : ছোটদের নেপোলিয়ন (১৯৬৯), ছোটদের মুহম্মদ আলী (১৯৮৩), ছোটদের নজরুল (১৯৭৭), বীরশ্রেষ্ঠ গামা (১৯৮৪), আলী আলী মোহাম্মদ আলী (১৯৮১)। সম্পাদনা : ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ : আবদুল কাদির। পুরস্কার : সুফী মোতাহার হোসেন পুরস্কার, নজরুল পরিষদ পুরস্কার (কলকাতা), নজরুল পুরস্কার (নজরুল একাডেমী, চুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ), বাংলাদেশ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ পুরস্কার, ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার।

লেখা-পরিচিতি : 'কলম' ১৯৯৩ সালের জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত।

চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলিম সাহিত্য সামগ্রিকভাবে শিখরস্পর্শী না হলেও এ-সময় পরিধিতে বাঙালী মুসলিম সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছে তা যে রেনেসাঁসের স্বাক্ষর বহনকারী তাতে সন্দেহ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশে রেখে এর তুলনা করলে একটি ক্ষীণ নদীর পাশে একে বিশাল পদ্মার মত মনে হবে; এবং বর্ষার পদ্মার।

বাংলা সাহিত্যে পদ্য লেখার ইতিহাস হাজার বছরের কিন্তু গদ্য লেখার ইতিহাস দু'শো বছরেরও কম সময়ের। বাঙালী মুসলমানের সত্যিকার গদ্য লেখকের ইতিহাস আরও কম সময়ের। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমকালে দু'জন শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকের আবির্ভাব ঘটে। এঁরা মীর মশাররফ হোসেন এবং নদীয়ার মোজাম্মেল হক। এঁরা যে শুধু গদ্য রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করছিলেন তাই নয়-বিচিত্রধর্মী গদ্য রচনা করেছেন। মীর মশাররফ উপন্যাসধর্মী 'বিষাদ সিন্ধু' ও 'গাজী মিয়ার বস্তানী' ছাড়াও নাটক প্রহসনও রচনা করেছিলেন। একা মীর মশাররফ যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর— বাংলা ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্তকালে একা একশ হ'য়ে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের রেনেসাঁসের সূচনা করে দিয়ে যান। মুসলিম বাংলা সাহিত্যের নীচে ঘুরে যাওয়া চাওয়া চাকা তখন থেকে উর্ধ্বে উঠতে শুরু হয়।

আঠার শ তিরানব্বই সাল ছিল বাংলা তের শ (১৩০০) সাল। এই সময় যে সব বাঙালী মুসলিম সাহিত্যিক-কবি ও গদ্য লেখক সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হন তাঁরা হলেন : মোজাম্মেল হক (বগুড়া), মোজাম্মেল হক (ভোলা); মতিয়র রহমান খান; নজিবর রহমান, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খান, রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, একরাম উদ্দীন, শেখ ফজলুল করীম; রেয়াজউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। এঁদের

www.pathagar.com

পূর্বসূরী যাঁরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে জন্মেছিলেন সেই মীর মশাররফ হোসেন, মওলভী মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন, কায়কোবাদ, দাদ আলী, শেখ আবদুর রহিম, রিয়াজউদ্দিন মাশহাদী, মোজাম্মেল হক (নদীয়া), মুনশী মেহের উল্লাহ, মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ, ডাক্তার আবুল হোসেন, মওলভী মেয়রাজউদ্দীন আহমদ, তসলিম উদ্দীন আহ্মদ; মুনশী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, মৌলভী আব্বাস আলী, কবি আর্জুমান্দ আলী, কবি আবু আলী মোহাম্মদ হামিদ আলী, আবদুল হামিদ খান ইউসুফজায়ী, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। মাওলানা মোহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী যে একটি উৎসাহিত সাহিত্য-পরিবেশ সৃষ্টি করেন তারই সিঁড়ি বেয়ে উল্লেখিত কবি-সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যেসব হিন্দু সাহিত্য-মনীষা জন্মগ্রহণ করেন একমাত্র মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক এবং কিয়দংশে কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন ও নজিবর রহমান ছাড়া তাঁদের মত দীপ্তিমান আর কোন মুসলমান সাহিত্য-প্রতিভা দেখা যায় না। যদিও চতুর্দশ শতাব্দীর নিরানব্বই বছরের মধ্যে ঐ সব হিন্দু সাহিত্যিক মনীষার সমকক্ষ মুসলিম প্রতিভা খুব বেশী জন্মগ্রহণ করেন নি তবু আজ চতুর্দশ শতাব্দীর বিদায় মুহূর্তে এসে মনে হয় বাঙালী মুসলিম সাহিত্যিকদের ফসলের ভাঁড়ার উপেক্ষা করার মত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম মুহূর্তে স্খলিত পায়ে উঠে দাঁড়াবার সঙ্কট কাটিয়ে তারা এখন লাভ করেছে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের তারুণ্য শক্তি। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ সময়ে যাদেরকে হাতে গোণা কয়েকজন মনে হত তারা এখন সংখ্যায় অগণিত। আর তারা এখন পদ্য লেখায় অসংখ্য নন গদ্য লেখাতেও অনেক। গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, রম্যরচনায়, জীবনী ও ভ্রমণকাহিনী লেখায় তাঁরা এখন বাঙালী হিন্দু লেখকদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি নয়—হিন্দু প্রতিভার অতিক্রমকারী শক্তি। সত্যিকথা বলতে কি এই জন্যে চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলিম সাহিত্য নিয়ে আলোচনা শুধু একটি প্রবন্ধ হাস্যকর সামান্য বলে মনে হবে।

চতুর্দশ শতাব্দীর শুরু হয় অজ্ঞাতনামা কয়েকজন মুসলিম লেখকের গদ্য লেখা দিয়ে। ১৩০০ সালে নূর মোহাম্মদের 'কলির শ্বশুর', মনোয়ার আলীর আলমাছ ও গোলরায়হান। কিন্তু যথার্থ উদ্দীপনামূলক যে গ্রন্থ দিয়ে শতাব্দীর শুরু হয় তা হ'ল সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' ও কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান'। প্রথমটির প্রকাশকাল ১৩০৭ (ইং ১৯০০) এবং দ্বিতীয়টির প্রকাশকাল ১৩১১ (১৯০৪)। অর্থাৎ শুরুটা কবিতা দিয়েই হয়েছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি গোটা শতাব্দী জুড়ে বাঙালী মুসলিমরা যে সাহিত্য চর্চা করেছে তাতে গদ্যের চেয়ে কবিতায় তাদের সাফল্য বেশী। গদ্যের মধ্যে আবার প্রবন্ধ ও গবেষণাধর্মী সাহিত্য বেশী সাফল্য। তুলনামূলকভাবে কথা সাহিত্যে– গল্পে ও উপন্যাসে সাফল্য কম। সবচেয়ে সাফল্য কম নাটকে।

চতুর্দশ শতাব্দীর বিদায় প্রাক্কালে মনে হচ্ছে অনতিবিলম্বে বাঙালী মুসলিমরা গল্প ও উপন্যাস লেখায় পারদর্শিতা অর্জন করেছে এবং নাটক লেখায় সিদ্ধি অর্জনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। মননশীলতায় আরও পরিণত হলে— বিজ্ঞান ও যুক্তির প্রতি আরও অনুগত হলে আগামী দু'তিন দশকের মধ্যে হয়ত তাঁরা বিশ্বমানের গদ্য সাহিত্য–ছোট গল্প ও উপন্যাস

www.pathagar.com

রচনা করতে পারে। ইতোমধ্যে তাঁরা তেমন মানের দু'একটি কাজ করেন নি তা-আমি বলব না। নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' বা সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌র 'কাঁদো নদী কাঁদো' বা 'অমাবস্যার চাঁদ'; আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ী'; শওকত ওসমানের 'জননী', শহীদুল্লাহ্ কায়সারের 'সংশপ্তক' সম্ভবতঃ সে রকম কাজের সামান্য নমুনা।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য— যুগান্তকারী সাহিত্য- কোন দেশে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘন ঘন সৃষ্টি হয় না। জাতি জ্ঞান, শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, মননশীলতা, রাজনৈতিক সচেতনতায় পরিণত হলেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টিতে সব সময় সক্ষম হয়না। মীর মশাররফ হোসেন যখন 'বিষাদ সিন্ধু' রচনা করেন তখন বাঙালী মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর ছিল। এমনকি নজরুল ইসলামও যখন মুসলিম বাংলা সাহিত্যে সূর্যের মত আবির্ভূত হন তখন যে বাঙালী মুসলিমরা নিদ্রাভিভূত ছিল সে কথা অস্বীকার কে করবে! নজরুল ইসলাম তিরিশের দশকে লিখেছিলেন— 'দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল/ ওরে বেখবর তুইও ওঠ জেগে তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল।' তার মানে বাঙালী মুসলিম বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকেও একটা ঘুমন্ত জাতি। শুধু নজরুল ইসলাম নন— ফররুখ আহমদও ইংরেজী চল্লিশের দশকে এসে লিখছেন- 'তবে তুমি জাগো যখন সকালে ঝরেছে হাস্না হেনা/ এখনও তোমার ঘুম ভাঙলো না/ তবু তুমি জাগলে না।' এই আহবানও প্রমাণ করে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নত পরিবেশ বাঙালী মুসলমানের তখনও উত্তরণ ঘটেনি।

আপাত দৃষ্টিতে অতি সচেতন নাগরিকের চোখে জাতির সমুন্নতি না ঘটলেও ১৭৫৭-এর পরে উপমহাদেশের মুসলিমদের বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন বা খণ্ডিতভাবে হ'লেও বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে তাদের নিরন্তর সংগ্রাম প্রমাণ করে তারা সাংঘাতিকভাবে নিদ্রিত ছিল না। এবং মশাররফ হোসেনের সাহিত্য জন্ম যে পরিবেশে ঘটেছিল বা নজরুল ইসলাম বা জসীম উদ্দীন বা ফররুখ আহমদের সে পরিবেশ অচেতন পরিবেশ ছিল না।

একেবারে অন্ধকার আদিম যুগে একজন বাল্মিকী বা ব্যাস, একজন হোমার বা ভার্জিল, একজন দান্তে বা গ্যেটে, একজন ইম্‌রাউল কায়িস বা একজন ফেরদৌসী বা খৈয়াম বা সাদী বা হাফিজ, একজন শেক্‌সপীয়ার বা মিল্টন বা ষ্টেটম্যান; একজন গুগো বা টলস্টয় বা দস্তয়েভস্কি; একজন রমা রলাঁ বা হেমিংওয়ে; একজন মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন-মনে হয় না। এইসব মহামনীষীদের জন্মসময়ে বা জীবনকালে সাহিত্য রচনার মত শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, সমৃদ্ধ করার মত সাংস্কৃতিক পরিবেশ নিশ্চয়ই ছিল। সুতরাং অচেতনতা ও সচেতনতার দ্বান্দ্বিক পরিবেশই সাহিত্য সৃষ্টির জন্মদাতা ও ধাত্রী। সমষ্টির বেদনা যখন একা ব্যক্তির হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত হয় তখনই তা সৃষ্টির উৎস হ'য়ে ওঠে। এই পৃথিবীতে অগণিত মানুষ জন্মগ্রহণ করছে কিন্তু অন্তর্ভেদী বা সুদূরপ্রসারী বা অতলগামী দৃষ্টি নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে সামান্য কিছু জন। এই দ্রষ্টার অন্তরে বেদনা ঘনীভূত হ'লে তা কাব্য কবিতা বা সংগীত বা সাহিত্য হ'য়ে প্রকাশ লাভ করে। সে জন্যেই আমি বা আমরা যদি এই আশা পোষণ করি যে, বাঙালী মুসলিমরা আগামী দু'দশ দশকের মধ্যে আরও মহত্তম সাহিত্য-কীর্তি সৃষ্টি করবে হয়ত তা পূর্ণ সত্য নয়- হয়ত তা খণ্ডিত সত্য।

www.pathagar.com

তবে এ- কথা অসত্য নয় যে আমরা সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার সম্পূর্ণ উজ্জ্বলতার শীর্ষে পৌঁছাইনি ব'লে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির তুলনায়- আমাদের মধ্যে সে সাহিত্য নিষ্ফলতার ম্লানিমায় নিমজ্জিত হওয়ার অবস্থায় নেই— তার দীর্ঘশ্বাস ফেলার দিন অন্ততঃ কিছুটা অবসান হ'য়েছে।

এই শতাব্দীতে বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে যে কত নক্ষত্র দীপ্ত সাহিত্যাকাশ সৃষ্টি করেছে তার একটা হিসাব মন্দ হবে না। কাব্য রচয়িতার মধ্যে আমরা যেমন কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন, ফররুখ আহমদ, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, বন্দে আলী মিয়া, কাদের নওয়াজ, আবদুল কাদির, সুফিয়া কামাল, বে-নজীর আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, তালিম হোসেন, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ খান, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম, সানাউল হক, মযহারুল ইসলাম, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্, সিকান্দার আবু জাফর, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, ওমর আলী, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, সায়ীদ আতিকুল্লাহ, আবদুস সাত্তার, জাহানারা আরজু, শহীদ কাদরী, ফজল শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আবদুল মান্নান সৈয়দ, রফিক আজাদ, আফজাল চৌধুরী, আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, হুমায়ুন কবীর, হুমায়ুন আজাদ, মোহাম্মদ রফিক, দিলওয়ার, জিয়া হায়দার, আবিদ আজাদ, হেলাল হাফিজ, রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, শাহাদাত বুলবুল, শিহাব সরকার, মতিউর রহমান মল্লিক, মোশাররফ হোসেন খান, তমিজউদ্দীন লোদী, আসাদ বিন হাফিজ, সোলায়মান আহসান, আবদুল হাই শিকদার, সাজ্জাদ হোসাইন খান, হাসান আলীম, মোরশেদ আলী, মুকুল চৌধুরী, কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার, মসউদ-উশ-শহীদ, আশরাফ আল দীন, বুলবুল সরওয়ার,রবিউল হাসান, সেলিম মাহমুদ। (আরও বহু কবির নাম এখানে দেয়া যেত। কৌতূহলী পাঠককে মৎরচিত ও 'সংগ্রামে' প্রকাশিত আমার 'চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলা কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে কবিদের নামগুলো দেখে নেয়ার অনুরোধ করছি।)

গল্প লেখকদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, মোহাম্মদ কাসেম, আবু জাফর শামসুদ্দীন, মবিন উদ্দিন আহমদ, মতিন উদ্দিন আহমদ, আশরাফ উজ-জামান, শওকত ওসমান, শাহেদ আলী, আবু রুশদ, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্, আবু ইসহাক, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আলাউদ্দীন আল আজাদ, জহির রায়হান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, রাহাত খান, নাজমুল আলম, শহীদ আখন্দ, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শওকত আলী, জামেদ আলী, আল মাহমুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, মাহবুবুল হক, হাসনাত আবদুল হাই, বারেক আবদুল্লাহ্, রশীদ হায়দার, রিজিয়া রহমান, দিলারা হাশিম, হেলেনা খান, জুবাইদা গুলশান আরা, মকবুলা মনজুর; বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ্, জোবেদা খানম, নীলিমা ইব্রাহীম, আঞ্জুমান আরা বেগম, কমর মুশ্তারী, আতা সরকার, মাখরাজ খান, মুজতাহিদ ফারুকী, মোশাররফ হোসেন খান, বুলবুল সরওয়ার; উপন্যাস রচয়িতার মধ্যে যেমন কাজী এমদাদুল হক, নজিবর

www.pathagar.com

রহমান, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, একরাম উদ্দীন, তরিকুল আলম, লুৎফর রহমান, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, নুরুন্নেসা খাতুন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবীর, আবু জাফর শামসুদ্দীন, আশরাফ উজ-জামান, শওকত ওসমান, আবু রুশদ, কাজী আফসার উদ্দীন আহ্মদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সরদার জয়েন উদ্দীন, শহীদুল্লাহ কায়সার, রশীদ করীম, আবু ইসহাক, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আলাউদ্দীন আল আজাদ, ফজল শাহাবুদ্দীন, জহির রায়হান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, জামেদ আলী, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ, রিজিয়া রহমান, আবদুল মান্নান সৈয়দ, রিজিয়া খান, রাজিয়া মজিদ, লায়লা সামাদ, ইমদাদুল হক মিলন, রোমেন আফাজ, আতা সরকার, রাবেয়া খাতুন, আহমদ ছফা, সেলিনা হোসেন, হুমায়ুন আহমেদ, নাটকে যেমন শাহাদাৎ হোসেন, ইব্রাহীম খা, আকবর উদ্দীন, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দীন, নূরুল মোমেন, আস্কার ইবনে শাইখ, মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্, আলাউদ্দীন আল আজাদ, সিকান্দার আবু জাফর, আবদুল হক, আলিম চৌধুরী, নীলিমা ইব্রাহীম, আ ন ম বজলুর রশীদ, ইব্রাহিম খলিল, সাঈদ আহমদ, সৈয়দ শামসুল হক, আলী যাকের, মমতাজউদ্দীন, ফরহাদ মজহার, সেলিম আল দীন; তেমনি প্রবন্ধ সাহিত্যে স্মরণীয় কাজ করেছেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আকরম খাঁ, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, তরীকুল আলম, শাহাদাৎ হোসেন, আকবর উদ্দীন, ইব্রাহীম খাঁ, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এয়াকুল আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ গোলাম হোসেন, লুৎফর রহমান, এস. ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহ্মদ, কাজী নজরুল ইসলাম, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, মুজাফফর আহমদ, কাজী দীন মোহাম্মদ, মাহবুবুল আলম, আবুল ফজল, গোলাম মোস্তফা, আবদুল কাদির, আবদুল মওদূদ, কাজী আবদুল ওদুদ, হুমায়ুন কবীর, কাজী মোতাহার হোসেন, একরামুদ্দীন, শেখ হাবিবুর রহমান, সৈয়দ আবুল হোসেন, মুহম্মদ এনামুল হক, আকবর আলী, মোতাহার হোসেন চৌধুরী, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, শামসুন্নাহার বেগম, মুহম্মদ আবদুল হাই, কবীর চৌধুরী, সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল গফুর, শাহেদ আলী, আসকার ইবনে শাইখ, সৈয়দ আলী আশরাফ, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, মুনীর চৌধুরী, আহ্মদ শরীফ, আলাউদ্দীন আল আজাদ, আনিসুজ্জামান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সুনীল মুখোপাধ্যায়, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, বদরউদ্দীন ওমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, গোলাম সাকলায়েন, আবু তালিব, আবদুল মান্নান তালিব, মুহম্মদ মতিউর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আবদুস্ সাত্তার, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবদুল্লাহ্ আবু সাঈদ, আহমদ ছফা, বুলবুল সরওয়ার, সালাউদ্দীন নিযামী, গাজী আজিজুর রহমান, শেখ দরবার আলম, গাজী শামছুর রহমান, আবদুস সুলতান, মীজানুর রহমান, হুমায়ুন আজাদ, মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, আলী আনোয়ার, গোলাম মোরশেদ, মনিরুজ্জামান, আফজাল চৌধুরী, হাসান আবদুল কাইয়ূম, তমিজউদ্দীন লোদী, খোরশেদুল আলম, হোসেন মাহমুদ, মুকুল চৌধুরী, আবদুল হাই শিকদার, মোশাররফ হোসেন খান, মজিদ মাহমুদ প্রমুখ।

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য এ শতাব্দীতে বাঙালী মুসলিম সাহিত্যিকেরা যে দু'টি বিষয়ে গৌরবজনক ভূমিকা রেখেছে তা হ'ল কাব্য ও প্রবন্ধ সাহিত্য। শতাব্দীর প্রারম্ভে আমরা যে সব গদ্য লেখকের সাক্ষাৎ পাই যেমন আকরম খাঁ, এয়াকুল আলী চৌধুরী, লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ তাঁদের প্রবন্ধ-গদ্য অতি উঁচুমানের। কাব্যভাষায় মুসলিম লেখকদের মধ্যে নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্‌দীন ও ফররুখ আহমদ যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন সেই ধরনের উঁচু সাহিত্যমানের গদ্যভাষা সৃষ্টি করেছিলেন আকরম খাঁ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, এয়াকুল আলী চৌধুরী, মোজাম্মেল হক ও বরকতুল্লাহ্। তাঁদের সৃষ্ট গদ্য- যে কোন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-গদ্যের সঙ্গে তুলনীয়।

এঁদের পরে কাজী নজরুল ইসলাম, এস. ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, গোলাম মোস্তফা, শাহাদাৎ হোসেন, আবুল মনসুর আহ্‌মদ, জসীমউদ্দীন, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, শাহেদ আলী, মুনীর চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আলাউদ্দীন আল আজাদ, আহমদ রফিক, আবদুল গাফফার চৌধুরী, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ অনুকরণযোগ্য গদ্য লিখে প্রমাণ করেছেন বাংলা গদ্য সাহিত্যে একাকী হিন্দু সাহিত্যিকদের অবদান নেই— মুসলিম সাহিত্যিকদেরও প্রাতঃস্মরণীয় অবদান আছে। ১৮৭৩ (১২৮০) এতে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র মীর মশাররফ হোসেনের গদ্য সম্পর্কে লিখেছেন- 'তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারেন না'। উপরে লিখিত মুসলিম লেখকদের শুধু নয় চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরবর্তী অধিকাংশ খ্যাতিমান গদ্য লেখকদের ভাষা সম্বন্ধে সে উক্তি করা যায়, এবং সে সঙ্গে আর একটি বাক্য সংযোজন করা যায় যে শুধু বিশুদ্ধ গদ্য নয়— সুন্দর পদ্য অনেক হিন্দুতে লিখতে পারে না।

আমি উপরে যে তালিকা দিয়েছি তা শুধু লেখকের নামের, তাঁদের কাজের বা কৃতকর্মের তালিকা দিই নি। তাঁদের সব কাজের তালিকা দিলে হাজার পৃষ্ঠার বইতেও তা ধরানো সম্ভব হবে না। গদ্য-পদ্য মিলিয়ে তার সংখ্যা অগণিত। আমি শুধু তাৎক্ষণিকভাবে স্মৃতিতে যে সব বই এর নাম আসে তার একটা তালিকা এখানে উদ্ধৃত করলাম ঃ

কায়কোবাদ- এর 'মহাশ্মশান' ১৩১১ (১৯০৪); শেখ আবদুর রহিম-এর 'হজরত মোহাম্মদ' ১৩০৪ (১৮৮৭); মোজাম্মেল হক-এর 'ফিরদৌসী চরিত' ১৩০৫ (১৮৯৮); 'শাহনামা' ১৩৯৬ (১৯০৯); সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' ১৩০৭ (১৯০০); 'রায়নন্দিনী' ১৩২৫ (১৯১৮); এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'শান্তিধারা', 'মানবমুকুট' ও 'নূরনবী'; মোহাম্মদ লুৎফর রহমান-এর 'মহৎ জীবন', 'মানব জীবন ও উন্নত জীবন'; এস. ওয়াজেদ আলীর 'বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ', 'মাশুকের দরবার', 'জীবনের শিল্প', নজীবর রহমানের 'আনোয়ারা' ১৩১৯ (১৯১২); কাজী ইমদাদুল হক-এর 'আবদুল্লাহ'; বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন-এর 'অবরোধবাসিনী' ১৩৩৫ (১৯২৮); আকরম খাঁ-এর 'মোস্তফা রচিত', মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র 'পারস্য প্রতিভা', শাহাদাৎ হোসেন-এর 'রূপচন্দা, গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী', ১৩৪৯ (১৯৪২); নজরুল

www.pathagar.com

ইসলামের 'অগ্নিবীণা' ১৩২৯ (১৯২২); 'সাম্যবাদী', ১৩৩২ (১৯২৫); 'সিন্ধু-হিন্দোল' ১৩৩৪ (১৯২৭); 'জিঞ্জির' ১৩৩৫ (১৯২৮); 'বুলবুল' ১৩২৫ (১৯২৮), 'চক্রবাক' ১৩৩৬ (১৯২৯), 'চোখের চাতক' ১৩৩৬ (১৯২৯), 'জুলফিকার' ১৩৩৯ (১৯৩২), 'মৃত্যুক্ষুধা; জসীম উদ্‌দীনের 'নকসীকাঁথার মাঠ' ১৩৩৬ (১৯২৯); 'বালুচর' ১৩৩৭ (১৯৩০), 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ১৩৪০ (১৯৩৩); বে-নজীর আহমদের 'বন্দীর বাঁশী', সুফিয়া কামালের 'সাঁঝের মায়া', আবুল মনসুর আহমদের 'আয়না', ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' ১৩৫১ (১৯৪৪), 'হাতেম তায়ী' ১৩৭৩ (১৯৬৬); আহসান হাবীবের 'রাত্রিশেষ' ১৩৫৩ (১৯৪৬), সৈয়দ আলী আহসানের 'অনেক আকাংখা' ১৩৬৪ (১৯৫৭), আবুল হোসেনের 'নব বসন্ত' ১৩৪৭ (১৯৪০), শামসুর রাহমানের 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' ১৩৬৬ (১৯৫৯), 'রৌদ্র করোটিতে' ১৩৭০ (১৯৬৩); আল মাহমুদের 'কালের কলস' ১৩৭৩ (১৯৬৬), 'সোনালী কাবিন' ১৩৮০ (১৯৭৩), শহীদ কাদরীর'উত্তরাধিকার' ১৩৭৬ (১৯৬৯); আবদুল মান্নান সৈয়দের 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' ১৩৭৪ (১৯৬৭); 'জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা' ১৩৭৬ (১৯৬৯), 'সকল প্রশংসা তার' ১৩৯৯ (১৯৯৩); আবুল হাসানের 'পৃথক পালঙ্ক' ১৩৮২ (১৯৭৫), রফিক আজাদের 'সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজে' ১৩৮১ (১৯৭৪); আবিদ আজাদ -এর 'ঘাসের ঘটনা' ১৩৮৩ (১৯৭৬), 'আমার স্বপ্নের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি' ১৩৯৪ (১৯৮৭)। এছাড়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লাল সালু' ১৩৫৫ (১৯৪৮), 'কাঁদো নদী কাঁদো' ১৩৭৫ (১৯৬৮), 'চাঁদের অমাবস্যা' ১৩৭১ (১৯৬৪), শওকত ওসমানের 'জননী' ১৩৭৫ (১৯৬৮), শাহেদ আলীর 'জিব্রাইলের ডানা'; আবু রুশ্‌দের 'সামনে নতুন দিন', শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সংশপ্তক', রশীদ করীমের 'উত্তম পুরুষ' ১৩৬৮ (১৯৬১) প্রভৃতি।

[উপরের তালিকায় অনেক প্রসিদ্ধ লেখকের নাম এবং তাদের অনেক ভালো গ্রন্থের নাম বাদ পড়েছে। সে জন্যে দুঃখিত। হাতে সময় থাকলে এবং এই প্রসঙ্গে আরও বিস্তৃত হওয়ার অবকাশ থাকলে নিশ্চয় আরও বহু নাম এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারত।)

উপরে যে তালিকা দেওয়া হ'ল তা চতুর্দশ শতাব্দীর বাঙালী মুসলিম সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কীর্তির আংশিক প্রতিচ্ছবি মাত্র। তবু এটুকুতেই বোঝা যাবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাঙালী মুসলমানের ঊষর সাংস্কৃতিক জীবনের পাশে তার সাধনার এই ফসল কত অসামান্য। এই ফসল উৎপাদনের আবার তিনটি পর্ব আছে। একটি বৃটিশ শাসিত সময়কালের ১৩০০ (১৮৮৭) থেকে ১৩৫৪ (১৯৪৭)-এর মধ্যকার সময়কালের, ১৩৫৪ (১৯৪৭) থেকে ১৩৭৮ (১৯৭১)-এর পাকিস্তান সময়কালের এবং স্বাধীন বাংলাদেশ অর্থাৎ ১৩৭৮ (১৯৭১) থেকে এই ১৪০০ (১৯৯৩) পূর্তি সময়কালের।

এই দীর্ঘ সময়ে বাঙালী মুসলিমরা যে সাহিত্য রচনা করেছে তার প্রেক্ষাপটে ও পটভূমিতে আছে শিক্ষা, জ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে উত্তীর্ণ হওয়ার অবিরাম সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার ইতিহাস। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বাংলা সাহিত্য হিন্দু ও মুসলমানের সাহিত্য হলেও এই দুই জাতি-সম্প্রদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস ভিন্ন।

www.pathagar.com

ইংরেজী উনবিংশ শতাব্দী এবং বাংলা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিন্দু মনীষার যে জাগরণ ঘটে সে জাগরণে সম্মিলিত জাতি হিসাবে মুসলিম মানসের জাগরণ ঘটেনি। সাংস্কৃতিক জাগৃতির পঞ্চাশ বছরের অগ্রগতির যে ইতিহাস সেটি হিন্দুর, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক জাগ্রতীয় পঞ্চাশ বছরের পশ্চাদপদতার যে ইতিহাস সে মুসলমানের। হিন্দু মনীষার সংগ্রাম ছিল শুধু বিদেশী ইংরেজের বিরুদ্ধে। হয়ত বা তার স্ব-জাতির ধর্মান্ধতা, সামাজিক পশ্চাৎপদতা বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও; কিন্তু মুসলিম জাতিকে একই সঙ্গে স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জনের জন্যে লড়তে হয়েছে বৃটিশ-হিন্দুর সম্মিলিত কূটনীতি, শাসন, প্রতিপত্তি, সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। বাঙালী মুসলমানের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বাঙালী হিন্দুদের বা উপমহাদেশের হিন্দুদের সমপর্যায়ের ছিলনা; তাই তাদের সাহিত্যের চরিত্র, জাত ও স্বরূপও এক পর্যায়ের নয়। একজন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ তাই যখন শুধু হিন্দু ভারতীয় বা হিন্দু বাঙালীর কথা চিন্তা করেছেন তখন একজন নজরুল ইসলামের তার নিজ জাতি ও সম্প্রদায়ের কথা ভাবতে হয়েছে। তবু এ ক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের কৃতিত্ব এইটুকু যে বাঙালী জাতির অর্ধেক অংশকে নিয়ে তিনি ভাবেন নি, গোটা বাঙালী জাতিকে নিয়ে তিনি ভেবেছেন এবং যে মানসিক সংকীর্ণতাকে তাঁর ভাষার পূর্বসূরী হিন্দু সাহিত্যিকরা অতিক্রম করতে পারেননি তিনি তা অতিক্রম করেছেন এবং তাঁর মুসলিম জাতির সাহিত্যিককে সেই উদারতার সাহিত্যিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে পেরেছেন। বাঙালী মুসলিম সাহিত্যিকেরা যে মুসলিম রেনেসাঁসের আন্দোলন করেছেন তার ঐতিহাসিক কারণ উপেক্ষা করার মত নয়; কিন্তু ভুললে চলবে না এই বাঙালী মুসলিমদের আর একটি অংশ নজরুলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশুদ্ধ রেনেসাঁসের আন্দোলন করেছেন। আন্দোলনের দুই ধারার এক দিকে ছিলেন যেমন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহ্মদ; মুজীবর রহমান খাঁ, বে-নজীর আহ্মদ, হাবিবুল্লাহ্ বাহার প্রমুখ; তেমনি অন্যদিকে ছিলেন আবুল হোসেন, আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবদুল কাদির, মোতাহার হোসেন চৌধুরী প্রমুখ। চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলিম সাহিত্যের পটভূমিতে তাই যেমন আছে মুসলিম লীগ সৃষ্টি, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, প্রথম মহাযুদ্ধ, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা ও পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস, যেমন আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের ইতিহাস, যেমন আছে উপমহাদেশ বিভক্তি, পাকিস্তান প্রাপ্তি, বাংলা ভাষা আন্দোলন, ছ'দফা আন্দোলন, স্বাধিকার ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম, ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষ, বাকশালের বিপক্ষে বিক্ষোভ এবং তার করুণ পরিণতি, ১৯৭৫-এর নভেম্বরের সিপাহী বিপ্লব, তেমনি আছে চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় দশকের মুসলিম বুদ্ধিজীবীর মুসলিম রেনেসাঁস ও ইউরোপ-আগত রেনেসাঁস আন্দোলন, আছে একই সঙ্গে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ইসলামী গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আন্দোলন। প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শের যে সংঘাত বৃটিশ রাজত্বকালে বাঙালী মুসলমানের সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ও রাজনৈতিক জীবনে ছিল— বিভাগোত্তর কালের পাকিস্তানে তার অবসান হয়নি— বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পরও যা বিলুপ্ত হতে পারেনি— সুস্পষ্ট গম্ভীর দু'টি রেখার মত যা

www.pathagar.com

পাশাপাশি অবস্থান করছে— বাংলাদেশের চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলিম সাহিত্যের সেটাই চারিত্র্য স্বরূপ।

এখানে বলে রাখা ভাল যে সাহিত্য যেমন ব্যক্তিগত উপলব্ধির তেমনি জাতিগত উপলব্ধির, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত উপলব্ধির; সাহিত্য যেমন ব্যক্তিগত উপলব্ধির তেমন ব্যক্তিগত প্রেমের বিরহের উপলব্ধির তেমনি ব্যষ্টিগত প্রেমের বেদনার উপলব্ধি। সাহিত্যে তাই ব্যক্তিগত চেতনার সঙ্গে সমষ্টিগত চেতনার ছাপ পড়ে। বাঙালী মুসলিম সাহিত্যিকদের চেতনায় যে অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ছাপ পড়েছে সেজন্যে এ-সাহিত্য কখনো জাতীয় সাহিত্য, কখনো সাম্প্রদায়িক সাহিত্য এবং কখনো আন্তর্জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু যে প্রধান বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে তাহ'ল সংস্কৃতির স্বাধীনতা বলে মনে হ'লেও বিভাগোত্তর কালে বাঙালী মুসলিমরা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সৃষ্টির যে অধিকার ও পরিবেশ পেয়ে যে ব্যাপক, বিশাল ও বিচিত্র সংস্কৃতি ও সাহিত্য-কীর্তি নির্মাণ করেছে তা উজ্জ্বলতম না হলেও উজ্জ্বল।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-চর্চায় মুসলমান

ডক্টর মোমেন চৌধুরী

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্ম : ১ নভেম্বর, ১৯৩৬, গোদাঘাটা মল্লিকপাড়া, আগরদাড়ি, সাতক্ষীরা। শিক্ষা : স্নাতকোত্তর (বাংলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পি এইচ ডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৭। পেশা : উপপরিচালক, বাংলা একাডেমী। বর্তমান অবসরপ্রাপ্ত।

প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলাদেশের লৌকিক আচার অনুষ্ঠান; জন্ম ও বিবাহ (১৯৮৮), লোক সংস্কার ও বিবিধ প্রসঙ্গ (১৯৯৭)। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, লালন বিষয়ক রচনাপঞ্জি প্রভৃতি।

লেখা-পরিচিতি ঃ অগ্রপথিক, ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা এখন বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষা। রাষ্ট্রীয় এবং জীবনের সর্বস্তরে এখন তার অবাধ ব্যবহার আমাদের গৌরবান্বিত করে। মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন,

রাজভাষা ও মাতৃভাষা অভিন্ন হইলে দেশের ও জাতির উন্নতির পথ যেরূপ সুগম হয়, বিভিন্নাবস্থায় সেরূপ হইতে পারে না।[১]

তিনি যখন এই উক্তি করেছিলেন তখন বৃটিশ রাজত্ব চলছে। তাঁর এই উক্তির ভেতর দিয়ে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাঁর সমকালে তিনি মাতৃভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং মাতৃভাষা-চর্চার অভাব যে মুসলমানদের দুর্দশার প্রধান কারণ, একথাও তিনি স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন।[২]

মধ্যযুগে, বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে এখনকার মতো মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহার অবাধ ছিল না। প্রথম দুই আমলে বাংলা ভাষা এককভাবে রাষ্ট্রভাষা ছিলই না; এবং এর ব্যবহার নিয়ে বাঙালী মুসলমানদের ভেতর দ্বিধা ছিল। তবুও দেখা যায়, শিক্ষিত ও সাহিত্যানুরাগী মুসলমানদের ভেতর বাংলা ভাষায় সাহিত্য-চর্চা একেবারে থেমে থাকেনি। পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে বাঙালী তরুণদের বুকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করতে হয়েছিল। এছাড়াও বাংলা ভাষায় উপর নানা ধরনের অনাবশ্যক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তার মৌলিক রূপ ও চরিত্র বদলিয়ে ফেলার অপচেষ্টা সে সময় কম হয়নি। কিন্তু সে সময় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবু জাফর শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রমুখ পণ্ডিত ও সাহিত্যিকের প্রবল যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মুখে এবং ভাষা আন্দোলনের উত্তাল স্রোতে তা ভেসে যায়। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধিকার আন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বের মানচিত্রে।

আমরা এবার একটু পেছনের দিন দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। প্রথমেই মধ্যযুগ। মাতৃভাষা বাংলা, আমরা জানি, সাহিত্য-চর্চার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত

www.pathagar.com

করেছিলেন মুসলমান সুলতান ও রাজন্যবর্গ। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও একদিকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের রক্তচক্ষু এবং অপরদিকে মুসলমান সমাজের বিরোধিতা উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্যিক-কবিদের সাহিত্য-চর্চার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। মধ্যযুগের সাহিত্য মূলত ধর্ম-সাহিত্য। 'দেবভাষা' সংস্কৃত থেকে 'অনার্য ভাষা' বাংলায় শাস্ত্রের রূপান্তর যেমন সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের নিকট থেকে ছাড়পত্র পায়নি, তেমনি আরবী-ফারসী থেকে বাংলায় কুরআন-কেতাবের কথা ভাষান্তরের ব্যাপারেও মুসলমান সমাজের একটি বড় অংশ তেমন উদ্যোগী ছিল না। কিন্তু সেকালেও বাঙালী মুসলমানদের অধিকাংশ ছিল বাংলা-ভাষী। সূফীদের কাছে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হলেও সাধারণ মুসলমানরা শরা-শরিয়ত সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞ। এঁদের কাছে ইসলাম ধর্মের এই মূল বিষয়গুলো পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ তারা নিয়েছিলেন।

গবেষকের ভাষায়

শাস্ত্রকথা বাংলায় লেখা বৈধ কিনা সে বিষয়ে সতের শতক অবধি মুসলিম লেখকেরা নিঃসংশয় ছিলেন না, শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, হাজী মুহাম্মদ, আবদুল নবী, আবদুল হাকিম প্রমুখ কবির উক্তিতে আমরা দ্বিধার আভাস পেয়েছি। অতএব, তবু যাঁরা এ সময় বাঙলায় শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁরা দ্বিধা ও পাপের ঝুঁকি নিয়েই করেছেন, এতে তাঁদের স্বধর্মপ্রীতি, লোক-হিতৈষণা, মনোবল ও যুক্তিপ্রিয় মনের পরিচয় মেলে।[৩]

শেখ মুত্তালিব 'কেফায়াতুল মুসল্লিন' এবং 'কায়দানী কিতাব'-এর লেখক। তিনিও সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। তিনি এ সব গ্রন্থ বাংলায় লিখতে গিয়ে যে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন, তার কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হলো। তিনি লিখেছেন,

আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ
তে কারণে দেশীভাষে রচিলুঁ প্রবন্ধ।
মুসলমানি শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলুঁ
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলুঁ।
কিন্তু মাত্র ভরসা আছএ মনান্তরে
বুঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে।
মুমীনের আশির্বাদে পুণ্য হইবেক
অবশ্য গফুর আল্লা পাক ক্ষেমিবেক
এসব জানিয়া যদি করএ রক্ষণ
তেবে সে মোমোর পাপ হইব মোচন।

মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম তৎকালীন সমাজের মাতৃভাষার প্রতি উপেক্ষার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি নিজেও ইসলাম বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন বাংলায়। তাঁর গ্রন্থাবলীর নাম ঃ সভারমুখতা, নসিয়তনামা বা সাবাবনামা তথা শাহাবউদ্দীননামা এবং দোর্‌রে মজলিস। শেখ মুত্তালিবের পিতা শেখ পরাণ 'কায়দানী কিতাব' ও 'নূরনামা'

www.pathagar.com

গ্রন্থের রচয়িতা। এ সময় লিখিত আশরাফের "কিফায়াতুল মুসলেমিন" এবং মুজাম্মিলের 'নীতিশাস্ত্রবার্তা' এবং আলাউলের তোহফা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এছাড়া মুসলিম আমলে রোমান্টিক কাব্যও বঙ্গানুবাদের দ্বারা মধ্যযুগে ধর্ম-সাহিত্যের পাশাপাশি নতুন স্বাদ এনে দেয়। কোরেশী মাগন, আলাউল, শা'বারিদ খান প্রমুখ কবিরা সে যুগে বাংলা সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন বলেই আমরা সে যুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত পেয়েছি। এক্ষেত্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা স্মরণ করি পুঁথি-সংগ্রাহক ও গবেষক আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদকে। মধ্যযুগে মুসলিমদের বাংলা সাহিত্য চর্চার নজির তুলে ধরার কৃতিত্ব তাঁরই। পরবর্তীকালে অধ্যাপক আলী আহমদও পুঁথি সংগ্রহে অবদান রেখেছেন।

বৃটিশ আমলে মধ্যযুগের এই আলোকিত দিকটি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা কেবল থেকে গেল দৈনন্দিন কার্যাবলীতে, সাহিত্যের দিকটি হলো উপেক্ষিত। কেবল তাই নয় ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষা থেকেও তারা দূরে সরে গেল। অভিজাত নাগরিক মুসলমানদের উর্দুকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে দেখি। কিন্তু গ্রামবাংলার অসংখ্য মুসলমানের মাতৃভাষা তখনও বাংলা কিন্তু এই অন্ধকার বেশি দিন থাকেনি। বাঙালী মুসলমানদের এই হৃত-দশা থেকে তুলে আনার জন্যে প্রশস্ত হৃদয় শিক্ষিত মুসলমানরাই ত্রাণকর্তা হয়ে আসেন।

মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে এঁরা কেবল ভেবেছেন তাই নয়, মাতৃভাষা বাংলায় তারা সাহিত্য-চর্চার উপর জোর দিয়েছেন। যে গুরুত্ব দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে মাতৃভাষাকে ব্যবহার করেছিলেন মধ্যযুগের মুসলিম কবিরা, তারই পুনরাবৃত্তি করতে হলো উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের শিক্ষিত মুসলমানদের। মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীকে মাতৃভাষার গুরুত্ব বুঝাতে হয় ওই সব উন্নাসিক শিক্ষিত মুসলিমদের, যাঁরা মাতৃভাষা চর্চাকে কেবল উপেক্ষা করেননি, এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ বোধ করেননি। ইসলামাবাদী সাহেব মাতৃভাষা কি এবং তার গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

মাতৃক্রোড়ে থাকিতেই শিশু আধআধ স্বরে স্বভাবের প্রেরণায় মুখে যে-কথা ব্যক্ত করে, তাহাই মাতৃভাষা। এই হিসাবে বাংলা বাঙ্গালার পৌনে-ষোল-আনা লোকের মাতৃভাষা। ইহাতে হিন্দু-মোছলমানের কোন পার্থক্য নাই। ঢাকা, কলিকাতা, মোর্শেদাবাদ ও চট্টগ্রাম টাউনের মোছলমানের ভাষা মাতৃভাষা কিংবা বিকৃত উর্দ্দূ ও বাংলায় মিশ্রিত হইয়া গেলেও তাঁহারা উভয় ভাষাতেই মনোভাব প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত বরং তাঁহাদের সংসার-জীবনের প্রত্যেক স্তরেই তাঁহারা উর্দ্দূ অপেক্ষা বাংলার অধিকতর মুখাপেক্ষী। খাতা-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ ও পত্র-ব্যবহার সমস্তই তাঁহাদিগকে বাংলাতেই করিতে হয়। সুতরাং বাংলা যে তাঁহাদেরও মাতৃভাষা, ইহাতে দ্বিমত হইতে পারে না।[৪]

সাহিত্যের বাহন সম্পর্কে জ্ঞান-তাপস প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র উক্তি এখানে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তিনি বলেছেন,

বাহন উপযুক্ত না হলে কেউ তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে না। লক্ষ্য লাভ করতে গেলে সাহিত্যের বাহন উপযুক্ত হওয়া চাই। সেই বাহন মাতৃভাষা।[৫]

www.pathagar.com

আর একজন মনীষীর নাম আমরা স্মরণ করতে চাই। তিনি খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ। বৃটিশ ভারতের প্রথম ভারতীয় এবং মুসলমান এ.ডি.পি.আই. কেবল শিক্ষাবিদ ছিলেন না, ছিলেন সমাজসেবী এবং সূফী সাধক। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনকালে মুসলিমদের দুর্দশা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। তিনি মুসলিমদের শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যম ছাড়া স্বজাতির উন্নতি সম্ভব নয়। তিনি লিখেছেন ঃ

মাতৃভূমি হিন্দুর নিকট যেরূপ আদরণীয়, মুসলমানের নিকটেও তদ্রূপ। বঙ্গভাষা একের পক্ষে যেমন নিজস্ব, অপরের পক্ষেও সেইরূপ। তাই বলি, যদি বঙ্গদেশের উন্নতি চাও, যদি বঙ্গভাষার প্রাধান্য দেখিতে চাও, যদি মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চাও, তবে ভাষা-ব্যবচ্ছেদ হইতে বিরত হও।[৬]

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন খান বাহাদুর সাহেবের এই ভাষণের তিন বৎসর আগে প্রায় অভিন্ন উক্তি করেছিলেন। তাঁর ভাষায় ঃ

বর্তমান সময়ে এই ভাষায় (বাংলা-লেখক) নানারূপ বিপ্লব সৃষ্টি হইতেছে। এই বঙ্গে অর্ধাধিক মুসলমান। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, বঙ্গভাষার উপর মুসলমানের ন্যায্য অধিকার বিদ্যমান। কিন্তু এ যাবত বঙ্গীয় মুসলমান নানা কারণে বঙ্গভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কম লোকই ইহার সেবা করিয়াছেন।- কিন্তু এখন বঙ্গীয় মুসলমানগণ বঙ্গভাষাকে ভাল মতেই চিনিয়াছেন, এই সাহিত্যের প্রতি অনাসক্তি প্রদর্শন যে জাতীয় উন্নতির পক্ষে প্রধান অন্তরায়, তাহা তাঁহারা খুব ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন।[৭]

অতঃপর তিনি মাতৃভাষা বাংলা সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বেশ জোরালোভাবে, 'তবে এইমাত্র বলিতে পারি, বাঙ্গালী মুসলমান- যাঁহারা দৈনন্দিন কথাবার্তায় বাঙ্গালা ব্যবহার করেন, যাঁহারা অস্থিমজ্জায় পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা অনুপ্রবিষ্ট, তাঁহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।[৮]

সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং সাহিত্য-চিন্তক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ছিলেন মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক এক প্রবন্ধে মাতৃভাষা বাংলা সম্পর্কে এক অবিস্মরণীয় বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর বক্তব্যটি নিম্নরূপঃ

বাংলা দেশবাসী মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা-সে বিষয়ে কাহারো মতবিরোধ নাই। আমরা বাঙলায় কথাবার্তা কহি, বাঙলায় স্বপ্ন দেখি, বাঙলায় চিন্তা করি, আমাদের প্রাণ বাঙালীর প্রাণ, হাসিকান্না বাঙালীর হাসিকান্না, এমন কি আমাদের রক্তমাংস বাঙালীর রক্তমাংস। অতএব, অপ্রতিরোধীয় রূপে আমাদের মাতৃভাষা— দেশের মাটিতে আমাদের বাস, যে দেশের বায়ু আমাদের শ্বাস, যে দেশের ফল-জলে আমরা পালিত, যে দেশের নদ-নদীর স্নেহধারায় আমরা পরিপুষ্ট, সেই দেশের ভাষা-বাঙলা। এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না যে, বাঙলা ভাষা হিন্দুর নিজস্ব ভাষা, উহা কখনো মুসলমানের ভাষা হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে কোন ভাষা কোনকালে বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের নিজস্ব খাস সম্পত্তি হয় নাই এবং বোধ হয় কোনকালেও হইবে না।[৯]

www.pathagar.com

মাতৃভাষা বাংলা বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েও সে স্বমহিমায় দেদীপ্যমান। মধ্যযুগে, বৃটিশ আমলে এমন কি পাকিস্তান আমলেও এর অপ্রতিরোধ্য গতিকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। ১৯৫২,সালে যারা বুকের রক্ত দিয়েছিলেন, তাঁদের স্বপ্ন এখন সার্থকতায় পূর্ণ। বাংলা সাহিত্য চর্চায় এখন সকল শ্রেণীর মানুষ নিবেদিতপ্রাণ। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা ইত্যাদি এখন মাতৃভাষায় হচ্ছে। অফিস-আদালতেও এর ব্যবহার এখন স্বতঃস্ফূর্ত। ধর্মীয় বিষয়াদি বাংলায় লিখিত হওয়ায় অধিক সংখ্যক মুসলমান এর অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছে।

বাংলা ভাষা বিশ্বের অষ্টমতম ভাষা। স্বাধীনতার পর থেকে মাতৃভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে এখন গবেষণা হচ্ছে। 'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি কেন্দ্র' হয়ে উঠেছে রাজধানী ঢাকা।

তথ্যসূত্র

১। মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খণ্ড ঃ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত। বা/এ, ঢাকা। জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/মে ১৯৯৩। পৃষ্ঠা ৩২৭

২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২৯

৩। শেখ মুত্তালিব বিরচিত কিফায়তুল মুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব ঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত। বা/এ ঢাকা। ভাদ্র ১৩৮৫/আগস্ট ১৯৭৮। পৃষ্ঠা (ফ)

৪। মৌলানা ইসলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৬-৩২৭

৫। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী, ১ম খণ্ড ঃ আনিসুজ্জামান। বা/এ, ঢাকা ফাল্গুন ১৪০০/ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪/ পৃষ্ঠা ১৯৮

৬। খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ্ ঃ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। বা/এ, ঢাকা। মাঘ ১৩৯৫/ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ পৃষ্ঠা ৮০

৭। আবুল কালাম শামসুদ্দীন ঃ আমাদের সাহিত্য। আল এসলাম, মাঘ ১৩২২

৮। আবুল কালাম শামসুদ্দীন রচনাবলী, ১ম খণ্ড ঃ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ সম্পাদিত। বা/এ, ঢাকা। আষাঢ় ১৪০১/ জুন ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৮১

৯। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী, ১ম খণ্ড ঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ। বা/এ, ঢাকা, কার্তিক ১৩৯৭/নভেম্বর ১৯৯০/ পৃষ্ঠা ২৮২

www.pathagar.com

বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানের দান

ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহ্‌মান

লেখক-পরিচিত : জন্ম : ১২ অক্টোবর ১৯৪১, কাটরা, মাগুরা। শিক্ষা : স্নাকোত্তর, ১৯৭৮। পি. এইচ. ডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৯। পেশা : অধ্যাপনা। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ : অগ্নি বাংলা (১৯৭২)। গবেষণা; লালন জিজ্ঞাসা (১৯৮৪), লালন শাহ্‌ জীবন ও গান (১৯৮৪), বৌদ্ধ চর্যাপদ (১৯৮৮), জাতি, জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ (১৯৯০), আমরা বাঙালী না বাংলাদেশী (১৯৯১), বাউলতত্ত্ব ও বাউল গান (১৯৮৯), দুদ্দ শাহ্‌ (১৯৯০), বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক (১৯৯৭)। সম্পাদনা : লালন গীতিকা (১৯৯৫), বাংলাদেশী জারী গান (১৯৮৬)। অনুবাদ : মেঘ ও রৌদ্র (১৯৮৯)।

লেখা-পরিচিতি : 'নতুন কলম' এপ্রিল ১৯৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত।

বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলমানদের দান সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা ব'লেছেন। প্রায় এক হাজার বছরের সাহিত্য-ধারায় একটি জাতির দানকে অল্প কয়েক পাতার আলোচনায় তুলে ধরা কঠিন। তাই খুব কম কথায় এ-বিষয়ে আলোচনা ক'রতে বলা দরকার; যাঁরা আলোচ্য বিষয়ে আলোকপাত ক'রেছেন, তাঁরা সাহিত্য-রচনায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান কবি-সাহিত্যিক ও নবাব-বাদশাহ্‌, আমীর-ওম্‌রাহ্‌ আর উজীর-নাজির-সিপাহ্‌সালারদের যে-রকম ভূমিকার উল্লেখ ক'রেছেন; বাঙ্‌লা ভাষা সৃষ্টির মূলে তাঁদের তেমন কোন ভূমিকা ছিল কিনা, সে-কথা একেবারে এড়িয়ে গিয়েছেন। বাঙ্‌লাদেশ আর বাঙ্‌লা ভাষার ইতিহাস এক সুতোয় গাঁথা এবং বাঙ্‌লা ভাষার বিকাশের ওপর-ই বাঙ্‌লা সাহিত্যেরও বিকাশের শর্ত জড়িত। 'বাঙালীর ইতিহাস'-এর লেখক নীহাররঞ্জন রায় ব'লেছেন, "সমগ্র বাঙ্‌লা দেশের 'বঙ্গ' নাম লইয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়া হিন্দু আমলে ঘটে নাই, তাহা ঘটিল পাঠান আমলে এবং পূর্ণ পরিণতি পাইল আকবরের আমলে, যখন সমস্ত বাঙ্‌লাদেশ 'সুবা বাঙ্গলা' নামে পরিচিত হইল।" ডঃ রায় কার শাসন-আমলে বাঙ্‌লা নানা জনপদ মিলে এক নাম পায়, সে-কথা না ব'ললেও, ইতিহাস-পাঠকদের অজানা নয় যে. মুসলিম শাসক সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌-এর সময়ে; তিনি-ই এ ঐতিহাসিক কাজটি সমাপন করেন। মশহুর ইতিহাসবিদ্‌ জনাব আবদুল করিম তাঁর একটি বক্তৃতায় লিখিতভাবে জানিয়েছেন- "১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌ সোনার গাঁও দখল ক'রে নেন এবং সর্বপ্রথম তিনটি শাসন-বিভাগ; লক্ষ্ণৌতি, সাতগাঁও ও সোনার গাঁওকে একক রাষ্ট্রভুক্ত ক'রে, এই সম্মিলিত রাজ্যের অধীশ্বর হন।" তিনি আরও জানিয়েছেন- "বেঙ্গালা শহরের যারা উল্লেখ ক'রেছে, তারা কেউ ষোল শতকের আগের লোক নয়; অথচ আমরা দেখেছি যে, চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বঙ্গকে 'বাঙ্গালা' নামে অভিহিত ক'রেছেন।" তাহ'লে এ-সময় থেকেই যে, দেশ-নাম রূপে 'বাঙ্‌লা'র দখল কায়েম হয়, তা সত্য। ড. রায়-কথিত "বঙ্গ" নামে নয়।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ইতিহাসের এ-খবর মানলে, ১২০১ সালে ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ারের নদীয়া-লক্ষ্ণৌতি দখলের আগে-পরে এদেশের সমাজ, ভাষা, সাহিত্য ও কালচারের হাল-হকিকৎ কেমন ছিল, তার ওপর আলোকপাত করা জরুরী হ'য়ে পড়ে। সে-বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গ-ভাষার উপরে মুসলমানের প্রভাব" নামের প্রবন্ধে লিখেছেন- এদেশে মুসলমান বিজয়ের সময়ে-"পণ্ডিতেরা 'নস্যাধার হইতে নস্য গ্রহণ করিয়া, শিখা দোলাইয়া সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি করিতে ছিলেন এবং 'তৈলাধার পাত্র কিম্বা পাত্রাধার তৈল' এই লইয়া ঘোর বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহারা 'হর্ষচরিত' হইতে "হারং দেহিমে হরিণি" প্রভৃতি অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিলেন এবং 'কাদম্বরী', 'দশকুমারচরিত' প্রভৃতি পদ্যরসাত্মক গদ্যের অপূর্ব সমাসবদ্ধ পদের গৌরবে আত্মহারা হইতেছিলেন। রাজসভায় নর্তকী ও মন্দিরে দেবদাসীরা তখন হস্তের অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া এবং কঙ্কণ-ঝঙ্কারে অলি-গুঞ্জনের ভ্রম জন্মাইয়া 'প্রিয়ে, মুঞ্চময়ী মানসনিদানং' কিংবা "মুখরম্ ধীরম্ ত্যজ মঞ্জীরম্" প্রভৃতি জয়দেবের গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিতেছিল। সেখানে বঙ্গ-ভাষার স্থান কোথায়? ইতরের ভাষা বলিয়া 'বঙ্গ-ভাষা'কে পণ্ডিতমণ্ডলী "দূর দূর" করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাঁড়ি, ডোমের স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন- 'বঙ্গভাষা' তেমনি সুধী সমাজের অপাংক্তেয় ছিল। তেমনি ঘৃণা, অনাদর ও উপেক্ষার পাত্র ছিল।" আজকের দিনে, অনেক পাঠকের কাছে মরহুম দীনেশ সেনের ঐ সব কথা অমূলক ব'লে মনে হ'তে পারে। মনে হ'তে পারে, এ হ'ল- মুসলমান পাঠকদের বাহ্‌বা পাবার আশায় বামুনদের কিছু গালমন্দ করা। আসলে তেমন ভাবনার কোন ফুর্‌সৎ নেই। কারণ মুসলমান বিজয়ের আগে কমছে-কম হাজার বছর ধ'রে, গৌড়', বঙ্গ, রাঢ়, সমতট, পুণ্ড্রবর্ধন এলাকার জনগণের কোন একক দেশ ও ভাষা ছিল না। সাহিত্যের ভাষা তো নয়-ই। খুব পুরনো কালের দিকে তাকালে দেখা যায়, গৌতম বুদ্ধের জীবনী 'ললিত বিস্তরে' (৫ম শতক) 'বঙ্গলিপি'র নাম বলা হ'য়েছে। তবে ঐ কেতাবে 'বঙ্গ-ভাষার' কোন নাম নেই। গৌতম বুদ্ধের সময়ে ও পরে, গৌড়বঙ্গ-মগধে জনগণের মুখের ভাষা ছিল, তবে তার সঠিক নাম কেউ জানে না। আমরা জৈনধর্মের লোকদের যে-ভাষায় সাহিত্য-কাব্য-দর্শন-চর্চার খবর পাই; তার নাম- 'বঙ্গভাষা' নয়; 'গৌড় ভাষা'ও নয়। বামুনেরা তার নাম দিয়েছে 'জৈন প্রাকৃত'। নামটি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ক'রে দেয়া; অপবাদমূলক অপনাম। ঘৃণার ছাপ্পা মারা এ-নাম। এরকম নাম তারা পরের কালেও বৌদ্ধ ও মুসলমানদের নিজ নিজ ভাষাকে দিয়েছে। তাই তথাকথিত 'জৈন প্রাকৃত'ই যে, সে-কালের এদেশের এলেমদার মানুষের সাহিত্যিক ভাষা ছিল— তা মেনে নেয়া চলে।

গুপ্ত আমলে, বিশেষ ক'রে শশাংকের আমলে, জৈন ধর্ম, জৈন জনকওম ও তাদের ভাষা-সভ্যতা পয়মাল ক'রে, যে-বামনাই শাসন, শোষণ ও সীমাহীন খুনখারাবী চলে— তার-ই পরিণাম হিসেবে পাল-পূর্ব আমলে গৌড়ে মাৎস্যন্যায় দেখা দেয়।

তারপর, সাত শতকের মাঝামাঝি, পাল হুকুমৎ (রাজত্ব) কায়েম হবার পর, দশম শতক অবধি 'গৌড়দেশে' সুখ-আরাম বজায় থাকলেও, বামুনদের 'দেবভাষা' আর

www.pathagar.com

এলেম-তালিমের 'কালচারাল কুঅৎ' সমাজে অটুট-ই থেকে যায়। তার নজীর, সেকালের শিলালিপিতে ও রাজশেখরের উক্তিতে আছে। 'গৌড়লেখমালা'র পহেলা বাব (খণ্ড) থেকে জানা যায়, 'পাল রাজারা বামুনদের যজ্ঞস্থলে হাজির হ'য়ে, মাথায় 'যজ্ঞবারি' ঢালতেন।' আরও নজর করার বিষয় যে, পাল রাজারা বৌদ্ধ। তাঁদের ধর্মীয় ভাষা 'পালি' হ'লেও, পালি ভাষায় তাঁরা কোন শিলালিপি লেখাননি। তাঁদের দরবারে যেমন বামুন পণ্ডিতদের জায়গা ছিল, তেমনি তাঁরা তাম্রশাসন, শিলালিপি, এমনকি, জমি কেনাবেচার বেলায়ও, কাজে লাগাতেন সংস্কৃতকে; বঙ্গভাষাকে (পালি ভাষাকেও) নয়।

সে-সময় রাজপুরীর বাইরে, জনসমাজে পালি ও সংস্কৃত– চর্চা ছিল না; তা নয়। তবে, পাল আমলের গৌড় এলাকায় ভাষা-পরিবেশের একটা বড় খবর হ'ল– সাধারণ বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা নিজেদের লৌকিক ভাষার সাথে সংস্কৃতের মিলমিশ ঘটিয়ে এক বিশেষ কিসিমের সংস্কৃত ভাষা গ'ড়ে তোলেন। সে-ভাষা বৈদিক সংস্কৃতের চে'য়ে জনগণের ভাষার (প্রাকৃত) বেশী কাছাকাছি ছিল। পাণিনীর ব্যাকরণকে আমল না দিয়েই সে-ভাষা তাঁরা তৈরী করেন। এটা তখনকার বঙ্গীয় বামুনদের মোটেই পছন্দ হয়নি। গৌতম বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম আর পালি ভাষাকে এমনিতেই তারা দু'চোখে দেখতে পারত না; তার ওপর দেবভাষার এই 'ইতর-দশা' দেখে তারা কুপিত হয় এবং ঐ ভাষাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও নিন্দা ক'রতে, ওর নাম দেয়–'বৌদ্ধ সংস্কৃত'। বামুনরা বৌদ্ধদের হেয় চোখে দেখত। তাই 'বৌদ্ধ সংস্কৃত'ও হ'ল– অপভাষা; হেয় ও হীন ভাষা। সে-ভাষায় যদিও বিপুল পরিমাণ সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, ব্যাকরণ, ইতিহাস লেখা হ'য়েছিল, তবু বামুন পণ্ডিতরা সেগুলোর আদর-কদর করেনি। তাঁরা মশহুর বৌদ্ধ ব্যাকরণ– লেখক চন্দ্রকীর্তির "চান্দ্র ব্যাকরণ" লোপ ক'রে দিয়ে– বাঁচিয়ে রাখে, পাণিনীর ব্যাকরণ। এক-ই ভাবে, তথাকথিত বৌদ্ধ-সংস্কৃতে লেখা সবকিছুর বিলোপ ঘ'টিয়ে, তারা টিকিয়ে রাখে কেবল নিজেদের কাব্য, দর্শন, পুরাণ, উপপুরাণ।

পরবর্তীকালে সেন-বর্মন আমলে, কেবল ভাষা লোপ নয়, বৌদ্ধ জনসাধারণের ওপর অসহনীয় জুলুম চালিয়ে, তাদের বিতাড়ন অথবা নিকেশ করা হ'তে থাকে। দীনেশচন্দ্র সেন ব'লেছেন—'বৌদ্ধদের ওপর বামনুদের এই পীড়নের সীমা-পরিসীমা ছিল না।"

"শতং বদ, মা লিখ" বা 'শতমুখে বল– একবার লিখ না'—এই মহাজনবাক্যটি পহেলা কোন্ বামুনের মাথায় আসে, তা জানা না গেলেও, গত পাঁচ হাজার বছর ধ'রেই এই বাক্যটি বামুনরা ভালভাবেই 'ফলো' ক'রে চ'লেছে। মহাজনবাণীটির মোদ্দা কথা হ'ল– 'তুমি তোমার শত্রুর সামনে শতমুখে তার তারিফ ক'রবে, লিখবে না কখনও। কারণ লিখলেই তা একটা দলিল (document) হ'য়ে যাবে। তোমার দুশ্‌মনের চুল পরিমাণ রেখা কোথায়ও টিঁকে থাক, তা হ'তে দেবে না।' আর্য বামুনদের এই তালিম-এর কামিয়াবীর কারণেই পাল আমলের পরে, দু'শ' বছরে কেবল বৌদ্ধ-সংস্কৃতই লোপ পায়নি; সেই সাথে ললিত-বিস্তরে লিখিত, 'বঙ্গলিপির বঙ্গভাষা', মৌর্য যুগ থেকে সেন-

www.pathagar.com

বর্মন-যুগ তক একবারও কোথাও আঁচড় রাখতে পারেনি। তার-ই ফলে, আনুমানিক ৬০০ সালের (ঈসায়ী) লোক, দণ্ডী, 'গৌড় প্রাকৃতে'র কথা তাঁর এক কেতাবে লিখলেও, তাকে 'বঙ্গভাষা' বলেননি। আনুমানিক ৮ম শতকের একজন লেখক, "আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প" বইয়ে, গৌড় এলাকার ভাষাকে "অসুর ভাষা" এবং পালরাজা গোপালকে 'দাস' ব'লে, লিখেছেন। এই "অসুর ভাষা"ই মার্কণ্ডেয়র লেখায় নাম পেয়েছে– 'গৌড় অপভ্রংশ'। ভাষাটা কেবল "ভ্রংশ" (ভাঙা) নয়; একেবারে অপভাবে ভাঙা । পাণিনীয় মানদণ্ডে নিশ্চয়-ই। খোলাসা কথায়, তখনকার বামুনদের নিকট গৌড় এলাকার মানুষ ছিল– অসুর; আর তাদের ভাষা পাণিনীর ব্যাকরণের মানদণ্ড অনুসারে, হ'ল– অপভাষা, কুভাষা, অসুরদের ভাষা। নবম থেকে চৌদ্দ শতক তক, এই অপ-ভাষাই ছিল, গৌড় জনগণের ভাষা। এ-সময় এ-ভাষাই ছোট লোক ও 'ইতর'দের লোক-সাহিত্যের লৌকিক ভাষা হিসেবে অনামিকা রূপে বেঁচে ছিল; তাই ড. সুকুমার সেন তাঁর "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" প্রথম ভাগ, পহেলা অংশে লিখেছেন– "নবম শতাব্দ হইতে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দের প্রারম্ভ পর্যন্ত পশ্চিমে গুজরাট হইতে পূর্বে বাঙ্গালা অবধি সমগ্র আর্যাবর্তে অপভ্রংশের অর্বাচীন রূপ অবহট্‌ঠ বা 'অপভ্রষ্ট' প্রচলিত ছিল— লোকসাহিত্যের ভাষা রূপে, সংস্কৃতের হীন বিকল্পভাবে। বাঙ্গালা প্রভৃতি নবীন আর্য ভাষা দশম শতাব্দ হইতে ধীরে ধীরে প্রাদেশিক রূপ লাভ করিতে থাকিলেও সামনে কোন আদর্শ ছিল না বলিয়া তাহা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে সদ্য সদ্য গৃহীত হয় নাই। তবুও কথ্য ভাষায় পদ ও বাক্-রীতি সমসাময়িক অবহট্‌ঠ রচনার মধ্যে প্রায়-ই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং কালানুক্রম ও বিষয় অনুসরণে নয়, ভাষা ধরিয়া এই সময়ে অর্থাৎ দশম হইতে চতুর্দশ শতাব্দের অবহট্‌ঠ সাহিত্যকে নবীন আর্যভাষার সাহিত্যের উপক্রম-পর্ব বলিয়া গ্রহণ না করিলে ইতিহাস উপেক্ষিত হয়।" ড. সেন সঠিকভাবেই ঐ সময়ের দেশীয় ভাষার হাল-হকিকৎ ধ'রতে পেরেছেন। তবে "বাঙ্গালা" এই শব্দটি চৌদ্দশতকের মাঝামাঝি সময়ের আগে; না-দেশনাম, না-ভাষানাম রূপে লেখা হ'য়েছে। ১০২৪ ঈসায়ীতে লেখা রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলই শিলালিপিতে 'বঙ্গাল দেশ'-এর হাজিরী দেখানো গেলেও, তা ছিল গৌড়ের বাইরের এলাকা এবং চর্যা গানের একটিতে "আজি ভুসুকু বঙালী ভৈলী" কথাটি বাঙালীর ভাষাগত পরিচয় দেয় না। তাছাড়া, "বঙ্গাল" ব'লে একটা শব্দ "প্রাকৃত-পৈঙ্গলে" থাকলেও, তা 'ভীরু বাঙাল' বোঝাতে লেখা হ'য়েছে। তাই ছ'শতক থেকে শুরু ক'রে চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি তক, অনেক বার গৌড়, গৌড়িয়া, গৌড় প্রাকৃত, গৌড় অপভ্রংশ, গৌড়ী রীতির উল্লেখ সাহিত্য ও শিলালিপিতে দেখা গেলেও 'বঙ্গভাষা' বা 'বাঙ্গালা ভাষা'বোঝায়, এমন কোন কথা বিশেষ কোন সূত্রে পাওয়া যায় না। এটা এতই কৌতুককর যে, হিন্দুদের লেখা গোটা মধ্য যুগের সাহিত্যে-কাব্যে কোথাও, 'বঙ্গভাষা' বা 'বাঙ্গালা-ভাষা'র যবন-স্পর্শ দোষ ঘ'টেছে ব'লে দেখানো যাবে না।

এ ঐতিহাসিক ক্যানভাসের ওপর নজর রেখেই বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানের দান বোঝার কোশেশ ক'রতে হবে। নইলে, ড. দীনেশচন্দ্র সেন বা ড. সুকুমার সেন-এর কথা পুরোপুরি বোঝা যাবে না।

www.pathagar.com

যদিও ওঁরা খুব সাফ্-সাফ্ সব কিছু বুঝে উঠতে পারেননি ব'লে, সত্যের কাছাকাছি পৌঁছেও; পুরো সত্যের মুখোমুখী হ'য়ে, বাঙ্লা ভাষা ও বাঙ্লা সাহিত্য, উভয়কেই মুসলমানদের-ই আওলাদ ব'লে মনে ক'রতে পারেননি, তবু ড. দীনেশচন্দ্র সেন তেরো শতকের বিস্মিল্লাতেই বঙ্গে মুসলিম হুকুমৎ কায়েমের ঘটনাকে খোশ্ আম্দেদ্ না জানিয়ে পারেননি। তিনি খোলাসা বয়ানে ব'লেছেন— "হীরা কয়লার খনির মধ্যে থাকিয়া যেমন জহুরীর আগমনের প্রতীক্ষা করে, শুক্তির ভিতর মুক্তা লুকাইয়া থাকিয়া যেরূপ ডুবুরীর অপেক্ষা করিয়া থাকে, বঙ্গভাষা তেমনি কোন শুভদিন, শুভ ক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুসলমান-বিজয় বঙ্গভাষার সেই শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করিল। গৌড়দেশ মুসলমানগণের অধিকৃত হইয়া গেল। তাহারা ইরান-তুরান যেদেশ হইতেই আসুন না কেন, বাঙ্গলা দেশ বিজয় করিয়া বাঙ্গালী সাজিলেন।. . . তাঁহারা এদেশে আসিয়া দস্তুর মত এদেশবাসী হইয়া পড়িলেন। হিন্দুর নিকট বাঙ্গলা ভাষা যেমন আপনার, মুসলমানদের নিকট উহা তদপেক্ষা আপনার হইয়া পড়িল।"

ড. দীনেশ সেনের শেষবাক্য পাঠের পর, বলা দরকার, বাঙ্লা ভাষা হিন্দুর নিকট চিরকাল আপনার ছিল না। ১৮ শতক অবধি 'বাঙ্গালা' শব্দটিকে তাঁরা সাহিত্যে-কাব্যে একবারও জায়গা দিয়েছেন কিনা, তা খুঁজে দেখলে, হতাশ-ই হ'তে হবে। মুসলমানরা এদেশে এসে, বাঙ্লা ভাষা পয়দা ক'রেছে; তাকে হাতে পেয়ে আপন ক'রে নেয়নি; রীতিমত জন্ম দিয়েছে। এর নজীর হাজির ক'রতে, নিচের তথ্যগুলোর দিকে পাঠকদের নজর দাবী ক'রছি।

ড. সুকুমার সেন দশম শতক থেকে নবীন আর্য ভাষার বিকাশের ধারায় বাঙ্লা ভাষা ধীরে ধীরে প্রাদেশিক ভাষার রূপ লাভের কথা ব'লেও লিখেছেন যে, ঐ ভাষার সামনে কোন আদর্শ না থাকায়, তা সদ্য সদ্য সাহিত্য রচনায় কামিয়াব হয়নি। তাঁর একথা মানলে, চর্যাপদের 'বাঙ্গালিত্ব' ঘুচে যায়। 'চর্যাপদ বাঙ্লা ভাষায় লেখা নয়' ব'লে যাঁরা মত দিয়েছেন, তাঁদের দলে আরও একজন পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ্ ভাষাতাত্ত্বিকের নাম যোগ হয়। তাই তিনি দু'বার দ্বিধা প্রকাশের পরও, ঈসায়ী চৌদ্দ শতক অবধি কালকে 'নবীন আর্য ভাষা (?) ও সাহিত্যে'র 'উপক্রম-পর্ব' ব'লে যে রায় দিয়েছেন, তা ঠিক। তিনি নবীন প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে বাঙ্লা ভাষা পয়দা হবার মূলে "অবহট্‌ঠে"র কথ্যরূপের পদ ও বাক্-রীতির যে-ভূমিকার ইশারা দিয়েছেন, তাও বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে।

তবে, ইয়াদ রাখা দরকার, বাঙ্লা রচনার নমুনা হিসেবে চর্যাপদের দাবী বাতিল হ'য়ে গেলে, চোদ্দ শতকের শিলালিপি ও বই-কেতাব মারফৎ অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠে লেখা যে-সব গান-ছড়া (নব চর্যাপদ, প্রাকৃত পৈঙ্গল 'ওগয়রহ' পাওয়া যায়, সেগুলোর শব্দ, পদ ও বাক্-রীতির সাথে পনের-ষোল শতকের বাঙ্লা ছড়া-কবিতার শব্দ, পদ ও বাক্-রীতির মিল খুব কম-ই। নজীর হিসেবে নিচের রচনাগুলোর দিকে তাকানো যেতে পারে।

চৌদ্দ শ' ঈসায়ীর শেষভাগে সংকলিত, 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে' কয়েক শ' কবির যে-বিপুল রচনার নমুনা র'য়েছে, সেগুলোর মধ্যে নিচে তিনটি কবিতাংশ হাজির করা হ'ল।

www.pathagar.com

১. 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে'র পহেলা পরিচ্ছেদের আশিসপুষ্পিকা–

"জিনি কংস বিণাসিঅ	কিত্তি পআসিঅ
মুট্ঠি অরিস্তী	বিণাস করে
	গিরিহথ ধরে।
জমলজ্জুণ ভঞ্জিঅ	পঅভর গঞ্জিঅ
কালিঅ কুল সং	হার করে
	জস ভুঅণ ভরে।
চানুর বিহণ্ডিঅ	ণিঅ কুল মণ্ডিঅ।
রাহা মহু	পাণ করে
	জনি ভমর বরে।
সো তুম্হ ণরাঅণ	বিপ্প পরাঅণ
চিত্তহ চিন্তিঅ	দেউ বরা
	ভব ভীই হরা ॥"

২. 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে'র দোস্‌রা পরিচ্ছেদের পুষ্পিকায়–

বপ্পঅ উক্তি	সিরে জিনি লিজ্জিঅ
তেজ্জিঅ রজ্জ	বণন্ত চলে বিনু
সোঅর সুন্দরি	সঙ্গহি লগ্‌গিঅ
মারু বিরাধ	কবন্ধ তাহাহণু।
মারুই মিল্লিঅ	বালি বহিল্লিঅ
রজ্জ সুগীবহ	দিজ্জ অকন্টঅ
বন্ধু সমুদ্দ	বিণাসিঅ রাঅণ
সো তুহরাহব	দিজ্জউ নিব্‌ভঅ ॥

৩. ঐ বইয়ের অপর এক কবির রচনা

ওগগর ভত্তা
রম্ভঅ পত্তা।
গাইক ঘিত্তা
দুগ্ধ সজুত্তা।
মোইনি মচ্ছা
নালিচ গচ্ছা
দিজ্জই কন্তা
খাই পুনবন্তা ॥

www.pathagar.com

এসব রচনার কোথাও বাঙ্‌লা ভাষার আমেজ পাওয়া যায় না।

এরপর, প্রায় এক-ই সময়ে রচিত নব চর্যাপদের ভাষা ও বাক্‌-রীতির দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। বাঙ্‌লা একাডেমী থেকে ছাপা 'বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস' পহেলা জেলেদ (খণ্ড) থেকে নিচেয় হাজির করা আরও তিনটি নমুনার দিকে নজর দেয়া যাক।

৪. উঠহু ভরাডো মণ্ডল রা আ
বজ্রবারাহি নীলবণ্ন দেহা॥
আমিএ নিরংজন দেশে
সহজ সুন্দরী লইয়া ॥
এ চউ জোগিনী এলেমেলে মেলা
বজ্র বারাহি আলিঙ্গন কোলা
উঠহু ভরাড়ো করাণ কবালি
জঅ জঅ আলিঙ্গন নীলবণ্ন বালী ॥

৫. বামাদহিনী এ দুই ঘরঈ
মাঝে বিলসই মহাসুখ ক্ষরই ॥
ভুংজহু জোইআ সহজ অনহা
সঅল বিষয়রে সমরস কলিআ ॥
গঅনে পবনে চিঅ মিলিআ
কাআ বাকচিঅ একু করিআ
একে ধাবই আমিঅ লইআ
আবরে পানি গাঢ় ধরিআ
পাবই রে গুরা পাআ পসাদ্দে ॥
ভণই বাক্‌বজ্র শুণ্ন (সমাধি) ॥

৬. কঅনে রূপ লোকে কঅনে রূপ বুদ্ধ।
বিমল নিরংজন সঅল বিসুদ্ধ ॥
নাচই অবধূঅ বজ্র সংজোগে
বিবিহ বিকল্প বিনামান রোধে ॥
(অখয়) নিরংজন অঙ্কুর বিহুনা
অনুপম করুণ কলিত সুখ চিহ্ন ॥
কেহু বোলে হেতুবজ্র কেহু ব'লে লীনা
অবধূঅ কাহ্ন-গতি (সহজানন্দা)
ফলহু ফুলহু হং ভমল সুচ্ছন্দা
ত্রিভুবন নাথ এক সম্বর রাআ ॥

www.pathagar.com

ড. সুকুমার সেন, গোপাল হালদার 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে'র ঐ সব রচনায় 'বাঙ্‌লা ভাষার ছোঁয়াচ আছে' ব'লেছেন। তবে, উপরে হাজির করা নমুনাগুলো থেকে সংস্কৃত, ও তা থেকে তৈরী শব্দগুলো সরিয়ে দিলে কি, বাকি উপকরণের গায়ে, বাঙ্‌লার কোন রকম আঁচ খুঁজে পাওয়া চলে? এর সাফ্ জবাব- 'না'। তাহ'লে, ঐ সব নমুনা আর যাই হোক, বাঙ্‌লা নয় ব'লে এলান করাই বেহ্‌তের। এ-কারণে বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের আসল মোলাকাৎ পনের শতকের আগে হয়নি ব'লেই মেনে নেয়া উচিত। বিষয়টি খোলাসা করার জন্যে একটা তুলনা হাজির করা যেতে পারে। আজ যে-চর্যাপদ 'হাজার বছরের পুরানো বাঙালা' ব'লে প্রায় 'সবাই' জানেন ও মানেন; সেই সব পদের একটিতে বলা হ'য়েছে—

"নাদ ন বিন্দু ন রবি ন সসিমণ্ডল।
চিঅ রাঅ সহাবেঁ মুকল॥"

সরহ-রচিত এই পদটি-(৩২ নং চর্যা)র উপরের অংশের সাথে তের বা চোদ্দ শতকে রচিত ব'লে অনুমিত, দ্বিজ রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ'-এর নিচেয় লেখা সূচনা-অংশটি তুলনীয়। যথা—

"নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন।
রবি সসী নহি ছিল নাহি রাতি দিন॥"

চর্যার ঐ দু'লাইনের সাথে 'শূন্য পুরাণ'-এর এ-দু'লাইন মিলিয়ে প'ড়লে 'শব্দ ও বাক্-রীতি' বিচারে বাঙ্‌লা ভাষায় লেখা বাঙ্‌লা কবিতার কাছাকাছি আসার দাবী শেষটিতেই বর্তায়; চর্যায় নয়। বাক্-রীতি বিচারে (শব্দ-বিচারেও)"ন রবি ন সসিমণ্ডল"-এর চে'য়ে "রবি সসী নাহি ছিল", ছহি বাঙ্‌লা ভাষাই। এ-ভাষা তবু, পুরো বাঙ্‌লা নয়; 'প্রাকৃত বাঙ্‌লা'। বররুচির 'প্রাকৃত ব্যাকরণে'র নিয়মের সাথে 'শূন্য পুরাণে'র শব্দরূপ ও ধ্বনিতত্ত্বের (সেই হিসেবে বানানের)ও মিল আছে। এ-পথেই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-কথিত "১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোন সময়ে রচিত", রামাই-এর 'শূন্যপুরাণ'স্থ 'নিরঞ্জনের রুস্মা'য় সঠিক বাঙ্‌লা ভাষার চারাগাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, বলা যায়। ছড়াটি "অর্বাচীন কালের" রচিত ব'লে অনেকে মনে ক'রলেও, তা ঠিক নয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ-রচনাটিকে ১৪৩৫ ঈসায়ীর পরে কোন সময়ে লেখা, কেন ব'লেছেন, তা খোলাসা করেননি। আমার ধারণা, কবিতাটি ঐ সময়ের আগেকার রচনা হ'তেও পারে।

বহুল-আলোচিত এ-রচনার ইতিহাসগত বিশেষ তথ্য নিয়ে যত আলোচনা করা হ'য়েছে, ভাষাগত বিশেষত্ব নিয়ে তত নয়। কোন কোন অমুসলিম লেখক রচনাটিতে নিহিত তথ্যের উল্টো তফ্‌সিরও ক'রেছেন। সেটি আলাদা বিষয় ব'লে, এখানে এর ভাষাগত দিকটির দিকে নজর দেয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি। কবিতাটি এই—

www.pathagar.com

শ্রী নিরঞ্জনের রুষ্মা

জাজপুর পুরবাদি সোলসঅ ঘরবেদি
বেদিলয় কেবল দুর্জ্জন।
দখিন্যা মাগিতে জাঅ জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিআ পুড়ায় ভুবন ॥ ১ ॥
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাঞিক দিসপাস।
বলিষ্ঠ হইল বড় দসবিস হয়্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাস ॥ ২ ॥
বেদ করে উচ্চারন বের্য্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিআ সভাই কম্পমান।
মনেত পাইআ মৰ্ম্ম সভে বোলে রাখ ধৰ্ম্ম
তোমাবিনা কে করে পরিত্তান ॥ ৩ ॥
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারন
ই বড় হোইল অবিচার ॥
বৈকণ্ঠে ডাকিয়া ধৰ্ম্ম মনেত পাইআ মৰ্ম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার ॥ ৪ ॥
ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপী মাথাএত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥ ৫ ॥
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত ব'লে ত দম্বদার।
জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা এক মন
আনন্দেত পরিল ইজার ॥ ৬ ॥
ব্রহ্মা হৈল মহামদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল সুলপাণি।
গনেশ হইআ গাজী কাত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইল্যা জত মুনি ॥ ৭ ॥
ত্যজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলি বাজায় বাজনা ॥ ৮ ॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবি তিহুঁ হৈল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হল্য বিবি নূর।
জতেক দেবতাগন হয়্যা সভে এক মন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥ ৯ ॥

www.pathagar.com

দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিআ ধর্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥ ১০ ॥

এ-রচনায় একুনে কুড়িটি আরবী ও ফারসী শব্দ (মূল রূপ ও বিকৃত রূপ সহ) র'য়েছে। এক-ই শতকে (১৪ শতক) লেখা বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তনে'ও কতকগুলো আরবী-ফার্সী লফ্জ (শব্দ) মেলে। এসব নজীর তথ্যগতভাবে বাঙ্লা ভাষার বিকাশ যে, দ্বিজ রামাই-এর 'নিরঞ্জনের রুম্মা'র পথেই হ'য়েছে, তার ইশারা দেয়। সেই 'কালের-ইশারা'কে খোলা মনে মেনে নিয়ে বাঙালী পাঠকদের বলা উচিত যে, পরের যুগে জনগণের বাঙ্লা ভাষার মৌলিক বিকাশ ঘ'টেছে; মুসলমানদের-ই হাতে; তার লালন-পালনও হ'য়েছে মুসলমান- সমাজে এবং মুসলিম বাঙালীদের আমলে।

তবু আখেরী কথা ব'লার আগে একটা কথা না ব'ললেই নয়। উপরে লিখিত আলোচনায় চোখ বুলিয়ে কেউ কেউ ব'লতে পারেন; চোদ্দ বা পনের শতকে লেখা বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যখানি-(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)র ভাষা কি বাঙ্লা নয়? যদি সেখানি বাঙ্লা ভাষায় লেখা ব'লে ধরা হয়; তাহ'লে ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তার জায়গা কোথায় হ'তে পারে? কথাটি জরুরী। তার জওয়াব হ'ল, বড়ু চণ্ডীদাস সংস্কৃত ভাষায় মহা এলেমদার কবি ছিলেন। তাঁর ঐ রচনা (শত শত পদ) রাঢ় বঙ্গের প্রাকৃত বুলির সাথে সংস্কৃত শব্দ ও বাক্-রীতি মিলিয়ে তৈরী। ঐ ভাষা জনগণের ভাষা ছিল না। ঐ ভাষায় দু'চারটা আরবী-ফার্সী শব্দ নিহিত থাকায়, একথা বলা যায় যে, মুসলমানদের হুকুমৎ যদি এদেশে ভালভাবে কয়েক শ' বছর কায়েম না থাকত, তাহ'লে, হয়তো ঐ পথেই বাঙ্লা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ হ'ত; 'নিরঞ্জনের রুম্মা'র পথে নয়। তা হয়নি। বাঙ্লা ভাষা ও সাহিত্যের পরেকার বিকাশ হ'য়েছে আলাদা পথে। সে-পথের খবরটি আজকের ইতিহাস (সাহিত্যের) লেখকরা হয় জানেন না; নয়তো জানাতে চান না। এ-ব্যাপারে আজকের বাঙ্লা ভাষার সংস্কৃতনির্ভর রূপ এবং ইতিহাস-চেতনার দীনতা; বাঙ্লা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পাঠককে ভ্রান্তি ও প্রতারণার জালে আটকে রেখেছে। আর তার ফলেই, যে-কোন পাঠক কৃষ্ণকীর্তনে নিহিত বড়ু চণ্ডীদাসের 'বাঙ্লা'র লেজের সাথে, বিদ্যাসাগর- বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্লার সরল রেখা টেনে; চমৎকার মিল খুঁজে পেতে পারেন। অথচ তাঁরা যদি ঐ রেখার (বাঙ্লা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের বিকাশরেখা) মাথাটা বড়ু চণ্ডীদাস-এর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে সরিয়ে, দ্বিজ রামাই পণ্ডিতের 'নিরঞ্জনের রুম্মা'য় লাগিয়ে, একবার উপরে ও নিচেয় তাকান, তুলনা করেন এবং ঐ কবিতার ভাষা, বাক্-রীতি ও বিষয়ের সাথে মধুসূদন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের ভাষা, বাক্-রীতি ও বিষয়বস্তুর তুলনা করেন, তাহ'লে যে, পুরোপুরি বিপরীত একটা ছবি পাবেন, তা ঠিক।

এ- বিষয়ে সাফ্-সাফ্ ধারণা লাভ ক'রতে নিচের ছবির দিকে নজর দেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

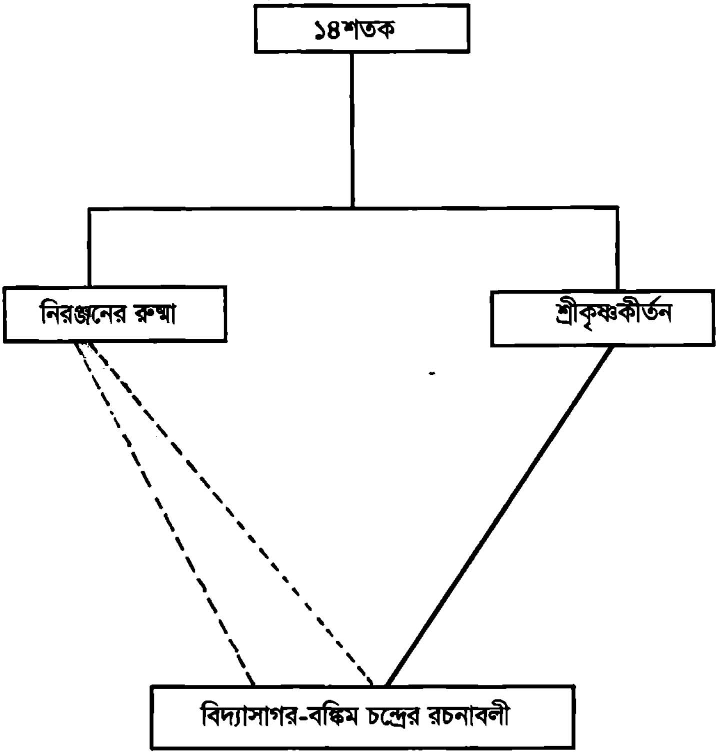

[ছবির ঐ হাল্‌কা রেখাটাই বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের মূল ধারা।]

পাশাপাশি দাঁড়ানো এই দুই বিপরীত ছবি দেখে পাঠক হয়তো ধাঁধাঁয় প'ড়ে জানতে চাইতে পারেন; বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের মূলধারার বিকাশ যে, বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষার পথে না হ'য়ে, দ্বিজ রামাই-এর ভাষার পথেই হ'য়েছো৷তার নতিজা কোথায়? পাঠকদের অবহিতির জন্য জানাচ্ছি, সে নতিজা আছে। আর সে-কারণেই বলা দরকার যে, কেবল বাঙ্‌লা সাহিত্য নয়, মূল বাঙ্‌লা ভাষাটাই মুসলমানদের দান। কালের কণ্ঠে তাঁদের পরানো এ-এক অক্ষয় ইসলামী তোহ্‌ফা (উপহার)। বারান্তরে, এবিষয়ে আরও খবর জানানো হবে।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান

অধ্যাপক আবু জাফর

লেখক -পরিচিতি ঃ জন্মঃ ১৫ মে ১৯৫২, কাঞ্চনপুর, হরিনারায়নপুর, কুষ্টিয়া। পেশা ঃ অধ্যাপনা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ, কুষ্টিয়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কবিতাঃ নতুন রাত্রি পুরনো দিন (১৯৭৩), বাজারে দুর্নাম তবু তুমিই সর্বস্ব (১৯৭৪), হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল (১৯৮০) প্রবন্ধ ঃ বাংলা গানের সুখদুঃখ (১৯৮৪), তুমি পথ প্রিয়তম নবী তুমিই পাথেয় (১৯৯৬), আমার নিকৃষ্ট গান (১৯৮৯)। অনুবাদঃ বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত কবিতা (১৯৭৫)।

লেখা-পরিচিতি ঃ মাসিক পৃথিবী, নভেম্বর ১৯৯৭ সংখ্যায় প্রকাশিত।

এটা প্রমাণিত, বিশ্বের যা-কিছু মৌলিক উপাদান তা-সবই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। মানুষের কোন হাত ছিল না, নেই-ও; মানুষ কেবল তার চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত আল্লাহপ্রদত্ত মৌলিক সৃষ্টিসমূহের অবলম্বনে উপযোগিতা সৃষ্টি করতে পারে। এবং এই উপযোগিতা সৃষ্টির ক্রমবিকশিত ইতিহাসই বহু শতাব্দীবাহিত মানবসভ্যতার বস্তুগত উন্মোচন ও বিকাশের ইতিহাস। অবশ্য এই উপযোগিতা সৃষ্টির ক্ষমতাও , বাহ্যত মানুষের নিজস্ব মনে হলেও, মানুষের নয়; এই ক্ষমতাও নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহ পাকেরই বিশেষ দান। কারণ আল্লাহ পাক পরিষ্কার এরশাদ করেছেন, 'আল্লামাল ইনসানা মাআলাম ইয়ালাম'- মানুষকে জানানো হয়েছে যা সে জানতো না। অর্থাৎ মানুষের জানা-অজানার বিষয়টিও আল্লাহর অনুগ্রত ও ইচ্ছাধীন। বিষয়টি সর্বাগ্রে উল্লেখ করলাম এইজন্যে যে, অন্য অনেক জিনিসের মত ভাষাও একটি মৌলিক সৃষ্টি; এবং সেই ভাষার মধ্যে সাহিত্যগুণ সৃষ্টির ক্ষমতাও আল্লাহপাকেরই বিশেষ রহমত। এ-নিয়ে বিশদ আলোচনা করা যায় কিন্তু তার বিশেষ আবশ্যকতা নেই; শুধু এইটুকু অনুধাবন করাই যথেষ্ট যে, পৃথিবীতে মৃত-জীবিত-জীবন্মৃত যে-হাজার হাজার ভাষার জন্ম হয়েছে, তার একটি শব্দও মানুষের তৈরী নয়। মানুষের হাতে শব্দের সংকোচন- প্রসারণ বা অদল-বদল বা অর্থের পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছে, কিন্তু কোন হোমার কি শেক্সপিয়র কি রবীন্দ্রনাথ অন্তত এই দাবী করতে পারবেন না যে, তাঁরা কোন একটি শব্দেরও স্রষ্টা বা আবিষ্কারক। অতএব এ-নিয়ে কোন বিতর্ক নেই, থাকার অবকাশও নেই যে, ভাষা একান্তভাবেই আল্লাহর এমন এক বিস্ময়কর ও মৌলিক ও রহস্যময় সৃষ্টি, যার সাথে কোন মানুষেরই কণামাত্র কোন কৃতিত্ব জড়িত নয়।

একদা বলা হতো, বাংলাভাষা সংস্কৃতের জঠরজাত এবং সংস্কৃতেরই অন্যতম দুহিতা। বহুদিন পর্যন্ত এই ধারণাই নির্ভুল হিসাবে বলবৎ ছিল। কিন্তু এটা যে ভুল, আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকদের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় তা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ডঃ শহীদুল্লাহ, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীদের গবেষণায় এটা এখন

www.pathagar.com

সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত যে, গৌড়ী কি মাগধি যাই হোক, সাধারণ মানুষের সাধারণ বাগ্‌ধারা কোন একটি প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব। কথাটা উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, কারো মনে যেন এই আত্মশ্লাঘা ভুলক্রমেও প্রশ্রয় না-পায় যে, ব্রাহ্মণচর্চিত ও পৃষ্ঠপোষিত সংস্কৃতের উদর বা ঔরসজাত এই বাংলাভাষা। বরং ইতিহাস যা বলে তাহলো, ব্রাহ্মণ্য রাজশক্তি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ বাংলাভাষার জন্ম ও বিকাশের ক্ষেত্রে সততই প্রবল প্রতিরোধ রচনা করেছে। এবং এই কারণেই বৌদ্ধ আমল ও বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গোপন ও প্রকাশ্য সহায়তা ও লালন ও অনুশীলনই ছিল শিশু ও সদ্যভূমিষ্ঠ বাংলাভাষার একমাত্র অবলম্বন। সময় নিয়ে মতভেদ আছে, থাকাটাই স্বাভাবিক; কারণ কোন ভাষাই কোন একটি বিশেষ দিনে জন্মগ্রহণও করে না, হঠাৎ কোন প্রত্যুষে একটি সর্বাঙ্গীন অবয়ব নিয়ে লোক সমক্ষে আবির্ভূতও হয় না। অতএব কেউ কেউ যাঁরা বলেন, বাংলাভাষার জন্মকাল খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী, সেটাও যেমন গ্রাহ্য করতে হয়, আবার কেউ কেউ এই জন্মসময়কে নবম-দশম শতাব্দী বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেটাও অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ ভাষা মানেই, খুবই ধীর গতিতে জাত ও বিকশিত একটি বাকসত্ত।

অবশ্যই এই জন্মকাল নিয়ে আমাদের পেরেশানির কোন হেতু নেই, কারণ আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ই ভিন্ন। এবং সেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপটে শুধু এইটুকু বলা দরকার যে, অদ্যাবধি আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত বাংলাভাষার যে আদি নিদর্শন, চর্যাপদসহ যে-সামান্য কিছু আদি নমুনা, তা একান্তভাবেই কিছু মরমিয়া বৌদ্ধ ও একেবারেই সাধারণ মানুষের কর্ম ও কৃতিত্ব। এর সঙ্গে না মুসলমানের কোন যোগ আছে, না উচ্চ কি মধ্যউচ্চ হিন্দুদের। মুসলমানদের নেই, কারণ মুসলমান তখনো উল্লেখযোগ্যভাবে এখানে আসেইনি, যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সংখ্যাও নগণ্য এবং তাঁদের উদ্দেশ্যও ছিল ব্যবসা কিংবা তওহীদের বাণীপ্রচার। অতএব প্রায় সদ্যোজাত এই ভাষার দিকে তাঁদের নজর কি মনোযোগ না-দেবারই কথা। আর হিন্দুরা যে কোন ভূমিকা রাখেনি তার কারণ, ব্রাহ্মণেরা এই ভাষাকে ঘৃণা করতো এবং অভিজাত সংস্কৃত-এর একটি 'ইতর প্রতিপক্ষ' হিসাবে প্রতিরোধ করা ছিল তাদের একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। এবং তাদের বিঘোষিত 'রৌরব' নামক নরকের ভয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও বাংলাভাষা চর্চাকে একটি ধর্মাচারণ ও গর্হিত অপরাধ বলে জ্ঞান করতো। এই বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, প্রাক-মুসলিম আমলে হিন্দুদের হাতে যখনই রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে তখন শুধু বৌদ্ধরাই বিতাড়িত হয়নি, বাংলাভাষাও তার স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত চর্চার বলয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। এটাই হিন্দু-ক্ষমতাধীন বাংলাদেশ ও ভাষার করুণ ইতিহাস।

কিন্তু সুখের বিষয় এই ইতিহাস দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বাংলায় মুসলিম রাজশক্তির প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পুরো পরিস্থিতিই পাল্টে গেল। যে-বাংলাভাষা ছিল ব্রাত্য উপেক্ষিত এবং উচ্চবর্ণ হিন্দুদের অসূয়ালাঞ্ছিত, সেই ভাষা মুসলিম রাজশক্তির আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় হয়ে উঠলো সজীব ও প্রাণচঞ্চল, ভাষার ধমনীতে বয়ে গেল অবাধ রক্তপ্রবাহ। বৃটিশপূর্ব মুসলিম শাসকদের (১২০৪ খৃঃ- ১৭৫৭ খৃঃ) এই অবদান কী-যে অপরিমেয় তা বর্ণনাতীত। একদা আততায়ী কিন্তু বর্তমান সুহৃদেরা সেই ইতিহাসকে যে

www.pathagar.com

ভাবেই অঙ্কন করুন বা আড়াল রাখুন, এটা অমোঘ সত্য যে, কয়েক-শতাব্দীর অব্যাহত সপ্রীতি পৃষ্ঠপোষকতা না-পেলে বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস চণ্ডিদাসেরও আবির্ভাব ঘটা কঠিন ছিল, বৈষ্ণবপদাবলী.কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তণ কি অন্য অনেক সাহিত্য সম্ভারে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হওয়াও ছিল অসম্ভব। মুসলিম শাসিত বাংলায় বাংলাভাষার যে-অবাধ অবারিত অনুশীলন ও সসম্মান প্রতিষ্ঠা, কেউ কেউ কৃতঘ্নবশত সেটা অস্বীকার করতে পারেন, বিস্মৃতও হতে পারেন, কিন্তু নির্মোহ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিচারে এটা অবশ্যগ্রাহ্য—বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ মানেই (মোটামুটি ১২০০-১৮০০ খৃঃ) মুসলিম রাজশক্তির অকৃপণ অকৃত্রিম পৃষ্টপোষকতাধন্য এক সুবর্ণ সৃষ্টিশীল অধ্যায়।

অবশ্য এই দীর্ঘ রাজত্বকালে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল, রাজশক্তির হাতবদলও ঘটেছে, কিন্তু বিস্ময়কর যে, তার কোন প্রভাব বাংলাভাষার বিকাশ ও চলমানতাকে বিন্দুমাত্র প্রতিরুদ্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত করেনি। করে-নি তার কারণ, যে কোন মুসলমান বিবেচনায় যে-কোন ভাষাই যেহেতু আল্লাহপাকের একটি প্রত্যক্ষ নেয়ামত, কোন ভাষাই কোন মুসলমানের কাছে উপেক্ষিত হতে পারে না। এবং ভাষাভিত্তিক অহমিকা যেহেতু ইসলামে নিষিদ্ধ, বিজিত জনপদের ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ ও আনুকুল্য প্রদানকে সর্বত্র এবং সততই একটি কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এই জন্যই পারস্য বিজয়ের পর ফারসি ভাষা যেমন উৎকর্ষ পেয়েছে, মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীর পার্শ্ববর্তী প্রায়-অপাংতেয় উপভাষা 'খড়ি বুলিও' একটি অনন্যসুন্দর সমৃদ্ধ উর্দুভাষায় রূপান্তরিত হতে পেরেছে। অতএব বাংলাভাষার প্রতি মুসলিম শাসকদের যে-সম্প্রীতি ও সদর্থক আচরণ, যা ক্রমাগতভাবে অব্যাহত ছিল, সেই ঋণ ইসলামের সর্বমানবিক জীবনদর্শনের সঙ্গেও সম্পৃক্ত।

অবশ্য কেবলই প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতাই একমাত্র অবদান নয়। সত্য যে, রাজশক্তির অকৃপণ আনুকুল্য নিয়ে বাংলাভাষার সাহিত্যসম্ভার স্ফীত হয়ে উঠেছে; হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের হাতেই ক্রমাগতভাবে সৃষ্টি হয়েছে বিপুল সাহিত্য সম্পদ। কিন্তু মেদবহুলতাই স্বাস্থ্য নয়, প্রকৃত স্বাস্থ্য মানে ধমনীতে নির্মল রক্তপ্রবাহ ও সুস্থতা ও স্বাভাবিক নিয়মে বেড়ে ওঠা। কেউ স্বীকার করুন না-করুন, বর্তমান নিবন্ধকারের অবিচল বক্তব্য— মধ্যযুগীয় হিন্দু সাহিত্যিকেরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, চৈতন্য জীবনচরিত এবং কিছু মঙ্গল কাব্যের মধ্যে এমন আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল যে, তাদের সাহিত্যসৃষ্টি ক্রমশই হয়ে উঠেছিল ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ। বৈষ্ণবপদাবলীসহ কিছু কিছু সাহিত্য কর্মের নান্দনিক গুণ নি:সন্দেহেতু উঁচুমানের, কিন্তু ক্রমাগত মানবসম্পর্করিক্ত একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ পুনরুক্তিহেতে সাহিত্য প্রায় স্থবির, বিষয় বৈচিত্র্যহীন ও নি:স্রোত বদ্ধ-জলাশয়ে পরিণত হবার উপক্রম করেছিল। এই করুণ অবস্থা থেকে বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করেছে মুসলিম সাহিত্যিকেরা। শাহ সগীর, সাবিরিদ খান, আলাওল, দৌলত উজির বাহরাম খান প্রমুখ লেখক তাঁদের নানা রচনা ও অনুবাদকর্মের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও পথের সন্ধান দিলেন। এবং যে-বাংলা সাহিত্য এতদিন ছিল এক ধরনের ঐশ্বরিকতা ও বহুলব্যবহৃত কৃষ্ণপ্রেমের জালে আটকে পড়া এক মক্ষিকা, সে

www.pathagar.com

হয়ে উঠলো মানবমুখী ও বৈশ্বিক নান্দনিকতার অভিসারী। পক্ষপাতদুষ্ট বহু গবেষক ও ঐতিহাসিক এই অসামান্য অবদানকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করেছেন; এমনকি মুসলিম রাজশক্তির অক্ষয় অবদানের কথাটিও যথাসম্ভব বিস্মৃত হয়ে নানাদিকে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু সত্য যেহেতু স্বতঃপ্রভ, ডঃ দীনেশ সেন- ক্ষিতিমোহন-ডঃ এনামুল হক প্রমুখ সাহিত্য-গবেষক এক্ষেত্রে যে-কোনরূপ সংশয়কে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রাচুর্যের দিক থেকে যাই হোক, মধ্যযুগীয় সাহিত্যের অন্তঃপ্রবাহে একটি নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করে মুসলিম লেখকেরা সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে যে-নতুন বাতায়ন মেলে ধরেছিলেন-সমকালীন প্রেক্ষাপটে সে-অবদান অপরিসীমরূপে গুরুত্বপূর্ণ। অতএব ১২০৪ খৃঃ থেকে ১৭৫৭ খৃঃ এই দীর্ঘ সময়কাল শুধু মুসলমানদের একচ্ছত্র রাজত্বকালই নয়, শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাদের ইতিবাচক পৃষ্ঠপোষকতা, মুসলিম কবিদের সম্প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবমুখী নান্দনিকতা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের একটি গৌরবান্বিত ইতিহাস।

কিন্তু পরবর্তী দু'শো বছরের ইতিহাস অবশ্য আশানুরূপ নয়। আশারনুরূপ তো নয়ই বরং নৈরাশ্যব্যঞ্জক। বলা সমীচীন, ইংরেজ শাসনের নীগড়ে প্রায় পুরো সময়টাই মুসলমানের কেটেছে দুঃখে-অভিমানে বিপ্লবে ও বিদ্রোহে। ইউরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের যে-আধুনিক নবযাত্রা শুরু হলো, সেখানে মুসলমানদের পদচারণা প্রায় একেবারেই অনুপস্থিত। অন্তত মীর মশাররফ হোসেনের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালটা একেবারেই মুসলিম অবদানশূন্য। কী কারণে এরকম হলো তার বিশদ ব্যাখ্যার আবশ্যকতা নেই। শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ভাগ্য বিপর্যয়ের দরুণ রাজাসন থেকে ছিটকে পড়ার কারণে অপমান দুঃখ অভিমান নিয়ে ইংরেজ প্রতিপক্ষের হাত থেকে আধুনিকতার দীক্ষাগ্রহণ মুসলমানদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। অন্যদিকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ রাজশক্তিরও একমাত্র প্রতিপক্ষ মুসলমান; তারাও চায়-নি মুসলমান স্বাভাবিক জীবনে এগিয়ে আসুক। বরং পুষ্পমাল্য নিয়ে সম্প্রীতি অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য অপেক্ষমান অনুগত অমুসলিম সম্প্রদায়ই বৃটিশদের কাছে অধিক প্রিয় ও আস্থাভাজন, এবং তারাই সকল পৃষ্ঠপোষকতা লাভের অধিকারী। অতএব এমতাবস্থায়, হিন্দুরা যখন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে রাজশক্তির আনুকুল্য নিয়ে সোৎসাহে নিবেদিত, মুসলমান তখন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাজশক্তির শত বৈরিতার গুরুভার মাথায় নিয়ে সমকালীন উদীয়মান আধুনিকতা থেকে বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন। ফলত অন্য অনেক ক্ষেত্রের মত শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রায় শতাব্দীকাল মুসলমানদের শ্রুতিযোগ্য বিশেষ পদধ্বনি নেই। কিন্তু খুবই বিস্ময়কর যে, মীর মশাররফ হোসেনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এটা প্রমাণিত হলো, মুসলমানদের সৃজনশীলতা অনিবার্য কিছু কারণবশত অবরুদ্ধ ছিল মাত্র; সেই অবরোধ, যে কোন কারণেই হোক, ভেঙ্গে-পড়া মাত্রই তাদের সৃষ্টিধর্মী অবদান বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আবার নানা বৈভবে সমৃদ্ধির সূচনা করলো।

বর্তমান নিবন্ধকারের দিক থেকে এটা বলে রাখা ভালো এবং আবশ্যকও বটে যে, শুধু কাজের প্রাচুর্য বা কবি সাহিত্যিকদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা প্রকৃত অবদান নিরুপিত হওয়া ঠিক

www.pathagar.com

নয়, উচিতও নয়। এমন হয় ও হতে পারে যে, একটি গ্রন্থ কি একটি কবিতা কি একজন মাত্র লেখকের কারণেই পুরো-সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি একটি নতুনতর দিক নির্দেশনা লাভ করলো। যেমন বোদলেয়র, যেমন টি.এস.এলিয়ট, যেমন পাস্তারনাকের 'ডঃ জিভাগো' উপন্যাস অথবা দা-ভিঞ্চির কিছু চিত্রকর্ম বা সত্যজিতের পুনঃসৃষ্ট 'পথের পাঁচালী'-প্রচলিত ধারায় এমন বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল, যা পরবর্তীদেরকে পুরনো-ধারার নিষ্ফল ও প্রায়-নিরর্থক অনুকৃতি ও গতানুগতিকতা থেকে মুক্তির সন্ধান দিল। অতএব কাজের ফিরিস্তি বড় নয়, নবতর দৃষ্টিভঙ্গির উপহারই বড়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যারা লিখেছেন, তাঁরা অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক অন্ধত্ববশত এই সত্যটিকে সজ্ঞানে অস্বীকার করেছেন, অথবা সেই কৃতিত্বের পুষ্পমাল্য বিশেষ-একটি সম্প্রদায়ভুক্ত কবি-সাহিত্যিকদের গলায় পরিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বরগুপ্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র, মাইকেল, বিহারীলাল বা বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের সবারই অবদান আধুনিক বাংলাসাহিত্যের শৈশব ও সদ্যপ্রাপ্ত কৈশোরে অত্যন্ত গরীয়ান; কিন্তু একমাত্র মাইকেল ছাড়া সবাই ছিলেন একটি প্রথাবিদ্ধ সংকীর্ণ জীবনদৃষ্টির অধিকারী। হয়ত সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে সেটাই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের নিয়ে এত বেশি অতিরঞ্জিত ও অতিশয়োক্তি হয়েছে, যা খুবই কৌতুকপ্রদ। অথচ তারা কেউ না ছিলেন টলস্টয়ের মত বিশ্ববেদনার অধিকারী, না-ছিলেন গ্যেটের মত 'সমগ্র পৃথিবীই আমার কাছে সম্প্রসারিত মাতৃভূমি' উচ্চারণ করবার মত বৈশ্বিক চেতনাসম্পন্ন। তাঁরা সবাই ছিলেন একান্তভাবে আত্মমুগ্ধ এক অতি সংকীর্ণ জগতের বাসিন্দা। বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করা যায় কিন্তু তার বিশেষ আবশ্যকতা নেই। যা বলতে চাই তা হলো, কেউ স্বীকার করুন না-করুন, হিন্দু সাহিত্যিকদের ক্রিয়াকর্ম যত বিপুলই হোক, এবং তাঁরা যত প্রতিভাবান ও পরিশ্রমীই হোন, বাংলাসাহিত্যের মানসসরোবরকে তাঁরা খুব একটা প্রশান্ত করতে পারেন নি। নানাভাবে নানা অবদানে এই সীমাবদ্ধতাকে প্রসারিত করেছেন মুসলমান সাহিত্যিকবৃন্দ। 'মহাশ্মশান' কি 'বিষাদসিন্ধু'র মধ্য দিয়ে কায়কোবাদ কি মশাররফ হোসেন যে-বিশ্বজনীন ও সর্বমানবিক বোধ ও বেদনাকে বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন, প্রচলিত সাহিত্যধারায় তার মূল্য অসামান্য। অবশ্য নান্দনিক উৎকর্ষ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়, কেউ কেউ তুলেছেনও, কিন্তু বিষয়টি খুবই বিতর্কিত। কারণ নান্দনিকতার মানদণ্ড একেবারেই আপেক্ষিক (Relative), যে-কারণে টি.এস এলিয়টের কবিতাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদগ্ধ কবি-সমালোচকেরা একদা বানর-হায়েনার চীৎকার বলে অভিহিত করতেন। অতএব শিল্পবিচারের আপাত-প্রচলিত শর্তাবলীর অধীনে আমাদের সাহিত্য সমালোচকেরা যাই বলুন, এটা সত্য যে, মীর মশাররফ ও কায়কোবাদের অসাম্প্রদায়িক বিশ্ববোধ বাংলা সাহিত্যের জন্য একটি অবিস্মরণীয় উপহার। এবং এতদসঙ্গে মুসলমানের আর একটি বড় অবদান হলো, আরবী ফারসি শব্দের বিপুল কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শব্দভাণ্ডারকে ধনাঢ্য করে তোলা। এতে গরিষ্ঠসংখ্যক বাংলাভাষীর যে-স্বাভাবিক বাক প্রবণতা, সেই দাবীও মর্যাদা পেয়েছে, বাংলাভাষার কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর নাগরিক সাহিত্যের পাশাপাশি বহুবর্ণ বহুবিচিত্র

www.pathagar.com

লোকসাহিত্যের যে-এক বিশাল প্রবাহ বয়ে চলেছে, সেখানেও নিরপেক্ষ বিচারে মুসলমান লোককবিদের প্রাধান্য মেনে নিতে হয়। ভোলা ময়রা কেষ্টা মুচি কি বহু বিখ্যাত নিধুবাবুদের অবদান অবশ্যই স্বীকার্য; কিন্তু সৈয়দ হামজা ফকির গরিবুল্লাহ প্রমুখের নানা বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ যে পুঁথি সাহিত্য তার প্রভাব এখনো বিদ্যমান। আর লালন ফকির, পাগলা কানাই, হাসন রাজা—এঁরা তো লাকসাহিত্য জগতের এক একজন মুকুটহীন সম্রাট। আর একটি অতি উল্লেখযোগ্য বিষয় ঃ বাঙ্গালীর সাহিত্য মানস দেবতা ও নারী ও প্রকৃতি বন্দনা দ্বারা যখন বিশেষভাবে অধিকৃত, তখন ইসলাম ও তওহিদ, স্বভাষা ও স্বদেশপ্রেম, মনীষীদের জীবনচরিত ও ইতিহাস চেতনার সংযোজন মুসলমানদের প্রায় একক কৃতিত্ব।

আসলে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অমুসলিম লেখকদের অবদান যত বিপুলই হোক, তার অন্তঃপ্রবাহ মাঝে মাঝেই পৌণঃপুনিকতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এবং এই দুরবস্থার মোকাবিলায় বারবারই মুসলিম সাহিত্যিকদের ফলদ আবির্ভাব। অর্থাৎ মুসলমানদের অবদান যতটা পরিমাণগত তার চেয়ে অনেক ও অধিক গুণগত, যা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি ও চলমানতাকে অবাধ ও অব্যাহত রেখেছে। কেউ অস্বীকার করলে করতে পারেন, কিন্তু এটাই নিরপেক্ষ ইতিহাস। স্মরণ করতে পারি, এমনকি আধুনিক বাংলা কবিতা যখন রবীন্দ্রবৃত্তের অধীনে রীতিমত খাঁচায় প্রহৃত বিহঙ্গের মত প্রায় অবরুদ্ধ ও অসহায়, নজরুল ইসলামের আবির্ভাববশতই সেই অসহায়ত্বের অবসান ঘটলো। রবীন্দ্রনাথের নিরর্থক অনুকরণ ছাড়াও যে বাংলা কবিতা ভিন্ন পথে ভিন্ন আঙ্গিকে অগ্রসর হতে পারে—এই সাহস ও প্রেরণার মহানায়ক নজরুল ইসলাম। এবং তিরিশোত্তর কালের সকল কবি তাদের নিজের বিকাশ ও অস্তিত্ব এবং তৎসঙ্গে বাংলা কবিতার রবীন্দ্রমুক্ত নবতর যাত্রায় নজরুল ইসলামের এই অবদানকে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষেই, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের যে-কী গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ ও দূরপ্রসারী অবদান, তা একটি সুদীর্ঘ আলোচনার বস্তু। কাজটি এখনো যথাযথভাবে সম্পাদিত হয় নি; যা-হয়েছে তা-থেকে মুসলিম লেখক ও তাঁদের রচনাসমূহের একটি সূচীপত্র জাতীয় বিশদ চিত্র পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু মুসলিম লেখক ও পাঠকের ভূমিকা যে-কী অভাবনীয়রূপে তাৎপর্যপূর্ণ, কী নিখাদ সাহস ও প্রেম ও বিশ্ববোধে গরীয়ান সে বিষয়ে যথোচিত বিবেচনা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে বিশেষ কোন কাজ হয়নি। বর্তমান নিবন্ধকার আশা করেন, কোন যোগ্য ব্যক্তি এই জরুরি কর্মটি সম্পাদনে নিশ্চয়ই কখনো ব্রতী হবেন।

অবশ্য এতদসঙ্গে আর একটি বিষয়ে আলোকপাত করা খুবই জরুরি। অতি-প্রগতিবাদীরা কী মনে করবেন জানি না, কিন্তু বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ, যা উল্লেখ না-করলে পুরো আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই বিষয়টি হলো, বাংলাভাষায় ইসলামী সাহিত্যভাণ্ডার। পবিত্র মহাগ্রন্থ কোরআনে-করীমের বহু তাফসীরগ্রন্থ, হাদীস শরীফের বহু অনুবাদ, মহানবী (সা) এর অসংখ্য পবিত্র সীরাতগ্রন্থ, সাহাবা (রা) দের জীবনচরিত ইত্যাদিসহ হাফিজ, রুমি, সাদী, ইমাম গাজ্জালী, খৈয়াম

www.pathagar.com

প্রমুখ অসংখ্য বিশ্বনন্দিত মনীষীর রচনাকর্মের অনুবাদ, এবং আমাদের বহু আলেম উলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদের মৌলিক গ্রন্থসমূহ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের যে এক বিশাল পরিমণ্ডল তৈরী হয়েছে—শিশির দাস জাতীয় অতি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া—সেই বিপুল ধনভাণ্ডার গড়ে তোলার একক কৃতিত্ব মুসলমানেরই। অবশ্য আগেই বলেছি, অতি প্রগতিবাদীরা কী মনে করবেন জানি না, অর্থাৎ এই বিশাল কর্মপ্রবাহকে তাঁরা ভাষা ও সাহিত্যের কোন কাজ বলে বিবেচনা নাও করতে পারেন। কিন্তু এতে কিছু যায় আসে না; কারণ এই 'সদ্বিবেচকদের' বিচার বোধই বড় অভিনব! কে একজন একটি চতুর্থ শ্রেণীর মার্কিনী নাটক অনুবাদ করলেন, তিনি সাহিত্যিক; 'কালকেতু উপাখ্যান' নিয়ে বই লিখলেন, তিনিও সাহিত্যিক; কিন্তু হজরত উমার (রা) কি গাজী সালাহউদ্দীনকে নিয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করলে, সেটা আর সাহিত্য পদবাচ্য হয় না। বদনসীব! এইজন্যই আল্লাহপাক এরশাদ করেন, "ফাইন্নাহা লাতামাল আবছারু ওয়ালাকি তামাল কুলুবুল্লাতি ফিছ্ছুদুর'—আসলে চোখ তো অন্ধ হয় না, অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়। অতএব এই অন্ধ হৃদয় আলোচকদের মানদণ্ড কোন মানদণ্ডই নয়; তাদের একদেশদর্শী একাক্ষ বিবেচনাকে 'সসম্ভ্রমে' পরিহার করে বাংলাদেশের অধিকাংশ পাঠক এটা পরম অনুরাগে মেনে নিয়েছে যে, ইসলামী চেতনা ও প্রেম ও বৈভবে সমৃদ্ধ যে অসংখ্য গ্রন্থ, সেই অবদান শুধু মূল্যবান নয়, অমর ও অবিনশ্বরও বটে।

যাই হোক পূর্বের আলোচনায় ফিরে আসি। বলাই বাহুল্য, সাহিত্য মানে কেবল একটি মনোজ্ঞ রসালাপ নয়, সস্তা বিনোদনও নয়। সাহিত্য একটি দেশ ও জাতির বিশ্বস্ত কণ্ঠস্বর, বিশ্বস্ত অভিজ্ঞান, জীবনের অভ্যন্তরে লালিত বিশ্বাস ও বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির একটি নির্ভুল অভিব্যক্তি। কথঞ্চিৎ গর্বের সঙ্গেই বলা যায়, মুসলমান এই অভিব্যক্তির সঠিক রূপায়নে চিরকালই যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা অভাবনীয়। মুসলিম কবি সাহিত্যিকেরা বাংলাভাষাকে কখনো পণ্য হিসাবে বিবেচনা করেন নি, খ্যাতি ও অর্থাগমের অবলম্বন হিসাবেও নয়। তাঁরা গ্রহণ করেছেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তাঁদের অস্তিত্ব ও সর্বচিত্তমথিত প্রেমের অখণ্ড অবিভাজ্য অবলম্বনরূপে। এবং এটা-যে কী অকাট্য সত্য, তার প্রমাণ অনুসন্ধানে বেশি বেগ পেতে হয় না। কেউ বলেনি, কেউ বলতেও পারেনি, অনেককাল আগে একজন মুসলমান কবি আবদুল হাকিমই বলেছিলেন, 'যেসব বঙ্গেত জন্মি হিংসা বঙ্গবাণী, সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি'। অথচ কী নিদারুণ পরিহাস, আজ যখন হিন্দীর একাধিপত্যকে আগ্রহে বরণ করে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কবি সাহিত্যিকেরা দিল্লী-বোম্বাইয়ের হাতে বিক্রয় হয়ে যাচ্ছে, একটিও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শ্রুত হয় না। কিন্তু বাঙালী মুসলমানের ভূমিকা কতই-না গৌরবের। তারা তাদের ভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে রক্তের নজরানা পেশ করে প্রমাণ করেছে, তাদের প্রেম আসলেই কত খাঁটি ও নিবিড় ও নিখাদ। আর কোন প্রকৃত-প্রেমই যেহেতু বিফলে যায় না, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের একচ্ছত্র সেবক, রথী ও মহারথীরূপে গণ্য হয়ে আসছিলো, তারা আজ হিন্দীভাষা ও ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল থেকে আগত অসংখ্য বেনিয়া এবং রাজকর্মচারীরা পদতলে নিষ্পিষ্ট করুণ করুণাপ্রার্থী কিংকরবিশেষ। এবং তাদের সাহিত্যপণ্যের বাজার

www.pathagar.com

আজ এমনভাবে সঙ্কুচিত, যা রীতিমত কৃপার উদ্রেক করে; এমনকি তাদের ভাব বিনিময়ের নৈমিত্তিক প্রাত্যহিক মুখের ভাষাও আজ বদলে যাচ্ছে। এবং এই কটাক্ষও তাদের হাসিমুখে পরিপাক করতে হয়— 'বিব্‌সা অওর চাক্‌রি নোক্‌রি তুম লোগ হামারা পাস ছোড় দো; তুম রবীন্দ্র ছংগীত গাও অওর কিতাব লিখো'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঢাকা এসে একদা বলেছিলেন- এই ঢাকাই হবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গতিনির্ধারক প্রাণকেন্দ্র। কথাটি তিনি বলেছিলেন 'আনন্দ' পুরস্কারলিপ্সু ঢাকার কিছু লেখকের মনরক্ষার জন্য নয়, মন পাওয়ার জন্যও নয়; বলেছিলেন মনের দুঃখে এবং কথাটি সর্বাংশে সত্য। অর্থাৎ সেই ভবিষ্যত অত্যাসন্ন যখন পালতোলা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের জাহাজসমূহের অধিকাংশ নাবিক হবে মুসলমান। কারণ দিল্লীর 'বিচক্ষণতায়' কলকাতার অন্য অনেককিছুর মত জীবন এবং ভাবসম্পদও বিস্তরভাবে লুণ্ঠিত ও অপহৃত হয়ে যাচ্ছে। এই দুর্ভাগ্য অপ্রতিরোধ্য, কলকাতা এখন এক সমূহ দীর্ঘশ্বাসের নগরী। ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি সত্যই বড় রহস্যময় ও কুহেলিকাপূর্ণ। বইয়ের বাজার-সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ-সত্যজিতের কলকাতা এখন তৃষ্ণার্ত চাতকের মত চেয়ে থাকে একদা উপেক্ষিত শতকরা নব্বই ভাগ 'চাষাভুষো' মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশ ও ঢাকা নগরীর ক্রেতা বিক্রেতাদের করুণাশ্রিত আনুকুল্যের দিকে। সত্যই বড় রহস্যময় ও কুহেলিকাপূর্ণ ইতিহাসের অভিপ্রায় ও গতিপ্রকৃতি! ভেদবুদ্ধিসর্বস্ব, সাম্প্রদায়িক ও অনুদার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতি সজ্ঞানে অমনোযোগী সাহিত্যিকদের অসূয়ালালিত প্রাধান্য প্রবল রূপ ধারণ করলে, এই রকমই হয়। এটাই প্রকৃতির প্রতিশোধ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশেষ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানী শব্দ

[রবীন্দ্রনাথ ও আবুল ফজলের পত্র]

লেখক-পরিচিতি ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জন্ম ঃ ৭ মে ১৮৬১; ২৫ বৈশাখ ১২৬৮, জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার, কলকাতা। মৃত্যু ঃ ২২ শ্রাবণ; ৭ আগস্ট ১৯৪১। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এক অসাধারণ প্রতিভা। তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি–গীতাঞ্জলী, যার জন্য তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। মূলত রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলাম—এ দুজন কবি এখনো পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছেন।

আবুল ফজল ঃ জন্ম ঃ ১ জুলাই ১৯০৩, কাজির পাড়া, কেউচিয়া, সাতকানিয়া। মৃত্যু ঃ ৪ এপ্রিল ১৯৮৩। শিক্ষা ঃ এম. এ. (বাংলা) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পেশা ঃ বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা ও সরকারী কলেজে অধ্যাপনা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা সদস্য।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ চৌচির (১৯৩৪), সাহসিকা (১৯৪৭), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৯৪৮), জীবনপথের যাত্রী (১৯৪৮), রাঙ্গাপ্রভাত (১৯৫৭)। গল্প ঃ মাটির পৃথিবী (১৯৩৪), আয়েষা (১৯৪০), মৃতের আত্মহত্যা (১৯৭৮), আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৬৩)। নাটক ঃ আলোক লতা (১৯৩৪), একটি সকাল (১৯৩৪), কায়েদে আজম (১৯৪৭), প্রগতি (১৯৪৮), স্বয়ম্বরা। প্রবন্ধ ঃ বিচিত্র কথা (১৯৪০), সাহিত্য সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬০), সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন, সাংবাদিক মুজিবর রহমান, বিদ্রোহী কবি নজরুল, সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র (১৯৬৮), শুভবুদ্ধি (১৯৭৪), সমকালীন চিন্তা (১৯৭৪), সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৭৪)। ধর্ম বিষয়ক ঃ কোরানের বাণী (১৯৭৩), হাদিসের বাণী (১৯৬১)। জীবনী ঃ হযরত আলী (১৯৬৮)। স্মৃতিকথা ঃ রেখাচিত্র (১৯৬৫)। সংকলন ঃ সপ্তবর্ণা (১৯৬৩)। পুরস্কার ঃ উপন্যাসে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, (১৯৬২)। প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় সাহিত্য পুরস্কার ১৯৬৩। আদমজী সাহিত্য পুরস্কার ১৯৬৬। নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক, ১৯৮০। মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮১। আবদুল হাই সাহিত্য পদক, ১৯৮২।

লেখা-পরিচিতি ঃ পত্রদুটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সওগাত' পত্রিকায়। পরে 'বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ', প্রকাশকাল, জুন ১৯৮৫ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়। পত্রদুটির প্রকাশকালের কোনো উল্লেখ নেই। তবে আবুল ফজলের শেষ চিঠিতে ১৯. ৯. ৪১ তারিখের ব্যবহার দেখে অনুমান করা যায় এটি ৪১ সালের পরে 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়েছিল।

আবুল ফজলের পত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু, চিটাগাং

এই অকিঞ্চিৎকর লেখাগুলির* স্থান বিশেষও যদি রবির স্নেহ–রশ্মিপাতে ধন্য হয়, তবে এই নগণ্য লেখকের ক্ষীণ প্রচেষ্টাও সার্থক বিবেচিত হইবে। গল্প-গ্রন্থ দুটিতে বঙ্গের পূর্ব্বে সীমান্তবাসী মুসলমান সমাজ ও পরিবার জীবনের কিছু কিছু ছবি আঁকবার চেষ্টা করা হয়েছে, ফলে তাহাদের মুখের ও জীবনের, সাহিত্যে এখনো অপ্রচলিত, বহু শব্দ ও প্রকাশ–ভঙ্গিমা বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং আমার বিশ্বাস মুসলমান সমাজের ছবি আঁকতে গেলেই এ রকম বহু অপ্রচলিত শব্দ বাঙলা ভাষাকে হজম করতেই হবে।

মুসলমান নায়িকা মুসলমান নায়ককে দস্তরখানা বিছিয়ে নাস্তা পরিবেশন করেছে, বহু ভেবেও এরকম বাক্যকে বিশুদ্ধ বাঙলায় পরিবর্ত্তিত করতে পারিনি। অথচ দস্তরখানার

www.pathagar.com

কোন বাঙলা প্রতিশব্দ আমি খুঁজে পাইনি, তৈয়ের করে নিতেও পারেনি। অথচ দস্তরখানা মুসলমান পরিবারে রোজ চার বেলাই ব্যবহার করা হয়। নাস্তার প্রতিশব্দ জোর করে হয়ত 'জলখাবার' করা যায়, কিন্তু তা করলে মুসলমানের কানে তা শব্দের 'শুদ্ধি করণে'র মতই শোনাবে। আর নিশ্চিত মুসলমান জীবনে ও শব্দের ব্যবহার ঘরোয়া না হয়ে পোষাকী হয়েই থাকবে (আমি অবশ্য আমার পূর্ব্ব বঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকেই বল্‌ছি)। হাসান সোরওয়ার্দ্দীর বাড়ির ভোজে আমার নিমন্ত্রণ আছে বলে না, বল্লে অনুবাদের মত শোনাবে। এই মাসের মাসিক সওগাত পত্রিকায় একটি চমৎকার খবর পড়লাম। খবরটি এই, পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়, তাঁর পুত্র এবং মুজীবর রহমান ('মুসলমান' পত্রিকার পরলোকগত সম্পাদক) একবার ট্রেনে সহযাত্রী ছিলেন। আহারের সময় উপস্থিত হলে বাবা তখনই খাবেন কি না, পুত্র জিজ্ঞাসা করেন। পণ্ডিতজী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, 'খাহেশ ন্যাহি হ্যায়'; কিন্তু 'খাহেশ' শব্দটী আধা উচ্চারণ করেই পণ্ডিতজী পিছিয়ে গেলেন ও বল্লেন ঃ 'ইচ্ছা ন্যাহি হ্যায়'। এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি থেকে এই মহাপুরুষের সমগ্র সাধনা ও আদর্শবাদের একটা আভাষ পাওয়া গেল। কিন্তু এই আদর্শ সাহিত্য-সেবীর কাছে শ্রদ্ধার দাবী করতে পারার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে কি? যে-জীবনকে অবলম্বন করে সাহিত্য রূপ নেবে, সেই জীবনের পরিবেষ্টনকে বাদ দিয়ে সেই সাহিত্যের ভাষার অন্য কোন স্বধর্ম আশা করা যায় কিনা ভাববার বিষয়। ব্যাকরণ ও অভিধান ঘেটেই সম্ভবত সেই স্বধর্ম খুঁজে বের করতে হবে।

এই বিষয়ে আপনার আরও কিছু মন্তব্য জানতে পারলে উপকৃত হতাম, কিন্তু আপনার ক্ষীণ স্বাস্থ্যের উপর আরও দাবী জানাতে লজ্জা ও সঙ্কোচ অনুভব করছি। যে-টুকু অপরাধ করলাম আশা করি তা নিজগুণেই ক্ষমা করবেন ।   ইতি– ৩১.৮.৪০

শ্রদ্ধাবনত

আবুল ফজল

[পত্র-প্রেরকের চৌচির, মাটির পৃথিবী ও বিচিত্র কথা নামক তিনখানি গ্রন্থ]

রবীন্দ্রনাথের পত্র

বিনয় সম্ভাষণ,

কিছুদিন হ'তে দৃষ্টিক্ষীণতাবশত পড়াশুনা করতে কষ্ট হয়। ডাক্তার চোখকে বিশ্রাম দিতে বলেন। ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আচারের পার্থক্য ও মনস্তত্ত্বের বিশেষত্ব অনুবর্ত্তন না করলে ভাষার সার্থকতাই থাকে না। তথাপি ভাষার নমনীয়তার একটা সীমা আছে। ভাষার যেটা মূল স্বভাব তার অত্যন্ত প্রতিকূলতা করলে ভাব প্রকাশের বাহনকে অকর্মণ্য করে ফেলা হয়। প্রয়োজনের তাগিদে ভাষা বহুকাল থেকে বিস্তর নতুন কথার আমদানী করে এসেছে। বাংলা ভাষায় পারসী আরবী শব্দের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু তারা সহজেই স্থান পেয়েচে। প্রতিদিন একটা দুটো করে ইংরেজী শব্দও আমাদের ব্যবহারের মধ্যে প্রবেশ করচে। ভাষার মূল প্রকৃতির স্কন্ধে একটা বিধান আছে যার দ্বারা নূতন শব্দের যাচাই হতে থাকে, গায়ের জোরে সেই বিধান না মানলে জারজ শব্দ

www.pathagar.com

কিছুতেই জাতে ওঠে না। ইংরেজি ভাষার দিকে তাকিয়ে দেখলে আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন। ওয়েলস্ আইরিশ স্কচ ভাষা ইংরেজি ভাষার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, ব্রিটনের ঐ সকল উপজাতিরা আপন আত্মীয় মহলে ঐ সকল উপভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে স্বভাবতই ব্যবহার করে থাকেন কিন্তু যে সাধারণ ইংরেজি ভাষা তাঁদের সাহিত্যের ভাষা ঐ শব্দগুলি তার আসার জবরদস্তি করতে পারে না। এই জন্যেই ঐ সাধারণ ভাষা আপন নিত্য আদর্শ রক্ষা করে চল্‌তে পেরেছে। নইলে ব্যক্তিগত খেয়াল অনুসারে নিয়ত তার বিকার ঘটত। "খুনখারাবি" শব্দটা ভাষা সহজেই মেনে নিয়েছে, আমরা তাকে যদি না মানি তবে তাকে বলব গোঁড়ামি। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন শব্দকে ভাষা স্বীকার করেনি, কোন বিশেষ পরিবারে বা সম্প্রদায়ে ঐ অর্থই অভ্যস্ত হতে পারে তবু সাধারণ বাংলা ভাষায় ঐ অর্থে চালাতে গেলে ভাষা বিমুখ হবে। শক্তিমান মুসলমান লেখকরা বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবন যাত্রার বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে করেন নি, এ অভাব সম্প্রদায় নির্বিশেষে সাহিত্যের অভাব। এই জীবন যাত্রার যথোচিত পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। পরিচয় দেবার উপলক্ষে মুসলমান সমাজের নিত্য ব্যবহৃত শব্দ যদি ভাষায় স্বতই প্রবেশ লাভ করে তবে তাতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে না, বরং বলবৃদ্ধি হবে, বাংলা ভাষার অভিব্যক্তির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে।

আপনার চৌচির গল্পটি আমার দৃষ্টিকে ক্লিষ্ট করেও পড়েচি। আমার পক্ষে এ গল্প বিশেষ ঔৎসুক্যজনক। আধুনিক-মুসলমান সমাজের সমস্যা ঐ সমাজের অন্তরের দিক থেকে জানতে হলে সাহিত্যের পথ দিয়ে জানতে হবে—এর প্রয়োজন আমি বিশেষ করেই অনুভব করি। আপনাদের মতো লেখকদের হাত থেকে এই অভাব যথেষ্টভাবে পূর্ণ হতে থাকবে এই আশা করে রইলুম। দুর্দৈবক্রমে বাংলাদেশের আধখানা সাহিত্যের আলো যদি না পড়ে তা হলে আমার বাংলাদেশকে চিন্‌তে পারব না, না পারলে তার সঙ্গে ব্যবহারে ভুল ঘট্‌তে থাকবে। কিন্তু এই পরিচয় স্থাপন ব্যাপারে কোন একটা জিদ বশত ভাষার প্রতি যদি নির্মমতা করেন তা হলে উল্টো ফল ফলবে। এই উল্টো ফল ফলাবার অধ্যবসায়ে বাংলাদেশ আজ কণ্টকিত। চোখ একটু সুস্থ হলে আপনার অন্য দুটি বই পড়বার চেষ্টা করব। একটু আধটু যা চেয়ে দেখতে পেরেছি তাতে বোধ হয়েছে আপনার লেখনীর অবাধগতি আছে। ইতি ৬-৯-৪০

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবুল ফজলের জবাব

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ভাষার নমনীয়তা সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মনে হয় যে ভাষায় লেখক লিখ্‌বেন তার প্রাণধারার সঙ্গে যদি লেখকের পরিচয় গভীর হয়, সেই ভাষার মূল প্রকৃতির সন্ধান পেতে তাঁর হয়ত বেগ পেতে হয় না। এইজন্য, আমার বিশ্বাস লেখক মাত্রেরই ভাষার ইতিহাস ও তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে পরিচয় রাখা উচিত। আমাদের অনেক লেখকের রচনায় এই পরিচয়ের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

ভাষার মূল প্রকৃতি যদি লেখকের আয়ত্ত হয়, তা'হলে অপ্রচলিত শব্দও প্রয়োগনৈপুণ্যে ভাষার গায়ে বেমালুম স্থান করে নিতে পারে। আপনার রচনার আশ্রয় নিচ্ছি।—

"তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁকে
মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি।
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক
নদীর জলে নাহিক চলে কিস্তি।" [জুতা আবিষ্কার]

'মশক' ও 'ভিস্তি' শব্দের কোন প্রতিশব্দ বাঙলায় নেই। কিস্তি শব্দের আছে এবং এক দাবা খেলোয়াড় ছাড়া বাঙলা ভাষাভাষী মুসলমানেরাও নৌকা অর্থে কিস্তি সাধারণ কথাবার্ত্তায় কি লেখায় ব্যবহার করে না; তবুও ঐ শব্দের প্রয়োগ এখানে এমন চমৎকার হয়েছে যে কোন গোঁড়া পাঠকও ঐ শব্দ ব্যবহারের জন্য কোন আপত্তি করেছেন বা করবেন, এমন দুর্দ্দিনের কল্পনা করা যায় না।

আপনি যে 'খুন' শব্দের কথা বলেছেন তার বিচিত্র প্রয়োগ আমাদের ভাষা স্বীকার করে নিয়েছে। হত্যা অর্থে খুন, যেমন–কাল পদ্মার চরে দুটো খুন হয়েছে, বলা চলে। খুনীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বা একটা খুনোখুনী ব্যাপার ঘটেছে, মুখে ও সাহিত্যে সচল বলেই বোধ হচ্ছে। রাজশেখর বাবুর অভিধানে (চলন্তিকায়) 'খুনচড়া' শব্দটিও দেখলাম এবং তিনি তার অর্থ দিয়েছেন, 'ক্রোধে রক্ত গরম হওয়া'। আমাদের ভাষায় এই খুন শব্দটির অর্থ ব্যাপ্তি ঘটেছে, যেমন, ছেলেটি হেসেই খুন, অথবা—

'শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হল খুন' [জুতা আবিষ্কার]

একটি লোক খুন হয়েছে, লোকটি খুনী, খুনোখুনী ব্যাপার ইত্যাদি প্রয়োগের সঙ্গে রক্তের আভাস পাঠকের মনে আসে এবং রক্ত অর্থে খুন শব্দটি আমাদের ভাষার অভিধানে স্থান পেয়েছে। রাজশেখর বাবু ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্তের অভিধানে রক্ত অর্থে খুন শব্দ দেখেছি। অন্য অভিধান হাতের কাছে নেই বলে যাচাই করতে পারিনি। অভিধান ভাষার শব্দ সম্পদের ভাণ্ডার বলেই অভিধানের দোহাই পাড়লাম, না হয় অভিধান সামনে রেখে কেউ সাহিত্য সৃষ্টি করেন বা করবেন তেমন বিশ্বাস আমার নয়। ভাষার অভিধানে স্থান পেলেই শব্দ জাতে উঠল বলা যেতে পারে। কিন্তু মনে হয় তার চলিষ্ণুতা নির্ভর করবে, সাহিত্য-স্রষ্টার প্রয়োগনৈপুণ্যের উপরই। বিচিত্রসম্ভবা 'খুন' শব্দটি নানাভাবে আমাদের মুখ ও কানের সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে পড়েছে, কালে হয়ত 'রক্ত' অর্থেও আমাদের ভাষা এই শব্দটিকে স্বীকার করে নেবে। যাঁর লেখনীর যাদুস্পর্শে 'নৌকা' অর্থে 'কিস্তি' আমাদের সাহিত্যে স্থান লাভ করছে এবং আজও নিত্য–নূতন শব্দ স্থান লাভ করছে, হয় ত কোনদিন তাঁরি লেখনির অমর স্পর্শে এই সুপরিচিত শব্দটিও 'রক্ত' অর্থেই স্বীকৃতি পাবে।

আজকাল কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী শব্দের উচ্চারণ বা বানানে বিশুদ্ধিকরণের প্রয়াস লক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু যে সব স্বাভাবিক নিয়মে বাঙ্গালীর মুখে ও রচনায় ব্যবহার হতে হতে একটা নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাকে বৈদেশিক উচ্চারণ ও বানান অনুযায়ী লিখতে প্রয়াস বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয় না; যেমন হাসপাতালকে হস্‌পিটেল, বাক্সকে বক্স বা

www.pathagar.com

নম্বরকে নাম্বার লেখা; উর্দু নেহায়েৎ আলাহিদা বা আরবী জওয়াব আমাদের ভাষায় বহু ব্যবহারে রূপান্তর পরিগ্রহ করেছে নেহাৎ, আলাদা ও জবাবরূপে। মূল ভাষার উচ্চারণ ধরে আজ তাকে বিশুদ্ধিকরণের চেষ্টা করা অর্থহীন বলেই মনে হয়। ইদানীং সুনীতি বাবুও এই মত সমর্থন করেছেন।

মাঝে মাঝে দেখা যায়, জনসাধারণের মুখে মুখেই বিদেশী শব্দ চমৎকাররূপে রূপান্তরিত হয়ে সচল হয়ে উঠেছে; মনে হয় হাসপাতাল, বাক্স, বিজলি বাতি প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিকের সহায়তা ছাড়াই জনসাধারণ মুখে মুখে তৈয়ার করে নিয়েছে। আমাদের এই অঞ্চলে সাধারণে Torch light এর বাঙলা করে নিয়েছে 'টিপ্ বাত্তি' এবং এই শব্দ ব্যাপকভাবেই প্রচলিত। শুনেছি চট্টগ্রামের সমুদ্রগামী মাঝিমাল্লারা Torpedo কে বলে 'তলপেডা', ধ্বনিগত সাম্য বজায় রাখার জন্যে আমরা না হয় তাকে 'তলপেডো' করে নিতে পারি। আমাদের দোকানদারেরা তাঁদের কর্ম্মচারীদের পূরা বেতনে যে privilage leave দেন, তার অনুবাদ করে নিয়েছে 'অনুগ্রহ বিদায়'। অনুবাদ নেহাৎ মন্দ হয়েছে বলে মনে হয় না। বাঙলা ভাষা যদি আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের বস্তু না হয়, তাহলে তার প্রসার ও সমৃদ্ধি আশা করা যায় না। কোন কোন বিষয়ে শব্দ সম্পদের দিক দিয়ে বাঙলা ভাষা দরিদ্র স্বীকার করি, কিন্তু আমার বিশ্বাস প্রতিদিনের ব্যবহার ও তার প্রয়োজনে নিত্য নূতন শব্দ সৃষ্টি হবে এবং এই সৃষ্টি শুধু সংস্কৃত ধাতু থেকেই করতে হবে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়মও চল্‌বে বলে মনে হয় না। এই কাজে আমরা খুব সহায়তা পাব আমাদের অফুরন্ত গ্রাম্য শব্দসম্পদের কাছে। নৌকার তিন-চারটা অংশের নাম হয়ত আমরা শিক্ষিত লোকেরা জানি; কিন্তু নৌকার মাঝি হয়ত পঞ্চাশটা অংশের পঞ্চাশটা নাম বল্‌তে পারবে, ঘর সম্বন্ধেও আমাদের সাহিত্যিক শব্দ ঐরকম শোচনীয়ভাবেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ বা ঘরামি একটা চালেরই হয়ত বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম বল্‌তে পারবে।

বাঙলার পল্লীচাষীর জীবনের ছবি আঁকতে গেলে বাঙালী সাহিত্যিক ত শব্দের অভাবে চাষীর ঘর দুয়ারের ও জীবনযাত্রার একটা খাঁটি বর্ণনাই দিতে পারবেন না। বাঙলার, চাষীমজুর, তাঁতীজেলে মাঝিমাল্লা, যারা দেশের মাটি কামড়ে পড়ে আছে, তাদের জীবনের ছবি এখনো আমাদের সাহিত্যে ফুটে ওঠেনি এবং এদের জীবনের যথাযথ ছবি আঁকবার চেষ্টা করলেই আমাদের সাহিত্যিক ভাষার দারিদ্র্য সহজেই উপলব্ধি হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের ভাষা যদি আমাদের প্রতি কাজের ভাষারূপে ব্যবহৃত হয় তাহলেই এই দারিদ্র্যের প্রতিকার হতে পারে। এখন আমরা নেহাৎ ঘরোয়া কাজেও অনাবশ্যক বিদেশী ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকি। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনকে চিঠি লিখব তাও লিখি ইংরেজীতে। সরকারী দপ্তরের কথা ছেড়েই দিলাম, যেখানে আমাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে সেখানেও আমরা ইংরেজীর আশ্রয় নিয়ে থাকি; বেসরকারী স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপ্যালিটি করপোরেশন, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, পত্রিকা আপিস ইত্যাদির হিসাবনিকাশ, চিঠিপত্র অবাধেই বাঙলায় চল্‌তে পারে; প্রদেশের বাইরে যেসব চিঠিপত্র যাবে তার

www.pathagar.com

ইংরেজী অনুবাদের ব্যবস্থা রাখলেই কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ব্যবহারের ভিতর দিয়েই আমরা আমাদের ভাষার অভাব ও প্রয়োজনীয়তার পরিচয় লাভ করব। এই অভাব ও প্রয়োজনীয়তা মিটবেই, সচল ভাষা নিশ্চল হয়ে থাকতে পারে না, পারে না বলেই 'বিজলী বাতি,' 'বোমারু,' 'টিপ্‌বাত্তি,' 'অনুগ্রহ বিদায়' 'আকস্মিক বিদায় (casual leave) সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

বাঙলা ভাষার দারিদ্র্যের আর একটা দিকেও আমাদের শিক্ষিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের। বাঙলা ভাষা, সাহিত্য ও দেশ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যা গবেষণা হয়েছে, তার বেশীর ভাগই ইংরেজী ভাষায় লিখিত। গবেষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা উপাধি যেমন ডি,লিট্‌; পি,এইচ্‌,ডি,; পি,আর,এস, ইত্যাদি পেয়েছেন তাঁদের গবেষণা বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী ভাষাতেই প্রকাশ করেছেন। এতে গবেষক পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের শক্তির ও গবেষণার ফলাফল বাঙলার বাইরেও প্রচারের সুবিধা হল বটে, কিন্তু বাঙলা ভাষার দারিদ্র্য ত ঘুচল না। বাঙলা ভাষায় লিখে পি,এইচ,ডি; ডি,লিট্‌ পেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুনে কোন বাধা আছে কিনা জানি না, যদি থাকে এই অযৌক্তিক বাধা যত শীঘ্র দূর হয় ততই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের মঙ্গল। এই বিষয় আপনি একটু ইঙ্গিৎ করলেই বোধ হয় এই বেড়া উঠে যেতে পারে। এই সব কথা লিখে আপনাকে বিরক্ত করার কারণ, আপনি আমাদের ভাষার ক্ষীণ স্রোতস্বতীকে মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত করে দিয়েছেন, এখনো এর গতিপথে যত বাধা ও বাঁধন আপনিই তা অনায়াসে দূর করতে পারেন। আপনি লিখেছেন "বাঙলা দেশের আধখানায় সাহিত্যের আলো পড়েনি," অতি কঠোর সত্য কথা। যদি বেয়াদবি মনে না করেন তবে এই প্রসঙ্গে আমার ও আমার বন্ধুগণের দীর্ঘ দিনের একটি প্রশ্ন উত্থাপন করি। বাঙলা সাহিত্যের অনির্ব্বাণ ভাস্কর পর্য্যন্ত এই আধখানা বাঙলার দিকে ফিরে তাকাননি,–রবির কিরণে বিশ্ব আলোকিত হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, বাঙলার মাটির আঙিনায় রবির আলোকপাত হল না! এর যথাযথ কারণ আমরা ধারণা করতে পারছি না। শুনেছি 'গল্পগুচ্ছে'র অনবদ্য গল্পগুলি শিলাইদহে আপনাদের জমিদারীতে বসেই লেখা, শিলাইদহের মুসলমান প্রজামণ্ডলীর মধ্যে আপনার কি আসন তা শ্রীযুক্ত সুকান্ত রায় চৌধুরীর প্রবন্ধ না পড়েও আমরা আন্দাজ করতে পারি; অথচ এদের জীবন আপনার কোন সাহিত্য প্রচেষ্টার উপাদান হতে পারল না। মনে হয় আসল কথা, মানুষের বাইরের চেহারা বা তার সঙ্গে বাহ্যিক সম্বন্ধ যতটুকু না সাহিত্যের উপদান, তার অন্তরের চেহারা তার থেকে বহুগুণ বেশী সাহিত্য সৃষ্টির কারণ ও প্রেরণা যোগাতে পারে। কিন্তু বঙ্গদেশের এক বৃহৎ অংশের অন্তরলোকে প্রবেশ করার কোন প্রয়াস কোন দিক থেকেই লক্ষিত হচ্ছে না, বরং রাষ্ট্র নেতা ও সংবাদপত্র সম্পাদকগণের দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা দিন দিন হিন্দু ও মুসলমানের ব্যবধানকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।

www.pathagar.com

আমাদের সামনে আদর্শ কি? হয় আমাদের বাঙালী জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে হবে, না হয় পৃথক পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে একটা বোঝাপড়া করে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হবে। বাঙালী জাতি গঠনই যদি আমাদের আদর্শ হয় তা হ'লে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য আমাদের ত্যাগ করে উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিই গ্রহণ করতে হবে, প্রয়োজন হলে উভয় সম্প্রদায়ের অনাপত্তিকর নূতন আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য তৈয়ার করে নিতে হবে, তখন আমাদের শুধু অন্নবস্ত্রে এক হলে চলবে না, রক্তেও এক হওয়ার সাধনা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তখন আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বহু বেড়া আলগা করতে হবে ও বহু ধারণা আমাদের বদলাতে হবে। যদি পরস্পরের তথাকথিত বৈশিষ্ট্য আমরা ছাড়তে না পারি, তা হলে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় হিসেবেই আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হবে, তখন প্রতি ক্ষেত্রে একটা বোঝাপাড়ার প্রয়োজন হবে। তখন ভাগ বাটোয়ারার গাণিতিক নির্ভুলতাই হবে আমাদের সাধনা ও আদর্শ।

ভবিষ্যৎ বঙ্গসন্তানদের পক্ষে কোন্ সাধনা অধিকতর কাম্য হবে কে জানে?

আমাদের জীবন পথে রবির আলোকপাত হউক। ইতি- ১৯-৯-৪১

শ্রদ্ধাবনত

আবুল ফজল

www.pathagar.com

একখানি পত্র

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

লেখক-পরিচিতি ঃ জন্ম ঃ ২৬ অক্টোবর ১৯৮৮, কাঁচড়াপাড়া গ্রাম, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ। মৃত্যু ঃ ২৬ জুলাই ১৯৫২। পেশা ঃ শিক্ষকতা, অধ্যাপনা।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য : স্বপনপসারী (১৩২৮), বিস্মরণী (১৩৩৩), স্মরগরল (১৩৪৩), হেমন্ত গোধূলি (১৩৪৮)। প্রবন্ধ সমালোচনা ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্য (১৩৪৩), সাহিত্য কথা (১৩৪৫) প্রভৃতি।

লেখা-পরিচিতি ঃ মোহাম্মদ শাকের উল্লাহ সম্পাদিত 'উষালোকে', নভেম্বর, ১৯৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত।

[কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) এই বিখ্যাত পত্র-নিবন্ধটি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের এক অসামান্য দলিল। সাহিত্যের ছাত্র মাত্রই অবগত আছেন যে, নজরুলের উন্মেষ যুগে তাঁর কাব্য-প্রতিভাকে 'বাঙ্গলার সারস্বত মণ্ডপে' অনির্বচনীয় ভাষায় 'স্বাগত-সম্ভাষণ' জানিয়েছিলেন তীক্ষ্ণধী সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার। আর এ কারণেই 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় (১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা; ভাদ্র ১৩২৭) প্রকাশিত মোহিতলালের এই পূর্ণাঙ্গ পত্র-নিবন্ধ- 'একখানি পত্র' থেকে অংশবিশেষ বহুবার উদ্ধৃত ও বহু পঠিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এমনকি অন্যত্র নিবন্ধ হিশাবে মুদ্রিত হ'লেও 'একখানি পত্রে'র মূল রূপ-সৌকর্য (শিরোনাম সমেত) পরবর্তীতে আর অক্ষুণ্ন থাকেনি। পত্র-নিবন্ধটি এক সময়ে 'বাংলা সাহিত্যের নব রূপায়ণ' শিরোনামে বেনজীর আহমদ সম্পাদিত (মেট্রিকুলেশনের জন্য পাঠ্য) "বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থে (১৯৫৬) সংকলিত হয়। বলাবাহুল্য, পত্র-নিবন্ধের ফুটনোট দুটি 'মোসলেম ভারত' সম্পাদক মোজাম্মেল হকের। - আহমদ আখতার]

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

আপনার পত্রিকার দুই সংখ্যা সম্প্রতি পাঠ করিয়া যে আনন্দ আশা ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়াছি তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটী লিখিয়া পাঠাইলাম, যদি আবশ্যক মনে করেন পত্রিকায় মুদ্রিত করিবেন।

মুসলমান সমাজের নব জাগরণের অনেক লক্ষণ সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গলা দেশে সেই লক্ষণ নিশ্চয় হইয়া উঠিয়াছে বাঙ্গালী মুসলমানের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সাধনায়। আমি যতদূর লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে আপনার এই 'মোসলেম ভারত' পত্রে সে সাধনার সিদ্ধির পরিচয় আছে। নিশ্চয়ই নির্জ্জন ও অপেক্ষাকৃত অপ্রকাশ সাধনার অবকাশে মুসলমান ভ্রাতৃগণ পূর্ব্ব হইতেই অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, নতুবা সহসা এমন সুন্দর ভাষা ও উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভব হইত না।

আমার অনেক দিন হইতে একটা ক্ষোভ ছিল এই, যে বাঙ্গালী হইয়া মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন থাকায়, মুসলমানগণ আমাদের এই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের ধন সাহিত্য ও ভাষাকে তাহার পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে দিতেছেন না, এবং নিজেরাও তাঁহাদের হৃদয়-নিহিত মনুষ্যত্বের স্বধর্ম ও স্বকীয় সাধনার বিশিষ্ট সৌন্দর্যের অবাধ স্ফূর্ত্তির অভাবে প্রাণে-মনে পঙ্গু হইয়া রহিলেন। কেননা, পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, যে শব্দ, যে

www.pathagar.com

বাণী মানবাত্মার হৃদয়-রহস্যের একমাত্র প্রকাশপন্থা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া নিরঞ্জর গুহাশায়ী অন্তরদেবতা জীবনলীলায় মূর্ত্তি ধারণ করেন-সেই বাক্, সেই ব্যক্তিত্বাবগুণ্ঠিত ব্রহ্মের আত্মসৃষ্টি বা আত্ম-প্রসারের আদি চেষ্টা মাতৃভাষাতেই সম্ভব। সেই বাণীকে অবহেলা করিলে আপনাকেই হারাইতে হয়। আত্মবিস্মৃত মুসলমান-সমাজ যেন যুগ-ধর্মবেশে অবশে অজ্ঞাতে সেই সাধনামন্ত্র প্রাণ-কর্ণে শুনিয়েছেন, তাই আজ বোধ হইতেছে, তাঁহারা আপনাকে এবং জাতিকে এতদিনে চিনিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে আমাদিগকেও সেই সত্য-সুন্দর বিচিত্র-মধুর স্বরূপ দেখাইতে সমর্থ হইবেন। নহিলে এই সাহিত্যসাধনার মধ্যে তাঁহারা যে খাঁটি বাঙ্গালী, এই প্রচ্ছন্ন সত্য কেমন করিয়া এমন প্রকট হইয়া উঠিল?

এইবার এক নূতন রসধারা, নবজীবনের আবেগ-প্রবাহে, আমার এই অতি আদরের, আজন্ম-সাধনার, শ্রেষ্ঠ অনুচিকীর্ষার ধন বঙ্গ-সাহিত্যের অকাল প্রৌঢ়ত্ব মোচন করিয়া, তাহার অঙ্গে-অঙ্গে যৌবন-হিল্লোল সঞ্চারিত করিবে। পারস্যের গোলাব-বাগিচার বুলবুল তাহার বৈতালিক হইবে, আরবের মরু-প্রান্তরে দূর মরুদ্যানের খর্জ্জুরকুঞ্জের আড়াল দিয়া যে বৃহৎ চন্দ্রোদয় হয়, তাহার আলোকে বঙ্গ ভারতীয় জরীন শাড়ী ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিবে। অনন্ত বালু রাশির দৈনন্দিন দহনজ্বালা নিরুদ্দেশ মরুসমীরণের প্রদোষকালীন হাহাশ্বাস, নিশীথ আকাশের দিগন্তবিসর্পী মহামৌনী নক্ষত্রসভা- জাগরণ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির ত্রিসন্ধ্যার ত্রিবিধ মন্ত্রে বঙ্গভারতীর অর্চ্চনা-রতি হইবে। একটা অভিনব সম্ভাবনা, অপূর্ব্ব সম্পদ, নূতন সুর-সংযোজনার আশা আমাকে সত্যই চঞ্চল করিয়াছেল।

পত্রিকার প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনার মত সুন্দর কিছু এ পর্য্যন্ত চোখে পড়ে নাই। যেন, সাহিত্যের যে সব সাধনায় আপনারা ব্রতী হইয়াছেন, তাহার ভাবগত আদর্শকে তুলিকার সাহায্যে চক্ষুগোচর করা হইয়াছে—, কি সুসংযত সুষমা! বাণীর কি পবিত্র সুন্দর পুষ্পপীঠিকা! আমার নিবেদন, যদি সম্ভব হয়, তবে জগদ্‌বিখ্যাত পারস্য কারু-শিল্পের (decorative art) এই জাতীয় চিত্রলিপি মুদ্রিত করিবেন; পারস্যের out-idea, এই চাক্ষুষ বিগ্রহের সহিত বঙ্গীয় পাঠকের পরিচয় সাধন করিবার অন্য উপায় দেখি না।*

মুসলমান লেখকের সকল রচনাই চমৎকার। কিন্তু যাহা আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কবি লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহু দিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাঙ্গলা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে, তাঁহার প্রতিভা যে সুন্দরী ও শক্তিশালিনী-এক কথায়, সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা যে তাঁহার মনোগৃহে সত্যই জন্মলাভ করিয়াছে, তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ তাঁহার ভাব, ভাষা ও ছন্দ। আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গলার সারস্বত-মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি

---

* 'মোসলেম ভারত'-এর প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা পারস্য কারুশিল্পের নিদর্শন নহে, উহা আরবীয় শিল্প-কলার মূর্ত্তবিকাশ। এই জাতীয় বহু চিত্র-লিপি প্রকাশ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহা বহু ব্যয়সাপেক্ষ। বর্ত্তমানে সে ব্যয়ভার বহন করা আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। - সম্পাদক, 'মোসলেম ভারত'।

www.pathagar.com

এবং আমার বিশ্বাস প্রকৃত সাহিত্যামোদী বাঙ্গালী পাঠক ও লেখক-সাধারণের পক্ষ হইতেই আমি এই সুখের কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি। বাঙ্গলার কবি-মালঞ্চে আজকাল দারুণ গ্রীষ্ম আসিয়াছে, মলয় সমীরণের অভাবে ব্যজনীবীজন চলিয়াছে। এ হেন সময়ে নূতন দিক হইতে নূতন হাওয়া বহিতে দেখিয়া গুমটক্লিষ্ট প্রাণে বড়ই আরাম পাইয়াছি। বাঙ্গলা কাব্য-লক্ষ্মীর ভূষণশিঞ্জন, তাহার নটিনীলাঞ্ছন নৃত্যলীলা ও নূপুরনিক্কণ মনোহর হইয়া অবশেষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণহীন শব্দসমষ্টি, কৃত্রিম নিয়ম-শৃঙ্খলিত নীরস-কঠিন ধাতুর আওয়াজ, মানব-কণ্ঠের অকৃত্রিম ভাবগভীর জীবনোল্লাসময় স্বরবৈচিত্র্যকে চাপিয়া রাখিয়াছে; অসংখ্য কাব্যরসমাত্রবঞ্চিত অসার অপদার্থ কবি-যশঃ-প্রার্থীর ঝিল্লিস্বরে বাঙ্গলাকাব্যে অকালসন্ধ্যার অবসাদ ও নির্জীবতা সূচিত হইতেছে। আপনার পত্রিকাতেও হিন্দু কবির সেই ঝিল্লিধ্বনি আছে। কিন্তু কাজী সাহেবের যে দুইটী কবিতা (অন্যগুলি পড়িবার সৌভাগ্য এখনও হয় নাই) পড়িলাম, তাহা দ্বারা মোস্লেম ভারতের গৌরব রক্ষা হইয়াছে, বাঙ্গলা কবিতার মান বাঁচিয়াছে, লেখক ও পাঠকের মধ্যে চিত্তবিনিময় হইয়াছে।

কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব ? বাঙ্গলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দঝঙ্কার ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে এক কালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিণীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতায় শব্দার্থময়ী কণ্ঠ-ভারতীর ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকুতি ও হৃদয়স্পন্দনের সহচর না হইয়া, ইদানীং কেবলমাত্র শ্রবণপ্রীতিকর প্রাণহীন চারু-চাতুরীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাঁহার হৃদয়নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া, মানবকণ্ঠের স্বর-সপ্তকের সেবক হইয়াছে। কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃউৎসারিত ভাবকল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী। "খেয়া পারের তরণী" শীর্ষক কবিতায় ছন্দ সর্ব্বত্র মূলতঃ এক হইলেও, মাত্রাবিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে: ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটী অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্ত্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথায়ও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই; ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে—— কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই—— এই প্রকৃত কবি-শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটী আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায়, যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্ব্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা ভীষণ-গম্ভীর অতি প্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ-বিন্যাস ও ছন্দঝঙ্কারে মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব,——

আবু বকর উস্‌মান উমর আলী-হাইদর
দাঁড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ি-মুখে সারি গান–'লা শরীক আল্লাহ্!'

www.pathagar.com

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দবিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডম্বরু-ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে;— বিশেষ ঐ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য-"লা শরীক আল্লাহ্"— যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য্য প্রয়োগ! ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য-যোজনা বাঙ্গলা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য্য লাভ করিয়াছে।

"বাদল প্রাতের শরাব" শীর্ষক কবিতায় ইরাণের পুষ্পসার ও দ্রাক্ষাসার ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। এ কবিতাটীতেও কবির 'মস্ত' হইবার ও 'মস্ত্' করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালী মাত্রেই ইহার উচ্ছল রসাবেশ অন্তরে অনুভব করিবে। কবির লেখনী জয়যুক্ত হউক।

পরিশেষে একটী বিনীত নিবেদন আছে। যে সকল ফার্সী শব্দ দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার আচার প্রথার সঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমানের নিজ ভাষায় পরিণত হইয়াছে যেগুলি না থাকিলে মুসলমান-জীবনের বাস্তব চিত্র বঙ্গ সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিবে না এবং অনেক স্থলে যে শব্দগুলিই ভাষার একটী ভঙ্গিরূপে পরিগণিত হইবে— সেই গুলিকে আমাদের মত নিরক্ষর হিন্দু-পাঠকের বোধগম্য করিবার জন্য (অন্ততঃ প্রথম কিছু দিন) কি উপায় করিতে পারেন?* নমস্কারান্তে নিবেদন ইতি।

---

* শ্রীযুত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের ন্যায় আরও দুই এক জন সাহিত্যরসিক বন্ধু আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ জানাইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, ঐ শব্দগুলি আমরা জোর করিয়াই বুঝি বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত করিতে চাহিতেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। মুসলমান জন-সাধারণ উঠিতে-বসিতে ঘরে-বাহিরে যে সমস্ত কথা সদা-সর্ব্বদা সহজভাবেই ব্যবহার করিয়া থাকে, সেইগুলি বাদ দিলে বর্ণিত বিষয়ের স্বরূপ (local colouring) ঠিকমত ফুটিয়া উঠিবে না। তবে ফুটনোটে ঐ শব্দগুলির অর্থ দিলে সকলের বোধগম্য হইতে পারে। কিন্তু সে সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে। সর্ব্বপ্রথম কথা হইতেছে এই যে, এমন অনেক আরবী-ফার্সী শব্দ আছে যে গুলির প্রতিশব্দ বাঙ্গলা ভাষায় আদৌ নাই এবং তাহাদের ভাবগত অর্থ প্রকাশ করিতে গেলেও বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। এমত স্থলে অনেক সময় সমাজ চিত্র আঁকিতে বসিয়া ভাষা-তত্ত্বের অবতারণা করিতে হয়। ইহা ছাড়াও ফুটনোটে অর্থ দেওয়া সম্বন্ধে আরও একটু বলিবার আছে। যে সমস্ত কথা আমরা মুসলমানগণ সকলেই বুঝি, সে কথাগুলি আমাদের বাড়ীর পাশের হিন্দু ভাইরা কেন বুঝিবেন না বা বুঝিবার চেষ্টা করিবেন না তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা যখন তাঁহাদের কথাবার্ত্তা, চাল-চলন এমন কি তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি স্তব, পূজা, আরতি, গায়ত্রী, সন্ধ্যা, আহ্নিক প্রভৃতি সর্ব্ব ক্রিয়া-কাণ্ডের সহিত অল্প-বিস্তর পরিচিত, অন্ততঃ সে শব্দগুলি কোন্ কার্য্যের সূচনা করে তাহা যখন অনায়াসেই বুঝিতে পারি, তখন হিন্দু ভ্রাতৃগণ আমাদের মনের ভাব-প্রকাশক সদাব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থগ্রহণ করিতে পারেন না, ইহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয় নহে কি?

যাহা হউক, ফুটনোটে অর্থ দেওয়া আমাদের অধিকাংশ লেখকগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও হিন্দু ভ্রাতৃগণের সুবিধার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা যাইবে। তবে তাঁহাদের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন এ বিষয়ে তাঁহাদের মুসলমান বন্ধুগণের নিকট সহায়তা গ্রহণ করেন। তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের পথ সুপ্রশস্ত হইবে- দেশের সমূহ কল্যাণ সাধিত হইবে। —সম্পাদক, 'মোসলেম ভারত'।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্র ন্থ প ঞ্জি

১. বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ ॥ মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন ॥ জুলাই ১৯৮৫
২. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ॥ আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত ॥ বাংলা একাডেমী ঢাকা ॥ প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯০
৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস ॥ নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান ॥ তৃতীয় প্রকাশ: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা ॥ প্রকাশকাল : ১৯৯২
৪. শহীদুল্লাহ-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ॥ সম্পাদক : আনিসুজ্জামান ॥ বাংলা একাডেমী ঢাকা ॥ প্রথম প্রকাশ : ১৯৯১
৫. মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ॥ সম্পাদক : মনসুর মুসা ॥ বাংলা একাডেমী ঢাকা ॥ প্রথম প্রকাশ : ১৯৯১
৬. নজরুল রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ॥ বাংলা একাডেমী ঢাকা ॥ নতুন সংস্করণ : ১৯৯৩
৭. মনীষা মঞ্জুষা (প্রথম খণ্ড) ॥ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ॥ প্রকাশক : মুক্তধারা ॥ প্রকাশকাল : ১৯৭৫
৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ) ॥ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান ॥ বইঘর, চট্টগ্রাম
৯. বাঙালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য চিন্তা ॥ সম্পাদক : রশীদ আল-ফারুকী ॥ বাংলা একাডেমী ঢাকা ॥ প্রকাশকাল : ১৯৯১
১০. অগ্রপথিক ভাষা আন্দোলন সংকলন ॥ সম্পাদক : মুকুল চৌধুরী ॥ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ঢাকা ॥ প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩
১১. বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসংগে ॥ আসকার ইবনে শাইখ ॥ বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা ॥ প্রথম প্রকাশ : ১৯৯১
১২. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ॥ আব্বাস আলী খান ॥ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা॥ প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৪
১৩. ভাষা লিপি ও সাহিত্য ॥ মুহম্মদ আবূ তালিব ॥ সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ঢাকা ॥ প্রথম প্রকাশ : ১৯৯০
১৪. বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
১৫. বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
১৬. গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন ॥ মাহফুজা খাতুন সম্পাদিত ॥ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ॥ প্রকাশকাল : জুন ১৯৬৮
১৭. কাব্য-বীথি ॥ আবদুল কাদির সম্পাদিত ॥ পাকিস্তান পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা ॥ প্রকাশকাল : ১৯৫৪
১৮. বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখকপঞ্জি (১৪০০-১৯৮৫), ১ম খণ্ড ॥ মোঃ আবদুর রাজ্জাক
১৯. পত্র-পত্রিকা : সওগাত, মাহে নও, নবনূর, ছোলতান, মোহাম্মদী, ঐতিহ্য, উষালোকে, মাসিক কলম, নতুন কলম, মাসিক পৃথিবী, অগ্রপথিকসহ বিবিধ পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা